দুর্গামা

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী

সারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

নিবেদন

সাধুমহাত্মাদিগের লোকোত্তর জীবনসাধনার অনুধ্যান এবং তাঁহাদিগের সুভাষিতাবলী ও সুকার্যাবলীর অনুশীলন মানুষকে শ্রেয়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণগোষ্ঠীর পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা অগণিত নরনারীকে সেই পথেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবং, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার অনন্যসাধারণ জীবনেতিহাস ও কর্মসাধনা ভবিষ্যতেও অনেক মানুষকে লোককল্যাণ এবং ভগবানলাভের পথে অনুপ্রাণিত করিবে।

দুর্গামার সমগ্রজীবন দৈবকৃপায় পরিপুষ্ট। দেবতার আশীর্বাদে তাঁহার জন্ম, শৈশবেই তিনি প্রভুদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথে সমর্পিতা, শ্রীসারদামাতার নিকট তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস, এবং তপস্বিনী গৌরীমাতার নিকট তাঁহার শিক্ষালাভ। তাঁহার প্রসঙ্গে শ্রীসারদামাতা বলিয়াছিলেন, মেয়েটি যেন ঠাকুরের পূজার 'অনাঘ্রাত ফুল।' সত্যই, ভগবানের ঈপ্সিত পথেই তাঁহার জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। তিনি অশেষগুণে ভূষিত, তাঁহার জীবন কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির মিলনতীর্থ। সর্বোপরি, মানুষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সেবায় তথা সমাজের কল্যাণে তিনি যে জীবনব্যাপী কর্মসাধনা করিয়াছেন, তাহা জাতিগঠনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবার যোগ্য। কেবল বঙ্গদেশের এবং ভারতবর্ষের নহে, যে-কোন দেশের পক্ষেই দুর্গামা গৌরবের, —বরণীয় ও স্মরণীয়।

দুর্গামা এবং তাঁহার মাতৃষ্বসা ও পালয়িত্রী গৌরীমার মুখে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা আমরা শুনিয়াছি। দুর্গামার স্নেহাশ্রয়ে অর্ধশতাব্দীকাল বাস করিবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকের হইয়াছে, তাঁহার জীবনের অনেক বিষয়ে আমাদেরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্মকথা কিছু কিছু রহিয়াছে। তাঁহার রচিত "সারদা-রামকৃষ্ণ" এবং "গৌরীমা" গ্রন্থদ্বয় হইতেও আমরা সাহায্য

পাইয়াছি। অধিকন্তু, তাঁহাকে শৈশবাবধি দীর্ঘকাল যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের অনেক কথা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। দুর্গামার ভক্ত এবং গুণমুগ্ধ অনেকের বিবৃতি এবং উক্তিও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আরও একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুর্গামার জীবনের অর্ধাংশেরও অধিক অতিবাহিত হইয়াছে গৌরীমার একান্ত সান্নিধ্যে এবং সমগ্রজীবন ছিল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত। সেইহেতু গ্রন্থে গৌরীমা সম্পর্কিত অনেক কথা এবং আশ্রমের অগ্রগতির ইতিহাস সবিস্তার আলোচনা অপরিহার্য হইয়াছে।

এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহাদিগের নিকট আমরা নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী

দোলপূর্ণিমা
১৩৬৭

সূচীপত্র

দেবাশীর্বাদপূতং জননমসুলভং শৈশবাৎ সাধুসঙ্গং
লব্ধ্বা নীলাদ্রিনাথং পতিমতিবিরলং ব্রহ্মচর্যব্রতঞ্চ ।
বাল্যে দিব্যানুভাবৈঃ পরমসুখময়ী যা সদা স্নিগ্ধমূর্তি-
র্বন্দে দুর্গাপুরীং তাং বিগলিতকরুণাং সারদা-দত্তশক্তিম্ ॥

পূর্বাভাষ

"ভগবানকে যা দান করা যায়, তার ক্ষয় হয় না, তা অমর হয়ে থাকে।"

এই কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বৃদ্ধা সাধুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং এইবার তাঁহার নিকট সবিস্তারে নিজেদের দুঃখের কারণ নিবেদন করিলেন, "পর পর চারটি সন্তান বৌমার কোল ছেড়ে অকালে চলে গেল। গেরস্তের পক্ষে এই ব্যথা যে অসহ্য। এর কি কোন প্রতিকার নেই, বাবা? দৈবকৃপায়, সাধুর আশীর্বাদে মানুষের দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদ দূর হয়, কত অসম্ভবও সম্ভব হয়। আপনি এর একটা উপায় করুন, বাবা।"

সাধু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "উপায় আছে বৈ-কি, মা। তাই তো বললুম,—ভগবানকে যা দেওয়া যায়, তার আর ক্ষয় হয় না। এরপর যে সন্তান আসবে তাকে ভগবানে সমর্পণ করো, তবেই সে বেঁচে থাকবে।"

পার্শ্বে উপবিষ্টা পুত্রবধূ সাধুর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মৃদুস্বরে বলেন, "তাই হবে, বাবা, সন্তান বেঁচে থাকবে তো!"

—"শুধু বেঁচে থাকবে কেন মা! অমর হয়ে থাকবে। অষ্টম গর্ভের সন্তান সুকৃতিযুক্ত হয়, তার আগমনে 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'—বংশ পবিত্র হয়, গর্ভধারিণী কৃতার্থ হন।"

এই বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন।

শান্তিপুরের মুখোপাধ্যায়-গৃহে এতদিনে অকস্মাৎ যেন দুঃখনিশার অবসান হয়, নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে আশার আলো। সাধু যেন এক অশ্রুতপূর্ব সঞ্জীবনমন্ত্রেই উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সমগ্র পরিবারটিকে।
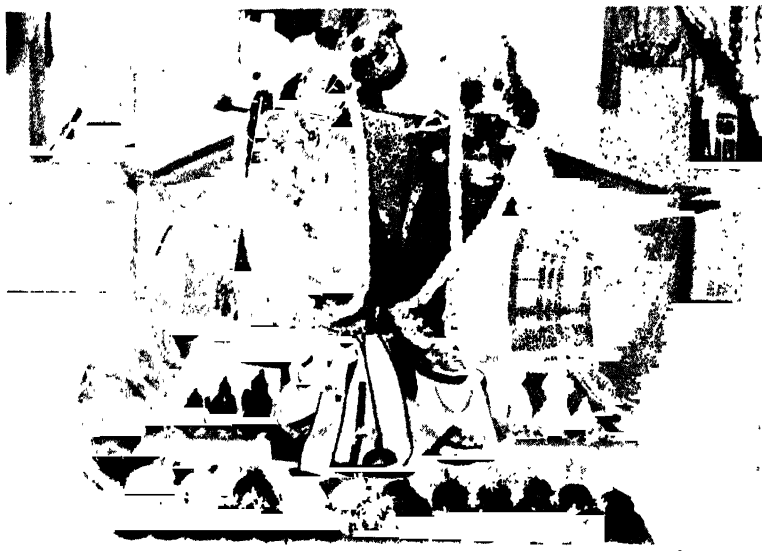
আড়ংঘাটার শ্রীশ্রীযুগলকিশোর

মন্দিরপ্রাঙ্গণে বকুল গাছ

একদিন বৃদ্ধা বলেন পুত্রবধূ ব্রজবালাকে, "চল বৌমা, আড়ংঘাটার ঠাকুরকে অন্তরের প্রার্থনা জানিয়ে আসি।"

আড়ংঘাটার শ্রীশ্রীযুগলকিশোর জাগ্রত দেবতা। কলিকাতা হইতে আড়ংঘাটার দূরত্ব প্রায় ছাপ্পান্ন মাইল, রাণাঘাটের পরেই চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। শান্তিপুর হইতে অবশ্য দূরত্ব অনেক কম। কত দূরদূরান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী আসেন যুগলকিশোরের নিকট মনস্কামনা জানাইতে। কেহ সন্তান কামনায়, কেহ-বা অন্য প্রার্থনা লইয়াও আসেন। মন্দির-সন্নিকটে দেবতার দৃষ্টিপথে একটি বকুলগাছে ঢিল বাঁধিয়া তাঁহারা দেবতার নিকট মনস্কামনা জানান, মানত করিয়া যান। যাঁহাদের অভিলাষ সিদ্ধ হয়, মানত রক্ষা করিতে এবং দেবতার পূজা দিতে তাঁহারা আবার আসেন। এইভাবেই ধর্মপ্রাণ ভক্তদের মুখে মুখে প্রচারিত হয় যুগলকিশোরের কৃপামাহাত্ম্য।

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নির্দেশে ব্রজবালাও আসেন, শুদ্ধাচারে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বকুলশাখায় ক্ষুদ্র একটি ইষ্টকখণ্ডও ঝুলাইয়া দেন,—অভীষ্টদাতা যুগলকিশোরের নিকট আপন প্রার্থনা নিবেদন করিয়া। পরিশেষে সাধুর নির্দেশানুযায়ী দেবতার নিকট অঙ্গীকারও করেন,—'এবার যদি ছেলে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের হাতে তাকে সমর্পণ করবো; আর যদি মেয়ে হয়, মেজদির হাতে তুলে দেবো। না-ই-বা হল সে সংসারী, তবু দেবতার আশীর্বাদে সন্তানটি বেঁচে থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক।'

সেইদিন সেই দেব-দেউলেই মহীয়সী মাতা ব্রজবালা আপনার অনাগত সন্তানকে মানসে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

বংশ-পরিচিতি

ব্রজবালার স্বামীর নাম বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, নিবাস নদীয়া জিলার শান্তিপুরে। বহুকাল হইতেই জাহ্নবীবিধৌত শান্তিপুর প্রসিদ্ধ স্থান, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের লীলাধন্য তীর্থ। তাঁহাদের উভয়ের প্রেমবন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।" বঙ্গদেশের ইতিহাসে নদীয়া, শান্তিপুরের মাহাত্ম্য বহুভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

বিপিনবিহারীর পিতার নাম রামযাদু (অন্য নাম যদুনাথ), পিতামহ রামহরি মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমানে। রামযাদুর বিবাহ হয় শান্তিপুরে—প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা উজ্জ্বলা দেবীর সহিত। রামযাদুর পুত্র বিপিনবিহারী মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া শান্তিপুরেই বসবাস করিতে থাকেন এবং ব্যবসাবাণিজ্যদ্বারা সমৃদ্ধ হন। তিনি সাধুদেবতায় ভক্তিযুক্ত এবং সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ব্রজবালার পিতা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস হাওড়া জিলার অন্তর্গত শিবপুরে। তিনিও ছিলেন নিষ্ঠাবান ও ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী দক্ষিণ-কলিকাতায় ভবানীপুরে মাতার বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া সেখানেই বাস করিতেন। গিরিবালার মাতা ছিলেন কালিদাসী দেবী, পিতা নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়। নন্দ-কুমারের আদি নিবাসও শান্তিপুরের অদূরে, কিন্তু পত্নী কালিদাসীর সম্পত্তিসূত্রে তিনি ভবানীপুরেই বাস করিতেন।

গিরিবালা দেবী ছিলেন অশেষগুণসম্পন্না—বিদুষী, সদাশয়া, তেজস্বিনী, এবং সর্বোপরি কালীমাতার পদাশ্রিতা মহাসাধিকা। তিনি বহু মাতৃসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। 'নামসার' নামক পুস্তিকায় তাহার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।* কালিদাসীও

* নামসারের ভূমিকায় কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিয়াছেন, "শাক্তসঙ্গীত যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে কোন মহিলা কবির নাম আমরা

ছিলেন ভক্তিমতী এবং সাধিকা। গিরিবালার দুই পুত্র—নবকুমার ও অবিনাশচন্দ্র, এবং পঞ্চকন্যা – বিপিনকালী, মৃড়ানী, জগদ্ধাত্রী, ধীমহি ও ব্রজবালা (অন্য নাম বিজয়া)। তন্মধ্যে মৃড়ানী ছিলেন অলোক-সামান্যা—তপস্বিনী, পরিব্রাজিকা, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবিকা। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা এবং শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী, ভক্তসংঘে 'গৌরীমা' নামে সমধিক পরিচিতা। মৃড়ানীর অর্থাৎ গৌরীমাতারই কনিষ্ঠা সহোদরা ব্রজবালা।

গৌরীমাকে নিমিত্ত করিয়া তাঁহার জননী গিরিবালা, কনিষ্ঠা ব্রজবালা এবং আরও কয়েকজন আত্মীয় দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীশ্রীসারদা মাতাঠাকুরাণীর দর্শন পাইয়াছিলেন। ঠাকুর-ঠাকুরাণীও দক্ষিণ-কলিকাতায় গিরিবালার গৃহে পদার্পণ করেন। গিরিবালার কণ্ঠে তাঁহার রচিত মাতৃসঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুর প্রীত হইতেন। গৌরীমার আত্মীয়বর্গ ঠাকুর-ঠাকুরাণীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ঠাকুরের দেহে ব্রজবালা স্বীয় ইষ্টমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণীকে তিনি এতই ভক্তি করিতেন যে, অনেক বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিয়া সেইমতেই তিনি কার্য করিতেন। তাঁহার এক পুত্রও ঠাকুর-ঠাকুরাণীর দর্শন ও আশীর্বাদলাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

একদিনের এক ঘটনা ঃ

"তিন-চারি বৎসর বয়সের এক সুদর্শন শিশু আসিয়া ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিল। সম্মুখে শ্মশ্রুমণ্ডিত অপরিচিত ব্যক্তি, পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইবার জন্য মায়ের উৎসাহ; মনে ভয় ও কৌতূহল

পাই নাই। গিরিবালা দেবীই বোধ হয় প্রথম শাক্তসঙ্গীত রচয়িত্রী।... গিরিবালা দেবী স্কুলকলেজের শিক্ষালাভ না করিলেও আপনগৃহে একনিষ্ঠভাবে সারস্বতসাধনা করিয়া বিদুষী হইয়া উঠেন। তাঁহার সারস্বত সাধনার রূপ তিনি ভাগবত সাধনায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। গানগুলিতে কেবল গভীর ভক্তি নয়, গভীর জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।"

লইয়া শিশু ঠাকুরের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হয়। একে সরল শিশু, তদুপরি সচকিতভাব, বেশ লাগে ঠাকুরের, অভয় দিয়া ডাকেন,—আয়, এখানে আয়। কোন ভয় নেই, সন্দেশ খেতে দেবো।

নিকটে আসিলে ঠাকুর তাহাকে আদর করিয়া দুই হাতে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুই কাদের ছেলে রে?

আদর পাইয়া শিশু হাসে, কথা কয় না।

—নাম কি তোর, বল্-না?

—শিবকালী।

—বাবার নাম বল্। কার সঙ্গে এলি এখানে?

শিশুর অসহায় চক্ষু কাহাকে যেন অনুসন্ধান করে বাহিরের দিকে। ব্রজবালা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইলেন।

—ওঃ, তাই বল, তোমার খোকা বুঝি? বেশ নামটি।" (১)

ইনিই ব্রজবালার দ্বিতীয় পুত্র। এই পুত্র সংসারে নিরাসক্ত ছিলেন। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ব্যক্তিদিগের সাহচর্যে আসিয়া দেশের এবং সমাজের সেবাতেই তাঁহার দেহমন অধিক সময় নিযুক্ত থাকিত, সুতরাং নিজের সংসারের সেবায় মনোনিবেশের অবসর ছিল অল্পই।

ব্রজবালার পুত্রসন্তান ছিলেন ছয়টি—কালীকিঙ্কর, শিবকালী, বঙ্কিমবিহারী, রাকেশবিহারী, রাখালবিহারী ও টুলু, এবং কন্যা দুইটি—দেবলক্ষ্মী ও যুগলকিশোরী। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করেন। শিবকালী এবং যুগলকিশোরী দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন; বঙ্কিমবিহারী ও দেবলক্ষ্মী দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই, কিন্তু সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন।

(১) শ্রীদুর্গামাতা-রচিত 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। অতঃপর এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি-স্থলে কেবল (১) লেখা থাকিবে

আমাদের দেশে মাতৃগণ সাধারণতঃ পুত্রধনে গর্বিত এবং পুত্রের নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। ব্রজবালা একাধিক পুত্রের মাতা হওয়া-সত্ত্বেও 'বঙ্কিমের মা' নামেই পরিচিতা ছিলেন। ইহাতে প্রিয়দর্শন এবং শান্তস্বভাব বঙ্কিমের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। এই ভাগ্যবান সন্তানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ত্যাগী ভক্তদিগের স্নেহাশিসও লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তগণ অনেকেই দক্ষিণ-কলিকাতায় গৌরীমাতার মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন। ব্রজবালার সহিতও তাঁহাদের পরিচয় ছিল এবং সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় উত্তর-কলিকাতায় বলরাম-ভবনে। এইস্থানে বাসকালে গৌরীমা একবার বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঐ সময়ে বলরাম-ভবনে বাস করিতেন। বলরাম বসুর সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী এবং মিশনের প্রথম সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ গৌরীমার চিকিৎসার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। সংবাদ পাইয়া গৌরীমার আত্মীয়বর্গ আসিলেন, ব্রজবালাও আসিলেন। রোগের গুরুত্ব বুঝিয়া ব্রজবালা বলেন,—'এ সেবা আমারই করণীয়, আর কারুর দরকার হবে না।' সেইদিন হইতেই তিনি পুত্র বঙ্কিমবিহারীসহ বলরাম-ভবনে রহিয়া গেলেন, গৌরীমা রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত। ব্রজবালার আন্তরিক ও অক্লান্ত সেবা, তাঁহার ধীরতা, সরলতা এবং মধুর স্বভাব সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। গৌরীমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজগণ সুশীলা ব্রজবালা দেবীর সংবাদাদি লইতেন।*

---

* গৌরীমাতার নিকট বরাহনগর মঠ হইতে সারদানন্দজী-লিখিত এক পত্র (২৪.১১.১৮৯৫)— বঙ্কিমের মা কোথায় এবং কেমন আছেন? তাঁহাকে নমস্কার।…আমার শত শত প্রণাম ইত্যাদি ইত্যাদি জানিবেন। যদি বিলাত যাওয়া হয় তো দেখা করিয়া যাইব।…নরেন্দ্রের চিঠি আসিলে স্থির হইবে। ইতি শরৎচন্দ্র।

ব্রজবালার বংশপরিচয় এবং দৈবানুকূল্যের পর্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার মাতামহী, মাতা এবং সহোদরা সকলেই মহাসাধিকা। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, জগন্মাতা শ্রীসারদা দেবী এবং সাধুসন্ন্যাসিগণের আশীর্বাদলাভে তিনি ধন্যা হইয়াছিলেন। সাধু-দেবতার আশিসধন্যা ব্রজবালা কেবল গুণবতীই ছিলেন না, সংসার-মধ্যে বাস করিয়াও তিনি ছিলেন সংসার-অনাসক্তা, সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি। সংসারের যাবতীয় কর্তব্যপালন করিয়াও তিনি চিত্তকে ঊর্ধ্বদিকে—ইষ্টপাদপদ্মে নিবদ্ধ রাখিতেন, গভীর রাত্রিতে জপধ্যান করিতেন। কোন কোন সময় এমন তদ্‌গত হইয়া থাকিতেন যে, বহির্জগতের বোধ থাকিত না, তন্ময়তায় রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। তাঁহার স্বামীও ছিলেন সজ্জন এবং ধর্মনিষ্ঠ। এইরূপ অনুকূল ক্ষেত্রেই যুগে যুগে মহামানবের শুভ আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। অনুরূপ শুচিসুন্দর পরিবেশের মধ্যেই ভক্তিমতী ব্রজবালার অষ্টমগর্ভে আবির্ভূত হয় দিব্যলক্ষণযুক্ত এক কন্যারত্ন।

আবির্ভাব

১৩০৩ বঙ্গাব্দ। শরৎকাল। স্নিগ্ধ শ্যামল বনানীতে, শস্যভারাবনত ধান্যক্ষেত্রে, ভরা-যৌবনা নদীর কলোচ্ছ্বাসে, পুলকচঞ্চল বিহঙ্গের কলকূজনে, আকাশে বাতাসে,—সর্বত্র তখন আগমনী সুর। মা আনন্দময়ীর শুভাগমনে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ সেদিন উৎসবমুখর।

আসন্নপ্রসবা ব্রজবালা তখন ভবানীপুরে—মাতুলালয়ে। অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনায় অন্তর তাঁহার পরমানন্দে পূর্ণ; প্রাণ চায় দৈব কার্যে দেহমনকে লিপ্ত রাখিতে, প্রতিটি মুহূর্তকে অতিবাহিত করিতে তচ্চিন্তায়। অনেকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাষ্টমী দিবসে কালীঘাটের মন্দিরে কালীমাতার ভোগরন্ধনের ভার তাই তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন।* এদিকে মনের মধ্যে নানারূপ আশঙ্কাও দেখা দেয়, অন্তরের আকুতি তাই জানান জগজ্জননীকে,—করুণাময়ী মাগো, আমাকে নিমিত্ত করে তোমার ভোগপূজোয় যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে। মাতাও প্রসন্না। মহাষ্টমীর পূজা সুসম্পন্ন; সন্ধিপূজাও নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল।

পরদিবস ৩০-এ আশ্বিন, (১৫ই অক্টোবর, ১৮৯৬), বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে, মহানবমীতিথিতে ভাগ্যবতী ব্রজবালার এক সুলক্ষণা কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। পূজামণ্ডপে তখন মায়ের অর্চনা আরম্ভ হইয়াছে, বাদ্য ও শঙ্খের মঙ্গলধ্বনিতে দশদিক আনন্দমুখরিত।

* কালীঘাটের শ্রীশ্রীদক্ষিণাকালী মাতার জনৈক অভাবগ্রস্ত সেবায়েতের নিকট হইতে ব্রজবালার মাতামহী শক্তিসাধিকা কালিদাসী দেবী মায়ের সেবা-পালা ক্রয় করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ দিবসে পরিবারস্থ মাতৃবৃন্দ ভোগরন্ধন করিয়া মা-কালীকে নিবেদন করিতেন। মন্দিরচত্বরে ভোগ রন্ধনের নিমিত্ত তাঁহাদের একখানি পৃথক ঘরও ছিল।

যুগলকিশোরের 'দোর-ধরা' বলিয়া পিতৃকুল কন্যার নামকরণ করিলেন—'যুগলকিশোরী'। সংক্ষেপে ডাকা হইত যুগল, আর আদরে যুগা। মাতৃকুলের শক্তিসাধনা, তদুপরি মহানবমী পূজাদিবসে আগমনহেতু তাহার নামকরণ হইল—'নবদুর্গা', যাহার সংক্ষিপ্ত ও সুপ্রচলিত নাম—দুর্গা।

কন্যা জাত হইবার একমাস পরে গঙ্গাস্নানান্তে ব্রজবালা উত্তর-কলিকাতায় বাগবাজারে শ্রীসারদামাতার নিকট উপনীত হইয়া কন্যাকে তাঁহার চরণতলে রাখিয়া বলেন, "মা, এটি আপনার মেয়ে।" শ্রীমাতা পরম আদরে কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। সেই লগ্নেই কন্যার উৎসর্গিত জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হইল।

এইবৎসর দুর্গাপূজায় পুরুলিয়ার ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে গৌরীমা তথাকার পূজামহোৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। এই শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই তাহার গর্ভধারিণীকে গৌরীমা বলিয়াছিলেন, "বিজু, এবার তোর মেয়ে হবে। মেয়েটিকে আমায় দিস।" বিজু—বিজয়া অর্থাৎ ব্রজবালা তাঁহার মেজদিদি গৌরীমাকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি ও মান্য করিতেন, তদুপরি সাধু-দেবতার নিকট সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে স্বীকৃতি দান করেন। গৌরীমা কন্যার আগমনবার্তা শ্রবণ করেন পুরুলিয়ায় থাকিতেই। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করিলে ব্রজবালা পুনরায় স্বীকৃতি জানাইলেন।

ইহার কিছুকাল মধ্যেই দুই ভগিনী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-মানসে পুরীধামে গমন করেন। এই যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তথায় তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ সবিশেষ জানা যায় না, কিন্তু আমাদের এইরূপ প্রত্যয় যে, কন্যার ভবিষ্যজীবনের এক অতিগুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনার সহিত এই তীর্থযাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ইহাও আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুই ব্রজবালার ইষ্টদেবতা।

অতঃপর ব্রজবালা শান্তিপুরে পতিগৃহে গমন করেন। কন্যার

পিতা এবং আত্মীয়পরিজনের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই শিশুর আগমনের পর তাঁহাদের সংসারে বৈষয়িক ব্যাপারে নানাবিধ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সকলের বিশ্বাস হইল, এই সুলক্ষণা কন্যাই ইহার কারণ। এইহেতু তাহার উপর সকলের স্নেহবাৎসল্যধারা সমধিক বর্ষিত হইতে লাগিল।

শৈশবের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা।

একদিন কন্যাকে ভূমিতে শয়ন করাইয়া জননী কার্যান্তরে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এমনসময় একজন কক্ষদ্বারে আসিয়া দেখেন,—নিদ্রিত শিশুর মস্তকের উপর একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে। তিনি 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চীৎকার করিতেই সেখানে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এমতাবস্থায় কি করা যায়? আতঙ্কে সকলের বক্ষ কম্পিত। সর্পকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কা আছে। ভীতিবিহ্বল চিত্তে সকলে সঙ্কটনাশিনী শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কেহ শিবশঙ্করের নামে মানত করিলেন। অনতিবিলম্বে সর্প ধীরমন্থর গতিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রুদ্ধশ্বাসে ব্রজবালা এতক্ষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, এইবার ত্বরিতগতিতে গিয়া নিদ্রিত শিশুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, শিরে চুম্বন করিলেন।

অতঃপর শ্বশ্রূমাতা বলেন বধূমাতাকে, "শীগ্যির চল একদিন আড়ংঘাটায়। ঠাকুরের মানত বাকী রয়েছে।" গেলেন আড়ংঘাটায় শ্বশ্রূমাতা বধূ ও কন্যাসহ। শ্রীশ্রীযুগলকিশোরকে মহাসমারোহে পূজা দেওয়া হইল।

দেবতার অনুগ্রহে সর্পদংশন হইতে কন্যা রক্ষা পাইল। কিন্তু পরবর্তী বিজয়াদশমী দিবসে ব্রজবালা ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুমাত্রই দুঃখের, দেবীবিসর্জনের দিনটিও স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর পক্ষে বিষাদময়। সুতরাং এই অকালমৃত্যু সমধিক করুণ। ততোধিক মর্মান্তিক—শিশুকন্যার এই সময়ের অসহায় অবস্থা। তাহার জননী

তক্তপোষের উপর শায়িতা, স্তন্যসুধা দিবার জন্য অনেকক্ষণ তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইতেছেন না। পিতামহীর ক্রোড় হইতে ক্রন্দনরত শিশু বারংবার তাহার জননীর নিকট যাইবার জন্য ক্ষুদ্র দুইখানি বাহু প্রসারিত করিতেছে। জননীর সাড়া না পাওয়ায় ক্রন্দন দ্বিগুণতর হইতেছে, অশ্রুধারায় গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। কাতরকণ্ঠে শিশু কাঁদিতে থাকে, "মা ওতো, ও মা ওতো।"

আত্মীয়পরিজন ব্রজবালাকে ঘিরিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। শিশু তখন অনন্তনিদ্রামগ্না জননীর তক্তপোষের একবার এ পায়া, আবার অন্যপায়া ধরিয়া তাঁহার দেহ স্পর্শ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে, এবং আকুলভাবে কাঁদিতেছে—"মা ওতো, ও মা ওতো।"

শৈশবে

মাতৃহারা শিশুকে মাতুল ও মাতুলানী দক্ষিণ-কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। মাতামহী ও মাতুলের স্নেহযত্নে এবং অন্যান্য সমবয়সী শিশুর সাহচর্যে সে বর্ধিত হইতে লাগিল। পিতা বিপিনবিহারী মধ্যে মধ্যে আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতাও আসেন এবং কন্যার উপর ধীরে ধীরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। এই শিশুকাল হইতেই তিনি তাহার আহার ও অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করিতে লাগিলেন। দেবতার নামে যাহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে, পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত তাহার অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ রহিল। কেবল দুগ্ধ এবং ফলাদি তাহাকে আহার করিতে দেওয়া হইত। এইভাবে জন্মাবধিই শিশুর ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা।

ইতিপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে এবং শ্রীসারদামাতার অনুপ্রেরণায় গৌরীমাতা মাতৃজাতির কল্যাণে কলিকাতার অনতিদূরে বারাকপুরে গঙ্গাতীরে ১৩০১ সালে (ইংরাজী ১৮৯৫) গুরুপত্নীর পুণ্যনামে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আশ্রমে কন্যাদিগকে গৌরীমা ভারতের সনাতন আদর্শে শিক্ষাদান করিতেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তাঁহার মনে এক চিন্তা জাগে—ভবিষ্যতে এই আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব তিনি কাহার উপর ন্যস্ত করিবেন। তাঁহার প্রিয়তম আরাধ্যদেবতা শ্রীশ্রীদামোদরজীউর সেবা-পূজার ভারই-বা নিশ্চিন্তে তুলিয়া দিবেন কাহার হস্তে।

'দেবী' (দেবলক্ষ্মী) নাম্নী ব্রজবালার অপর কন্যাকেও তিনি মধ্যে মধ্যে কুমারী-পূজার উদ্দেশ্যে নিকটে আনিয়া রাখিতেন। কন্যার পিতা গৌরীমাকে ভক্তি করিতেন, কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিতেন না। নবজাত কন্যাকে দেখিয়াই গৌরীমা বুঝিয়াছিলেন,—এই শিশুকন্যা সুলক্ষণযুক্তা, দৈবীগুণসম্পন্না, ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য-সিদ্ধির যোগ্য সহায়ক হইবে।

আড়াই-তিন বৎসর বয়স হইতেই এই কন্যার আশ্রমজীবনের সূচনা হয়। কখনও কয়েকদিবস সে বারাকপুর আশ্রমে বাস করিত, কখনও পিতা বা মাতামহীর নিকট চলিয়া যাইত; আবার গৌরীমার আকর্ষণে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত। তাহার সেবক ও প্রহরিরূপে থাকিত হিন্দুস্থানী মংরুরাম। তাহাদের উভয়ের প্রতিই উভয়ের আকর্ষণ ছিল গভীর।*

কন্যা যখন আশ্রমে থাকিত, গৌরীমা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনানুযায়ী তাহাকে শিক্ষাদান করিতেন। এই সময়েই তাঁহার নিকট শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়। গীতা, চণ্ডী, ভাগবত হইতে নির্বাচিত অংশ এবং দেবদেবীর স্তবস্তোত্র গৌরীমা তাহাকে মুখস্থ করাইতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্ফুট ভাষায় সে ঐ সকল আবৃত্তি করিত, শ্রোতাদের কর্ণে যেন তখন মধুবর্ষণ হইত। উত্তরকালে গৌরীমার নিকট আমরা শুনিয়াছি, বাল্যকালে রাত্রে নিদ্রার মধ্যেও কন্যা গীতার অংশবিশেষ অভ্যাসবশে বলিয়া যাইত। প্রাতঃকালে ঠাকুরনামের পর তবে সে আহার পাইত, তৎপূর্বে নহে। এইসকল কঠোর নিয়মে সে ক্রমশঃ এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহাতে তাহার কোন কষ্টবোধ হইত না। গৌরীমার অনুশাসন ও প্রতিটি নিয়ম কন্যা সানন্দে মানিয়া চলিত।

একদিন গৌরীমা তাহাকে দেবীপ্রণামের মন্ত্র শিখাইতেছিলেন—"শরণ্যে ত্র্যম্-বকে গৌরি! নারায়ণি! নমোঽস্তুতে।" সরল শিশু ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মামণি, এই গৌলিও তোমাল মত বকে?" প্রশ্ন শুনিয়া গৌরীমা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। এমন প্রাণখোলা হাসিতে শিশু বুঝিল, না, ভয়ের কোন কারণ নাই। তখন সে খুশিমনে মামণিকে জড়াইয়া ধরিল।

* মংরু যখন বৃদ্ধ, মনিবের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি, তখনও সে কলিকাতাস্থ এই আশ্রমভবনে তাহার স্নেহের সেই পালিতা কন্যাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার আসিয়াছে।

গৌরীমা অনেক দেবদেবীর মূর্তি শিশুকন্যাকে দিয়াছিলেন, তাঁহাদের লইয়া তাহার পূজা ও খেলা—দুইই চলিত। গৌরীমা পূজাপাঠে বসিবার পূর্বে তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "খুকি, আমি এখন পূজোয় বসবো, তুমিও তোমার ঠাকুরের পূজো কর, গোল করো না।" মামণির নির্দেশপালনের ব্যতিক্রম কদাপি হইত না। কিন্তু আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে গুল্মলতাসমাচ্ছন্ন অগণিত যে দীর্ঘকায় বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান, বায়ুতাড়নায় তাহাদের পত্রপল্লবে যখন মর্মরধ্বনি উঠিত, তাহাদের শাখায় শাখায় পক্ষিকুল দলে দলে আসিয়া যখন আনন্দের অথবা কলহের কলরব তুলিত, মামণির পূজাধ্যানের বিঘ্ন দূর করিতে শিশু তাহার পূজার আসন ত্যাগ করিয়া আসিত এবং ক্ষুদ্র তর্জনী বা ক্ষুদ্র একখণ্ড ভগ্ন শাখা দেখাইয়া অস্ফুট কথায় তাহাদিগকে শাসন করিত, 'এই দুত্তু্ তোমলা গোল কলো না, মামণি দপ কত্তে, বব্‌বে, তোমলা তুপ কলো।' তাহারা নীরব হইলে সেও নীরবে বসিয়া পূজা অথবা ঠাকুর লইয়া খেলা করিত।

এক পূর্ণিমারাত্রিতে বালিকা ঘর ছাড়িয়া নিভৃতে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়াছে, প্রহরী মংরু পার্শ্বে উপবিষ্ট। চন্দ্রকিরণ নিস্তরঙ্গ গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিয়াছে। কখনও বৃহদাকার নৌকার দাঁড়ের আঘাতে বিক্ষুব্ধ খণ্ড খণ্ড তরঙ্গের উদ্ভব হইতেছে, চন্দ্রও যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। এইরূপ মনোরম দৃশ্যদর্শনে কন্যার মনে মহা-আনন্দের সঞ্চার হয়, নিবিষ্টচিত্তে প্রকৃতির এই রূপমাধুরী সে পান করিতে থাকে। এমন সময় গৌরীমার সশঙ্ক চীৎকার—"খুকি, ও খুকি। এই রাত্রে মেয়ে গেল কোথায়!" মংরুর সাড়ায় সেইস্থানে আসিয়া দেখেন, কন্যা ভাব-বিভোর। গৌরীমার করস্পর্শে তাহার ভাবভঙ্গ হয়, উদ্বেলিত কণ্ঠে বলে, "মামণি, ছ্যাতো, ছ্যাতো, তন্‌গায় কি তুন্‌দল তাদ তেচে তেচে তয়েচে"—(দেখ দেখ, গঙ্গায় কি সুন্দর চাঁদ ভেসে ভেসে চলেছে)। এই মনোরম দৃশ্য দর্শনের জন্য সানন্দে মামণিকেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল।

কন্যাটি আশৈশব এতই ধীর স্থির সুশীলা ছিল যে, সকলেই তাহার ধীরতা ও গাম্ভীর্য দর্শনে মুগ্ধ হইত। কেবল তাহাই নহে, এই শৈশব হইতেই বালিকার এক আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তিও ছিল। আশ্রমে যে কয়দিন সে বাস করিত, সেই কয়দিনই আশ্রমবাসিনী সকলের এবং প্রতিবেশীদেরও হৃদয় ও নয়নের আনন্দস্বরূপ হইয়া থাকিত। তাহার অনুপস্থিতিতে সকলেরই যেন শূন্যবোধ হইত।

এইভাবে কখনও বারাকপুর আশ্রমে, কখনও ভবানীপুরে মাতামহীর গৃহে বাস করিয়া শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় কন্যার দেহ ও বয়স বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বয়স এখন চারি বৎসর, গৌরীমার হিসাবে গর্ভবাসের দশমাস সহ পাঁচ বৎসর। হৃষ্টপুষ্ট দেহখানি, বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, সুশ্রী ও লাবণ্যময়। কয়েকখানি অলঙ্কারও উঠিয়াছে অঙ্গে,—মানাইয়াছে সুন্দর।

বাগ্‌দত্তা

—পাঁচ বছরেরটি তো হলো বিজুর মেয়ে। আর দেরী করা ভাল হবে না। শুভস্য শীঘ্রম্‌।

—কি করতে চাও তুমি ?

—মেয়ের মা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সন্তানকে ভগবানে সমর্পণ করবে।

—তা কিভাবে হবে, খুলে বল।

—পুরীর মন্দিরে পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করা হবে। ঘটা করে বিয়ে হবে।

—পাণ্ডারা রাজি হবে ?

—সে আমি বুঝবো, তুমি রাজি আছ কি-না তাই আগে বল।

—তোমাকে আমি মা হয়ে দেবতার পায়ে সমর্পণ করতে পেরেছি, একেও পারবো। কিন্তু এক্ষুণি এত তাড়াহুড়ো কেন ? গৌরীদান তো আট বছর বয়সে।

—না, অত দেরী নয়। পাঁচ বছরেই সম্প্রদান করা হবে। যতদিন সম্প্রদান না হয়, ততদিন তো ওর ভাত খাওয়া চলবে না।

—তা তো বুঝলুম, কিন্তু মেয়ে তো আমার নয়। মেয়ের বাবার সম্মতি নিতে হবে। পিতামহী শক্ত মানুষ, তাঁকে রাজি করাতে পারবে ? তাঁদের মত আগে নাও।

গৌরীমাতা ও তাঁহার গর্ভধারিণীর মধ্যে এইপ্রকার আলোচনা হইবার পর শান্তিপুরে গিয়া গৌরীমা আপনার বক্তব্য কন্যার পিতা ও পিতামহীকে বলেন। দীর্ঘকাল পূর্বেকার প্রতিশ্রুতির বিষয় পিতামহী ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, অথবা বাস্তবজীবনে ইহার কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পিতা ধর্মভীরু ব্যক্তি, স্বর্গতা পত্নী যে দেবতার নিকট কন্যাকে দান করিবার কথা দিয়াছিলেন, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই, অথচ জগন্নাথদেবের সহিত কন্যার আনুষ্ঠানিক

বিবাহেও অন্তরের সম্মতি দিতে পারিলেন না, স্পষ্টভাষায় প্রতিবাদেও সাহসী হইলেন না।

শিশুকন্যার আহারে ও জীবনযাত্রায় যে বহুপ্রকার নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে গৌরীমার উপর পিতামহী প্রসন্ন ছিলেন না, বলিলেন, "বেশ তো, ঠাকুরের উদ্দেশে মেয়েকে সমর্পণ কর, কিন্তু ঘটা করে বিয়ে দেওয়া কেন, বাপু? মা-মরা মেয়ে, ওর ভবিষ্যতের ভালমন্দ আমাদেরই তো দেখতে হবে। তা ছাড়া, বামুনের মেয়ে, পরে ওর বিয়ে দিতে যদি বাধা না দাও, তবে দেবতায় সমর্পণে আমাদের আপত্তি নেই।"

—বামুনের মেয়ের কি দুবার বিয়ে দেবেন আপনারা?

—মানুষের মেয়ের সঙ্গে মন্দিরের বিগ্রহের বিয়ে দেওয়াটাই-বা কেমনধারা কথা? এও কি হয় না-কি?

—হ্যাঁ, এমন নজীর রয়েছে। পুরীর মন্দিরেই হয়েছে। দেবতা-কেই স্বামী বলে স্বীকার করতে হবে। জগতের নাথ রাজরাজেশ্বরের লক্ষ্মী হবেন আপনার ঘরের মেয়ে, এ কত বড় সৌভাগ্যের কথা!

—তা বটে, কিন্তু আমরা মুখ্যুসুখ্যু গেরস্ত মানুষ, এসব ব্যাপার বুঝতে পারি না। বড় হলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, নইলে সমাজে আমাদের নিন্দে হবে। লোকে বলবে, বাপ আবার একটা বিয়ে করে, দেবতার নাম করে মা-মরা মেয়েটাকে বিদেয় দিয়েছে।

গৌরীমা বুঝিলেন, সহজ পথে কার্যোদ্ধার হইবে না। উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সাধুর কাছে আপনারা কথা দিয়েছিলেন, দেবতার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,—মনে আছে সে সব? মেয়ে তো বাগ্‌দত্তা হয়েই আছে, এখন কি দেবতাকে ফাঁকি দিতে চান? তাতে কি মেয়েরই কল্যাণ হবে? না, সংসারের মঙ্গল হবে? বিষয়টা ভাল করে তলিয়ে দেখুন আপনারা।"

যোগিনীমাকে আত্মীয়স্বজন সকলেই যেমন শ্রদ্ধা করিতেন, তেমন ভয়ও করিতেন। তাঁহার মুখ হইতে অভিসম্পাত বাহির হইলে সংসারের অমঙ্গল হইবে,—সকলেই এইরূপ আশঙ্কা করিতেন।

পিতামহী আতঙ্কিত হইলেন, ভাবিলেন,—আপাততঃ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই শ্রেয়, পরে যাহা হয় হইবে। বলিলেন,—না, মা, দেবতাকে ফাঁকি দেবো কেন? মেয়ের বাপের যখন আপত্তি নেই, তাই হবে।

কন্যার পিতাকে গৌরীমা বলিলেন,—পুরীধামে গিয়ে কন্যাসম্প্রদান তোমাকেই করতে হবে। ওদিককার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে আমি তোমাকে তারিখ জানাবো।

শান্তিপুর হইতে আনন্দিত মনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন গৌরীমা, এবং শ্রীসারদামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যাসম্পর্কিত সকল কথা নিবেদন করিলেন। পূর্বাপর বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীমাতা সন্তুষ্ট-চিত্তে আশীর্বাদ জানাইলেন।

দেবে আর মানবে বিবাহ।—পাত্র স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব এবং পাত্রী পঞ্চমবর্ষীয়া এক মানবকন্যা!

অভিনব এই বিবাহের উদ্যোগপর্ব আরম্ভ হইল।

পাত্রীর অলঙ্কার ও বস্ত্র এবং পাত্রের যৌতুক,—বিবাহানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। সর্বাধিক অর্থ-সাহায্য করিলেন কন্যার মাতামহী গিরিবালা দেবী এবং গৌরীমাতার শিষ্যা কেশবমোহিনী দেবী। পাত্রীর পিতা এবং মাতুলও কিছু কিছু অলঙ্কার উপহার দিলেন। অন্যান্য আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদিগের কেহ কেহও এবিষয়ে সহযোগিতা করেন।

শ্রীসারদামাতা আশীর্বাদরূপে কন্যাকে দিলেন একখানি বেনারসী সাড়ী ও একজোড়া স্বর্ণনির্মিত চূড় এবং দেবজামাতার জন্য দিলেন ধান দূর্বা-সুপারি-বাঁধা চেলীর জোড়। শুনিতে অদ্ভুত হইলেও, কন্যার বিবাহের জন্য যে অলঙ্কার নির্মিত হয়, তাহার অনেকগুলিই হইয়াছিল শ্রীমাতার অঙ্গের পরিমাপ অনুযায়ী। কারণ, ভক্তিমতী গৌরীমাতার কর্তৃত্বাধীনে যাহা নির্মিত হয়, সেইসকল অলঙ্কার সর্বাগ্রে ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর দেব-অঙ্গে ধারণ করাইয়া তৎপরে সেই স্পর্শপূত অলঙ্কারে কন্যার দেহ সজ্জিত করা হয়। এমন-কি শ্রীমাতা-প্রদত্ত চূড়ও গৌরীমাতার নির্দেশানুযায়ী স্বামী সারদানন্দজী মাতা-ঠাকুরাণীর হস্তের পরিমাপেই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকার পক্ষে ঐ সকল আভরণ বৃহত্তর হওয়ায় বলয়াকারের অলঙ্কারগুলির ভিতরের দিকে মখমল কাপড় জড়াইয়া তবে তাহা বালিকার ধারণোপযোগী করা হইয়াছিল।

এই বিবাহব্যাপারে সকলেরই অদম্য কৌতূহল! কী যে ঘটনা ঘটিবে, সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট কোন ধারণা নাই। কন্যার কৌতূহলও কম নহে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই কতপ্রকার পরিকল্পনা

ও আলোচনা চলিয়াছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত যে কী সংঘটিত হইবে, তাহা তাহার অনুমানের সম্পূর্ণ বাহিরে।

অবশেষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভাবী বধূসহ গৌরীমাতা পুরীতীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন কন্যার মাতামহী, মাতুল, কেশবমোহিনী দেবী, জগৎমোহিনী দেবী, নলিনচন্দ্র রায় (কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট) এবং আরও দুই-একজন।

এইপ্রকার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি-না,—সে বিষয়ে পাণ্ডা এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে তাহা গৌরীমা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। সুতরাং পুরীযাত্রার পূর্বেই কলিকাতা, ভাটপাড়া ও বারাণসীর কতিপয় পণ্ডিতের সহিত এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। যাঁহারা এবম্বিধ অনুষ্ঠান সমর্থন করিলেন, তাঁহাদিগের অভিমত গৌরীমার সিদ্ধান্তের শক্তি বৃদ্ধি করিল।

পুরীধামে উপস্থিত হইয়া গৌরীমা তাঁহার পাণ্ডা ভিতরছ মহাপাত্র গোবিন্দচন্দ্র শৃঙ্গারীকে তাঁহাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন। এই বিবাহ সম্পর্কে গৌরীমাতা, কেশবমোহিনী দেবী ও পুরীর দুই-তিনজন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা যাহা শুনিয়াছি এবং গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র (যিনি বিবাহানুষ্ঠানে সহকারী পুরোহিত ছিলেন) ও কর্মচারী বলভদ্র মিশ্রের নিকট হইতে লিখিত ও মৌখিক বিবরণ যাহা পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল। উক্ত সকলেই এই অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী।

পাণ্ডা গোবিন্দচন্দ্র পুরীর তৎকালীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেবের নিকট জগন্নাথদেবের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকুমারীর বিবাহ-প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। মন্দিরের মধ্যেই এইপ্রকার বিবাহের প্রস্তাবে রাজা অতীব বিস্মিত হইয়া তাঁহার দেওয়ানকে ইহা বিবেচনা করিতে নির্দেশ দিলেন। বিচারবিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ান কয়েক-দিবস সময় চাহিলেন এবং অবিলম্বে মন্দিরের প্রধান পাণ্ডাদিগকে বিষয়টি জানাইলেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে এইপ্রকার

দেবতা-মানবীর বিবাহ অনুষ্ঠান অধিকাংশ পাণ্ডা অনুমোদন করিলেন না। তাঁহাদের আপত্তিতে তেজস্বিনী গৌরীমা নিরুৎসাহ না হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—জগন্নাথদেবের সঙ্গেই যদি বিবাহ হয়, তবে তাহা মন্দিরমধ্যে এবং তাঁহার সান্নিধ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে, বাহিরে নহে। অতঃপর বিষয়টি উড়িষ্যার বরেণ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের গোচরীভূত হয়। তাঁহার আহ্বানে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকুমারীর বিবাহের এই অসাধারণ প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য এক বিচারসভায় মিলিত হইলেন।

দুই পক্ষের এইরূপ বিচারবিতর্কের পদ্ধতিতে কন্যার মাতামহী গিরিবালা দেবী প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি একদিন মণিকোঠায় গিয়া ভগবান জগন্নাথদেবকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, "ত্যাখ ঠাকুর, আমার নাতনী ফ্যাল্‌না নয়। যদি তুমি গ্রহণ কর, মান ইজ্জৎ ধর্ম সব রক্ষে কর, মেয়ে দেবো ; নয়তো মেয়ে ফেরৎ নিয়ে যাবো।"

পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচনাকালে গৌরীমাতা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—যে ব্যক্তি নিজেকে ভগবানের নিকট সর্বতোভাবে সমর্পণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যোগিজনের কঠোর সাধনা অপেক্ষা গোপীগণের নিষ্কাম প্রেম এবং অহেতুক আত্মসমর্পণ শ্রীভগবানের অধিক প্রিয়। ভক্তিশাস্ত্রে ইহা পরম উপাসনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাই, যুগে যুগে ভগবানের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়াছে, ভক্তিমতী নারী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার সেবা-আরাধনায় জীবন ধন্য করিয়াছে। কিন্তু কেবল মানসে আত্মসমর্পণ করিলেই শেষরক্ষা হয় না, ভগবানকে স্বামীর মতই ভালবাসিতে হয় এবং শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ অনুষ্ঠানও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা অসাধারণ এবং বিরল হইলেও অশ্রুতপূর্ব নহে। শ্রেয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া আপনারা শাস্ত্রবিরোধী এবং ভগবানের অনভিপ্রেত কার্য করিবেন না। আপনারা সুপণ্ডিত, আপনাদের নিকট আমি শাস্ত্রানুমোদিত নির্দেশই প্রার্থনা করি।

স্থানান্তরের শাস্ত্রজ্ঞদিগের অভিমতও গৌরীমা সভায় ব্যক্ত

করিলেন। পরিশেষে বলিলেন, এই ব্রাহ্মণকন্যাকে আপনারা সামান্যা মানবী বলিয়া মনে করিবেন না। দেবতা ও সাধুর আশীর্বাদে এবং লক্ষ্মীর অংশে ইহার জন্ম। জগন্নাথদেবের সহিত বিবাহ হইবে বলিয়াই অতি শুদ্ধাচারে এই কন্যা প্রতিপালিত হইতেছে। অদ্যাবধি সে অন্নগ্রহণ করে নাই, কেবল দুগ্ধ ও ফলাদি খাইয়াই জীবনধারণ করিতেছে। ভবিষ্যতে কোন মানুষের সহিত ইহার বিবাহ হইবে না। সমগ্রজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত-পালনপূর্বক এই কন্যা দেবতার সেবাপূজা করিবে, ধর্মপ্রচার করিবে, পরহিতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া কেবল ভগবানের প্রীতিকর কার্যই করিবে। আপনারা সানন্দে এই বিবাহ অনুমোদন করুন, কন্যাকে আশীর্বাদ করুন।

সন্ন্যাসিনী মাতাজীর পাণ্ডিত্যে, যুক্তিতে ও ভক্তিতে পণ্ডিতবর্গ মুগ্ধ হইলেন এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। অবশেষে পণ্ডিতসভায় বিবাহের প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। কিন্তু অপ্রচলিত বিধায় এবং সংস্কারহেতু পণ্ডিতবর্গের বিধান অনেক পাণ্ডার মনঃপূত হইল না। শেষপর্যন্ত স্থির হইল, দ্বাদশজন পণ্ডিত শাস্ত্রপাঠ করিবেন এবং পাণ্ডাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ গোবিন্দচন্দ্র উপবাসী থাকিয়া পুরুষোত্তমের নিকট এই সম্পর্কে আজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে একটি পুষ্পমাল্য পুরুষোত্তমের কণ্ঠে পরাইয়া দেওয়া হইবে, যদি তাহা কণ্ঠচ্যুত হইয়া রত্নবেদীর উপর পতিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে—এই বিবাহে প্রভু সম্মতি দিয়াছেন। এইভাবে চূড়ান্ত নির্দেশের দায়িত্ব পুরুষোত্তমের উপরই অর্পিত হইল। দৈব পরীক্ষার ফলাফল দেখিতে বহু নরনারী তখন মন্দিরে সমুপস্থিত। এমনসময় নিবেদিত পুষ্পমাল্যটি প্রভুর কণ্ঠচ্যুত হইয়া রত্নবেদীর উপর পতিত হইল। এই দৈবনির্দেশে দর্শকদিগের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। নারীগণ হুলুধ্বনি করেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—এ কন্যা মানবী নহে, দেবী—জগন্নাথের শক্তি। প্রভুদত্ত 'আজ্ঞামালা' গৌরীমাকে প্রদান করিয়া পাণ্ডাজী বলিলেন,—প্রভু এই কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এইবার আপনারা সম্প্রদানের আয়োজন করুন।

শুনিয়াছি, এত কাণ্ডের পরেও, রাজার মনে সংশয় থাকিয়া যায়,—যদি এবম্বিধ কার্যের ফলে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে। সংশয়চিত্ত রাজা মুকুন্দদেব স্বয়ং প্রভুসকাশে নির্দেশ প্রার্থনা করেন। তিনিও অনুকূল নির্দেশ পাইলেন।

পাত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পক্ষে পুরোহিত হইলেন পণ্ডিত মার্কণ্ড মহাপাত্রের পুত্র শঙ্কর মহাপাত্র এবং পাত্রী শ্রীমতী দুর্গা দেবীর পক্ষে রহিলেন পাণ্ডা গোবিন্দচন্দ্র ও পুরোহিত লোকনাথ মিশ্র। কলিকাতা হইতে আগত পাত্রীপক্ষীয় ব্যক্তিগণ বিবাহানুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থা করিলেন। বহুপ্রকার দ্রব্যসম্ভারের বিপুল সমাবেশ হইল।

পঞ্চমবর্ষীয়া ব্রাহ্মণকন্যার সহিত পুরুষোত্তমের শুভ বিবাহ! গৌরীমাতার দীর্ঘকালের আকিঞ্চন এইবার সিদ্ধির পথে।

"মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে" শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিরাট মন্দিরের মধ্যে, প্রশস্ত জগমোহনে, গরুড় স্তম্ভের সন্নিকটে বিবাহ-অনুষ্ঠান যথাবিধি আরম্ভ হইল। অভিনব এই ক্রিয়াকাণ্ড দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কুতূহলী বহু নরনারী সেইস্থানে সমবেত হইলেন। চতুর্দিকে কর্মকর্তৃগণ উপস্থিত এবং মধ্যস্থলে দেববালা উপবিষ্টা। মস্তকে মুক্তাখচিত সুবর্ণ মুকুট, ললাটে কুঙ্কুম, কপোলে চন্দনসজ্জা, সর্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার। অলক্তকরঞ্জিত পদযুগলে নূপুর, পরিধানে শ্রীমাতা-প্রদত্ত বেনারসী সাড়ী। অর্ধাবগুণ্ঠনবতী নববধূ জগৎপতির নয়নপথে সাগ্রহদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আসীনা—ধীর ও শান্ত। অপরপ্রান্তে মণিকোঠায় রত্নবেদীর উপর পুষ্পমাল্যশোভিত দণ্ডায়মান রাজরাজেশ্বর জগন্নাথদেব বিশাল চক্রলোচনের শুভদৃষ্টিতে বিবাহ অনুষ্ঠান এবং মনোরম বসনভূষণে সুসজ্জিতা নববধূকে প্রসন্নমনে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

পিতার অনুপস্থিতিতে এবং তাঁহারই উপরোধে কন্যাকে সম্প্রদান করিলেন মাতামহী গিরিবালা দেবী। সুসজ্জিতা বালিকা বধূকে রত্নবেদীর চতুর্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণান্তে রত্নবেদীর উপর জগন্নাথ

দেবের বামপার্শ্বে তুলিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদী মাল্য তাহার কণ্ঠে অর্পণ করা হইল।

অনবদ্য এই অনুষ্ঠানে মন্দির তখন আনন্দমুখরিত।

এই প্রসঙ্গে মায়ের নিকট পরবর্তিকালে আমরা শুনিয়াছি, "বিয়ের পর পাণ্ডারা আমায় প্রভুর পেটের কাছে তুলে দিলে। কী নরম ভুঁড়ি, আমি যেন তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলুম! সে সুখস্পর্শ আজও অনুভব করি, সে আনন্দ নিত্য স্মরণ করি।"

বিবাহ উপলক্ষে প্রচুর মহাপ্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পুরোহিত ও পাণ্ডাগণ পরিতৃপ্তিসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পুরীর রাজা এবং বহু মহাত্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকটও উহা প্রেরিত হইল। এইদিনই জগন্নাথদেবের মন্দিরে কন্যা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে এবং ইহাই তাহার জীবনে প্রথম অন্নগ্রহণ।

লোকমুখে প্রচারিত হইতে থাকে এইসকল অভিনব কথা। দলে দলে মানুষ আসিতে লাগিলেন ভাগ্যবতী কন্যার দর্শনমানসে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীও কেহ কেহ আসিলেন। কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সন্ন্যাসিনী গৌরীমার পরিকল্পনা শুনিয়া তাঁহারা বিস্ময় মানিলেন। পুরীর রাজা কন্যা ও গৌরীমাতাকে রাজবাটীতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন এবং গাড়ীসহ দেওয়ানকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা জানাইয়া রাজা ও রাণী জগন্নাথদেবের বধূকে যোগ্য উপহার প্রদান করিলেন।

পুরুষোত্তমের সহিত মানবীর বিবাহে একদা যাঁহারা আপত্তি জানাইয়াছিলেন, বিবাহের পর সেইসকল পাণ্ডা দাবী জানাইলেন,—এই কন্যা জগন্নাথের শক্তি,—লক্ষ্মী, তাঁহাকে সমগ্রজীবন পুরীধামেই প্রভুর নিকট থাকিতে হইবে। গৌরীমাতা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন,—এই কন্যা মঠাধ্যক্ষা হইবে, দেবতার সেবাপূজা করিবে, শাস্ত্রপাঠ করিবে, নারীজাতিকে ধর্মশিক্ষা দান করিবে, সর্বোপরি সকলের মাতৃরূপে অধিষ্ঠিতা থাকিবে। অবশ্য, প্রভুদেবের দর্শন-মানসে কন্যা প্রতিবৎসর পুরীধামে আসিবে। এইরূপে তাঁহাদিগকে

বুঝাইয়া গৌরীমাতা এবং অন্যান্য সকলে মহা-উৎফুল্ল চিত্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

যুগলকিশোরীর বিবাহ হইল পুরীধামে এবং বউ-ভাতের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় বৃন্দাবনধামে।

ভক্ত বলরাম বসুদের বৃন্দাবনস্থিত কালাবাবুর কুঞ্জের ঠিকানায় লিখিত কন্যার মাতামহীর পত্রপাঠে বুঝা যায়,—বাংলা ১৩০৯ সালে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনপূর্ণিমার পূর্বেই গৌরীমাতা কন্যাসহ বৃন্দাবনে গমন করেন। বউ-ভাতের প্রীতিভোজন উপলক্ষে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে গৌরীমা এক বিশেষ তিথিতে এক মণ দুগ্ধের পরমান্ন এবং নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যাদি দেবতাকে নিবেদন করেন। কন্যাও ইহাতে সামর্থ্যানুযায়ী সহায়তা করে। এই উৎসবের প্রসঙ্গে পরবর্তিকালে আমরা মায়ের নিকট শুনিয়াছি, "মন্দিরচত্বরে সেদিন উপস্থিত সবাইকে ছোট হাতা করে গোবিন্দজীর ঐ অমৃত প্রসাদ নিজহাতে আমি পরিবেশন করেছিলুম। সেদিনও পুরীর উৎসবের মতই খুব ঘটা হয়েছিল।"

গৌরীমাতার স্বভাবসিদ্ধ উদাসীনতার জন্যই হউক, অথবা কর্মব্যস্ততার জন্যই হউক, বৃন্দাবনে আসিবার পর তিনি কলিকাতায় কোন পত্র লিখেন নাই। এদিকে বহুদিন বালিকার সংবাদাদি না পাইয়া, বিশেষতঃ বৃন্দাবনে কচ্ছপ ও বানরের উৎপাতের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া গিরিবালা এক পত্রে গৌরীমাকে লিখিলেন, (অক্টোবর, ১৯০২), "মা, কেন তুমি পত্র দিতেছ না? ওমা, তোমাকে যুগাকে না দেখে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। তোমার এ দুঃখিনী বৃদ্ধা মা শোকে পাগল। তাকে কেন এত ভাবাও মা? তোমার দাদা ভেবে অস্থির, পত্রের আশে সবাই পথ চেয়ে আছি।"

বৃদ্ধা মাতামহীর কী গভীর ভালবাসাই না ছিল মাতৃহীনা দৌহিত্রীর জন্য!

স্বামিজীর স্নেহাশিস

প্রভু জগন্নাথদেবের সহিত গৌরীমাতার পালিতা কন্যার শুভ সম্প্রদান কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে,—গৌরীমাতার মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে,—এই সংবাদ শ্রবণে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দিত হইলেন। কন্যাটিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, 'খুকী' বলিয়া ডাকিতেন। গৌরীমা তাহাকে তিন-চারি বৎসর বয়স হইতেই মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদিগের নিকট লইয়া যাইতেন। তাহাকে স্বামিজী আদর করিতেন, বুকে কাঁধে তুলিতেন। ছোট বালকের ন্যায় তাহার সহিত খেলাও করিতেন। বিশ্ববরেণ্য এই বিরাট পুরুষের অন্তরে ঐরূপ আনন্দময় শিশুসুলভ ভাবটি চিরকালই প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি।"

একদা তিনি খুকীকে কাঁধে তুলিয়া আদর করিতেছিলেন, তাহার ক্ষুদ্র পা দুইখানি বার বার স্বামিজীর বক্ষ স্পর্শ করিতেছে দেখিয়া গৌরীমা দারুণ আপত্তি জানাইলেন, "ও কী হচ্ছে নরেন, খুকীর পা যে তোমার বুকে ঠেকছে, ওতে ওর অপরাধ হচ্ছে। ওকে নাবিয়ে দাও।" হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন স্বামিজী, "কিছু অপরাধ হবে না গৌরমা। খুকীর পায়ে একদিন শত শত মানুষ মাথা নত করবে।"

১৩০৮ সালে স্বামিজী বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন করেন। বেলুড় মঠে ইহাই প্রথম দুর্গোৎসব। শ্রীসারদামাতা এই পূজায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীর অনুরোধে গৌরীমা কতিপয় অল্পবয়স্কা কন্যা নির্বাচন করিয়া কুমারীপূজার ব্যবস্থা করেন। নির্বাচিতাদের মধ্যে পূর্বোক্ত 'খুকী' এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র-কন্যা রাধারাণীও ছিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-শঙ্খ বলয়-বস্ত্রাদি সহযোগে স্বামিজী স্বয়ং কুমারীদিগকে পূজা করিলেন। এইসকল জীবন্ত দেবীপ্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন এবং হস্তে মিষ্টান্ন, দক্ষিণাদি

প্রদানপূর্বক স্বামিজী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। খুকী ছিল তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা এবং এইসময় ভাবে বিভোর। পূজাকালে তাহার দেবী-ভাবে স্বামিজীও এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহার কপালে রক্তচন্দন পরাইবার সময় তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, "আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগে নি তো!"

ইহার কিছুদিন পরে গিরিবালা দেবী এবং গৌরীমা কন্যাসহ পুনরায় বেলুড় মঠে গমন করেন। তাঁহাদের আগমন বার্তা জানিয়া স্বামিজী একতলায় আসিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে গিরিবালাকে বলেন, "দিদিমা, খুকী উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েদের সেবা করবে। ওকে আমি বিলেত পাঠাবো। সব খরচা আমি দেবো। তোমরা কিন্তু আপত্তি তুলো না।*

নিষ্ঠাবতী গিরিবালা সহাস্যে ইহার উত্তরে বলেন, "দাদা, দেশে থেকেও তা হতে পারে।"

খুকীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামিজী উচ্চধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল,— উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সে পাশ্চাত্যদেশেও যাইবে এবং সে-দেশের শিক্ষাধারা ও সমাজসেবার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তাহা এই দেশে প্রচার ও কার্যকরী করিবে। এতদুদ্দেশ্যে কয়েক সহস্র মুদ্রাও সারদানন্দজীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন স্বামিজী। বিদেশ হইতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনকালে ঐ-দেশীয় একটি পোষাক আনিয়া তিনি খুকীকে স্নেহোপহার দান করেন। পোষাকটি অদ্যাপি আশ্রমে সযত্নে রক্ষিত আছে।

অতঃপর আসিল বাংলার ১৩০৯ সালের বিষাদভরা সেই বিশে আষাঢ়। বারাকপুর আশ্রমে সেদিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। গৌরীমা ঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন, এমনসময় সহসা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "মঠে কি সর্বনাশ হল

* স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ গৌরীমাতাকে 'গৌর-মা' বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীকে তাঁহারা 'দিদিমা' বলিতেন।

রে! নরেন বুঝি ফাঁকি দিলে।” সেইদিনই অপরাহ্ণে যাঁহারা স্বামিজীকে মঠে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে বেড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা গৌরীমার আশঙ্কা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

বেলুড় মঠ হইতে সেই রাত্রেই মর্মন্তুদ সংবাদ আসিল, স্বামিজী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন!

পুত্রহারা জননীর ন্যায় গৌরীমা কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববিজয়ী বরপুত্রের মহাসমাধি-নিমগ্ন মূর্তিখানি শেষবারের মত দর্শনের উদ্দেশ্যে গৌরীমা কন্যাসহ নৌকাযোগে বেলুড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, স্বামিজীর কর্মক্লান্ত দেহ চিরনিদ্রায় শায়িত। সঙ্গিনী কন্যা তখন নিতান্তই বালিকা, তৎসত্ত্বেও এই ঘটনা তাহাকেও অত্যন্ত বিচলিত করিল। স্বামিজী তাহাকে আর আদর করিতে আসিবেন না, তাহার সহিত আর খেলা করিবেন না,—ভাবিয়া সেও করুণভাবে কাঁদিতে লাগিল। শেষকৃত্য সম্পন্ন হইবার পর ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহারা পুনরায় নৌকাযোগে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

দীক্ষা

জননী ব্রজবালার দেহান্তে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ মাতুলালয়ে,—ভবানীপুরেই বাস করিত, কদাচিৎ পিতৃগৃহে যাইত। মমতাময়ী মাতামহী তাহাদিগকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দিতেন না। নিরীহ-প্রকৃতি পিতা ইহাতে মনে দুঃখিত হইতেন, কিন্তু আপত্তি জানাইতে পারিতেন না। তাহাদের ভবানীপুরে থাকিবার অবশ্য আরও একটি কারণ ছিল। গিরিবালার কনিষ্ঠা ভগিনী বগলার বিবাহ হইয়াছিল কলিকাতার অনতিদূরে বরাহনগরে, এক সঙ্গতিপন্ন পরিবারে। তাঁহার একমাত্র কন্যা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই শোক ভুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রজবালাকে শৈশব হইতেই স্নেহক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করেন। 'ব্রজবালা' নামকরণও তাঁহারই। গিরিবালার ন্যায় বগলাও মাতা কালিদাসী দেবীর ভবানীপুরের বিষয়সম্পত্তির অংশ পাইয়াছিলেন। নিঃসন্তান বগলার সেই অংশ তিনি স্নেহাস্পদ ব্রজবালার সন্তানদিগকে দান করেন।

মাতৃহারা ভাগিনেয়ীর জন্য মাতুল অবিনাশচন্দ্রের স্নেহযত্নও ছিল অপরিসীম। আত্মীয়পরিজনের অজ্ঞাতসারে তিনি যুগলকে নিকটবর্তী জগুবাবুর বাজারে লইয়া গিয়া পরিতোষপূর্বক মতিচুর, কচুরী ইত্যাদি খাওয়াইতেন; আবার সাবধানও করিয়া দিতেন, "বাড়ী গিয়ে মেঠাই খাবার কথা যেন কাউকে বলো না।"

মাতামহী তাহাকে স্বরচিত সঙ্গীত ও স্তোত্র গাহিতে শিখাইতেন, পৌরাণিক গল্প বলিতেন, সরল ভাষায় নানারূপ ধর্মোপদেশও দিতেন। একদিন কন্যা "মাতামহীর নিকট শুইয়া আছে, ঠাকুরদেবতার গল্প-প্রসঙ্গে মাতামহী বলিলেন,—ভক্তি হলে ভগবানকে পাওয়া যায়।

ভক্তি যে কি বস্তু, সে জ্ঞান তখনও কন্যার হয় নাই, প্রশ্ন করিল,—ভক্তি কোথায় পাওয়া যায় দিদিমা?

"—সেই-যে পরমহংস মশায়ের পরিবার, তাঁর কাছে আছে। তিনিই ভক্তি দিতে পারেন।

কন্যার মনে কৌতূহল জাগে, ঐ বস্তুটি পাইতে হইবে। দ্বিতীয় সহোদর তাহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে সে পরদিবসই বলিল,—সেই মায়ের কাছে নিয়ে চল, ভক্তি আনতে হবে। কথা শুনিয়া তিনি তো প্রথমে খুব হাসিতে লাগিলেন, পরে তাহার আবদারে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীমাতাকে তিনিও অতিশয় ভক্তি করিতেন, ভাবিলেন, ভগ্নীকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারও মাতৃদর্শন হইবে।

দুইজনে ভবানীপুর হইতে বোসপাড়া লেনে মাতাঠাকুরাণীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা তখন সবেমাত্র ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন, কন্যা প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেল, ছুটিয়া গিয়া মায়ের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বলিল,—তোমার কাছে না-কি ভক্তি আছে, আমায় দাও। শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে বলেন,—ওমা, এ খুদে ভক্ত বলে কি গো! আমার কাছে যে ভক্তি আছে, কে বলেছে তোমায়?

—দিদিমা যে বললে, তোমার কাছে আছে।

গিরিশচন্দ্রের ভগ্নী ন' দিদি এবং যোগেনমার গর্ভধারিণী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন,—শক্ত করে ধরো খুকি, মা-ঠাকরুণের কাছেই ভক্তি আছে।

মায়ের বস্ত্রাঞ্চল সে আরও শক্ত করিয়া ধরিল এবং একেবারে গাত্রসংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—আচ্ছা, দাঁড়া বাপু, এনে দিচ্ছি; এই বলিয়া ঠাকুরঘর হইতে মা একখানি প্রসাদী অমৃতি-জিলিপি আনিয়া কন্যার হাতে দিলেন।

ভক্তিপ্রাপ্তির কাহিনী ততক্ষণে প্রচার হইয়া গিয়াছে। অনেকে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে ঘিরিয়া সকলেই ভক্তির জন্য হাত পাতিলেন; এ বলে,—দিদি, আমায় একটু দাও; ও বলে,—খুকি, আমায় একটুখানি দাও। মা-ঠাকরুণ তোমায় ভক্তি দিয়েছেন, আমাদের সবাইকে ভাগ দিতে হবে।

"এ অবস্থার জন্য কন্যা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সকলকে কিছু কিছু ভাগ দিয়া নিজেও একটু গ্রহণ করিল এবং অবশিষ্ট একটু রাখিয়া দিল।" (১)

শৈশব হইতেই শ্রীসারদামাতার প্রতি বালিকার আকর্ষণ ছিল গভীর। তাঁহাকে সে এতই ভালবাসিত যে, মধ্যে মধ্যে সহোদর শিবকালী অথবা বঙ্কিমবিহারীর সহিত দক্ষিণ-কলিকাতা হইতে উত্তর-কলিকাতায় শ্রীমাতার নিকট চলিয়া যাইত। কোন কোন দিন বাটীতে ফিরিতে অনিচ্ছা জানাইত, সহোদর তাহাকে মাতাঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। বালিকা পরমানন্দে শ্রীমাতার সান্নিধ্যে থাকিত, তাঁহার সহিত শয়ন করিত, নানা গল্প শুনিত, এবং তাঁহার অমৃতময় প্রসাদ গ্রহণ করিত।

১৩১১ সাল, মহাষ্টমী-পূজার পুণ্যতিথি।

গিরিবালা দেবী দৌহিত্র শিবকালীকে বলিলেন, "আজ খুব শুভদিন, যুগলকে নিয়ে সকাল সকাল একবার বাগবাজারে চলে যাও, পরমহংস মশায়ের পরিবারকে তোমরা দণ্ডবৎ করে এসো গে।"

দিদিমার নির্দেশ শুনিয়া বালিকা মহাখুশী।

শূন্যহস্তে দেবতা ও সাধুদর্শনে যাওয়া অবিধেয়; ফুল, ফল, মিষ্টান্ন, অন্ততপক্ষে একটি হরীতকী দানান্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হয়। মাতামহী একটি পাত্রপূর্ণ গোত্নগ্ধ দিলেন। পথে তাঁহারা কয়েকটি পদ্মফুলও ক্রয় করিলেন।

শ্রীমাতা তখন বাগবাজার ষ্ট্রীটে একটি ভাড়াবাটীতে বাস করিতেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, মাতাঠাকুরাণীর দর্শনমানসে এই বিশেষ দিবসে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছেন, অনেকেরই হস্তে ফলফুল মিষ্টান্ন। বালিকার মনে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়,—কি করিয়া এতগুলি লোক অতিক্রম করিয়া সে মাতার নিকট যাইবে, তাঁহার হস্তে দুগ্ধ ও ফুল দিবে।

অন্তর্যামিনী মাতা স্বয়ং ভক্তিমতী বালিকার মনের সংশয় নিরসন

করিয়া বলিলেন, "এই-যে খুকি, তুমি এসেছ! কাছে এসো। মহাষ্টমীর দিন, আজ তোমায় দীক্ষা দেবো।"

দীক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব এবং ব্যাপারটি যে প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা বালিকা জানে না, সেরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়াও সে আসে নাই। সে ইহাই বুঝিল যে, মা তাহাকে আদর করিয়া নিকটে ডাকিতেছেন, জিনিষগুলি তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই দিতে পারিবে। মন প্রফুল্ল হইল। দক্ষিণ হস্তের পদ্মফুলগুলি বাম হস্তে লইল, ভ্রাতার নিকট হইতে দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধপাত্রটি লইয়া ধীরে ধীরে শ্রীমাতার নিকটে গিয়া সে দাঁড়াইল। দুগ্ধপাত্রটি মাতা গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার আসনের নিকট রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "এই তোমার পূর্ণঘট স্থাপন হলো।"

জীবনের এই বিশেষ স্মরণীয় দিবসটি সম্পর্কে স্বীয় মনোভাব তাঁহার রচনা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"অতঃপর মায়ের আদেশে কন্যা পূজাকক্ষে প্রবেশ করিলে মা সস্নেহে তাহাকে নিকটে বসাইলেন। কন্যার প্রার্থনায় নহে, তাহার সাধনার ফলস্বরূপ নহে, কল্যাণময়ী জননী নিজেই কৃপা করিয়া কন্যাকে দীক্ষাদান করিলেন, চরণে আশ্রয় দিলেন, তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। মায়েরই নির্দেশে কন্যা তাঁহার পাদপদ্মে পদ্মপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া প্রণত হইলে মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিলেন। মন্ত্রজপ করিবার নিয়মাদি বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ দিলেন।

"সমস্ত দিনটি মায়ের সান্নিধ্যে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। মায়ের জন্য অপরাহ্ণে সহোদর একখানি বস্ত্র এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিলেন। একটি রৌপ্যমুদ্রাও দিলেন দক্ষিণার জন্য। বিদায়ের পূর্বে কন্যা এইসকল মায়ের চরণে নিবেদন করিল। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মা বলিলেন,—শীগ্যির শীগ্যির আবার এসো মা।

"এমন একটি-দুইটি ঘটনা মানুষের জীবনে সংঘটিত হয়, যাহা

"এ অবস্থার জন্য কন্যা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সকলকে কিছু কিছু ভাগ দিয়া নিজেও একটু গ্রহণ করিল এবং অবশিষ্ট একটু রাখিয়া দিল।" (১)

শৈশব হইতেই শ্রীসারদামাতার প্রতি বালিকার আকর্ষণ ছিল গভীর। তাঁহাকে সে এতই ভালবাসিত যে, মধ্যে মধ্যে সহোদর শিবকালী অথবা বঙ্কিমবিহারীর সহিত দক্ষিণ-কলিকাতা হইতে উত্তর-কলিকাতায় শ্রীমাতার নিকট চলিয়া যাইত। কোন কোন দিন বাটীতে ফিরিতে অনিচ্ছা জানাইত, সহোদর তাহাকে মাতাঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। বালিকা পরমানন্দে শ্রীমাতার সান্নিধ্যে থাকিত, তাঁহার সহিত শয়ন করিত, নানা গল্প শুনিত, এবং তাঁহার অমৃতময় প্রসাদ গ্রহণ করিত।

১৩১১ সাল, মহাষ্টমী-পূজার পুণ্যতিথি।

গিরিবালা দেবী দৌহিত্র শিবকালীকে বলিলেন, "আজ খুব শুভদিন, যুগলকে নিয়ে সকাল সকাল একবার বাগবাজারে চলে যাও, পরমহংস মশায়ের পরিবারকে তোমরা দণ্ডবৎ করে এসো গে।"

দিদিমার নির্দেশ শুনিয়া বালিকা মহাখুশী।

শূন্যহস্তে দেবতা ও সাধুদর্শনে যাওয়া অবিধেয়; ফুল, ফল, মিষ্টান্ন, অন্ততপক্ষে একটি হরীতকী দানান্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হয়। মাতামহী একটি পাত্রপূর্ণ গোদুগ্ধ দিলেন। পথে তাঁহারা কয়েকটি পদ্মফুলও ক্রয় করিলেন।

শ্রীমাতা তখন বাগবাজার ষ্ট্রীটে একটি ভাড়াবাটীতে বাস করিতেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, মাতাঠাকুরাণীর দর্শনমানসে এই বিশেষ দিবসে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছেন, অনেকেরই হস্তে ফলফুল মিষ্টান্ন। বালিকার মনে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়,—কি করিয়া এতগুলি লোক অতিক্রম করিয়া সে মাতার নিকট যাইবে, তাঁহার হস্তে দুগ্ধ ও ফুল দিবে।

অন্তর্যামিনী মাতা স্বয়ং ভক্তিমতী বালিকার মনের সংশয় নিরসন

করিয়া বলিলেন, "এই-যে খুকি, তুমি এসেছ! কাছে এসো। মহাষ্টমীর দিন, আজ তোমায় দীক্ষা দেবো।"

দীক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব এবং ব্যাপারটি যে প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা বালিকা জানে না, সেরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়াও সে আসে নাই। সে ইহাই বুঝিল যে, মা তাহাকে আদর করিয়া নিকটে ডাকিতেছেন, জিনিষগুলি তাঁহার হস্তে নিশ্চয়ই দিতে পারিবে। মন প্রফুল্ল হইল। দক্ষিণ হস্তের পদ্মফুলগুলি বাম হস্তে লইল, ভ্রাতার নিকট হইতে দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধপাত্রটি লইয়া ধীরে ধীরে শ্রীমাতার নিকটে গিয়া সে দাঁড়াইল। দুগ্ধপাত্রটি মাতা গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার আসনের নিকট রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "এই তোমার পূর্ণঘট স্থাপন হলো।"

জীবনের এই বিশেষ স্মরণীয় দিবসটি সম্পর্কে স্বীয় মনোভাব তাঁহার রচনা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"অতঃপর মায়ের আদেশে কন্যা পূজাকক্ষে প্রবেশ করিলে মা সস্নেহে তাহাকে নিকটে বসাইলেন। কন্যার প্রার্থনায় নহে, তাহার সাধনার ফলস্বরূপ নহে, কল্যাণময়ী জননী নিজেই কৃপা করিয়া কন্যাকে দীক্ষাদান করিলেন, চরণে আশ্রয় দিলেন, তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। মায়েরই নির্দেশে কন্যা তাঁহার পাদপদ্মে পদ্মপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া প্রণত হইলে মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিলেন। মন্ত্রজপ করিবার নিয়মাদি বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ দিলেন।

"সমস্ত দিনটি মায়ের সান্নিধ্যে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। মায়ের জন্য অপরাহ্ণে সহোদর একখানি বস্ত্র এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিলেন। একটি রৌপ্যমুদ্রাও দিলেন দক্ষিণার জন্য। বিদায়ের পূর্বে কন্যা এইসকল মায়ের চরণে নিবেদন করিল। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মা বলিলেন,—শীগ্যির শীগ্যির আবার এসো মা।

"এমন একটি-দুইটি ঘটনা মানুষের জীবনে সংঘটিত হয়, যাহা

কোন অবস্থাতেই—সুখের উচ্ছ্বাসে, দুঃখের আঘাতে, অথবা কালের প্রবাহেও বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায় না, মানসচক্ষে জাগিয়া থাকে ধ্রুবতারার মত, অকূল পাথারে অভ্রান্ত নির্দেশে পথ দেখাইয়া দেয়, চিত্তে অনুক্ষণ শক্তি দেয়, আনন্দ দেয়।" (১)

শ্রীমাতার সঙ্গে নানাস্থানে

দীক্ষালাভের কিছুকাল পরে যুগলকিশোরী শ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে পুরীধামে গমন করে। গোলাপমা ও শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণও তাঁহাদের সহিত গিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা ভক্ত বলরাম বসুদের সমুদ্র-নিকটবর্তী 'শশী নিকেতনে' এবং পরে কয়েক-দিবস মন্দিরসন্নিকটে ক্ষেত্রবাসীর বাটীতে বাস করেন। এই যাত্রায় তাঁহাদের প্রায় দুই মাস কাল পুরীধামে অতিবাহিত হয়। শ্রীমাতার গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরী দেবী, ভ্রাতা ও অন্যান্য অনেকে এবং গৌরীমাতা, তাঁহার গর্ভধারিণী এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর কিছু দিন পর আসিয়া তথায় মিলিত হইলেন। যদিও পূর্বে এই তীর্থে আসিয়া সকল দেবদেবী দর্শনের সৌভাগ্য কন্যার হইয়াছিল, তথাপি শ্রীমাতা তাঁহার নবদীক্ষিতা শিষ্যাকে নূতন করিয়া পুনরায় সেইসকল দর্শন করাইলেন। দূরবর্তী সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি প্রভৃতি স্থানেও লইয়া গেলেন।

জগন্নাথদেবের মণিকোঠায় শ্রীমাতা একদিন প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—'আমার মেয়ের ভার নিয়েছ ঠাকুর, ওকে রক্ষে করো তুমি।' অন্য একদিন মঙ্গলারতির পরে মহাপ্রভুর স্নানকালে তিনি শিষ্যাকে বলিলেন,—'অবকাশ-বেশটি ভাল করে মনে রেখো। জগন্নাথদেব দয়াল ঠাকুর, যে তাঁর আশ্রয় নেয়, তার ভাবনা নেই।'

একদা অপরাহ্নে শ্রীমাতা 'শশী নিকেতনে' বসিয়া আছেন, কয়েকটি ছোট ছোট বালিকা সেখানে খেলা করিতেছিল। গৌরীমাতা আসিয়া বলিলেন, "ঢের হয়েছে খেলা, এবার তোমাদের একটা পরীক্ষা হবে। তোমরা মা-ঠাকরুণের কাছে আসন করে বসো। কেউ নড়বে না, কথা বলবে না, চোখ খুলবে না।"

গোলাপমা বলেন,—"আমি তোমাদের পাহারায় রইলুম। যখন ওঠার সময় হবে, আমি বলবো।"

গৌরীমা এবং গোলাপমা উভয়কেই বালিকারা ভয় করিত। সকলে আসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ তাহারা নিয়ম

রক্ষা করিয়া রহিল। তৎপরে কাহারও দেহে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, কেহ-বা মুহূর্তের জন্য চক্ষু মেলিয়া অপরের অবস্থা বুঝিয়া লয়। মাতা হাসেন তাহাদের আচরণে। গোলাপমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। তিনি বলিয়া উঠেন—"এ···ই···ই খবরদার! চোখ খুলবে না কেউ।"

চক্ষু পুনরায় মুদ্রিত হয়। পুনরায় একের পর একের দেহে এবং চক্ষে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। গোলাপমা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন পুনর্বার। কিন্তু বালিকাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চক্ষু মেলিয়া হাসিয়া ফেলে, শ্রীমাতা এবং গোলাপমাও হাসিতে থাকেন।

কেবল একটি বালিকার ধৈর্য অসামান্য। তাহার দেহে এতক্ষণ কোনপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই, নিশ্চল বসিয়া ছিল। গোলাপমা তাহাকে পরীক্ষায় প্রথম স্থান দিলেন। শ্রীমাতা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আদর করিলেন, আশীর্বাদ জানাইলেন। বালিকাটি—যুগলকিশোরী।

পূর্বেও আর একবার রথযাত্রাকালে মাতাঠাকুরাণীর সহিত এই কন্যার জগন্নাথ দেবের দর্শনলাভ হইয়াছিল। তাহার নিকট পরবর্তি-কালে আমরা শুনিয়াছি, "মায়ের সঙ্গে রথের ওপর উঠে মহাপ্রভুকে স্পর্শ করা, আবার রথের দড়ি ধরে টানারও সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন শৈশব হলেও মনে পড়ে—সে সব আনন্দময় স্মৃতি।"

কলিকাতা বাসকালে শ্রীসারদামাতা ভক্ত বলরাম বসুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। কন্যাও কখন কখনও তথায় মাতৃসঙ্গে বাস করিয়াছেন। এই বাটীতে অবস্থানের সূত্রেই উক্ত পরিবারের সকলের সহিত তাহার নিকট-সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুকে কন্যা 'দাদা' এবং পত্নী সুশীলাবালা দেবীকে 'বৌদিদি' বলিয়া ডাকিত। শ্রীমাতা, গৌরীমা এবং এই কন্যা ঐ গৃহে কোন্ কোন্ কক্ষে বাস করিতেন তাহা সুশীলা দেবী আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীরাজলক্ষ্মী বসু, রামকৃষ্ণ বসুর ভগিনী কৃষ্ণময়ী দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জু ও

নিত্যানন্দ বসুর পত্নী কমলা দেবী-প্রমুখের সহিতও তাহার এইরূপেই সম্প্রীতি গড়িয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা, এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের বহু অন্তরঙ্গ সন্তানের সান্নিধ্যও যুগলকিশোরী এই বাটীতেই লাভ করে। তাহার সরল ব্যবহার, সুমিষ্ট আলাপ সকলকে প্রসন্ন করিত। উক্ত গৃহের শিশুকুল এবং যুগলকিশোরী স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লইয়া মধ্যে মধ্যে তাস ও অন্যান্য খেলা খেলিতে বসিত। ব্রহ্মানন্দজী প্রায়শঃ হারিয়া যাইতেন, তখন অভিমানের সুরে খেলার সঙ্গীদিগকে বলিতেন, "তোরা জোচ্চুরি করে আমায় হারিয়ে দিলি, আমি খেলবো না তোদের সঙ্গে।" শিশু-মহলে হাসির রোল উঠিত, তাহারাও দুই-এক কথা শুনাইয়া দিত। শিশুস্বভাব স্বামিজীও ইহাতে হাসিতেন।

বরেণ ঘোষের পিসিমাতা, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের পত্নী ও কন্যা, ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষের পত্নী ও ভগিনী, কিরণচন্দ্র দত্তের বাটীর মাতৃবৃন্দ, ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কন্যাগণও বলরামভবনে এবং সময় সময় মাতৃভবনেও সমবেত হইতেন। ইঁহারা সকলেই এই সুকৃতিযুক্তা কন্যাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

রামকৃষ্ণ বসু ও তাঁহার গর্ভধারিণী উড়িষ্যায় তাঁহাদের জমিদারী কোঠারে একবার শ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া গিয়াছিলেন। যুগল-কিশোরীও তাঁহার সঙ্গে ছিল।

শ্রীমাতার আহ্বানে তাঁহার সহিত কলিকাতার বহু ভক্তের বাটীতেও কন্যা গমন করিয়াছে। কোন কোন স্থানে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে সে স্তবস্তোত্র, মোহমুদ্গর, গীতার অধ্যায়বিশেষ, রাস-পঞ্চাধ্যায়, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-বিরচিত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্র' আবৃত্তি করিয়া শুনাইত।

মাতৃদর্শনে গেলে একদিন শ্রীমাতা কন্যাকে বলেন, "চলো, আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণকে আজ একবার দেখে আসি।'

"মায়ের সহিত কোনস্থানে যাইতে হইবে, ইহাতেই প্রচুর আনন্দ; সুতরাং কোনপ্রকার প্রশ্ন না করিয়া তাঁহার সঙ্গে শিবিকায়

আরোহণ করিলাম। শিবিকা গিয়া উপস্থিত হইল ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে, বোসপাড়া লেনে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। ভগিনী নিবেদিতা এবং জনৈকা শিক্ষয়িত্রী···মাতাঠাকুরাণীকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইলেন; প্রণাম ও সম্ভাষণের পর মাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। এতক্ষণে সঠিক বুঝিতে পারিলাম, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী অন্য কেহই নহেন, ইনি সেই গোপালের মা।

তিনি তখন অতিবৃদ্ধা এবং চলচ্ছক্তিহীনা। তাঁহার সেবার অসুবিধা হইতেছিল জানিতে পারিয়া ভগিনী নিবেদিতা বৃদ্ধাকে নিজগৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। অত্যন্ত যত্নের সহিত তিনি তাঁহার সেবা করিতেন এবং তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। গোপালের মা সেইসময় শয্যাগত; তথাপি দেখিয়াই মনে হইল, অতিসাধারণ একখানি শয্যার উপর সৌন্দর্যের এক প্রতিমা পড়িয়া রহিয়াছে,—প্রেম, সরলতা ও পবিত্রতার জীবন্তবিগ্রহ!

মাতাঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে ও? আমার মা কি এলে? বৌমা এসেছো?

মা উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ মা, আমি এসেছি। কয়েকটি ফল মা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ফলকয়টি গোপালের মায়ের হাতে দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধা আদর করিলেন। মুহূর্তকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও বৌমা, আমার গোপাল কেমন আছে?···

—তুমি সময়মত আমার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিও মা। আমি গোপালের কাছে যাবো।

—তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন মা। মাতার নয়নযুগল বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

এই সাক্ষাতের বৎসরাধিক কাল পরেই গোপালের মা সাধনোচিত ধামে গমন করেন। শেষসময়ে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সেবা করিয়া যে হৃদয়বত্তা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কৃতজ্ঞ-অন্তরে আমরা স্মরণ রাখিব।” (১)

এইকালে কন্যা ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও মিস্ ম্যাক-লাউড্, ভগিনী নিবেদিতা, দেবমাতা, ক্রিশ্চিয়ানা-প্রমুখ ভক্তিমতী মহিলাগণ যখন শ্রীমাতার পুণ্যদর্শনে আসিতেন সেইসময় সে তথায় উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগের আলোচনা ও আচরণ মনোযোগ-সহকারে লক্ষ্য করিত। উক্ত পাশ্চাত্য মহিলাগণও সাক্ষাৎকার সময়ে তাহার ভক্তি, ধৈর্য, বিনয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করিতেন। বিদেশিনী এইসকল মহিলার ভারতবর্ষের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, সর্বোপরি শ্রীমাতার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম ভক্তি কন্যাকে মুগ্ধ করিত। সুতরাং কন্যাও তাঁহাদিগকে ভালবাসিত।

শ্রীমাতা একদিন যুগলকিশোরীকে আশীর্বাদ করিয়া বলেন, 'মা, তুমি ফুলের মত থেকো।' ভগিনী নিবেদিতা সেইসময় মায়ের জন্য একগুচ্ছ সুন্দর ফুল লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "মাটা ডেবী, কেন আপনি বালিকাদের কেবল বলেন, 'ফুলের মত থাক।' আমি বালিকাদের বলি, 'তুমি সুখী, বড় সুখী থাক।" মা সারদা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "সুখের কি মূল্য আছে মা? ফুলের মত পবিত্র থাকলে, ভগবানের পূজোয় লাগবে, তাঁর পায়ের শোভা হবে, জীবন ধন্য হবে।" ফুলের মত পবিত্র জীবনের এইরূপ অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া ভগিনী নিবেদিতা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অন্তরে উপলব্ধি করিলেন—মাতৃবাক্যের তাৎপর্য এই যে, বাহ্যিক সুখ অপেক্ষা দেহমনের পবিত্রতা অনেক উন্নততর বস্তু।

শ্রীমাতা যে-সকল সন্তানসন্ততিকে কৃপা করিতেন, তাঁহাদিগের কর্ণে স্বয়ং ইষ্টমন্ত্র শুনাইয়া দিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে জপ করিবার প্রণালী এই কন্যাদ্বারা শিক্ষা দেওয়াইতেন।

বাংলা ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে একদিন গৌরীমাতা ও কন্যা তারকেশ্বরে গমন করেন। বাবা তারকনাথের দর্শনপূজা সমাপনান্তে গৌরীমাতার মনে অকস্মাৎ এক সংকল্পের উদয় হইল, বলিলেন—জয়রামবাটী যাবি? মা-ঠাকরুণের কাছে? পায়ে হেঁটে যাওয়া, বেশ হবে, পারবি?

প্রথমতঃ মাতাঠাকুরাণীর দর্শন, তদুপরি এইভাবে গিয়া তাঁহার পল্লীভবনে সহসা উপস্থিত হইতে পারিলে, তাহাতে অভিনবত্ব এবং আনন্দ দুইই হইবে, ভাবিয়া আপাততঃ কন্যার চিত্ত উৎফুল্ল হইল। পথের দূরত্ব, বিশেষ করিয়া বৈশাখের খরতাপের কথা যথাযথভাবে বিবেচনা করিবার অবকাশও তাঁহাদের আর ঘটিয়া উঠিল না। পরিব্রাজন-পটীয়সী সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতা এবং তাঁহার উত্তরসাধিকা বালিকা মাতৃচরণ-দর্শনমানসে বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে যুগতীর্থ জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠে বস্ত্রখণ্ডে দোলায়মান নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীদামোদর নারায়ণশিলা, হস্তে কমণ্ডলু, একখানি করিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র ও গামছামাত্র সম্বল। পাথেয় ভোজ্য, পানপাত্র, কম্বল বা ছত্র প্রভৃতি কিছুই নাই।

নিদারুণ গ্রীষ্মকাল। তাঁহাদিগের পদতলে উত্তপ্ত ধরণী এবং মস্তকোপরি অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ড মার্তণ্ড। এই অবস্থায় সুদীর্ঘ আঠাশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। বালিকার বয়স মাত্র দশ, পদব্রজে সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত, অল্পদূর অগ্রসর হইতেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাপশ্রান্ত গবাদি পশুকুলও এইসময়ে আহারান্বেষণে বিরত থাকিয়া স্থানে স্থানে বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। পথিপার্শ্বের জলাশয়গুলি শুষ্কপ্রায়, অবশিষ্ট জল অপেয়। মস্তকে জলসিক্ত গামছাখানিও রৌদ্রতাপে বার বার শুকাইয়া যাইতেছে। বালিকার পদযুগল প্রায় অচল হইয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে অনতিবিলম্বে ছায়াশীতল একটি পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়। সেইস্থানে তাঁহারা উপবেশন করিলেন। বিশ্রামকালে পল্লীর এক সহৃদয় ব্রাহ্মণ তথায় তাঁহাদিগের এইরূপ কাতর অবস্থা দর্শনে ডাব, তালশাঁস, খেজুর ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। গৌরীমা তদ্দ্বারা দামোদরজীর ভোগ সমাপন করিলেন। সাময়িক বিশ্রামে দেহের ক্লান্তি দূর হইল, ক্ষুৎপিপাসারও নিবৃত্তি হইল। কিন্তু তখনও সম্মুখে চব্বিশ মাইল পথ বাকী। বালিকার অবস্থায় উদ্বেগ বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ সেইদিবস আর তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। তাঁহার

গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। পরদিবস প্রাতে চলিতে চলিতে খানাকুল কৃষ্ণনগরে যাইয়া কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। ধর্মপ্রাণ অধিবাসিগণ সাগ্রহে দামোদরজীর পূজাভোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। সেইস্থান হইতে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ। ক্লান্ত বালিকাকে গৌরীমা উৎসাহ দিতে থাকেন, "কষ্ট করলে তবে তো কেষ্ট পাওয়া যায়। পায়ে হেঁটে যাচ্ছ, মা-ঠাকরুণ তোমায় কত আদর করবেন, দেখবে'খন।" গৌরীমার কথায় যেন তাহার শ্রান্তির লাঘব হয়, দেহে ও মনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতে থাকে।

অফুরন্ত পথ চলিয়া এবং অনেকপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, চতুর্থদিবসে তীর্থযাত্রিদ্বয় পরমারাধ্যা সারদামাতার পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। পূর্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, অকস্মাৎ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া মাতাঠাকুরাণী যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে যুগলকিশোরী তারকেশ্বর হইতে পদব্রজে জয়রামবাটীতে আসিয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীমাতা তাহাকে অনেক আদর করিলেন, এবং গৌরীমাকে মৃদুহাস্যে বলিলেন,—

'যারে ঘুমালে চিয়াতে নারি, তারে করলে বিধি দণ্ডধারী!'

শ্রীমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী সমবয়সী রাধারাণী, সুশীলা প্রভৃতির সহিত বালিকার পুনর্মিলন হইল। মাতুলানীগণ যথেষ্ট আদরযত্ন করিলেন। মা সারদা বাঁড়ুয্যেদের পুকুরে প্রত্যহ স্নান করিতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, স্বহস্তে প্রসাদ দিতেন, এক শয্যায় স্থান দিতেন।

মাতাঠাকুরাণী কন্যাকে শিহড়ের শান্তিনাথ শিব, মাতুলালয়, হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাটী, তাজপুরের বিশালাক্ষী ও কামারপুকুর দর্শন করাইলেন। দেবী সিংহবাহিনীর বিভূতি বর্ণনায় মাতা কন্যাকে বলেন, "সিংহবাহিনী বড় জাগ্রত দেবী, তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে অভীপ্সিত মেলে। যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য আমার মন খুব ব্যাকুল হয়েছিল, তখন এই দেবীরই শরণ নিই। ইনিই আমাকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার উপায় করে দিয়েছিলেন। তুমি যাও মা, সিংহবাহিনীকে তোমার মনের প্রার্থনা জানিয়ে এসো।"

মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কন্যা দেবীসমীপে অন্তরের প্রার্থনা জানাইয়া আসিল। মাতৃসান্নিধ্যে থাকিবার অবকাশে সমাগত অনেক সন্তানসন্ততির প্রতি করুণাময়ী মায়ের অপার কৃপার বহু ঘটনা বালিকা প্রত্যক্ষ করে। এইপ্রসঙ্গে পরবর্তিকালে তিনি বলিয়াছেন, "এই তীর্থযাত্রায় অনেক কষ্টস্বীকার করতে হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ফলস্বরূপ অপার আনন্দও লাভ হয়েছিল।"

পরবর্তিকালে আর একবার। গৌরীমা কন্যাসহ স্বল্পকালের জন্য বসিরহাটে গিয়াছেন, এমনসময় অবিলম্বে তাঁহাদের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানাইয়া স্বামী সারদানন্দ জনৈক ভক্তকে এক পত্রসহ পাঠাইলেন। জরুরী আহ্বানে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিলে স্বামিজী গৌরীমাকে বলেন,—মা-ঠাকরুণ যে জয়রামবাটী থেকে আর আসতে চাইছেন না। এদিকে, তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তেরা সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তুমি নিজে গিয়ে যেমন করে হোক মা-ঠাকরুণকে নিয়ে এসো, গৌরমা, এ আর কারুর কম্ম নয়।

সারদানন্দজী এবং ভক্তগণের ব্যাকুলতা বুঝিয়া গৌরীমা কন্যাসহ জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাওড়া হইতে ট্রেনে বিষ্ণুপুর, তৎপর গো-শকটে অবশিষ্ট পথ। জয়রামবাটী পোঁছাইতে সন্ধ্যা হইল। শ্রীমাতার সহিত তাঁহাদের এইবারের সাক্ষাতের বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ।—

"সেইদিন জয়রামবাটীতে এক সাধুর আবির্ভাব হইল,—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে এক লাঠি। সঙ্গে তাঁহার অনুরূপ এক চেলা। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সহোদর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইয়া দিদিকে গিয়া সংবাদ দিলেন, 'দেখ গো, তোমার এক মাদ্রাজী ভক্ত এসেছে।'

"এদিকে সাধুও বহির্বাটীতে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সাধু তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। একে

অপরিচিত পুরুষমানুষ, তাহাতে অন্তঃপুরের মধ্যে, তাহার উপর অসময়ে ভিক্ষা চাওয়া,—ভ্রাতৃজায়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাধুকে গালমন্দ আরম্ভ করিলেন, 'আ মরণ, ভিক্ষের আর জায়গা পেলে না? এ ভরসন্ধ্যেয় গেরস্তের বাড়ীর মধ্যে এসেছ ভিক্ষে চাইতে!'

"সাধু তাহা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া এক-পা দুই-পা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহিলাও ভয়ে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিলেন, পশ্চাৎ দিকে সরিতে সরিতে একস্থানে ঠেকিয়া পড়িলেন। তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ওগো ঠাকুরঝি, শীগ্‌গির এসো, একটা বেটাছেলে অন্দরে ঢুকেছে।'

"চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমাও আসিলেন এবং সাধুকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সাধু অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমা আরও বিস্মিত হইলেন। সাধু তখন মাথার পাগড়িটা একটানে খুলিয়া ফেলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীমা বিস্ফারিতনেত্রে গালে হাত দিয়া বলিলেন, 'ওমা গৌরদাসী! আমি যে সত্যি চিন্‌তে পারি নি। খুকীকেও চিন্‌লুম না। ধন্যি মেয়ে বাপু তোমরা!'

বাড়ীতে হাসির রোল পড়িয়া গেল।" (২)

মাতাঠাকুরাণীর পল্লীভবনে গৌরীমা ও কন্যা পরমানন্দে কয়েক-দিবস অতিবাহিত করেন।* তৎপর শ্রীমাতাসহ তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(২) শ্রীদুর্গামাতা-রচিত 'গৌরীমা' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত'।
অতঃপর এই গ্রন্থের উদ্ধৃতিস্থলে কেবল (২) লেখা থাকিবে।

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ আনুড়, ১৩ জুন ১৯১০
এখানে গৌরমাতা ও দূর্গা পংছিয়াছেন···আমাকে উহারা লইয়া জাইব বলিয়া বসিয়া আছেন বোধ হয় ১০ রোজ আগামি মাহায় কলিকাতায় জাইব।

যুগলকিশোরীর বয়ঃক্রম এখন একাদশ, বয়সে কিশোরী, কিন্তু গঠন সুপুষ্ট। তাহার আত্মীয়গণ অনেকেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, —মেয়ে যখন একবার যোগিনীমায়ের কবলে পড়িয়াছে, সেও একদিন যোগিনী হইয়া যাইবে। সেই পথেই তাহার পরিবর্তনও আরম্ভ হইয়াছে। অধিক বিলম্ব করিলে সম্পূর্ণরূপেই হতাশ হইতে হইবে। সুতরাং জগন্নাথদেবকে সম্প্রদান করা সত্ত্বেও আত্মীয়গণ কন্যাকে গৃহস্থাশ্রমে ব্রতী করাইতে আগ্রহান্বিত হইলেন। তাঁহারা বলেন,— ইহাতে অধর্ম হইবে কেন? ভগবান তো সর্বজীবের পিতা, তাই বলিয়া কি সকলের মানুষ-পিতা থাকে না? না থাকিলে, ভগবানের সৃষ্টি কি করিয়া রক্ষা পায়? ব্রজের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেরও তো বিবাহ হইয়াছিল। গৃহে তাঁহাদের স্বামী ছিলেন। শাস্ত্রমতে নারীর পক্ষে মানুষ-স্বামীর আশ্রয়ে থাকাই ধর্ম, অন্তরে সে ভগবানকে ভজনা করুক-না, তাহাতে তো আপত্তি করিবার কিছু নাই।

যুগাকে যে-ভাবেই হউক বিবাহ দিতেই হইবে। পিতৃপক্ষ সচেষ্ট হইলেন। মাতুলও ইহা সমর্থন করিলেন। চেষ্টার সর্বপ্রথম কথা— কন্যাকে অবিলম্বে শান্তিপুরে পিতৃগৃহে আনিয়া নিজেদের আয়ত্তে রাখিতে হইবে। কিন্তু, যোগিনীমায়ের কঠোর কবল হইতে কি করিয়া তাহাকে উদ্ধার করা যায়? সেই রুদ্রাণী সন্ন্যাসিনীর সম্মুখে গিয়া কে কন্যাকে দাবী করিবে? ব্যাপারটা কোনমতেই সহজসাধ্য নহে। পিতা যোগিনীমায়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন, ভয়ও করেন। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দাবী জানাইবার সাহস তাঁহার নাই। তথাপি আত্মীয়গণ বারাকপুর আশ্রমে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। যোগিনীমা হাঁকাইয়া দিতেন,—বটে! জগন্নাথের লক্ষ্মীকে তোমরা আবার বিয়ে দেবে? খবরদার, এ মুখো হবে না। মেয়ের বাপ এলে তাঁর সঙ্গে কথা হবে, তোমরা কে হে বাপু?

তাঁহারা বুঝিলেন, এই পথে কার্যোদ্ধার হইবে না। স্থির করিলেন, পথে ঘাটে যেস্থানেই যুগার সাক্ষাৎ পাইবেন, জোর করিয়া লইয়া আসিবেন। তাহার পর যাহা হইবার হইবে। আইনতঃ অভিভাবক পিতা, তিনি কন্যাকে চাহিতেছেন, কন্যাকে জোর করিয়া রাখিবার অধিকার যোগিনীমার নাই। প্রয়োজন হইলে পুলিসের সাহায্যে তাঁহারা যুগাকে উদ্ধার করিবেন।

এদিকে যোগিনীমা স্থানীয় ভক্তদিগকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন, অপরিচিত কাহাকেও আশেপাশে দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ যেন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়। কন্যাকেও পলায়নের পথঘাট তিনি বুঝাইয়া রাখিলেন,—যেদিক হইতে লোক আসিবে, বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলাইবে। কোন্ দিকে কাহার বাটীতে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে, তাহাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়া রাখিলেন।

একদিন যোগিনীমার জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে দেখিয়াই কন্যা উধাও। সর্দার-মাঝি মুচিরামদাসের কন্যা সখী তুলসীদাসীর গৃহে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

—যুগা কৈ? কেমন আছে?

—ভাল আছে, এখন এখানে নেই।

সহোদর ব্যাপারটি বুঝিলেন, মনে মনে কুপিতও হইলেন; কিন্তু সংযতভাবেই বলেন,—পরের মেয়েকে তুমি এভাবে আটকে রেখেছ কেন? কদ্দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে? তাঁরা থানাপুলিস করলে তোমার সুনাম কি বাড়বে?

যোগিনীমা বলিলেন,—যজ্ঞের ঘি কি শেষটায় কুকুরে খাবে? দেবতাকে সম্প্রদান করার আগে তোমাদের এসব ভাবা উচিত ছিল। মেয়ে মহৎ কাজের জন্য নির্দিষ্ট। মেয়ে পাবে না। যা করতে পার কর গিয়ে তোমরা, গৌরীপুরী কারুর পরোয়া করে না।

অবস্থা সুবিধার নহে বুঝিয়া সহোদর আলোচনার ধারা পরিবর্তন করিয়া বলিলেন,—বিষয়টা তুমিও ধীরভাবে চিন্তা করে দেখ।

যুগার বিয়ে না দিলে ওর বাবার নিন্দে হবে। লোকে বলবে, লোকটা আবার বিয়ে করে ঘাড়ের বোঝা এভাবে বিদেয় করেছে। তারা আমারও নিন্দে করবে, বলবে, খরচের ভয়ে মা-মরা ভাগ্নীকে মামা সাধু করে দিয়েছে। আমার কথা শোন, যুগাকে তুমি ওদের হাতে ফিরিয়ে দাও, আমার একটা মেয়ে তুমি নাও। নিঃসর্তে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিচ্ছি।

যোগিনীমা উত্তর দিলেন,—আমি জানি, আরমানী বিবির মতই তোমার মেয়েরা সুন্দরী, কিন্তু বিজুর এ মেয়ের মত উচ্চ আধার তো তোমার মেয়েদের নয়। হলে আমি যেচে নিতুম। আমি দৈবনির্দেশে একে নিয়েছি, এভাবে গড়ে তুলছি। মনে ব্যথা পেয়ো না তুমি। তোমার মেয়েরা খারাপ নয়, তারাও ভাল, সংসারে সুখী হবে। কিন্তু যুগা যে আলাদা থাকের। মুখুজ্যেকে বলো, মেয়েকে নিমিত্ত করে আমার সঙ্গে যেন ঝগড়া না করে। এ মেয়ে তার বংশের গৌরব হবে। শত শত লোকের মা হয়ে পুজো পাবে। এ কত বড় সৌভাগ্য! সেই যাকে বলে 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।

পরাজয় মানিয়া ফিরিয়া গেলেন অবিনাশচন্দ্র।

বালিকার জ্যেষ্ঠ সহোদর শিবকালী মুখোপাধ্যায় এখন প্রাপ্তবয়স্ক এবং সংসারাশ্রমে ব্রতী। তিনিও সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন ভগিনীর বিবাহের জন্য, কিন্তু গৌরীমার সহিত পারিয়া উঠিলেন না।

এদিকে, গৌরীমাতাও চিন্তিত হইলেন,—এ তো মহাঝামেলা। কদ্দিন এভাবে চলবে? এসব দুর্ভাবনায় আশ্রমের কাজ, ঠাকুরের সেবাপূজো—সবকিছুর বিঘ্ন হচ্ছে। কী করা যায়?

কন্যার স্বলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, এইসময়ে একদিন গৌরীমা মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষের লোকদের খুব বকাবকি করিলেন। তৎপর কন্যাকে বলিলেন, "মা, আমরা এদের ছেড়ে পালাই চল। তুমি তোমার বাপভাইকে ভালবেসো না, মা। ওরা জগন্নাথকে ভালবাসে না, বিশ্বাস করে না। তুমি শ্রীমাকে ভালবেসো, দামোদরকে ভালবেসো। এই বিষয়ীদের তুমি ত্যাগ কর।' আশ্চর্য, সন্ন্যাসিনীর

হুঙ্কারে আমার সকল ভালবাসা মামা ভাই সব হইতে চলিয়া গেল, মনে হইল—সব বিরোধী। জগন্নাথ প্রভুকে যে ভালবাসে না সে অতি পর।"

গৌরীমা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া উত্তর-কলিকাতায় ভক্ত বলরাম বসুদের বাটীতে আসিয়া উঠিলেন, এবং এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীসারদামাতা ও স্বামী সারদানন্দজীর নিকট গমন করিলেন। অবস্থা শুনিয়া শ্রীমাতাও চিন্তিত হইয়া বলেন, 'শরতের পরামর্শ নাও।'

অপরপক্ষও সারদানন্দজীর নিকট মধ্যে মধ্যে আসিতেন কন্যা-সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সহযোগিতালাভের আশায়।

উক্ত কন্যা কুমারী থাকিয়া এবং উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া মাতৃজাতির ও দেশের সেবা করিবে, স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ অভিপ্রায় সারদানন্দজীও অবগত ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, 'গৌরমা, খুকীকে যদি এই পথে রাখতে চাও, তবে শীগ্যির বাংলাদেশ ছেড়ে দূরে চলে যাও।' পাথেয়স্বরূপ কিছু টাকা তিনি গৌরীমাকে দিলেন এবং পশ্চিম-ভারতে এক ভক্তের ঠিকানাও বলিয়া দিলেন।

বারাকপুর আশ্রমের কার্যধারা তখন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিত না। মধ্যে মধ্যে ভক্তগণের আমন্ত্রণে গৌরীমা বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্যে যাইতেন। আশ্রমবাসিনী কন্যাদিগকে জননী গিরিবালার দায়িত্বে অথবা শ্যামনগর ও অন্যত্র ভক্ত গৃহস্থের বাটীতে রাখিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। এইবার স্ব স্ব গৃহে কন্যাদের প্রেরণ করিয়া যুগলকিশোরীসহ গৌরীমা প্রথমে কলিকাতায় আসিলেন। অতঃপর মাদ্রাজে গমন করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে সোলাপুরে গিয়া ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার হরিপদ মিত্র এবং তদীয়া পত্নী (স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নারী শিষ্যা) ইন্দুমতী দেবীর অতিথি হইলেন। প্রবাসে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতবাসের প্রসঙ্গে ইন্দুমতী লিখিয়াছেন,—

"আমরা তখন বম্বে প্রেসিডেন্সীর সোলাপুর জিলায় থাকি।··· ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, বেলা ৩টার সময় হঠাৎ শ্রীশ্রীগৌরীমা তাঁর পালিত কন্যা (বয়স ১১।১২) শ্রীমতী দুর্গা দেবীকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গা গাড়ী করিয়া আমাদের বাসায় আসিলেন। পূর্বে জানা ছিল না যে তাঁহারা আসিবেন, বা পরিচিতও ছিলেন না, এজন্য হঠাৎ দেখিয়া একটু আশ্চর্যও হইলাম। কিন্তু গৌরীমার গেরুয়া বসন দেখিয়া সন্ন্যাসিনী এবং বাঙ্গালী বোধ হইল, দুর্গামার তখন পরিধানে সাদা কাপড়, নাকে নোলক ইত্যাদি। দেখিয়াই মনে হইল ভাল লোক হইবেন। আমরা তাঁহাদিগকে থাকিবার স্থান দিলাম।···তাঁর নিকট ভগবান রামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীশ্রীমার ও পূজ্যপাদ গুরুদেব স্বামিজীর কথাসকল শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতাম।···পূজনীয়া মাতাজীর নিকট শুনিলাম, তাঁহার পালিত কন্যা শ্রীমতী যুগাকে জোর করিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ বিবাহ দিবার চেষ্টা করায় পূজনীয় সারদানন্দ স্বামীর পরামর্শে মাতাজী যুগাকে লইয়া আমাদের নিকট আসিয়া গুপ্তভাবে থাকেন।···

"···মাদ্রাজ হইতে শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পূজনীয়া মাতাজী সম্বন্ধে পত্র দিলেন, তাঁহার পত্র পাইয়া আমাদের মনের সন্দেহ কিছুই রহিল না। মাতাজী ও যুগামাকে আমরা আমাদের পরিবারভুক্ত করিয়া লইলাম এবং আনন্দে আমাদের দিন গত হইতে লাগিল।···মাতাজীর নিকট শুনিলাম, স্বামিজী দুর্গামাকে কোলে লইয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, চিরকুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া জগতের মাতৃজাতির উন্নতির জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। মাতাজী আমাদের নিকট সোলাপুরে প্রায় চারি মাস ছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রবাসে অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলাম।···যুগামা তখন বালিকা, তাঁহাকে আমার স্বামী ইংরাজী পড়াইতেন।"

সোলাপুরেই ইন্দুমতী দেবী এই কন্যার প্রথম ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন। সোলাপুর হইতে তাঁহারা পাণ্ডারপুরে শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী বিগ্রহ এবং পুনায় সারদাসদন নামক বিধবা-আশ্রম দেখিতে

যুগলকিশোরী

যুগলকিশোরী ও গৌরীমাতা

গিয়াছিলেন। বোম্বাই ও বেলগাওতেও যাওয়া হয়। সারদাসদনের এবং উত্তরকালে নারী-বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ডক্টর ধোন্দো কেশব কার্ভে, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পত্নীর সহিতও তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁহারা উৎসাহ প্রকাশ করেন।

কন্যা এবং দৌহিত্রীর সংবাদ দীর্ঘকাল না পাইয়া গিরিবালা একদিন উত্তর-কলিকাতায় শ্রীসারদামাতা এবং স্বামী সারদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমাতা তাঁহাকে বলেন, "গিন্নি, তুমিই মূলাধার। কন্যা আমার জগন্নাথে সঁপেছ, কন্যাকে সংসারী করার ইচ্ছা ত্যাগ কর—আমায় ভিক্ষা দাও।"

উত্তরে গিরিবালা বলেন, "আমার জোর নেই মা, কন্যার মামা বাপ ভাই তাঁরাই কর্তা। আমি মেয়েমানুষ।"

শ্রীমাতা আবার বলেন, "তুমি ইচ্ছা ত্যাগ কর।"

গিরিবালা বলেন, "তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

সোলাপুর হইতে আশ্বিন মাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌরীমা ও কন্যা কলিকাতায় সারদানন্দজীর সহিত সাক্ষাতের পর বৎসরাধিক কাল শ্যামনগর, মূলাজোড়, বসিরহাট প্রভৃতি স্থানে ভক্তদের গৃহে বাস করেন। মধ্যে মধ্যে গৌরীমা বারাকপুরে গিয়া আশ্রমবাটীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং প্রতিবেশী ভক্ত সন্তানদিগকে আশ্রম প্রহরায় উৎসাহ দিয়া আসিতেন।

গৌরীমার বসিরহাটে যাতায়াত ছিল পূর্ব হইতেই। ১৩০৬ সালে উত্তর-কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক মহিলা-সভায় গৌরীমাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ভাষণ শুনিয়া জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি বসিরহাটের উকীল দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরীর পত্নী শৈলবালা চৌধুরী,—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আত্মীয়া। ইঁহার সাদর আমন্ত্রণে গৌরীমা বসিরহাটে

তাঁহাদের বাটীতে গমন করেন। তদবধি তিনি এবং পরে বালিকা যুগলকিশোরীও বহুবার বসিরহাটে গিয়া তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। শৈলবালাকে গৌরীমা এতই বিশ্বাস করিতেন যে, বসিরহাটে অবস্থানকালে সহসা স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে তাঁহার তত্ত্বাবধানেই কন্যাকে রাখিয়া গমন করিতেন।

বাল্যকালেই যুগলকিশোরী বসিরহাটের ভক্তগণের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন। যাঁহারা এইসময়ে তাহাকে পাঠাভ্যাসে সস্নেহ সহায়তা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ রায়, কবি ভুজঙ্গভূষণ রায় চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা এই কন্যার মধ্যে পাইয়াছিলেন একাধারে পরম সুশীলা স্নেহময়ী ভগিনী এবং আগ্রহশীলা এক মেধাবিনী শিক্ষার্থিনী।

এই শিক্ষার্থিনীর নিকট বাল্যকালের প্রসঙ্গে আমরা শুনিয়াছি, "আশুদা ছিলেন খুবই কৌতুকপ্রিয়। একদিন ভূগোল পড়াতে পড়াতে আমাকে বলেন, 'বুডাপেষ্ট মানে কি জানিস? বুড়া পেস্তা খায়।' আর একদিন গৌরীমা আমার হাতে কিছু মিষ্টি দিয়েছেন, হঠাৎ আশুদা এসে আমার হাতের কবজীটা ধরে তাঁর মুখের কাছে তুলে সব মিষ্টিই খেয়ে ফেললেন। তাই দেখে গৌরীমা আশুদাকে খুব বকলেন। আমার মনে কিন্তু কোন রাগ বা দুঃখ হয় নি, বরং খুশীই হয়েছিলুম দাদার স্নেহের আচরণে।"

বসিরহাটে ভক্তবৃন্দের আগ্রহে গৌরীমা বালিকাদিগের জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করেন।* ইহাতে তিনি অধ্যাপনা করিতেন। বয়সে বালিকা হইলেও এই কন্যাও শিশুশ্রেণীতে শিক্ষকতা করিত।

১৩১৫ সালের শেষভাগে বসিরহাটে শৈলবালা দেবীর তত্ত্বাবধানে কন্যাকে রাখিয়া তাহার বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে গৌরীমা শান্তিপুরে কন্যার পিতার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

* বালিকাদিগের সেই পাঠশালাটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া বর্তমানে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহিবৃন্দের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে।

কন্যার প্রসঙ্গে "পিতা নিজের মনের অবস্থা সরলভাবে খুলিয়া বলিলেন। কন্যাকে যোগিনীমার হাতে সমর্পণ করিতে পত্নী ব্রজবালার অন্তিম ইচ্ছা, জগন্নাথদেবে সম্প্রদান এবং আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা,—এইসকল বিবেচনা করিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। উভয় পক্ষে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে পিতা স্বীকৃত হইলেন যে, অন্যে যাহাই করুক, তিনি নিজে যোগিনী-মা এবং কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না।" (২)

ইহাতে গৌরীমা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং বসিরহাট হইয়া কন্যাসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জননী গিরিবালার সাক্ষাতেও গমন করেন, এবং তাঁহার আগ্রহে দুই-চারি দিবসের জন্য যুগল-কিশোরীকে তাঁহার নিকট রাখিয়া আসিলেন। একদিন যুগল গুরুদর্শন-মানসে উত্তর-কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাতামহীও সঙ্গে চলিলেন। মাতৃভবনে গিয়া স্বামী সারদানন্দজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার এবং মধুর সম্পর্কের এক চিত্র পাওয়া যায় কন্যার লিখিত বিবরণ হইতে—"আমরা ট্রামে করিয়া চিৎপুর দিয়া শ্রীশ্রীমার বাড়ী উদ্বোধন অফিসে আসিলাম। মাতামহী বিরাট এক ঘটী দুধ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তদের জন্য কিছু মা কালীর প্রসাদী মিষ্টি আনিয়াছিলেন। উদ্বোধনে ঢুকিতেই স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, 'দিদিমা বুড়ি যে, কেমন আছ গো? একদিন মহামায়ার প্রসাদ খাওয়াও।' বৃদ্ধা বলিলেন, 'কবে খাবে দাদা, বল, আমি নিয়ে আসবো।'

"পরে স্বামী সারদানন্দ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এই যে বুড়ী যে, কেমন আছিস বল বল। তোর ভ্যাং ভ্যাং পড়া কেমন চলছে?* এবার তোকে ছাড়ছি না, তোকে স্কুলে মাষ্টার করবো। আচ্ছা, বসিরহাট স্কুলে কি করে পড়াস আমায় শোনা।'

* সংস্কৃত শব্দরূপ শিক্ষাকেই স্বামিজী কৌতুকচ্ছলে 'ভ্যাং ভ্যাং পড়া' বলিয়াছিলেন।

"আমি প্রণত হইলে সারদানন্দজী একান্ত ভ্রাতৃস্নেহে পিঠে একটি কিল দিয়া বলিলেন, 'নে নে, আর পেন্নাম করতে হবে না।' হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, 'সে কথা মনে আছে তো? বলবি— শরৎদাদা।"

এই স্নেহপাত্রীর মুখে 'মহারাজ' সম্বোধন তাঁহার মনঃপূত হইত না, দাদা ডাক শুনিলেই তিনি অধিক প্রীত হইতেন।

১৩১৬ সালের প্রথমভাগে গৌরীমাতা এবং কন্যা কলিকাতার অন্তর্গত শান্তিনাথতলায় ভক্ত বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরীর বাটীতে বাস করিতেছিলেন। এইস্থানে গৌরীমাতা এবং উদ্বোধন-ভবনে শ্রীসারদা-মাতা একই সময়ে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। গৌরীমাতার রোগ এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল যে, চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। রোগাক্রান্ত মাতৃদ্বয় তখন নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন,—গৌরীমার দেহান্ত হইলে কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে চালিত হইবে? রোগশয্যায় থাকিয়াও গৌরীমা কন্যাকে বুঝাইতেন,—আমি মরে গেলে তুই কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাবি নি, মা-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে থাকবি।

শ্রীমাতাও কন্যাকে উদ্বোধন-ভবনে আনিয়া রাখিবার জন্য স্বামী সারদানন্দকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু, পীড়িত গৌরীমাতার নিত্যপূজিত দামোদরশিলার প্রাত্যহিক পূজাভোগের দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া কন্যার পক্ষে অবিলম্বে শ্রীমাতার নিকট গিয়া বাস করা সম্ভব হয় নাই; তবে মধ্যে মধ্যে অবসর সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও কন্যাকে উপদেশ দিতেন,—তোমার বাবা, দাদা, মামা যে-ই নিতে আসুক, তুমি কিন্তু তাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে যেয়োনি। তোমার কোন ভাবনা নেই মা, আমার কাছে তুমি থাকবে। তোমার কত শিষ্যসন্তান হবে, তাদের মা হয়ে থাকবে তুমি। যদি সংসারে ফিরে যাও, কে তাদের দেখবে?

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অনতিবিলম্বে রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিলেন, কিন্তু গৌরীমাতার নিরাময় হইতে অধিক সময় লাগিল। রোগমুক্ত হইবার পর শ্রীমাতার ইচ্ছানুযায়ী গৌরীমাতা ও যুগল উদ্বোধন-ভবনে তাঁহার সান্নিধ্যে প্রায় আড়াইমাস বাস করেন।*

ইহারই কয়েকদিন পূর্বে যুগলকিশোরী কঠিন আমাশয় রোগে মরণাপন্ন হয়। চিকিৎসক বিধান দিলেন মাছের ঝোল খাইতে। গৌরীমা বলিলেন, "দামোদরের সেবার জন্যই যদি মেয়ের জন্ম হয়ে থাকে, তবে কাঁচকলার ঝোল খেয়েই সেরে উঠবে। আর, যদি মেয়ে মরে যায়, তবে জানব—দামোদরের সেবা ওর কপালে নেই।" কয়েকদিবসের মধ্যেই অবশ্য মাছের ঝোল না খাইয়াও কন্যা সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু ভক্তিমতী নারীমহলে কন্যার এই অসুস্থতা প্রসঙ্গে সেদিন দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল,—যুগলের জীবন-সংশয় জানিয়াও চিকিৎসকের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া গৌরীমা তাহাকে কেবল কাঁচকলার ঝোলই খাওয়াইলেন, দুই-চারি দিবসের জন্যও মাছ খাইতে দিলেন না।

এইবার উদ্বোধন-ভবনে বাসকালে একদিন "গোলাপমা, ছোট-মামী, ন' দিদি এবং আরও কয়েকজন মহিলা কন্যাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং আমিষভক্ষণের উপকারিতা বুঝাইতে লাগিলেন, 'তুমি কেন মাছ খাবে না? মাছ না খেলে, গৌরমার মত কঠোরতা করলে, তুমি কদিন বাঁচবে? তোমায় মাছ খেতেই হবে।'

"আলোচনার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই কন্যার মাছ খাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু গৌরমার

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ বাগবাজার, ১৪ অক্টোবর, ১৯০৯

গৌরদাসী এখানেই আছে। ভাল আছে। আমি ভাল আছি।

"ভয়ে খাইতে পারিতেছে না। মাতাঠাকুরাণীর সম্মতি লইয়া ইহাকে মাছ খাওয়াইতে হইবে; তাহা হইলে গৌরমা আপত্তি করিতে পারিবেন না। অদ্য হইতেই এই ব্যবস্থা আরম্ভ করিতে হইবে।

"তাঁহাদিগের বক্তব্য মাতাকে জানাইলেন। তিনি কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—মাছ খেলে দোষ নেই। তোমার ইচ্ছে হলে খাবে মা।

"গোলাপমা বলিলেন,—গৌরমার শিক্ষায় মেয়ে এভাবে তৈরী হচ্ছে। গৌরীমা জানাইলেন,—ওর যদি ইচ্ছে থাকে, মা-ঠাকরুণ যদি বলেন, খাবে মাছ। আমি বারণ করবো না।

"এইপ্রকার বাদপ্রতিবাদে আপত্তি জানাইয়া যোগেনমা বলেন,—তোমরা অত কথা বললে, ও মতি স্থির করতে পারবে না। এর ভার মা-ঠাকরুণের হাতে ছেড়ে দাও।

"মাতাঠাকুরাণী ধীরে ধীরে কন্যাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—শোন মা, আমার কথা। তোমার যদি মাছ খেতে ইচ্ছে যায়, কোন দ্বিধাসঙ্কোচ করো না তুমি, মাছ খাবে। আর যদি খাবার প্রবৃত্তি তোমার না থাকে, তাহলে কারুর প্ররোচনায় তুমি খেয়ো না। আমি বললেও খেয়ো না। কেন নিজের অনিচ্ছায় খাবে। তুমি নিজে ভেবে স্থির কর মা, অন্যের কথায় চলো না।

"মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কন্যা বলিল,—কোনদিনই আমার মাছ খেতে ইচ্ছে হয়নি মা। মাছ আমি খাবো না। উত্তরে মা প্রীত হইলেন, নিকটে টানিয়া কন্যাকে আদর করিলেন।" (১)

একদিন ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে গোলাপমা কন্যাকে বলেন, "ছাখ্, পরমহংস মশাই যদি বেঁচে থাকতেন, তোকে কত ভালবাসতেন!" মা সারদাকে বলেন, "মা, যুগল কিন্তু বড় ভাল মেয়ে, যুগল বালক তো, দেখ মা, কারু সঙ্গে ঝগড়া করে না। গৌরমার খুব কড়া শিক্ষা।"

শ্রীমাতা বলিলেন, "আসলে সেই বুড়ী দিদিমা গো। সে-ই মূল। বুড়ী কালীনামে ডগমগ।"

গোলাপমা বলেন, "গৌরমা কিন্তু বুড়ী দিদিমার কাছেও মেয়েকে ছাড়ে না। বলে, পাছে বুড়ী বিষয়বুদ্ধি দেয়।"

শ্রীমা হাসিয়া বলেন, "গৌরদাসীর কি তুলনা আছে।"

বৃদ্ধা মাতামহী সম্বন্ধে শ্রীমাতা উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। একদিন বৃদ্ধার প্রশংসায় তিনি কন্যাকে বলেন, "মাতামহী নয় গো, ও তোমার প্রথম গুরু—ধর্মের পথ দেখিয়ে দিলে। ওকে ভক্তি করবে। ঐ থেকেই তো রক্তধারা বইছে। কালী কালী করে জীবন দিলে। তাই পেটের সবাই কেউ কালী, কেউ কেষ্ট বলে জীবন দিচ্ছে।"

বৃদ্ধাও শ্রীমাতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, "তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি দশ মহাবিদ্যা"—বলিয়া প্রণাম করিতেন।

বৃদ্ধার দৌহিত্রী ছিল অতিশয় সুশীলা। দীক্ষাগুরু শ্রীসারদামাতার প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি ও আনুগত্য। পক্ষান্তরে, গুরুও বহুগুণের আধার তাঁহার এই মানসকন্যাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এইবার দীর্ঘদিন উদ্বোধন-ভবনে শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে বাসকালে বালিকা শিষ্যা তাঁহাকে দিবারাত্র সেবা করিবার অনেক সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে; গুরুও শ্রদ্ধাবতী শিষ্যাকে পূজার বিধি ও ধর্মবিষয়ে বহুপ্রকার শিক্ষাদান করেন।

কন্যার স্বলিখিত বিবরণ :

"শ্রীশ্রীমার আদেশে তাঁহার শিক্ষায় তাঁহার পূজিত ঠাকুরকে আরতি করিতাম। মা শিখাইয়া দিতেন ভোগ আরতি। মা যেদিন ক্লান্ত থাকিতেন, খাটখানিতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিতেন, 'যুগল মা, বড় ক্লান্ত আমি, কর তো মা আরতি। কিছু ভয় নেই মা, তোমায় সারাজীবন এই করতে হবে, কর মা।' নিজে মাতাঠাকুরাণী সন্ধ্যায় জপ করিতেন, সেই স্থানটিতে আসন পাতিয়া এই অধমাকে জায়গা করিয়া দিতে বলিতেন।"

একদা মাতাঠাকুরাণী বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিতা সীতাদেবীর খেদোক্তি-বিষয়ক একখানি গান গাহিতেছিলেন,—

বহু সাধনার গুণে পেয়েছিলাম নবদূর্বাদল শ্যামে,
হারায়েছি বিনা যতনে, ধিক্ রে জীবনে।···

সেই ঘরে বসিয়া কোন কোন ভক্তিমতী মহিলা শ্রুতিমধুর করুণ সঙ্গীতটি নীরবে শুনিতেছিলেন। বালিকা শিষ্যা পদসেবা করিতেছিল। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে প্রাণের পরম প্রার্থনাটি গুরুর নিকট নিবেদন করিল। তাহার ভাষাতেই উল্লেখ করিতেছি, "পা দুখানি—যা আমার হৃদয়ের সর্বস্ব, আমার ভবপারের তরী,—তাহাতে বাতের তেল মালিশ করিতে করিতে···আমি বলিলাম, 'মা আমায় গেরুয়া দিন,— আমি সাধু হব। আপনার দেওয়া মন্ত্র জপ কচ্ছি, আপনার দেওয়া কাপড় পরব। মনের বস্ত্র মন্ত্র, দেহের আচ্ছাদন গৈরিক··· আমি সন্ন্যাস নেব মা।"

মাতাঠাকুরাণী প্রথমতঃ মৃদুহাস্য করিয়া বলেন, "ও গোলাপ, ও ছোটবৌ, শুনছো—খুকী বলে কী!"···

কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, তাহার পরে শ্রীমাতা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তোমায় সন্ন্যাস দেব। শরৎকে বলে একটা শুভদিন আগে স্থির করি।"

শ্রীমাতার এইরূপ ইচ্ছার কথা গৌরীমাতা শরৎ মহারাজকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "খুকীর ভাগ্য ভাল, মা-ঠাকরুণ ওকে সন্ন্যাস দিচ্ছেন। কিন্তু গৌরমা, ওর বয়েস তো খুবই কম, একেবারে নাবালিকা। সন্ন্যাসে ওর পিতার সম্মতিটা আগে আদায় কর। নইলে, পরে আত্মীয়রা এসে আমাদেরও উত্ত্যক্ত করবে।"

কথাটা গৌরীমা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন,—সত্যই, এ ব্যাপারে কন্যার পিতার সম্মতি লওয়া প্রয়োজন।

কন্যাকে লইয়া গৌরীমা শান্তিপুরে বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্যা স্বয়ং প্রস্তাব উত্থাপন করিল,—আমি সন্ন্যাস নেবো সারদামাতার নিকট, আপনার অনুমতি চাই।

কন্যার মুখে সন্ন্যাসের প্রস্তাব শুনিয়া পিতা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। পূর্ববারে যখন কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়াছিল, পিতা অভিলাষ জানাইয়াছিলেন,—'আমাকে একবার বাবা বলে ডাকো।'

ব্রহ্মচারিণী কন্যা পিতার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ তো করেই নাই, উপরন্তু বলিয়াছিল,—'আমার বাবা বিশ্বনাথ শঙ্কর, মা আমার উমা শঙ্করী।'

নিজকন্যার মুখে এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ এবং অপ্রত্যাশিত উত্তরে সেদিন পিতা যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। সত্য বটে, প্রকৃত পিতা দেবাদিদেব মহাদেব এবং পরমাপ্রকৃতি শঙ্করীই জগজ্জননী, তথাপি নরদেহধারী জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতার সঙ্গে একটি সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর সম্পর্ক থাকে সন্তানের। আত্মজ-আত্মজার সহিত একান্তভাবে একাত্ম হইয়াই থাকেন মাতাপিতা। সন্তানের 'মা-বাবা' ডাক তাঁহাদের কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করে। পিতা বিপিনবিহারী তাই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা লইয়াই কন্যার মুখে 'বাবা' ডাক শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা শুনিতে না পাইয়া, তদুপরি ঐরূপ উত্তর শ্রবণে তিনি মর্মাহত হইয়াছিলেন।

সেই কন্যাই পুনরায় আসিয়াছে, বালিকাবয়সেই পিতার নিকট কঠোর সন্ন্যাসব্রতের অনুমতি লইবার উদ্দেশ্যে। এইরূপ আশঙ্কা যে তাঁহার মনে কদাপি উদিত হয় নাই তাহা নহে, বরং ইদানীং এই-প্রকার দুশ্চিন্তা তাঁহার সমগ্র চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বানপ্রস্থের পর বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রে আছে, বাল্যকালেই সন্ন্যাসগ্রহণের এত আগ্রহ কেন? কন্যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইসকল নানাকথা চিন্তা করিতে স্নেহময় পিতৃহৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা বাজিত। সংসারের সকল পিতার ন্যায় তাঁহারও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, অন্য দশজনের ন্যায় তাঁহার এই মাতৃহারা কন্যাও স্বামিপুত্র লইয়া বিবাহিত জীবন যাপন করুক, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক। কিন্তু, বিধাতার অভিপ্রায় হয়তো অন্যরূপ। পিতা অসহায়ের ন্যায় চিন্তা করিতেন,—যোগিনীমার সাহচর্যে এবং অনুপ্রেরণায় তাঁহার আদরিণী কন্যা ত্যাগতপস্যার পথেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, এইভাবে সেও একদিন সন্ন্যাসিনী হইবে। কন্যার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা এবং প্রতিশ্রুতিও তাহাই ছিল। দৈব এবং ভবিতব্য তাহাকে ঐ পথেই আকর্ষণ করিতেছে। মায়াবদ্ধ বিষয়ীর বিচারে তাহা প্রেয় না হইলেও, তাহা

যে শ্রেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পথ হইতে কন্যাকে এখন আর নিবৃত্ত করাও সম্ভব নহে। অবশেষে পিতা ইহা চিন্তা করিয়াই সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিলেন যে, যাহা রোধ করা যাইবে না, তাহাতে অনর্থক বাধা সৃষ্টি করিয়া লাভ কি? ইহাতে কেবল তিক্ততাই বৃদ্ধি পাইবে, অধিকন্তু, কদাচিৎ কন্যাকে দেখিবার আশাটুকু হইতেও হয়তো চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে।

কন্যার প্রার্থনার উত্তরে পিতা তাই শেষপর্যন্ত বলিলেন,—দুটি সর্তে তোমার সন্ন্যাসে আমি অনুমতি দিতে পারি।

—কি সর্ত, বলুন।

—প্রথম সর্ত: আমার সঙ্গে বসে আজ তোমায় খেতে হবে।

—আমি ব্রহ্মচারিণী, কারুর সঙ্গে একপাতে বসে খাই না, পাশে বসে খেতে পারি। কিন্তু সংসারের রান্না তো আমি খাব না।

দ্বিপ্রহরে পিতা স্বয়ং শুদ্ধাচারে পৃথকভাবে রন্ধন করিলেন, বহুকাল পর পিতাপুত্রী পাশাপাশি বসিয়া আহার করিলেন। পিতা এক অনাস্বাদিত আনন্দ লাভ করিলেন।

আহারান্তে দ্বিতীয় সর্ত সম্পর্কে তিনি বলিলেন,—আমি কয়েকটি প্রশ্ন করবো, যদি যথাযথ উত্তর দিতে পার, তবেই তোমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দেবো। এখন বিশ্রাম কর, সন্ধ্যেবেলা আমার প্রশ্ন শুনবে।

পিতার এইপ্রকার প্রস্তাবে সে চিন্তিত হইল। প্রশ্ন যদি অত্যন্ত কঠিন হয়, সে যদি তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারে, তখন কি হইবে? যোগিনীমার নিকট হইতে তো উত্তর জানিয়া লওয়া চলিবে না তখন।

সূর্যদেব অস্তাচলে অদৃশ্য হইয়াছেন, তথাপি সন্ধ্যার অন্ধকার তেমন ঘনীভূত হয় নাই,—এমনসময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। চিন্তাকুল বালিকা সহসা সম্মুখে দেখে,—এক দীর্ঘাকৃতি ছায়ামূর্তি, মস্তকে সুপক্ক কেশ, গলদেশে যজ্ঞোপবীত। বালিকা চমকিত হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হাস্যে বলেন,—'আমি পিতামহ। ভয় পেও না তুমি। প্রশ্নের উত্তরে

আমি তোমায় সাহায্য করবো।' বালিকা প্রকৃতিস্থ হইল এবং অনতিবিলম্বে পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পিতৃদেবের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বালিকা সহজেই দিতে সক্ষম হইল। অবশেষে তিনি চরম কথাই ব্যক্ত করিলেন,—'নারীর সন্ন্যাস নিষিদ্ধ, এতে আমার বংশের অকল্যাণ হবে।' এহেন প্রশ্নে কন্যা প্রথমতঃ উদ্বেগ বোধ করিল। এমনসময় পিতার পশ্চাদ্দিক হইতে বৃদ্ধ পিতামহ আকার-ইঙ্গিতে উত্তর বুঝাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া কন্যা পিতার কথার উত্তরে—যোগিনীমার সন্ন্যাসের কথা বলিল, শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিক গুরু সন্ন্যাসিনী ভৈরবীর কথা বলিল। অবশেষে বলিল,—আমি সন্ন্যাসিনী হলে আপনার বংশের অকল্যাণ হবে না, পিতৃপুরুষগণ প্রসন্ন হবেন। যোগিনীমার সন্ন্যাসে বংশের গৌরবই বৃদ্ধি হয়েছে।

অতঃপর পিতার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কন্যা প্রার্থনা জানায়,—আপনি প্রসন্নমনে আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিন।

দৈব অনুকূল। পিতার অন্তর বিগলিত হইল।

পরীক্ষায় কন্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, পিতা প্রসন্নচিত্তে তাহাকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দান করিলেন। পরীক্ষাবিজয়ের আনন্দে এবং বৃদ্ধ পিতামহের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এইবার পৌত্রী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখে,—তিনি উভয় হস্ত উত্তোলনপূর্বক তাহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া ক্রমশঃ নিকট হইতে দূরে অদৃশ্য হইতেছেন। তাঁহার উৎফুল্ল বদনমণ্ডল দর্শনে বালিকার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল যে, সন্ন্যাসগ্রহণের অনুকূল সিদ্ধান্তে পিতামহের আত্মা অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

গৌরীমাতা এবং কন্যা সানন্দমনে উদ্বোধন-ভবনে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসে অনুমতিলাভের সংবাদ শ্রীসারদামাতা ও স্বামী সারদানন্দকে জানাইলেন। শ্রীমাতার অনুমোদনে সারদানন্দজী পরবর্তী রাধাষ্টমী তিথিতে কন্যার সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষার দিন ধার্য করিলেন।

যে-দিবস শ্রীমাতার নিকট কন্যা সন্ন্যাসের প্রার্থনা নিবেদন করে, তাহার পূর্ব হইতেই তাহার মন যুগপৎ আনন্দ এবং নানা ভাবনায় আন্দোলিত হইতেছিল।—"সেইদিন থেকে মন বড় ভরে রইল। মা কি নির্দিষ্ট করেছেন? আমি বলেছি মাকে ছুঁয়ে—মা যা বলবেন তাইই করব। মা, মা,—তুমি আমায় তোমার কর। আমি সন্ন্যাসী হয়ে পুরীতে থাকব, জগন্নাথ দেখব।

"মা তো শুধু মুখে আশীর্বাদ করলেন, কৈ বললেন না তো—তুমি সাধু হবে। তখন নিজ পরিধানের বস্ত্রখানির মূল্য মনে করে মনে বড় বিরাগ এল। মা বোধ হয় ভাবলেন, এমন ভাল কাপড় পরে আছি, সোনার জিনিষ গায়ে রয়েছে, এ সাধু হবে কি করে? মন আবার বলল—না, মা ভগবতী, মা জানেন আমি সাধু হতে চাই।"

"ইহার কিছু পূর্বেই আমার চুড়ি, নোলক, হার, মাকড়ী মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমতী রাধারাণী এবং জনৈকা বালিকা ফুলুরাণী,—তাদের অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

মা বার বার হাত দুটি ধরে দেখলেন, বললেন—পবিত্র ফুল।"

সন্ন্যাসগ্রহণে পিতার অনুমতির সংবাদ সকল আত্মীয়পরিজনের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। "ইহার ভিতর মামা আসিলেন, ভ্রাতা আসিলেন, মাতামহী আসিলেন। আমি ভীত ত্রস্ত শঙ্কিত।" শ্রীগুরুকৃপায় মেঘ ও আশঙ্কা দূরীভূত হইল, অবস্থা অনুকূল হইল। "মা তাঁহাদের এত আশীর্বাদ করিলেন, সারদানন্দজী ভ্রাতাকে এত আদর করিলেন, আমায় তাঁহারা কৃপা করিলেন। তাঁহারা মার কাছে যেন আমায় রাখিয়া দিলেন।" সহোদর শিবকালী স্বর্গীয়া জননী ব্রজবালার কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার (প্রায় তিনশত টাকা মূল্যের) সারদানন্দজীর নিকট রাখিয়া গেলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া সন্ন্যাসানুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

শ্রীমাতার ইচ্ছানুযায়ী এবং বালিকার প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃও বটে, সারদানন্দজী অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১৩১৬ সালের শুভ রাধাষ্টমী দিবসে উদ্বোধন-ভবনের দ্বিতলে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্নেহধন্যা শিষ্যাকে সন্ন্যাস দান করেন। পূজাহোমাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান দুইদিনে সম্পূর্ণ হয়।

সন্ন্যাসের স্মৃতিকথায় কন্যা লিখিয়াছেন,—

"পুণ্যতিথি রাধাষ্টমী আসছে কাল। শ্রীশ্রীমা একখানি নূতন নরুণপাড় ধুতি আনিয়া গৈরিক আনিয়া নিজহাতে ছোপাইলেন। সন্ন্যাসিনী মাতাকে, গোলাপমাতাকে, যোগীনমাতাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। মা আমায় বলিলেন, মা তুমি কাকে ভালবাস? আমি বলিলাম, যাঁর শ্রীপাদপদ্মে সব সঁপে দিয়েছি। মা বলিলেন, সেই রূপ সেই মূর্তি চিন্তা কর, দেখ।

"পরদিন গঙ্গাস্নান করিয়া,—মার সাথেই স্নান করিয়া, একটি চাকরকে দিয়া (নাম মোহন) একখানি কোকিলপাড় ধুতি, বাগবাজারের কস্তুরী, রসগোল্লা আনাইলাম। পূজার ফুল আনাইলাম। শ্রীশ্রীমা পূজা করিলেন।...সন্ন্যাসিনী মাতা হোমের আয়োজন রাখিয়া দিলেন।"

শুনিয়াছি,—গৈরিক বসন দানের পূর্বে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতা নিকটে উপবিষ্টা আদরিণী কন্যার চিবুক স্পর্শ করেন, মস্তকে শ্রীহস্ত স্থাপনপূর্বক আশীর্বাদ করেন এবং তাহাকে দিয়া কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন করান। এইসময় কন্যার মনে ও দেহে এক অননুভূত দিব্যভাবের আবেশ হয়, এবং যখন শ্রীমাতা তাহার অঙ্গ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত করেন, তখন আনন্দের উদ্দীপনায় কন্যার সংজ্ঞা লোপ পায়।—

"কতক্ষণ আমার সংজ্ঞা ছিল না, জানি না, দেখি—আমার পরিহিত বস্ত্রের বদলে গৈরিক বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত। কপালে রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন এবং সিন্দুর মা পরাইয়া দিলেন,—গলায় মালা মা দিয়া দিলেন। আমি পূজা করিলাম—গুরুপূজা ইষ্টপূজা। মা আমায় অঞ্জলি দেওয়াইলেন। আমি আনন্দে বিভোর হইলাম। আমার সর্বাঙ্গে মা হাত বুলাইলেন, দুর্গাপুরী মা বলিয়া ডাকিলেন।

"তখন ভাবিয়াছিলাম—মা আদর করিলেন। আজ ভাবি—মা রক্ষাকবচ জপিয়া দিয়াছেন—কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—চরণসমীপে টানিয়া লইয়াছেন।"

সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিবার পর শ্রীমাতা বলেন,—"গৌরীমার মেয়ে দুর্গামা—দুর্গাপুরী দেবী।"

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর কৃপাধন্যা এই সন্ন্যাসিনী শিষ্যাকে অতঃপর আমরা 'মা' অথবা 'দুর্গামা' বলিয়া উল্লেখ করিব।
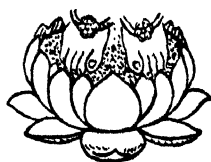
গৌরীমা দুর্গামা রাধারাণী শ্রীশ্রীমা সুশীলা কুসুম হরির মা

(ফটো—বি, দত্ত)

সন্ন্যাসের পরে দুর্গামা

বারাকপুর আশ্রম-প্রসঙ্গে

নিতান্ত ক্ষুদ্রাকারে বারাকপুরে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের আরম্ভ। পল্লীর বালিকাগণ প্রত্যহ আসিয়া পাঠাভ্যাস করিত। একে একে প্রায় পঁচিশজন কুমারী, সধবা ও বিধবা আশ্রমবাসিনী হইয়াছিলেন। ঘরের বারান্দায় এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় পাঠাভ্যাস চলিত। গৌরীমা স্বয়ং সকলকে সস্নেহে শিক্ষাদান করিতেন; অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত খেলাও করিতেন।

দুর্গামার নিকট আমরা শুনিয়াছি, বারাকপুর আশ্রমে যে-সকল ভক্তসন্তান যাতায়াত করিতেন এবং আশ্রম-পরিচালনায় নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— রায় বাহাদুর মাধবচন্দ্র রায় (ইঞ্জিনীয়ার), সুরেন্দ্রনাথ সেন (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শিষ্য), কুমুদবন্ধু সেন (শ্রীসারদামাতার শিষ্য), মুচিরাম দাস, গগন জেলে, শুকদেব, প্রহ্লাদ, সুরেশ, কুলদাপ্রসাদ, মোহিত মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রকুমার নাগ, বিনয়কুমার সান্যাল এবং অমিয় কুমার সান্যাল। শেষোক্ত তিনজনের পত্নীত্রয় গৌরীমার শিক্ষাধীনে কিছুকাল বারাকপুর আশ্রমে বাস করিয়াছেন।

এই শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের মধ্যে একজন পরবর্তী কালে স্বামীর সংসারে সুখৈশ্বর্য লাভ করিয়াও বলিয়াছেন, "সেই যে বারাকপুর আশ্রমের জীবনযাত্রা, তার তুলনায় আজকের জীবনের ভোগপ্রাচুর্য কত অকিঞ্চিৎকর। আমরা বারাকপুর আশ্রমে কত-দিন একবেলা পাতলা ডাল আর তেঁতুলের অম্বল দিয়ে ভাত খেয়ে, আর একবেলা শুধু মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। কত স্থানাভাব ছিল তখন আমাদের, তাতেও সে যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, মায়ের কত স্নেহযত্ন, আজও তা ভুলতে পারি নি।"

গৌরীমার নির্বাচিত—ভবিষ্যৎ আশ্রমের আশাস্থল দুর্গামা বয়সে তখন পূর্বোক্ত সকলেরই কনিষ্ঠা। তাঁহারা ভগিনীকে অতিশয় স্নেহ

করিতেন, তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন। ভগিনীও তাঁহাদিগকে নিকট আত্মীয়জ্ঞানে 'দাদা', 'বৌদিদি' বলিয়া ডাকিতেন।

পূর্বোক্ত মাধবচন্দ্র রায়ের পত্নী কেশবমোহিনী দেবীকে দুর্গামা 'কেশবদি' বলিতেন। ইনি গৌরীমার মন্ত্রশিষ্যা, সংসারে থাকিয়াও কঠোর আদর্শে জীবন যাপন করিতেন। শৈশবাবধি ভগিনী দুর্গাকে পরম স্নেহযত্নে ইনি সেবা করিয়াছেন, তাঁহার এবং আশ্রমের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন।

এইসকল দাদা-দিদি-বৌদিদিদের সহিত মায়ের মধুর সম্পর্ক পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ উত্তরকালে এই সন্ন্যাসিনী ভগিনীকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাভক্তিবশতঃ, অবশ্য ভগিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, প্রণাম করিতেন; মা কিন্তু নিজেকে তাঁহাদিগের সেই কনিষ্ঠা ভগিনী মনে করিয়াই অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করিতেন।

দুর্গামার সন্ন্যাসগ্রহণের পর মাতৃদ্বয় বারাকপুরে গিয়া পুনরায় আশ্রম-পরিচালনায় নিরুদ্বেগে মনোনিবেশ করিলেন। এইসময় হইতেই দুর্গামা ধীরে ধীরে গৌরীমার সহকারিণীরূপে যোগ্যতা প্রকাশ করিতে থাকেন। গৌরীমার অবর্তমানে আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহারা মনে সংশয় পোষণ করিতেন, সন্ন্যাসিনী দুর্গামাকে দেখিয়া তাঁহারাও আশ্বস্ত হইলেন; এবং নিঃসন্দেহে বুঝিলেন যে, একান্ত দৈবানুগ্রহেই গৌরীমা এইরূপ যোগ্য উত্তরসাধিকা লাভ করিয়াছেন। দুর্গামার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের অভ্যন্তরেও যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইতে লাগিল।

পক্ষান্তরে, গৌরীমার তপস্যা, দৈবশক্তি, কর্মক্ষমতা ও নানাবিধ অলৌকিক ঘটনাদর্শনে দুর্গামার মনও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তিনি বলিয়াছেন,—আশ্রমস্থ পঞ্চবটীতলে জপ কিংবা নামকীর্তন করিতে করিতে গৌরীমা অনেকদিন সমাধিস্থ হইয়াছেন, সমগ্র রাত্রি একইভাবে অতিবাহিত হইয়াছে।

তপস্যাপূত দৃষ্টিদ্বারা আশ্রমের নিমিত্ত বারাকপুরে যে ভূমিখণ্ড

গৌরীমা নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহা যে পুণ্যভূমি ও সিদ্ধস্থান তাহা আমরা মাতৃদ্বয়ের নিকট বহুবার শুনিয়াছি। নির্বাচিত স্থানটির নাম 'কপালেশ্বর'। সুরেন্দ্রনাথ সেন এই সিদ্ধস্থানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

"বারাকপুর আশ্রমের প্রাঙ্গণে একদিন প্রাতঃকালে গৌরীমাতা সবিস্ময়ে দেখেন, গঙ্গাতীর হইতে কাদা-মাখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন মন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। অনুসন্ধানে মা জানিলেন, ঐ প্রত্যূষে ঐরূপ ছোট বালিকা আশ্রমে কেহই আসে নাই। তখন জগজ্জননীর শুভাগমন হইয়াছে মনে করিয়া গৌরীমা সেই পবিত্র পদচিহ্নের উপর গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাকেন।"

সুরেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতার যে-সকল ভক্তসন্তান সেইদিন গৌরীমার দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও উক্ত পদচিহ্ন দর্শন করেন।

এই পুণ্যভূমির সম্পর্কে পরবর্তী কালের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন গৌরীমার জনৈক সন্তান—

"আশ্রম তখন ৫৩।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে। বারাকপুরের গঙ্গাতীরে অবস্থিত আশ্রমের স্থানটি দর্শনের জন্য আমার খুব কৌতূহল হয়। গৌরীমাতার নিকট গিয়া আশ্রমের সঠিক অবস্থান আমি জানিতে চাহিলাম। পলতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের জলকলের সীমানায় কয়লা-রাখার জেটীর নিকটে অবস্থিত আশ্রমের পঞ্চবটী, দেবদারুগাছ ইত্যাদি বিবরণ দিয়া, তারপর মা ঐ সিদ্ধস্থান কপালেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। অল্প কিছু বলিতেই কথা বন্ধ হইয়া গেল। মায়ের মুখে গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। প্রবেশদ্বারের পাশেই সিমেন্ট-বাঁধানো বেঞ্চিতে মা বসিয়াছিলেন, আমি হাতপাখা দিয়া বাতাস করিতেছিলাম। সহজ অবস্থায় ঝুলানো মায়ের পা দুইখানি সামনের দিকে শক্ত হইয়া রহিল। হাত দুইখানিও শক্ত হইল। মায়ের গায়ের রং ফরসা, মুখখানি আরও লাল হইল। দৃষ্টি স্থির, মনে হইল দূরে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। এমন অবস্থা আমি আর কখনও দেখি নাই, ভয় পাইলাম। এমনসময় বাহির হইতে মায়ের পরিচিত এক ব্যক্তি সেস্থানে প্রবেশ করিলেন। কাতরভাবে বলিলাম,

"দেখুন তো, মায়ের কি হলো ? এবং মা যাহাতে পড়িয়া না যান সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেই বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—এখন ছোঁবেন না, ছোঁবেন না, মা সমাধিতে রয়েছেন।

"সমাধি অবস্থা আমি পূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া একটু দূর হইতেই মাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। তিনি বাহিরের উঠান হইতে চীৎকার করিয়া দুর্গামাকে ডাকিলেন। দুর্গামা আসিয়া অবস্থাদৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা কোন্ বিষয়ে কথা বলছিলেন ? আমি সংক্ষেপে বলিলাম। দুর্গামা ঠাকুরনাম শুনাইতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে গৌরীমার শক্ত হাত পা শিথিল হইল, কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা নির্বাক। গৌরীমাও কিছুসময় নির্বাক থাকিয়া আমায় বলিলেন,—না রে, বলতে দিলে না, মুখ চেপে ধরেছে। তুই একা ওখানে যাস্ নি, আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব একদিন।

"তখন স্পষ্ট বুঝিলাম, একজন কথা বলিবার সময় যদি তাহার মুখ অন্য একজন জোরে চাপিয়া ধরে, তখন যেমন শব্দ হয়, গৌরীমার মুখ হইতে ঠিক সেইরকম শব্দই বাহির হইতেছিল। আরও মনে হইল আমার, ঐ স্থানের অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করা হয়তো ঈশ্বরের অথবা ঐ সিদ্ধস্থানের বিদেহী সাধকদিগের অভিপ্রেত নহে। এই বিষয়ে গৌরীমাকে পরবর্তিকালে আর কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। অবশ্য, দুর্গামা পরে কিছু কিছু বলিয়াছেন এবং আশ্রমের ঐ স্থানটিও আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।"

পূর্বোক্ত নানাকারণে আমাদের মনে এইরূপ বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে যে, বারাকপুরের অন্তর্গত কপালেশ্বর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের স্থানটি বহুসাধকের তপস্যাপূত সিদ্ধস্থান।*

* সম্প্রতি কপালেশ্বরের প্রসঙ্গে শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য মহারাজ-প্রবর্তিত "উজ্জীবন" পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৭৪) শ্রীকানাই ঘোষ "রাঢ় বঙ্গের তিন ঠাকুর ও শ্রীধাম খড়দহ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত

বারাকপুর-প্রসঙ্গে আরও দুইটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ এই-স্থানে করিতেছি, দুর্গামার মুখে যেমনটি আমরা শুনিয়াছি।—

বারাকপুর আশ্রমের ঘাটে প্রতিবেশী অনেক মহিলা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। স্নানশেষে তাঁরা কলসী অথবা ঘটী ভরে গঙ্গাজল নিতেন, তার কিছুটা ঢালতেন শিবঠাকুরের মাথায়, কিছুটা পঞ্চবটীতলায়, তারপর যোগিনীমার মন্দিরে প্রণাম করে যে যার ঘরে ফিরে যেতেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় দুটি যুবতী বধূ গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন। পঞ্চবটীতলা দিয়ে ঘাটে যাবার সময় তাঁদের মধ্যে একজন হঠাৎ

কাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেয় রুদ্ররাম ব্রহ্মচারীর সাধনায় খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ, সাঞীবনের শ্রীনন্দদুলালজীউ এবং শ্রীরামপুরের শ্রীরাধাবল্লভজীউর শ্রীমূর্তিত্রয় ঐ কপালেশ্বরেই জগন্মাতার নির্দেশে দেবভাস্কর দ্বারা নির্মিত হয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,…যেস্থানে দেবমূর্তিত্রয় নির্মিত হইয়াছিল এবং রুদ্র যেস্থানে জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তী সময়ে উক্ত পবিত্র স্থানে, বারাকপুর মণিরামপুরের কপালেশ্বরের সাধক (কপালেশ্বরতলা বর্তমানে পলতা জলকলের মধ্যে অবস্থিত) সাগর আচার্য সস্ত্রীক তথায় আগমন করিয়া জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে ঘট স্থাপনা করিয়া মাতৃসাধনায় আত্মনিবেদন করেন। একদিন অতি প্রত্যুষে আচার্যদেব পুষ্পচয়নের জন্য গমন করিলে এই সময় পণ্যাটি (পণ্যহাটী বা পাণিহাটী) অঞ্চলের এক শাঁখারি আসিয়া আচার্যদেবের স্ত্রীর নিকট তাঁহার কন্যার শাঁখা পরিবার জন্য মূল্য প্রার্থনা করেন। শাঁখারির কথায় তিনি বিস্মিত হন। ইতিমধ্যে আচার্যদেব কুটীরে আগমন করিয়া শাঁখারির নিকট জানিতে পারেন গঙ্গার দহের নিকট তাঁহার কন্যা শাঁখা পরিয়া জলকেলি করিতেছেন। ঘটের মধ্যে টাকা আছে দিতে বলিয়াছেন। আচার্যদেব বিস্ময়বিমূঢ়ের ন্যায় ঘট উপুড় করিয়া পাঁচটী মুদ্রা পাইয়া শাঁখারিকে প্রদান করিয়া জড়াইয়া ধরেন ও গঙ্গার দহের নিকট ছুটিয়া যান, কিন্তু কয়েকটি ক্ষুদ্র পদচিহ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে মা! মা! রবে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে থাকেন।"

অবসন্নভাবে মাটীতে বসে পড়লেন। ভয়ে সঙ্গিনী ছুটে গেলেন গৌরীমার কাছে, বললেন,—ও যোগিনীমা, একটা বৌকে ভূতে পেয়েছে, কি সব বকচে, আপনি শীগ্‌গির একবারটি এসে দেখুন।

ঐরকম কাতর ডাকে যোগিনীমা তখনই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বৌটিকে দেখে তাঁরও মনে হল, মেয়েটা ভর-সন্ধ্যেতে এলো-চুলে চলেছিল, ওর ওপর নিশ্চয়ই কারুর অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। তিনি সেখানে আগুন জ্বাললেন, তাতে সরষে মরিচ কি কি সব জিনিষ ফেললেন। তারপর সেখানে লাঠি দিয়ে সপাং সপাং করে মারতে লাগলেন। বৌটিকেও কয়েক ঘা দিলেন। কিন্তু কোন সুফল দেখা গেল না। তারপর পঞ্চবটীতলায় বসে তিনি সুমধুর সুরে রামনাম কীর্তন আরম্ভ করলেন। তখন এক ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—যোগিনীমা, তুমি এসব কি করছ এখানে?

গৌরীমা বলেন,—তুমি কে? কেন বৌটাকে কষ্ট দিচ্ছ?

ছায়ামূর্তি উত্তর দেয়,—দেব না? বৌটার এত বড় আস্পর্ধা, পঞ্চবটীতলায় বসে আমি জপ কচ্ছি, ও অশুদ্ধ কাপড়টা আমার গায়ে লাগিয়ে দিল! কেন, আঁচল ওড়াবার আর জায়গা পেলে না ও?

গৌরীমা বুঝলেন, সাধারণ ভূত নয় এ, তাই জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কে?

ছায়ামূর্তি বললেন,—আমি মহাবীর, এখানে বসে জপ করি।

গৌরীমা বিনীতভাবে বলেন,—ওর খুবই অন্যায় হয়েছে, বাবা, ওর বুদ্ধি কম, আপনি ক্ষমা করুন।

মহাবীর বলেন,—তুমি বলছ যখন, ক্ষমা করব। কিন্তু তার আগে ও গঙ্গাস্নান করে আসুক, ভিজে কাপড়ে এখানে গড়াগড়ি দিক, নাকে খত্‌ দিক।

ততক্ষণে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বহু নরনারী এসে জমা হয়েছেন। কয়েকজন মহিলা সেই বৌটিকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনলেন। তারপর বৌটি পঞ্চবটীতলায় গড়াগড়ি দিলেন, নাকে খত্‌ দিলেন।

গৌরীমা তখন মহাবীরকে বললেন,—আপনি এবার প্রসন্ন হোন, কিছু গ্রহণ করুন।

মহাবীর,—তোমার ঘরে তো আখের গুড় আছে, তাই দাও কলাপাতায় করে।

গৌরীমা একজনকে বলেন,—শীগ্‌গির একটা আগোট কলা-পাতা কেটে নিয়ে এসো। আমাকে বললেন,—গুড়ের যে নাগরি আছে ঘরে, গোটা একটা নিয়ে এসো তো, মা। একপালি গঙ্গাজলও আনবে। আর একটা নতুন কুশাসন। সব কিছু এনে আমি অনেকখানি জায়গা গঙ্গাজলে মার্জন করলুম, কলাপাতাখানি গঙ্গাজলে ধুয়ে রাখলুম, আসন পেতে পাশে খাবার জন্য গঙ্গাজল দিলুম। গৌরীমা পাতার ওপর নাগরি থেকে গুড় ঢালতে লাগলেন, আর মহাবীরকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন।

সকলেই তখন ভয়েতে আর ভক্তিতে আবিষ্ট। যেন একটা ছম্‌ছম্‌ ভাব। মহাবীরের কথা আমরা কিছুই শুনতে পাই নি, তাঁকে চোখেও দেখি নি, কিন্তু কলাপাতায় যখন গুড় পড়তে লাগল, তৎক্ষণাৎ তা নিঃশেষ হতে লাগল, এটা চোখে দেখেছি। নাগরির সমস্তটা গুড় নিঃশেষ হয়ে গেল। গৌরীমা ভূমিষ্ঠ হয়ে সেই জায়গায় প্রণাম করলেন, উপস্থিত আমরাও সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম। মায়ের নির্দেশে সেই বধূ কলাপাতা আর নাগরি গঙ্গায় দিয়ে এলেন। ততক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।

দ্বিতীয়টি—

একবার গৌরীমা বারাকপুর থেকে কিছু মূল্যবান গ্রন্থ ও কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় করে শ্যামনগর যাচ্ছেন। তাঁর মনের উদ্দেশ্য,—ঐসব জিনিষপত্র সেখানে জনৈক ভক্তের বাড়ীতে রেখে আসবেন। সঙ্গে রয়েছি আমি, আর সুরেশ ও কুলদাপ্রসাদ নামে দুটি ব্রাহ্মণ সন্তান।

শ্যামনগরে গঙ্গাতীরে যখন নৌকো গিয়ে ভিড়ল, অন্ধকার নেমে

এসেছে। তখন বর্ষাকাল, তার ওপর ভাঁটায় গঙ্গার জল কমে অনেকখানি জায়গা একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছে। যাতায়াতের খুবই অসুবিধে। সন্তান দুটি মাঝির সঙ্গে আদ্দেক জিনিষ মাথায় নিয়ে গন্তব্যস্থানে চললেন। আমি তখন অসুস্থ ছিলুম, তাই গৌরীমা আমার কাছে নৌকোর মধ্যে রইলেন। অনেক সময় কেটে গেল, সন্তানরা কেউই ফিরছেন না। গৌরীমা খুবই চিন্তিত হলেন, ক্রমে অস্থির হয়ে উঠলেন। আরও পরে মাঝি এসে জানালো,—কুলদা-বাবুকে সাপে কেটেছে। চটকলের ডাক্তার সাহেব বলেছেন, তাঁর আর বাঁচার আশা নেই। বাবু আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছেন।

পরের ছেলে আশ্রমের সেবা করতে এসে জীবন হারাবে? দুঃসংবাদ শুনে গৌরীমা মর্মাহত হলেন, ভয়ঙ্কর রেগেও গেলেন। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তাঁর আজীবন পূজিত প্রাণাধিকপ্রিয় দামোদরজীর ওপর। তাঁকে ভীষণভাবে বকাবকি করতে লাগলেন: খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, সারাদিন খেটেখুটে ভিক্ষে করে সব জোগাড় করবো আমি, আর তুমি ঠাকুর, রাজাসনে বসে বসে কেবল মালাচন্দন পরবে, দিব্যি সুখে খাবে, আর এমন সব বিভ্রাট বাধাবে? তা চলবে না। আশ্রমের সেবা করতে এসে যদি ব্রহ্মহত্যা হয়, ঠাকুর, জেনে রাখ, আজ তোমায় আমি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে তবে এখান থেকে যাবো।

আমায় বললেন,—দেখ তো মা, কি কাণ্ড! মরণপথের ছেলেটা আমায় ডাকছে, আমি চললুম। কোন ভয় নেই মা, বসে বসে দুর্গানাম কর। এই কটি কথা বলেই রুদ্রাণী মাতা রওনা হলেন, মাঝি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কণ্ঠদেশে দামোদরজী বাঁধা, পাগলিনীর মত ছুটে চললেন মুমূর্ষু পুত্রকে দেখার জন্যে।

আমায় তো অভয়বাণী শুনিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি ভরসা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শরীর অবসন্ন, সাপের কামড়ে কুলদাদাদার জীবনসংশয়ের খবর, দামোদরজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা, জন-মানবহীন স্থানে আমি একা,—অন্তরে বাইরে সর্বত্রই যেন অন্ধকার

দেখতে লাগলুম। ক্লান্ত দেহমনে শক্তি সঞ্চয় করতে আমি দুর্গতি-নাশিনী শ্রীদুর্গার নাম উচ্চারণ করতে থাকলুম।

যথাস্থানে গিয়ে গৌরীমা দেখেন,—কুলদাদাদা শুয়ে, চোখ দুটি বোজা, বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই বল্‌লেই হয়। পাশে বসে সুরেশদা কাঁদছেন। কঠোর সন্ন্যাসিনীর চোখ দুটিও এ দৃশ্যে জলে ভরে এলো। পুত্রের মাথায় তিনি জপ করলেন, হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর পায়ের কাছে গিয়ে বসলেন। সাপে কামড়ানো জায়গাটা কেটে ডাক্তার বেঁধে দিয়ে গেছেন। মা বললেন,—বাঁধন খুলে দে, কাটা জায়গাটা আমি দেখবো। কেউ সাহস পায় না, বাঁধন খুললেই সারাশরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়বে। হুঙ্কার দিয়ে সুরেশদাকে বললেন,—খোল্‌ শীগ্‌গির, খোল্‌ বলছি। গৌরীমার প্রকৃতি সুরেশদা জানতেন, সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই ভয়ে ভয়ে বাঁধনটা খুলে দিলেন। পুত্রের প্রতি সদাশুভদা মাতা কিছুক্ষণ তাঁর দৃষ্টি ঐ ক্ষতস্থানের ওপর নিবদ্ধ করে রাখলেন। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে নিঃসংশয়ে বললেন,—কুলদা কিছুতেই মরবে না।

আবার মাথার কাছে এসে কুলদাদার বাহুমূল ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে জোরে জোরে ডাকলেন,—কুলদা, এই কুলদা। মৃত্যুপথযাত্রী পুত্র মায়ের স্নেহমাখা ডাকে অর্ধবাহ্যজ্ঞান অবস্থাতেই চোখ দুটি একবার মেলল,—মায়ের মুখখানি দর্শন করে চোখ তাঁর আবার বুজে গেল।

সুরেশদাকে সেখানে থাকতে বলে গৌরীমা আমাকে আনার জন্যে মাঝির সঙ্গে নৌকোয় ফিরে এলেন।

সে রাত্রে আর আমাদের বারাকপুর আশ্রমে ফেরা হল না। শ্যামনগরের সেই ভক্তের বাড়ীতেই গৌরীমা রইলেন, জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করলেন, আর বারে বারে কুলদাদার সংবাদ নিলেন।

কুলদাদাদার জীবন রক্ষা পেল।

দামোদরজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমারও দুশ্চিন্তার অন্ত হল।

গোয়াবাগান আশ্রমে

বারাকপুরে আশ্রমের স্থিতিকাল—প্রায় বিশ বৎসর।

গৌরীমাতা নানাকারণে আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরের চিন্তা এবং চেষ্টা করিতেছিলেন।—মহানগরী কলিকাতা ছিল সেইসময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী। আশ্রমের অর্থসাহায্যকারী হিতৈষিগণও অনেকেই কলিকাতায় বাস করিতেন। অভাব অভিযোগ উপস্থিত হইলে গৌরীমাকে কলিকাতায় আসিতে হইত। নারীদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার এবং শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেও কলিকাতাই যোগ্যতম স্থান, ইহাতেও সন্দেহ ছিল না। কলিকাতায় একটি আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও হিন্দু ধর্মানুরাগিগণ অনেকে অনুভব করিতেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও গৌরীমাকে বলিয়াছিলেন, "এই টাউনে বসে কাজ করতে হবে।" অধিকন্তু, সারদামাতার সান্নিধ্যে বাস করা ছিল গৌরীমা ও দুর্গামা উভয়েরই সবিশেষ কাম্য। এতদ্ব্যতীত, বঙ্গীয় সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের পলতা জলকলের সম্প্রসারণের জন্য আইন-বলে বারাকপুর আশ্রমের জমিসহ প্রায় ১৮৩ বিঘা জমি দখল করেন। অবশ্য, জমি দখলের আলোচনা এবং মাপজোখের সময়েই গৌরীমা বুঝিয়াছিলেন, ঐ স্থানে বাস করা আর সম্ভব হইবে না।

সুতরাং উপরোক্ত কারণে ১৩১৮ সালের ১৪ই শ্রাবণ বারাকপুর হইতে আশ্রম উত্তর-কলিকাতায় ১০নং গোয়াবাগান লেনে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু সরকার-কর্তৃক ভূমি দখল লইবার পূর্বপর্যন্ত গৌরীমা ও দুর্গামা অবসর পাইলেই বারাকপুরের আশ্রমবাটীতে চলিয়া যাইতেন এবং কয়েকদিবস নির্জনে সাধনভজন করিতেন। আশ্রমবাসিনী কোন কোন কন্যাও এইসময়ে তাঁহাদের সহিত তথায় গিয়াছেন। ঐ পুণ্যস্থানের প্রবল আকর্ষণ সর্বদাই তাঁহারা অন্তরে অনুভব করিতেন। তথাপি আশ্রম কলিকাতায় স্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হওয়ায় সকলেই

আনন্দিত হইলেন এবং এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাও প্রসন্না হইলেন।

কলিকাতায় আশ্রম স্থানান্তরিত হইবার পর যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ), সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক), অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানী, নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত-প্রমুখ বিদ্যোৎসাহিগণ আশ্রম ও বিদ্যালয়ের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। দূরের ছাত্রীদিগের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানীর অর্থানুকূল্যে একটি ঘোড়ার গাড়ীও হইল।

গৌরীমা বিদ্যালয়ের গাড়ীতে করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানে এবং অন্যান্যস্থানেও বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। গৌরীমা ঘোড়াটির নাম রাখিয়াছিলেন 'সারদেশ্বরীদাস'। কিন্তু ঘোড়াটি ছিল দুরন্ত, একদা গাড়ী উলটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। তাহা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী উক্ত ঘোড়াটিকে বিদায় দিয়া একটি উত্তম ঘোড়া ক্রয়ের পরামর্শ দেন। গৌরীমা অবিলম্বে তাহাকে বিদায় দিলেন। আশ্রমের তখন অর্থাভাব, ঘোড়াটিকে বিক্রয় করিলে বিনিময়ে কিছু অর্থলাভ হইত; কিন্তু 'সারদেশ্বরীদাস'কে তিনি বিক্রয় করিলেন না, তাহাকে 'পিঁজরাপোলে' পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে কাঁটাপুকুরের সেন-বাটীর ভক্তদিগের দানে আর একটি ঘোড়া ক্রয় করা হয়। মাতৃদ্বয় নূতন ঘোড়ার গাড়ী সর্বপ্রথম মাতাঠাকুরাণীর ব্যবহারের জন্য লইয়া গেলেন। গাড়ীতে আরোহণকালে মা ঘোড়াটিকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'রামদাস'। এই ঘোড়াটি ছিল শান্ত এবং সে দীর্ঘকাল আশ্রমের সেবা করিয়াছিল।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এইসময় হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বহু ভক্তপরিবারের কন্যাগণ গৌরীমার বিদ্যালয়ে আসিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সংসারাশ্রমের নিকট আত্মীয়াগণ, এবং বলরাম বসুর পৌত্রী ও দৌহিত্রীগণেরও কেহ কেহ গোয়াবাগান আশ্রম-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে আসিতেন।

প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনায় সহযোগিতা পাইবার জন্য গৌরীমা এইকালে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করেন। মাতা দুর্গাপুরী দেবী, নগেন্দ্রনন্দিনী দাসী, সুরেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকুমার গুহনিয়োগী সমিতির সদস্য হইলেন এবং সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন সিটি কলেজের অধ্যাপক অনন্তকুমার রায়। অপরিণতবয়স্কা হইলেও দুর্গামাতার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মপটুতা ছিল অসাধারণ, গৌরীমা এবং আশ্রম-হিতৈষিগণ প্রথম হইতেই তাঁহাকে সমিতির সদস্যা মনোনীত করিলেন।

অতঃপর আশ্রমের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষার দায়িত্ব দুর্গামাতার উপর ন্যস্ত হইল। দীর্ঘকাল তিনি স্বহস্তে হিসাব লিখিয়াছেন এবং হিসাবপরীক্ষকদ্বারা পরীক্ষা অন্তে তাহা আশ্রমের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ব্যতীত আশ্রমবাসিনী বালিকাদের নানাবিধ দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন। অন্তেবাসিনীদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃকনিষ্ঠা, তাহাদের কাহারও তিনি 'দিদি', কাহারও 'মাসী' এবং সমবয়স্কাদের বন্ধু। কাহারও কোন দোষত্রুটি গৌরীমার দৃষ্টিতে না পড়ে, সেজন্য তিনি সদাসতর্ক থাকিতেন। আশ্রমবাসকাল পূর্ণ হইলে কোন কন্যার গৃহগমনের সময় এই মমতাময়ী দিদি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। গৌরীমা বলিতেন, "সন্ন্যিসীর এত মোহ ভাল নয়।" কিন্তু মা বলিয়াছেন, "আমার শোক কিছুতেই নিবারণ হত না, অন্য ঘরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতুম। ভালবাসা একটা রোগ ছিল আমার।' একদিন মা-ঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'মা, মানুষের উপর আমার বড্ড ভালবাসা, কি হবে মা?' মা বলেছিলেন, 'ভালবাসবে বৈ কি, তুমি যে তাদের মা গো!"

আশ্রম গোয়াবাগানে অবস্থানকালে দুর্গামার প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আশ্রমে অন্তেবাসিনী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসুতপা দেবী অন্যতম। ইনি বসিরহাটের পূর্বোক্ত শৈলবালা চৌধুরীর কন্যা, শৈশবাবধি দুর্গামাকে 'মাসীমা' বলিয়া ডাকিতেন।

যথাকালে ইনি গৌরীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস লাভ করেন ; এবং ১৩৩০ সাল হইতে আশ্রম-তত্ত্বাবধায়িকার পদে আছেন।*

সন্ন্যাসিনী হইবার সৌভাগ্য সকল কন্যার ঘটে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অনুকূল থাকে না। কিন্তু সংসারে ফিরিয়া গিয়াও যাঁহারা গৌরীমাতার আদর্শ এবং দুর্গামাতার ভালবাসা ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। তাঁহাদের মধ্যে একজন—আসামের শ্রীকুঞ্জবালা দেবী। তাঁহার স্বামী তেজপুরের শ্রদ্ধেয় দেশসেবক মহাদেব শর্মা। কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম সহোদর জ্ঞানতপস্বী মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁহারই নির্দেশে মহাদেব শর্মা গৌরীমাতার নিকট আসিয়াছিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণান্তে অবসর সময়ে যথাসাধ্য আশ্রমসেবাও করিতেন। স্বামীর আগ্রহেই বালিকা বধূ কুঞ্জবালা কয়েকবৎসর আশ্রমজীবন যাপন করেন।‡

* সুতপা দেবীর গর্ভধারিণীকে লিখিত শ্রীসারদামাতার পত্র—

পোঃ বাগবাজার, ১৯. ১. ১৯১২

..."তোমার কন্যাকে শ্রীমতী গৌরদাসীর নিকট রাখিয়াছ, জানিয়া সুখী হইলাম, তাহার মঙ্গল হইবে।"...

‡ শ্রীকুঞ্জবালা দেবী লিখিয়াছেন :

"১৩১৮ সন, কার্তিক মাস, সোমবার, ১০নং গোয়াবাগান লেনে শ্রীশ্রীগৌরীমাতার আশ্রমে গিয়াছিলাম।... আর সেই আশ্রমে তিন বৎসর মাতাজীর সঙ্গে ছিলাম।...

"একদিন শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে মা আমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। শ্রীমা আমার মাথার ঘোমটা দেখিয়া বলিয়াছিলেন মাতাজীকে, 'ও গৌরদাসী, এইটি কার বৌগা ?' মা বলিলেন, 'আসাম থেকে আসিয়াছে।'...আমি শ্রীমাকে প্রণাম করিলাম। মা আমাকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, বৌটি কার সঙ্গে এতদূর এল গো ?' মা বলিলেন, 'ওর স্বামীর সঙ্গে আসিয়াছে।'...শ্রীমা বলিলেন, 'তুমি বৌটিকে কিছু দিয়াছ ?' 'না, মা, তোমাকে না জানাইয়া কি আর দিতে পারি ?' তখন শ্রীমা বলিলেন,

কুঞ্জবালা ছিলেন দুর্গামার সমবয়সী, সুতরাং বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। ইনি যখন পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন তখন গৌরীমা বলিয়াছিলেন, 'তোর প্রথম কন্যাসন্তান হবে, সেটিকে আমায় দিস্।' গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতার প্রতি এই পতিপত্নীর ভক্তিবিশ্বাস এতই প্রবল ছিল এবং আশ্রমের আদর্শ ও সমাজহিতকর কার্যাবলীতে তাঁহারা এমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, কয়েকবৎসর পরে তাঁহারা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রথমা কন্যা অজিতাকে গুরুর নিকট সমর্পণ করেন। অষ্টমবর্ষীয়া অজিতা মাতৃদ্বয়ের বিশেষ স্নেহাস্পদ ছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ ইনি আশ্রমে বাস করিতেছেন। গৌরীমাতার নিকট তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস লাভ হয়।

আশ্রমে সমাগত মহিলাগণও দুর্গামাতার আন্তরিক ভালবাসা ও সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। আসাম-গৌরীপুরের রাণী ভক্তিমতী সরোজবালা বড়ুয়া শ্রীসারদামাতার পুণ্যদর্শনে একদিন উদ্বোধন-

"শরত রাখালদের একবার প্রণাম করাইয়া নিও। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন বৌমাকে কানে কথা শুনাইয়া দিবে। আমার এখানে একদিন এস, প্রসাদ পাবে।'...

...বড়দিনের ছুটীতে মায়েদের সঙ্গে ঢাকা ফরিদপুরে যাইবার ভাগ্যও হইয়াছিল। গরমের বন্ধে মায়েদের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথধামেও আমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। একমাস পুরীতে ছিলাম।...পাণ্ডারা শ্রীদুর্গামাকে বলিতেন,—আমাদের জগন্নাথ-বৌ আসিয়াছেন, প্রসাদ দাও, প্রসাদ দাও,—বলিয়া সকলেই মার হাতে প্রসাদ তুলিয়া দিতেন।...

...মাতৃদ্বয়কে আমি দেবীজ্ঞান করিয়াছিলাম। আমি আসামের মেয়ে।... আমি স্বামীর নববিবাহিতা—নিজের সব মানুষের কাছ থেকে টেনে নিয়ে ওঁদের শ্রীচরণে আমাকে স্থান দিলেন। সে কি আদর, যত্ন, ভালবাসা! জীবনে কি আর ভুলতে পারি? আমি আমার গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকেও এত স্নেহ পাই নাই। আমি সংসারের সব ভুলিয়া আশ্রমে ছিলাম।...আমার আশ্রমের শিক্ষায় আমার স্বামী ও শাশুড়ী খুব সন্তুষ্ট ছিলেন।"

তৎকালে বয়স্থা নারী এবং সধবাদিগকেও আশ্রমবাসিনীরূপে গ্রহণ করা হইত। অবশ্য, পরে গৌরীমাতার জীবদ্দশাতেই এই নিয়মের পরিবর্তন হয়।

ভবনে গিয়াছিলেন। শ্রীমাতা তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, "আমার এক মেয়ে আছে, নাম গৌরীপুরী, গোয়াবাগানে তার আশ্রম, তুমি সেখানে যেও, মা। তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণে শান্তি পাবে।"

গোয়াবাগান আশ্রমে যেদিন সরোজবালা আসেন, দুর্গামার সঙ্গেই তাঁহার সর্বপ্রথম আলাপপরিচয় হয়। গৌরীমার ধর্মপ্রাণতা এবং দুর্গামার মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারে তিনি আশ্রমের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলেন। ক্রমে এই আকর্ষণ ঘনিষ্ঠতা ও অনুরাগে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে রাণীমা প্রায়ই আশ্রমে আসিতেন। সন্ন্যাসিনী মাতৃদ্বয়কে একাধিকবার তিনি গৌরীপুরেও লইয়া গিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয়ও মাতৃদর্শনে আশ্রমে আসিতেন। তাঁহারা যখন আসিতেন, বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে জলযোগ করাইতেন। রাণীমা আশ্রমে অর্থসাহায্যও করিতেন। পরবর্তী কালে এই মহাপ্রাণা মহিলার প্রদত্ত দশহাজার টাকাকে ভিত্তি করিয়াই আশ্রমের প্রথম ও প্রধান ভবনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। বলিহারের রাণীমাতাও মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিতেন এবং অর্থসাহায্যও করিতেন।

গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতার পক্ষে গোয়াবাগান হইতে উদ্বোধন-ভবনে গিয়া মাতৃদর্শন সুলভ হইল। মাতাঠাকুরাণীর পক্ষেও আশ্রমে যাতায়াত সহজ হয়। আশ্রমকন্যাগণও তাঁহার দর্শনের সুযোগলাভ করিত। গোয়াবাগান আশ্রমে যেদিন শ্রীমাতা প্রথম পদার্পণ করেন, সেইদিন তিনি তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি স্বহস্তে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিকৃতিখানি অদ্যাপি আশ্রম-মন্দিরে যথারীতি পূজিত হইতেছে।

"মাতাঠাকুরাণী কৃপা করিয়া অনেকবার আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি যেদিন আশ্রমে শুভাগমন করিতেন, সেদিন আশ্রম নবশ্রী ধারণ করিত, আলিপনাদিদ্বারা গৃহ সজ্জিত করা হইত। আনন্দদায়িনীর আগমনে আশ্রমবাসিনীদের হৃদয়ও অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত হইত, স্তবসঙ্গীতাদি এবং আরতি দ্বারা আশ্রমের

অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে তাহারা অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিত। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্তরঙ্গগণও কেহ কেহ মায়ের সঙ্গে আসিতেন। গৌরীমা স্বয়ং সকলকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন।

"আশ্রমবাসিনীদিগের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকিত না, যেদিন মা কোনস্থানে যাতায়াতের পথে অকস্মাৎ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। গৌরীমার অনুপস্থিতিতেও তাঁহার এইরূপ শুভাগমন ঘটিয়াছে। কন্যাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে মায়ের বন্দনা করিত। তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া মা তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেন, যাহাতে ধর্মপথে তাহাদের জীবন সার্থক হয়।

"কোন কোন সময়ে মা আশ্রমে আসিয়া দুই-তিন দিবস বাসও করিয়াছেন। যে কয়েকদিন মা আশ্রমে থাকিতেন, যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা বহিত। অল্পবয়স্কা কন্যাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া মা তাহাদের মাথায় তেল মাখাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, কত আদরযত্ন করিতেন। কন্যারাও মা-মা করিয়া কয়েকদিন মায়ের স্নেহে মগ্ন হইয়া থাকিত।" (১)

এইসময়ে গৌরীমা রন্ধন করিতেন, ভোগ তুলিয়া দিতেন, এবং পূজাকার্য ও ভোগ নিবেদন করিতেন শ্রীমাতা স্বয়ং। কদাচিৎ তিনি স্বহস্তে রন্ধনও করিয়াছেন। গৌরীমা পরিবেশন করিয়া, নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। আশ্রমকন্যাগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিত, কেহ বাতাস করিত, কেহ স্তবকীর্তন করিত।

"আশ্রমের অন্তেবাসিনীদিগকে মাতা নানাবিষয়ে উপদেশ দিতেন। পাঠাভ্যাসে উত্তম ছাত্রীদিগকে তিনি উৎসাহ দিতেন, প্রশংসা করিতেন। সময় সময় কোন কোন কন্যাকে পারিতোষিকও দিয়াছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গে মা বলিতেন,—মেয়েরা পড়াশুনো করবে, বিদ্যালাভ করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের ছুঁচের মত বুদ্ধি ভাল নয়। তারা ঠকে সেও ভাল, জিতে দরকার নেই। তারা সরল

হবে, পবিত্র থাকবে। আশ্রমের ব্রতধারিণী কন্যাদিগের সাধনভজন প্রসঙ্গে মা বলিতেন,—'তোমরা মালাও জপবে। এতে সহজে চিত্ত স্থির হয়।" (১)

আশ্রমে শ্রীমাতার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া নানাস্থান হইতে পরিচিত এবং অপরিচিত বহু মহিলা তাঁহার দর্শনে আসিতেন। পুরুষ ভক্তসন্তানগণও সমবেত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইতেন। দুর্গামাতার আকর্ষণে শ্রীমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণীও দুই-চারিদিন আশ্রমবাস করিয়াছেন।

আশ্রমের আর্থিক অবস্থা তখন আদৌ সচ্ছল ছিল না, কোন-প্রকারে প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। এমনও অনেকদিন গিয়াছে যে, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া গৌরীমার ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, তৎপরে ভোগরন্ধন, এবং নিবেদনান্তে কন্যাগণ প্রসাদ পাইয়াছে অপরাহ্নে। কল্যাণময়ী শ্রীমাতা আশ্রমে আসিয়া একদিন এইরূপ অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া প্রিয়শিষ্যার শিরে অভয়হস্ত রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমিই তোমাদের ভোজ্য পাঠাবো, সকলকে ভাগ করে দিও। কাল খাবে, পরশু খাবে বলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রেখো না।"

আশ্রমের প্রতি শ্রীমাতার কত যে সস্নেহ কৃপাদৃষ্টি, তাহা আজিও আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। তিনি বলিয়াছিলেন, "গৌরদাসীর আশ্রমের সল্‌তেটি পর্যন্ত যে উস্‌কে দেবে তার কেনা বৈকুণ্ঠ।" একাধিক ভক্তিমতী এবং সহৃদয়া মহিলাকে তিনি আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন, যাঁহারা কেবল হিতাকাঙ্ক্ষিণীই নহেন, যথাশক্তি হিতকারিণীও হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যনামে উৎসর্গিত এই আশ্রম তাঁহার মহৎ আদর্শ উদ্‌যাপনের ব্রত গ্রহণ করিয়া যেমন একদিকে নিজেকে ধন্য করিয়াছে, অপরপক্ষে তেমনই করুণাঘনমূর্তি স্বয়ং সারদেশ্বরী মাতাও তাঁহার সুদুর্লভ সাহচর্য, সতত সস্নেহ দৃষ্টি ও অপার আশীর্বাদ প্রদানে এই প্রতিষ্ঠানকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন।

১৩১৯ সালে শারদীয়া পূজার পর মাতাঠাকুরাণী বারাণসীধামে গমন করেন। এই যাত্রায় দুর্গামাতাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গৌরীমা তখন আসাম-গৌরীপুরের রাণীমাতার আমন্ত্রণে সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং আশ্রমের দায়িত্বভার দুর্গামার উপর ন্যস্ত থাকায় শ্রীমাতার সহিত তাঁহার যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কয়েকদিন পরে গৌরীমা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বারাণসীতে বাসকালে দুর্গামা মাতাঠাকুরাণীর সহিত প্রায়শঃ মাতা অন্নপূর্ণা এবং পিতা বিশ্বনাথের দর্শনে যাইতেন। বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত সেবাশ্রমও তাঁহারা দর্শন করেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ছিলেন বারাণসীতে, তিনি দুর্গামাকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। মাতাঠাকুরাণী প্রায় আড়াই মাস কাল তথায় অবস্থান করেন, কিন্তু দুর্গামাকে আশ্রম-কার্যের প্রয়োজনে পূর্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

এই বৎসরই কটকের অন্তর্গত 'বহু' গ্রামের জমিদার হরিপ্রসাদ বসুর আমন্ত্রণে গৌরীমা এবং দুর্গামা তথায় গিয়াছিলেন। সেইস্থান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনমানসে তাঁহারা পুরীধামেও গমন করেন। সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন আশ্রম-সম্পাদক অধ্যাপক অনন্ত-কুমার রায় এবং দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ (দুর্গামা এবং আশ্রমকন্যাগণ যাঁহাকে 'টটীদিদি' বলিয়া ডাকিতেন)।

এইসময়ে পুরীধামের একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

গৌরীমাতা ইতিপূর্বে বহুবার কুমারীপূজা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার অন্তরে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি শুভসংকল্প ছিল—পূতচরিতা দুর্গামাকে জগদম্বাজ্ঞানে ষোড়শীপূজা করিবেন। দুর্গামাতা এইকালে ষোড়শবর্ষে উপনীতা। এইবার পুরীধামে গৌরীমা তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই সংকল্প পূরণ করিলেন। পূজার স্থান—মহালক্ষ্মীর মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দির।

শিক্ষাব্রতী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ এবং নলিনীকান্ত ঘোষকে এই প্রসঙ্গে দুর্গামা বলিয়াছেন, "পূজোর উপকরণ বহু জিনিষ লেগেছিল। মা অনেকদিন ধরে সে সব সংগ্রহ করেছিলেন। মায়ের অনুগত পাণ্ডাদের সহযোগিতায় মা-লক্ষ্মীর মন্দিরে পূজোর বন্দোবস্ত হয়। পূজোর দিন আমাকে উপোস থাকতে হয়েছিল। পূজো হয়েছিল রাত্রে, মন্দিরদ্বার বন্ধ হয়ে যাবার পূর্বে। মা যখন অর্চনা আরম্ভ করেন, তখন আমি সজ্ঞানে দাঁড়িয়ে। কখন-যে বসে পড়লুম, সঠিক মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, প্রায় ঘণ্টাখানেক মার ক্রিয়া-কলাপ দেখেছি, এরপর আমার বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে—তখনই বোধ হয় আমি বসে পড়েছি।"

পূজান্তে দুর্গামাতা পূজনীয়া গৌরীমাতাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বাধা দিয়া বলেন, 'তোমায় পূজো করেছি, তোমার প্রণাম তো নিতে পারবো না।'

দুর্গামার প্রণাম গ্রহণে গৌরীমা আপত্তি করিতেন। তিনি কনিষ্ঠা সহোদরার কন্যা হইলেও গৌরীমা তাঁহার প্রতি আজীবন সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। বলিতেন, 'ওর প্রণাম নিতে পারি না, ও যে জগন্নাথের লক্ষ্মী। নারায়ণের নারায়ণী!'*

ষোড়শীপূজার কিয়ৎকাল পূর্ব হইতেই দুর্গামাতার মনোরাজ্যে একটি নূতন ভাবের বিকাশ ঘটিতেছিল। ভক্তগণের কনিষ্ঠা ভগিনী-রূপে আর তিনি কিছুতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার অন্তরে তখন আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল,—সন্তানগণ যেন তাঁহাকে

* বহুকাল পূর্বে দুর্গামাতার প্রসঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী শ্রীবীরেন্দ্র-কুমার বসুকে গৌরীমা বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীর অংশে ওর জন্ম। ওর ভাগ্যে আশ্রমের অনেক সম্পদ হবে।"

তাঁহার কোষ্ঠীবিচারে প্রখ্যাত জ্যোতিষী মোহিনীমোহন শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "মায়ের দেব গণ, সর্বগ্রহ অনুকূল, ধর্ম ও কর্মস্থান খুব ভাল। ইনি অনেক গৃহ ও মঠ নির্মাণ করিবেন।"

এই দুই জনের উক্তিই মায়ের জীবনে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

'মা' বলিয়া ডাকেন। অবশ্য, তখনও বহু বৃদ্ধসন্তান কন্যাস্নেহবশতঃ তাঁহাকে 'মা' বলিয়াই ডাকিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইত না। তাঁহার ইচ্ছা হইত, কায়মনোবাক্যে পবিত্র এবং ত্যাগী সন্তানের 'মা' ডাক তিনি শুনিবেন। সেইসময় হইতেই ভক্তগণ দুর্গামাকে 'ছোটমা' বলিতে আরম্ভ করেন। আশ্রমবাসিনী কন্যাগণের তিনি হইলেন 'মা' এবং গৌরীমা 'ঠাকুমা'।

১৩২০ সাল। কতিপয় ভক্তের আমন্ত্রণে গৌরীমা কিছুদিনের জন্য শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ সহরে গমন করেন। দুর্গামার বয়স তখন প্রায় সতর। আশ্রম ও বিদ্যালয় পরিচালনার সর্বপ্রকার দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত। কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনে গৌরীমার নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা বিলম্ব হওয়ায় ব্যয়ের অর্থও নিঃশেষ হইয়া আসিল, অধিকন্তু তাঁহাকে এক নূতন বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হইল।

গোয়াবাগান আশ্রমে সেইসময় দ্বারবান ছিল কানাইয়া। সে রোগাক্রান্ত হইল, রোগ—ভয়াবহ বিসূচিকা। স্বভাবতঃই নূতন আশ্রম-পরিচালিকা দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এ সময় তাঁহার কি কর্তব্য ? কানাইয়ার কি হইবে ? আশ্রমবাসিনীদিগেরই-বা কি অবস্থা দাঁড়াইবে ? যদি কানাইয়া না বাঁচে ?—তাঁহার চিন্তাধারা এইভাবে নানাপথ বাহিয়া চলিল।

বসিরহাটের ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল তখন কলিকাতায়, সংবাদ পাইয়া আশ্রমে আসিলেন। কিন্তু পরিচালিকা চিকিৎসককে কি বলিবেন ? তাঁহার নিজেরই দেহ তখন অবশপ্রায়, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, গণ্ডদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত। কোনমতে তিনি রোগীর অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন,—দাদা, কানাইয়া যদি মরে যায় ? কি হবে তাহলে ? যেমন করেই হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

চিকিৎসক দুর্গামার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার হাত দুইখানিতে ঝাঁকানি দিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলেন,—বোন, আমি ডাক্তার, সে সব আমি বুঝবো। কিন্তু, তুমি সন্ন্যাসিনী ; তুমি

এমনভাবে ভেঙে পড়লে কেন? এত দুর্বল হলে, ভবিষ্যতে মায়ের এই বিরাট কাজ চালাবে কি করে? তুমি স্থির হও, আমি ব্যবস্থা করছি।

তিনি কানাইয়াকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশ্রমে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু প্রায়ই আসিয়া আশ্রমের সংবাদাদি লইতেন। শ্রীমায়ের আশীর্বাদে কানাইয়া অচিরেই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

গোয়াবাগান আশ্রমপ্রসঙ্গে শ্রীসুতপাপুরী দেবী এক মহীয়সী নারীর কথায় লিখিয়াছেন:

"আশ্রম গোয়াবাগানে অবস্থানকালে এক অশীতিপরা বৃদ্ধা প্রায়ই তাঁর ছেলে বা নাতিদের সঙ্গে আশ্রমে আসতেন। আমরা ছোটরা তাঁকে 'দিদিমা বুড়ী' বা 'বুড়োমা' বলতুম। তাঁর আসাটা কিন্তু পূজনীয়া গৌরীমা পছন্দ করতেন না। গৌরীমার পছন্দ না হলে কি হবে? 'বুড়োমা' এলেই আমরা মহা-উল্লসিত হয়ে উঠতুম। তিনি যেমন ছিলেন সুরসিকা, তেমনি মিষ্টভাষিণী ও স্নেহকোমলা। গল্পে গানে, কবিতায় ছড়ায়, মজার মজার কত কথায় আমাদের শিশুচিত্ত, এমন-কি বয়স্কাদেরও হৃদয় সহজেই তিনি জয় করে নিতেন। শুধু রঙ্গতামাসায় নয়, পুরাণ, ভাগবত, চণ্ডীর কথা, এমন-কি আজব গল্পও এমন সুন্দরভাবে বলতেন যে, শ্রোতাদের ভীড় বৃদ্ধার চারপাশে জমেই থাকতো। কাজকর্ম বা পড়াশুনার অবসরে তাঁর কাছে যে কতক্ষণে যাব, এই চিন্তাই কেবল আমাদের মনে।

"আবার মনে ভয়ও থাকতো, কখন গৌরীমা এসে পড়বেন আমাদের সভায়, কি বলবেন, বা রাগ করবেন। বুড়োমাও এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেন, বলতেন, 'দাদারা, দামুর বৌ আসছে।* তোরা সব যে যার কাজে যা, পরে আবার গল্প হবে।'

* শ্রীশ্রীদামোদরজীর পত্নী অর্থাৎ গৌরীমাতা

"তিনি বাংলা, ইংরাজী, ফারসী কতরকম কবিতা আবৃত্তি করে বা নিজেই তৈরী করে বলতেন। একটি ইংরাজী কবিতা আজও মনে আছে,—

King's daughter, what is the matter ;
Sorry face ?
There is no flower in the garden,
So I went to forest.

আবার ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদ করেও বলতেন, –

রাজকুমারী, বদন ভারী, কিসের জন্যে ?
মালঞ্চেতে ফুল ছিল না, গিয়েছিলুম অরণ্যে।

"বুড়োমা জ্যোতিষীদের মত হাত দেখতেও জানতেন। আমরা সবাই হাত দেখাতুম। এত আনন্দ পরিবেশন করেও তিনি কোন কোন দিন হঠাৎ খুব মুষড়ে পড়তেন। অফুরন্ত কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কতায় কখন যে ট্যাঁক থেকে তাঁর অমূল্য সম্পদ পড়ে গেছে, খেয়াল নেই। সন্ধ্যেবেলা তাঁর মৌতাতের সময় আর আফিমের কৌটো খুঁজে পান না। ভয়ঙ্কর অস্থিরতা, কোন দুষ্টু মেয়ে তাঁর অগোচরে সেটিকে লুকিয়ে রেখেছে তাঁর সঙ্গে মজা করার জন্য। অনুনয় জানান বৃদ্ধা—'দাদারা, কে আমার ওষুধের কৌটোটি সরিয়েছ, শীগ্যির দাও।' কপট কোপে মেয়েরা বলে,—সে কি বুড়োমা, আমরা তো যার যার জায়গায় বসে আপনার কথা শুনছি। কৌটোর খবর আমরা কি জানি? অবশেষে ধীরস্থির দুর্গামাকে বিপদের কথা জানান বৃদ্ধা। দুর্গামা খুঁজে এনে দিলে তাঁর দেহে যেন তখন প্রাণ ফিরে আসে, হাসি ফোটে মুখে।

"বুড়োমা দুর্গামাকে 'দাদা' বলেই ডাকতেন বেশী সময়, কখনও 'খুগা' বা 'খুকী'ও বলতেন। দাদার প্রতি বৃদ্ধার যে খুবই ভালবাসা ও আকর্ষণ ছিল তা স্পষ্টই বুঝতুম। কিন্তু তখন আমাদের এ কথাই মনে হোত যে, দুর্গামা সুশীলা, তাঁর অনেক গুণ, সকলের প্রীতি-ভালবাসাই তাঁর স্বাভাবিক প্রাপ্য, তাই বৃদ্ধারটাও পেয়েছেন।

আমরা ছাত্রীরা তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝি নি, বৃদ্ধার দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত জানতেও পারি নি যে, আমাদের সেই পরম আনন্দময়ী বুড়োমা ঠাকরুণই দুর্গামার স্নেহময়ী মাতামহী, গৌরীমার গর্ভধারিণী,—রত্নগর্ভা গিরিবালা দেবী। পরে বুঝেছি, অকালমৃতা কনিষ্ঠা কন্যার স্মৃতিচিহ্ন—পরম স্নেহের দৌহিত্রীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণই মমতাময়ী মাতামহীকে বারবার টেনে আনতো আশ্রমে। বিলম্বে এটাও বুঝেছি, আশ্রমে আত্মীয়দের যাতায়াতের জন্যই গৌরীমা তখন অত অসন্তুষ্ট হতেন। বালিকা সন্ন্যাসিনী দুর্গামাকে আত্মীয়দের স্নেহমমতা থেকে রক্ষা করার জন্যই ছিল গৌরীমার অত বিধিনিষেধ আর সতর্কতা।"

দৌহিত্রীর জন্য কেবল স্নেহমমতাই পোষণ করিতেন না, যতদিন গিরিবালা জীবিত ছিলেন, তিনি দুর্গামার অধিকাংশ ব্যয়ভারও বহন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বারাকপুরে আশ্রমের প্রয়োজনে যে আড়াই বিঘা জমি ক্রয় করা হয়, তাহার অধিকাংশ অর্থই গিরিবালার দান। নানাভাবে তিনি আশ্রমকে সাহায্য করিয়াছেন। তবে ভবানীপুরের সম্পত্তির যে অংশ তিনি গৌরীমা ও দৌহিত্রীকে দান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই।

আমাদের পরমপূজনীয়া এই বুড়োমা—মহাসাধিকা গিরিবালা দেবী ১৩২০ সালের ২৭-এ অগ্রহায়ণ, শনিবার পূর্ণিমাতিথিতে গঙ্গাযাত্রা করেন। সংবাদ পাইয়া গৌরীমা মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। তপস্বিনী কন্যা জননীকে কালী-নাম শুনাইতে লাগিলেন। পূতসলিলা ভাগীরথীর দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধা ডাকেন,—'মা গঙ্গে, মা কালিকে, মা দুর্গে।' এইভাবে নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও মনন করিতে করিতে কালীসিদ্ধা গিরিবালা দেবী সাধনোচিতধামে প্রয়াণ করেন।

এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন গৌরীমাতা, কিন্তু ইহার প্রসারের কৃতিত্ব প্রধানতঃ দুর্গামাতার। এই দুই অবদানই রত্নগর্ভা

গিরিবালা দেবীর। সর্বোপরি, তাঁহার এই অবদান কেবল আশ্রমের কল্যাণেই নহে, সমগ্র জাতি এবং দেশের কল্যাণেও বটে।

এক অন্ধকারময়ী রজনীতে জননী গিরিবালা স্বীয় দুহিতাকে জগৎস্বামীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন, বৈরাগ্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই গিরিবালাই আবার একদিন নীলাচলে পুরুষোত্তম-ধামে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে তাঁহার দৌহিত্রী সম্প্রদান করেন।

অবশ্য এইহেতু কন্যা ও দৌহিত্রীকে একান্তভাবে আপনার করিয়া পাইবার জন্য মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার কথঞ্চিৎ অতৃপ্ত না থাকিয়া গিয়াছিল, তাহা নহে। হয়তো-বা ইহার জন্য তাঁহার মনোবীণায় এক অব্যক্ত বেদনার সুর অহোরাত্র বাজিত, তাহার মূর্ছনায় হয়তো তাঁহার স্নেহসিক্ত কোমল হৃদয় মাঝে মাঝে আকুল হইয়াও উঠিত। তথাপি সেইসকল সহজ ভাবাবেগের ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি তাঁহার একান্তই ব্যক্তিগত ইতিবৃত্তরূপে অন্তর্লোকেই অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেবল ব্যক্তি-পরমার্থের জন্য নহে, 'জগদ্ধিতায়' তিনি তাঁহার কন্যা ও স্নেহের পুত্তলী দৌহিত্রীকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মাতা গিরিবালা, গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতা—এই তিনই বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। এই তিনই মাতৃজাতির গৌরব, দেশের সম্পদ, কালজয়ী সাধিকা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদিগের কথা লিপিবদ্ধ থাকিবার যোগ্য।

অতুলনীয়া মাতা গিরিবালা, তুমি ধন্য! তোমার বংশধারাও ধন্য! তোমার নিকট এই আশ্রম অশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। আশ্রমের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কন্যাগণের পক্ষ হইতে ওগো মহিমময়ী মাতা, তোমার উদ্দেশে আমাদের শত শত সভক্তি প্রণাম।

শ্রীসারদামাতার একান্ত সান্নিধ্যে

গোয়াবাগান হইতে বাগবাজারে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাসভবনের দূরত্ব নিতান্ত কম নহে, সুতরাং গৌরীমাতা অধিকতর নিকটে বাটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরেই ৯৭।৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে একটি বাটীর সন্ধান পাওয়া যায় এবং ১৩২০ সালের শেষভাগে আশ্রম তথায় স্থানান্তরিত হয়। এখন হইতে শ্রীমাতার সঙ্গলাভ মাতৃদ্বয়ের পক্ষে সহজতর হইল। সকালে অথবা সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে তাঁহারা সুযোগমত মাতৃসন্দর্শনে যাইতেন। মায়ের জন্য নানাপ্রকার খাদ্যবস্তুও প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইতেন। মাতৃগতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দজী শ্রীমাতার তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশ্যে কোন কোন দিন দুর্গামাকে বলিয়া দিতেন,—বুড়ি, এই এই খাবার মা-ঠাকরুণের পছন্দ, তোরা তৈরী করে এনে খাওয়াবি মাকে। স্বামিজীর আদেশ পালন করিয়া দুর্গামা নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন।

শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের ভাড়াবাটী হইতে মাতৃদ্বয় আমাদিগকে অনেকদিন শ্রীমাতার দর্শনে লইয়া গিয়াছেন, কিছু কিছু খাদ্যবস্তু আমরাও বহন করিয়াছি। আমরা তখন বালিকা, তথাপি শ্রীমাতার স্নেহ ও আশীর্বাদ স্মরণে আছে। তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, এমন পাঁচজন ব্রতধারিণী অদ্যাপি আশ্রমে রহিয়াছেন।

অল্পবয়স্কা কন্যাগণের কণ্ঠে গান শুনিতে শ্রীমাতা ভালবাসিতেন। একদিন দুর্গামা আশ্রমের কয়েকজন কন্যাসহ মাতৃভবনে গিয়াছেন। সকলে শ্রীমাতাকে প্রণাম করিলে কালী নাম্নী সর্বকনিষ্ঠা কন্যাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'গান গাইতে পার, মা?' সে উত্তরে বলিল, 'পারি।'. শ্রীমা বলিলেন, 'গাও।' মাতৃ-আদেশে সে গৌরীমাতা-রচিত একখানি কীর্তন গাহিল—"জয় সারদাবল্লভ, দেহি পদপল্লব, দীনজনবান্ধব, দীনজনে।" কীর্তন শুনিয়া মা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'গৌরদাসী বেঁচে আছে তাই, নইলে মনে করতুম সেইই

গাইছে!' কন্যাটিকে শ্রীমাতা যথেষ্ট আদর ও আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'আবার এসে গান শুনিও, মা।'

শ্রীসারদামাতা ও স্বামী সারদানন্দজীর আমন্ত্রণে আশ্রমবাসিনীগণ মধ্যে মধ্যে মাতৃভবনে গিয়া প্রসাদ পাইতেন। শ্রীশ্রীমায়ের এক জন্মোৎসবপ্রসঙ্গে জনৈকা আশ্রমবাসিনী লিখিয়াছেন।*

"একবার মায়ের জন্মদিবসে মা উদ্বোধনেই আছেন। তিনি গৌরীমাকে আশ্রমবাসিনী সকলকে লইয়া প্রসাদ পাইতে বলিয়াছেন। ওদিকে আবার শরৎ মহারাজও এক ব্রহ্মচারী সন্তানকে পাঠাইয়াছেন, গৌরীমা যেন সকলকে লইয়া উদ্বোধনে যান। দ্বিপ্রহরে গৌরীমার সহিত আমরা উপস্থিত হইলাম। গৌরীমা এবং দুর্গামা উভয়ে নব বস্ত্র, ফুলের মালা, মিষ্টি প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইতেই মা স্বয়ং হাত পাতিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত জিনিষগুলি গ্রহণ করিয়া, রাখিবার জন্য গোলাপমাকে দিলেন। দুর্গামা মাকে কাপড়খানি পরিতে অনুরোধ করায় মা তৎক্ষণাৎ সেই নববস্ত্র পরিধান করেন এবং গৌরীমা দুর্গামা উভয়েই মাকে মালা পরাইয়া দেন ও সন্দেশ মায়ের হস্তে দিলে মা উহা গ্রহণ করেন। তখন আমরা সকলেই মাকে প্রণাম করি। সেইদিনের সেই আনন্দক্ষণটুকু আমাদের জীবনের পরমতম মুহূর্ত হইয়া আছে। মা আমাদের চিবুকে হস্ত দিয়া চুমা খাইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই মালা খুলিয়া দুর্গামাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখ তো, আমার মেয়েকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে?'

"ইহার পূর্বে আরও দু-এক বার মাতাঠাকুরাণীর জন্মদিনে আমরা তাঁহার নিকট সমবেত হইয়াছি, কিন্তু কি কারণে জানি না, এই দিনটাই মনের মাঝে বিশেষ স্মরণীয় দিন হইয়া আছে।··

"ঐদিন বহুলোকসমাগম হইয়াছিল, বিশেষতঃ ভক্ত পরিবারের প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। মেয়েদের আহারের স্থান নির্দিষ্ট

* মাসিক বসুমতী, ১৩৬২

হয় ছাদের উপর। প্রসাদ পাইবার ডাক পড়িলে জনৈকা মহিলা বলেন, 'তোমরা তো গৌরীমার আশ্রমের মেয়ে, তোমরা কি মাছ খাও?' আমরা 'আমিষ খাই না' বলাতে তিনিই জনৈক কর্মী সন্তানকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গৌরীমার স্কুলের মেয়েরা তো মাছ খান না, উহারা কোথায় প্রসাদ পাবেন?' তখন আশ্রমবাসিনী আমাদের সকলের ডাক পড়িল একেবারে শ্রীশ্রীমার নিজকক্ষে। দেখি, মা নব বস্ত্রে ভূষিতা হইয়া আসনে উপবিষ্টা। গৌরীমা ও দুর্গামাকে নিজ-পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সম্মুখের সারিতে মা আমাদের বসিতে বলায় আমরা আশ্রমবাসিনীরা মায়ের সম্মুখে বসিয়া প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করি।...

"সেইদিন অত লোকের ভিতর গৌরীমা ও দুর্গামার উপর মায়ের স্নেহের আধিক্য ও করুণার প্রকাশ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। নিজের পাত হইতে তাঁহাদের প্রসাদ দিলেন স্বহস্তে, অবশ্য আমরাও বাদ যাই নাই। সেইদিন ঐ ঘরে মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী, বরেণ বাবুর পিসীমা, কৃষ্ণময়ীদিদি (বলরাম বসুর কন্যা), কিরণ দত্তের বাটীর মায়েদের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণময়ীদিদি হাসিয়া মায়ের প্রতি অনুযোগ করিয়া বলেন, 'যুগার প্রতিই মায়ের বিশেষ পক্ষ-পাতিত্ব দেখি, আমরা বুঝি কেউ নই?' মা মৃদুহাস্যে উত্তর দেন, 'ওকে যে আমার অনেক ভার বইতে হবে, আর ও যে আমার সন্ন্যিসী মেয়ে গো।"...

শ্রীমাতাঠাকুরাণী বহুস্থানে কন্যাকে স্নেহবশতঃ সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমাতা একবার শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশে রথ দেখিতে যাইবেন, যাত্রার প্রাক্কালে শিষ্যাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একখানি মোটর গাড়ীতে ছোটমামী, রাধারাণী, নিতাই-বাবুর মা ও দুর্গামাকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী গেলেন। গৌরীমা, গোলাপমা, যোগেনমা, হরির মা-প্রমুখ ভক্তিমতী মায়েরা এবং অনেক গৃহী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সন্তান স্বামী সারদানন্দজীর সহিত নৌকাযোগে তথায় গিয়া মিলিত হইলেন। মাতাঠাকুরাণীর সহিত

জগন্নাথদেবের রথ টানিয়া দুর্গামার অপরিসীম আনন্দ হইল। এই-রূপে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান, খড়দহ, কালীঘাট প্রভৃতি বহুস্থানে যাইবার সময় শ্রীমাতা তাঁহার এই শিষ্যাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

মাতাঠাকুরাণীর একান্ত সান্নিধ্যে থাকাকালে তিনি দীক্ষা, বীজতত্ত্ব, বীজানুশীলন, ইষ্টের স্বরূপনির্ণয় ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় দুর্গামাতাকে শিক্ষাদান করেন। আধার ভেদে রূপ ভেদ, কোন্ আধারে কোন্ বীজটি অনুকূল,—এইসকল গূঢ়তত্ত্ব শ্রীমাতা তাঁহার যোগ্যা শিষ্যাকে অধিগত করাইয়াছিলেন। একদিন তিনি কন্যাকে বলেন, "তোমার সামনে কোন মানুষ এসে দাঁড়ালেই তার মুখচ্ছবিতে তার জীবনের অনেক ঘটনা দেখতে পাবে। তোমার চোখের সামনে সব ভেসে উঠবে। তাদের আধার অনুযায়ী বীজনির্ণয় করার সুবিধে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব শ্রীমাতাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা শ্রীমাতা তাঁহার উত্তরসাধিকাকে অধিগত করাইলেন,—গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত এইসকল বীজ কালে কত সন্তানের হৃদয়ে উপ্ত হইয়া কিরূপ সুফল প্রদান করিয়াছে তাহা এইস্থানে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। দীক্ষাপ্রসঙ্গে একদিন শ্রীমাতা বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যিসীর দীক্ষাদানে জাতবিচার নেই, উত্তম অধম, সাধু অসাধু সকলকেই দীক্ষা দেওয়া যায়; যে ধর্মপিপাসু হয়ে আসবে, তাকেই ধর্মলাভে সাহায্য করতে হয়, এতে জগতের কল্যাণ।"

শ্রীমাতার অনুপম জীবনকথা প্রচার করিয়া দুর্গামা বহু নর-নারীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন এবং কাহাকে কাহাকেও জীবন্ত জগজ্জননীর সন্ধান দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে তাঁহার এক 'তাপসী বহিনজীর' কাহিনী উল্লেখ করিতেছি।—

উত্তর-কলিকাতায় এক বিত্তশালী পরিবারের কন্যার বিবাহ হয় রাজা-উপাধিধারী সুবিখ্যাত এক ধনীর পুত্রের সহিত। কুলশীল ও ধনসম্পদের বিচারে যোগাযোগ সুন্দর। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা ব্যবস্থা দিলেন অন্যরূপ। অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুত্রটি

মগুপ, দুশ্চরিত্র। তুচ্ছকারণে নবপরিণীতা বধূকে পরিত্যাগ করিয়া সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিল। কন্যার মাতাপিতার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। কন্যার ভবিষ্যৎ সুখৈশ্বর্যের সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সম্মুখে উচ্ছল যৌবন, আর সীমাহীন অন্ধকার। অবশেষে কন্যার মানসিক তৃপ্তিবিধানে পিতা তাঁহাকে লইয়া অনেক তীর্থভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধুদর্শন করিলেন। কন্যার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্ত হয়।

কন্যার পিতৃগৃহে গৌরীমার যাতায়াতসূত্রে দুর্গামার সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয়। দুর্গামা লিখিয়াছেন, "একদিন গৌরীমার সহিত কন্যার পিত্রালয়ে গিয়াছি, কন্যা জিজ্ঞাসা করেন,—ভগবানে আত্মসমর্পণ করে কি গোটা জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়? তুমি কার কাছ থেকে এমন ভাব পেলে বহিনজী?

"মাতাঠাকুরাণীর সন্ধান দিলাম।

"তাঁর কাছে আমায় একটিবার নিয়ে চল। তোমার সাধনা আমি নেবো। আমি প্রভুকে ভালবাসবো, প্রভুর শরণাগত হবো। ···কিন্তু, আমার কি হবে? অনাঘ্রাত ফুল তো আমি নই। প্রভু আমায় কি দয়া করে নেবেন?

"কন্যাকে দেখিয়া মাতা প্রসন্ন হইলেন,— এযে বৃন্দাবনের গোপী! তাঁহার সংসারজীবনের ইতিহাস শুনিয়া মাতা ব্যথিত হইলেন, সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—অতীতকে ভুলে যাও মা। রাধাগোবিন্দকে দেহমন সঁপে দাও; প্রাণভরে ডাকো তাঁকে। তিনিই ইহকাল আর পরকালের স্বামী। তাঁকে পেলে, জীবনে অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাবে।

"মাতাঠাকুরাণীর নিকট কন্যা অনুপ্রেরণা পাইলেন, মায়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগও জন্মিল। সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, মিষ্টান্নাদি সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তিনি মায়ের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

"ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে থাকিয়াও তিনি তাপসীর ব্রত বরণ করিলেন। মূল্যবান অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন।

সধবার চিহ্নরূপে তিনি দুই হস্তে অতিসাধারণ দুইটিমাত্র স্বুবর্ণকঙ্কণ ধারণ করিতেন। রাধাগোবিন্দকে হৃদয়সর্বস্ব করিয়া লইলেন; তাঁহার সেবায়, তাঁহার পূজায় বিভোর থাকিতেন।

"দীর্ঘকাল আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

"তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন সংবাদ জানিতে গেলাম। দেখিলাম, ব্রজবাসিনীর বেশে সজ্জিতা, হস্তে সেই দুইটি স্বুবর্ণকঙ্কণ, ললাটে পূজারিণীর চন্দনতিলক।

"প্রশ্ন করিলাম,—বহিনজী, তোমার রাজাস্বামীর দেহান্তে তুমি বৈধব্য গ্রহণ করনি! তোমার মনে কি এতটুকুও দুঃখ হয় নি?

"তাপসী উত্তর দিলেন স্মিতবদনে,—শ্রীমা-যে আমায় গোবিন্দ-চরণে নিবেদন করেছিলেন, তাঁকে নিয়েই আছি। তাঁর তো মৃত্যু হয় না; আমি সধবাই আছি বহিনজী। কোন দুঃখু নেই আমার।

"ধন্য এই নারী! আর, মাতাঠাকুরাণীর কৃপায় কী না হয়। মা-যে আমার স্পর্শমণি।" (১)

সার্থক শিক্ষা

ইতিমধ্যে দুর্গামা বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার প্রস্তুতির সুযোগ তাঁহার হয় নাই।

স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছা ছিল যে, দুর্গামা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহাদের পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্যভার গ্রহণ করেন। অধিকন্তু,— "খুকী উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েদের সেবা করবে। ওকে আমি বিলেত পাঠাবো"—দুর্গামা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের এই অভিপ্রায় সারদানন্দজী অবগত ছিলেন। তিনিও দুর্গামাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামিজীর ন্যায় উচ্চধারণাও পোষণ করিতেন। অথচ তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা যথানিয়মে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি দুঃখিত ছিলেন। ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গৌরীমা এবং দুর্গামা যখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে কলিকাতায় আনিবার জন্য জয়রামবাটী গমন করেন, সেই সময় সারদানন্দজী এক পত্রে দুর্গামার প্রসঙ্গে গৌরীমাকে লিখিয়াছিলেন, "খুকী কেমন আছে? তার পড়ার ভারও আমায় দিলে না। এবার আমি তাকে রেখে দেব। ঐ রকম ঘুরে ঘুরে বেড়ালে লেখাপড়া হবে না। স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল যে, খুকী মানুষ হয়। আমার এই চিঠিখানা খুকী নিজে যেন একবার পড়ে।"

আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পর গৌরীমা দুর্গামার নিয়মিত পাঠাভ্যাসের যথোচিত ব্যবস্থা করেন। আশ্রমবাসিনী কন্যাদের শিক্ষাবিষয়ে গৌরীমা এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন যে, —ত্যাগী ও ব্রহ্মচারী হইয়া যাঁহারা আজীবন আশ্রমে থাকিবেন, সংস্কৃতভাষায় তাঁহাদিগকে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে, শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে। ভাষাশিক্ষা-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,

—এক-একটি ভাষা চরিত্রগঠনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান যুগে ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা সাধারণতঃ চিত্তকে বহির্মুখী করে এবং দেবভাষা সংস্কৃত চিত্তকে করে অন্তর্মুখী। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াই দুর্গামার ইংরাজী-শিক্ষায় তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। দুর্গামার কিন্তু ইংরাজী ভাষার প্রতিও অনুরাগ ছিল।

ইতিপূর্বেই দুর্গামা সংস্কৃতভাষায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৩২১ সালে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কলাপ-ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, সেইহেতু গৌরীমাতাও আশ্রমে বালিকাদিগের জন্য এই ব্যাকরণ পাঠের প্রবর্তন করেন।*

১৩২৩ সালে দুর্গামা ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পণ্ডিত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অধ্যাপনা করিতেন। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত, সজ্জন ও সরল ব্যক্তি। অধ্যাপকগণের মধ্যে এই পণ্ডিত মহাশয়ের স্নেহযত্ন ও সরলতা দুর্গামার অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। মা তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি করিতেন। পক্ষান্তরে, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও এই শিক্ষার্থিনীর আচরণ, মেধা, পাঠে অনুরাগ ও মনোযোগে পরম প্রীত ছিলেন।

আশ্রমের আরও কয়েকটি বালিকা এই বৎসর আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। গৌরীমা তাঁহাদিগকে লইয়া একদিন মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি প্রসন্ন হইয়া সকলকেই কিছু কিছু উপহার দিলেন। মাতৃভবনে উপস্থিত অনেকেই এই কৃতকার্যতার জন্য দুর্গামা ও বালিকাদিগের প্রশংসা করেন। কিন্তু ইংরাজীকে অবহেলা করিয়া দুর্গামা কেবল সংস্কৃত চর্চা করিতেছেন,—স্বামী

* "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে গৌরাঙ্গদেবের কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যাপনার কথা উল্লিখিত আছে।

সারদানন্দজীর ইহা মনঃপূত ছিল না। তিনি তাঁহার অভিমত একদিন গোলাপমার মাধ্যমে শ্রীমাতার নিকট উপস্থিত করেন। মাতাও ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন এবং গৌরীমাকে বলেন, "আমার মেয়ে কিন্তু ইংরেজীও পড়বে।" শ্রীমাতার কথার উপর আর অন্য কোন কথা নাই, তাঁহার নির্দেশ গৌরীমা শিরোধার্য করিয়া বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছে, তাই হবে মা। ও ইংরেজীও পড়বে। সংস্কৃতের আর একটা পরীক্ষা দিয়েই বেশী করে ইংরেজী পড়বে।"

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের একান্ত বাসনা ছিল,—দুর্গামাকে তিনি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া আপনারও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। পাঠে মায়েরও ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দুর্গামা ১৩২৪ সালে কৃতিত্বের সহিত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কন্যার এইরূপ সাফল্যে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পরম আনন্দিত হইয়া অশেষ আশীর্বাদ করিলেন। বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ও অতি আনন্দের সহিত ছাত্রীকে আশীর্বাদ করেন, 'মাগো, তুমি এ যুগের গার্গী হবে।'

অতঃপর দুর্গামা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আশ্রমবাসিনী ছাত্রীদিগকে বাহিরের কোন বিদ্যালয়ে গিয়া পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। আশ্রমাভ্যন্তরেই পড়াশুনা করিয়া 'প্রাইভেট' ছাত্রীরূপে দুর্গামা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। দুর্গামাকে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য একজন বৃদ্ধ গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিল। সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ১৩২৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন।

এইসকল পরীক্ষায় দুর্গামার যথার্থ কৃতিত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আশ্রমের তৎকালীন আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ

অবহিত হইতে হইবে। গৌরীমার প্রধান সহকারিণীরূপে দুর্গামাকে তখন স্বীয় পাঠাভ্যাস ব্যতীত অতিরিক্ত অনেক কর্ম করিতে হইত। সংসারের অন্য দশজন বালকবালিকার ন্যায় তাঁহার পক্ষে নির্বিঘ্নে অধ্যয়ন করা সম্ভব হইত না, অবকাশ মিলিত সামান্যই। তদুপরি আর্থিক অসচ্ছলতা,—রাত্রে পাঠের জন্য তৈলবাবদ নির্দিষ্ট ছিল মাত্র দুইটি পয়সা। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইলে তিনি সখেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন। অনন্যোপায় হইয়া পঠিত বিষয়ই অন্ধকারে পুনরাবৃত্তি করিতেন। কিন্তু এইপ্রকার বহুবিধ অসুবিধাসত্ত্বেও অসাধারণ ধৈর্য এবং একান্ত আগ্রহবলেই তিনি পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন।

পরবর্তী কালেও যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করিব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্যতা-দ্বারা কোন মানুষের যথার্থ শিক্ষার মান নিরূপিত হইতে পারে না। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী কি পরিমাণ ধারণা লাভ করিয়াছে এবং শিক্ষার আদর্শের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথে সে কতখানি পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে,—এই প্রশ্নের মধ্যেই শিক্ষার উৎকর্ষবিচারের প্রকৃত মানদণ্ডটি নিহিত আছে। সর্বোপরি, শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন—তথ্যসংগ্রহ ও জ্ঞান অর্জনের তারতম্যের মধ্যে ততখানি নহে,—যতখানি আভ্যন্তরীণ বিকাশের মধ্যে, মানসিক, চারিত্রিক ও আচরণগত উন্নীতকরণের মধ্যে। দুর্গামা স্বভাবতঃই ছিলেন প্রীতি, সংযম এবং পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমা। অধিকন্তু, এইসময় শ্রীসারদা-মাতার জীবনাদর্শ, গৌরীমাতার শিক্ষা এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁহার সমগ্র মনোভূমিকে পরিপ্লাবিত এবং উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীসারদামাতা শিক্ষা দিয়াছেন, "মেয়েরা কোটিতে গুটিক কেউ যেন সব ছেড়ে নিঃসঙ্গ হয়ে ঠাকুরকে ধরে। মেয়েদের বুঝিয়ে

দিও, তারা কেবল খোড়বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়িখোড় করতে আসেনি, তারাও সন্ন্যিসী হতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে।"

জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে গৌরীমাতা বলিয়াছেন, "মনে রেখো, বাইরের চাকচিক্যে মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ে না। মেয়েদের আসল সৌন্দর্য তাঁদের দেহমনের পবিত্রতায়।···স্নেহ, সেবা, আত্মসংযম, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি মধুর গুণাবলীর মিলনক্ষেত্র বলেই হিন্দুনারী 'দেবী' আখ্যা পেয়েছেন। তাঁকে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে। তা না হলে কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।"

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করিয়াছেন, "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।···সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।"

নারীশিক্ষার এই আদর্শ দুর্গামাকে এমনই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ইহাকে বাস্তবে রূপদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু স্বভাবসুলভ সংযম ও ধীরতাহেতু বাহিরে তাহার কোন প্রকাশ পরিলক্ষিত হইত না। গৌরীমা তাহা উপলব্ধি করিতেন। সুতরাং কার্যোপলক্ষে তিনি যখন যেস্থানে যাইতেন উচ্চ আধারের বালিকা দেখিলে তাঁহাদের মাতাপিতার নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া দুর্গা-মাতার হস্তে অর্পণ করিতেন। দুর্গামাও নিজের ভাবরাশি বালিকাদের মধ্যে পরমাগ্রহে সঞ্চারিত করিয়া কন্যাগঠন করিতে লাগিলেন।

এইসময়েই দুর্গামা প্রথম দীক্ষা দান করেন। লেখিকার বয়স তখন মাত্র আট, দীক্ষার গুরুত্ব তাহার অজ্ঞাত, পূজনীয়া 'ঠাকুমা' অর্থাৎ গৌরীমাতার নির্দেশেই মা সর্বপ্রথম তাহাকে ইষ্টমন্ত্র দান করেন। ঠাকুমা সেদিন আদর ও কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, "কমলা, তুই আমার নাতি-চেলা, আমি তোর দাদা-গুরু।"

ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৩২৯ সালে শিলঙে বাসকালে মা দ্বিতীয় দীক্ষা দান করেন জনৈকা মহিলাকে।

কেবল কন্যাগণই নহেন, এইসময় হইতে গৌরীমা আপনার দীক্ষিত কোন কোন সন্তানের জীবনগঠনের দায়িত্বও দুর্গামার উপর ন্যস্ত করেন। সন্তানগণ যাহাতে উচ্চ আদর্শ ও ত্যাগের পথে অগ্রসর হন, জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন, তাহার জন্য মায়ের যে কী ব্যাকুলতা! তাঁহাদের কল্যাণার্থে কত জপ, শ্রীমাতার নিকট কত প্রার্থনা! অথচ দুর্গামা তখন বয়সে নবীনা, যদিও ব্যক্তিত্বে প্রবীণা। সন্তানগণও তখন হইতেই তাঁহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন তদানীন্তন জনৈক সন্তান—"মা তখনও সর্বসাধারণের সামনে অবাধে আসাযাওয়া করেন না এবং কথাবার্তাও বলেন না। একদিন গৌরীমা তাঁকে বাইরের ঘরে ডেকে এনে বললেন, 'এ সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর', আর আমাকে বললেন, 'মাকে প্রণাম কর।' আমি মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেই বিস্মিত, স্তম্ভিত। গৌরীমা এ জিনিষ পেলেন কোথায়? এ তো মর্তের নয়। মনে হল-যেন স্বয়ং ভগবতী মাতারূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন সন্তান পালনের জন্য। প্রণাম করতে গিয়ে মায়ের চরণযুগল দর্শনমাত্র আমার আবার মনে হল, পাদপদ্ম কথাটি অনেকদিন ধরেই জানি, কিন্তু এযাবৎ তার কোন মর্ম উপলব্ধি হয় নি। আজই প্রথম বুঝলুম পাদপদ্ম কাকে বলে। দুর্গামাতার স্নেহ এবং অনুপ্রেরণাই আমার এ জীবনের প্রথম এবং প্রধান পাথেয়। তাঁর স্নেহাশীর্বাদ না পেলে এ জীবন কোন্ দিকে যে ধাবিত হত তা কে জানে!"

একবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে এক মহতী সভায় গৌরীমাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ বলিয়াছিলেন,—তিনি এমন এক নারীসংঘ গঠন করিয়া গিয়াছেন, যাহা অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। আপনারা সকলে মাতাজীর এই কার্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সহায়ক হউন, তবেই তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে। তিনি ছিলেন স্পর্শমণি, কিন্তু সাধারণ স্পর্শমণি নহে। সাধারণ স্পর্শমণি

কেবল অপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু তিনি ছিলেন এমন স্পর্শমণি, যিনি স্পর্শমণি সৃষ্টি করিতে পারেন। গৌরীমাতার সৃষ্ট স্পর্শমণি বলিতে তিনি দুর্গামাতাকেই বুঝাইয়াছিলেন ; অর্থাৎ অপরকে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে সঞ্চালিত করিবার শক্তি যে দুর্গামাতার ছিল, সেই সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। অন্য এক উপলক্ষে স্বামিজী আশ্রমেও অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন, দুর্গামার কন্যাগঠনের শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"মানব-অন্তরে সুপ্ত দেবত্বের সম্যক্ বিকাশসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য।" এইদিক হইতে বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই দুর্গামার শিক্ষা সার্থক হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাতা, গৌরীমাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও আদর্শ তাঁহার জীবনকে মানবকল্যাণে অনুপ্রাণিত করিয়া অমৃতের পথে পরিচালিত করিয়াছে।

জগন্নাথ স্বামী

দুর্গামা তাঁহার অন্তরঙ্গদিগের নিকট বলিয়াছেন, জগন্নাথদেবকে তিনি একটি ছড়া শুনাইতেন,—

'ছেলেবেলায় ধূলো খেলায়
প্রাণ সঁপেছি সেই বেলায়।'

এই প্রাণ-সমর্পণের যথার্থ স্বরূপ কি,—তাহা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সাধারণ বুদ্ধি ও বিচারপদ্ধতি দ্বারা সেই অনন্যসাধারণ বোধি ও অলৌকিক অনুভূতির পরিমাপ করিতে চেষ্টিত হইলে বিড়ম্বনাই বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন 'গৌরীমাতার ভক্তসন্তান', দুর্গামা তাঁহাকে শৈশবাবধি 'আশুদা' বলিয়া ডাকিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের বাল্যপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "জগন্নাথের হাত নেই, পা নেই, চকালোচন' বলে আমি মাঝে মাঝে দুর্গার সঙ্গে তামাসা করতুম। পতিনিন্দায় তার মনে খুব দুঃখ হত, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে গাল ভেসে যেত। ওর দুঃখ আর চোখের জল দেখে আমার বড়ই কৌতুকবোধ হত; আর ভালও লাগত খুব। তখন তার মনটাকে পরীক্ষাচ্ছলে আবার বলতুম, 'আরে, কি মুশকিল, তোমার দেবতার রূপের বর্ণনা করেছি বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ। তবে কি করে খাঁটী সন্নিসী হবে?' কিন্তু খাঁটী সন্ন্যাসী তাকে তো হতেই হবে, সুতরাং অতিকষ্টে তখন দুর্গা আপনার অশ্রু দমন করতো।"

বয়োবৃদ্ধির সহিত দুর্গামার এই অনুরাগ উত্তরোত্তর কি রূপ ধারণ করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় যৌবনকালে জগন্নাথ স্বামীর উদ্দেশে তাঁহার স্বহস্তলিখিত এবং সুদীর্ঘকাল সংগোপনে সুরক্ষিত কতিপয় পত্র ও কবিতায়। ইহাদের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

"ওগো, তুমি নাকি সাধকের সাধনার পিয়াস পূর্ণ কর! যোগীর যোগফল প্রদান কর! তপস্বীর তপঃপূত হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য গ্রহণ

কর।···একবার সে ক্ষণিকের আলো—সে বিজুরীর নীল উজ্জ্বল দীপ্তি দেখাও।···এ দুর্দমনীয় অন্তরের জাগরণ। এ নব উষা—যেন আহ্বানের আশা দিয়ে বলছে, তুমি দাতা—তুমি প্রদর্শক। তুমি সাথী, তুমি নিয়ন্তা। মঙ্গল হাসি কখনো—কল্যাণীর মূর্তিতে অন্তরকে ছেয়ে ছায়—কখনো রুদ্র আলোকে গভীর গর্জনে এগিয়ে ছায়—দুইই আমার শ্রেয়ঃ।”

* * *

“শ্রীচরণসমীপে—

দেবতা, নিঃস্ব কাঙ্গাল বলেই তো কেবল প্রাণটা তোমায় চায়। তুমি আমার—ইহা সত্য, ধ্রুব সত্য। কিন্তু, আমি কি তোমার ?···

“তুমি তো ভিতরে আছ, আত্মজ্ঞান জাগায়ে আমার হৃদয়ে ঐ ত্রিমূর্তি বস। আমি অহর্নিশ দেখি, আর মালা-চন্দনে শ্রদ্ধা-চাঁপা দিয়ে চন্দনলাগি করি। কেন বাহিরের এ ছুটাছুটি প্রয়াস, কেন অপরের স্বাস্থ্য শান্তি নষ্ট করে টেনে নিয়ে যাই। তুমি তো মনে তেমন দৃপ্ত দৃঢ়তা দাও নাই, দেব, যে একা যদি যাই আমার ভয় নেই, আশঙ্কা নেই।—তুমি আছ, তুমি আমার প্রভু, আমার বিরাট অধিপতি। আমার বন্ধু! কেন অপরের সহায়তা? দাও দর্শন অন্তর মাঝে দাও,—বড় বেদনায় তোমার কাছে আসি। তুমি একজন শ্রেষ্ঠ আপন আছ আমার। এর তীব্র অনুভূতিতে অন্তরে শক্তি পাই, তাই দাঁড়াতে পারি। তুমি সব করাচ্ছ, ভিতরে আছ, যা কচ্ছ—সব মঙ্গল। তবে আমি বুঝি না, মাঝে মাঝে বুঝি আবার ভুলে যাই। কেন এ কোমল মনোবৃত্তি দিলে বন্ধু? একবার রুদ্র পাষাণ কর, লোহা আগুণেও যা গলবে না। শুধু নিরালায় আপন মনে তোমারই চরণে এ বারিবিন্দু ঝরবে—ঐ শ্রীপাদপদ্ম দুটি সিক্ত হবে। তুমিও আশীর্বাদে অন্তরকে ভরিয়ে দিবে। শক্তি দাও, তোমায় দেখার জন্য অপরকে ব্যস্ত না করি। তোমার ভাবনা আমায় তোমার বার্তা এনে দিক। যখন বৃদ্ধ হব —একা একা এসে তোমাতেই—তখন চিনে নিও।

"যদি আয়ু না থাকে জানায়ে দাও। শেষ কালটায় তোমার দেশে তোমার বালুকণায় থাকতে দিও, কেমন ওগো! মরণের সময় তুমি—তুমি এসে জানাইও যে, জীবনেও তুমি ছাড়া আমি যেমন নিঃস্ব ছিলাম, মরণেও তুমিই আমার ক্ষুদ্র সত্তাকে তোমাতে যুক্ত হতে দিয়ে বড় ধনী গর্বময়ী করলে।

"অভিমান—তুমি আমায় রোজ রোজ চাট্টি প্রসাদ দিলে না কেন? কত কষ্ট আমার, দেবে না কেন তুমি?

"আমার বিরোধ—আমার অশ্রু তোমার—তোমার হে।"

আবার, কখনও অভিমানভরে তাঁহার প্রভুকে লিখিয়াছেন,—

"এত করে কেন ব্যথা দাও স্বামী,
নিজে মনে ভাব—নহি কাঙ্গালিনী আমি,
শুধু তোমাধন লাগি'
হয়ে সর্বত্যাগী,
তবু সদয় না হও তুমি!"…

কিন্তু অভিমানও স্থায়ী হয় নাই, সুতরাং আবার কাতরতা,—

"দেবতা, তোমায় দোষ দিই—আমার স্থান কোথায়? আমি তোমার দয়া বুঝতে পারলাম না, আমায় ধিক্, দেব! তুমি যে আমার পরম আত্মীয়! তুমি যে আমার জীবনধন জগন্নাথ! আমি যে তোমার একান্ত শরণাগতা দাসী। তুমি আমায় ছেড় না, তোমার চরণের রেণুত্বই আমি চাই। আজ বড় ইচ্ছে হচ্ছে—তোমায় পত্র দিই, কিন্তু পত্রের উত্তর কি পাব? তোমার উত্তর যে আশীর্বাদ,—প্রাণের অনুভূতি! দেব! ক্ষমতা দাও, যেন তোমায় ডাকি। দেব আমার! তোমার দেশ থেকে আমায় বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করে পাঠায়েছ। এবার জেনেছি, তুমি আমায় ত্যাগ কর নি। এবার বুঝেছি আমি তোমারই, তুমি আমারই!

তোমার চিরদাসী।"

"প্রাণের দেবতা। কেন আর ছলনা? তুমি কি আমার সঙ্গে কলকাতা এসেছ? আমি অশ্রুসিক্ত নয়নে বারংবার তোমায় বলেছিনু, 'আমার সঙ্গে এসো— আমার দেশে তোমায় যেতে হবে।' সত্যি কি আসবে না? এসো, আমি যে আর পাচ্ছি না দীনবন্ধু! তুমি বিদেশে!···আমি যে একাকিনী।"*

* * *

"শ্রীচরণসমীপে—

দেবতা, তুমি যে দেশে সে দেশে প্রাণের টেলী আছে, কিন্তু পোষ্টাফিস নেই। সেই বৃদ্ধ পাণ্ডা যখন যত্ন করে তোমার অমিয় জ্যোতিঘন—সে বিশ্বমোহন বিরাট মূর্তি দেখাতো আমায়, তখন যে ভাবতুম—না, প্রাণের টেলী যায় তোমার কাছে। আবার আসবার দিন যখন তোমার মন্দির ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, সত্যি মনে হচ্ছিল সেই বিরাট মন্দিরের একটী কোণে সব ছেড়ে—সে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু পার্থিব—অবশ্য সেগুলি আমার চোখে ধূলার ন্যায়,··· সেই বৈকুণ্ঠে, পুরীতে তোমার—আমার দেবতা, আমার ঈশ্বর, আমার ভগবান, আমার স্বামী, পুরীর ঠাকুর। তোমার নাম বলতে লজ্জা হয়। মনে হয় পাছে, তুমি রাগ কর—তুমি যে জগতেরই—আমি তো তোমায় সব দিয়েছি।···

* * *

···"গিয়েছিনু আমি সজলনয়নে—
অশ্রু ঝরেছে সারাটি রাত,
রেলের যাত্রী শুধায় মোরে –
কেন কর অশ্রুপাত?

---

* মা একবার পুরীধামে জগন্নাথদেবকে বলেন, "প্রভু, তুমি উৎকল, আমি বেঙ্গল, আমার সঙ্গে বাংলায় যাবে কি?" জগন্নাথ প্রভুর নির্দেশে সেইবারই মা শ্রীক্ষেত্র হইতে সুদর্শনচক্রসহ ত্রিমূর্তি আনিয়া কলিকাতায় আশ্রম-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি যথারীতি তাঁহাদিগের পূজার্চনা চলিতেছে।

ওগো, তখনি বাসনা জেগেছিলো—
দেহ দিয়ে যাব এইবার
দেশে ফিরিব না আর—
সেই আসা শেষ আসা আমার গো—
তবু যে দর্শন-লালসা জাগিল
সে শুধু ভ্রান্তি—শুধু তোমার ছলনা।
শুনেছি পুরাণে বেদেতে গায়—
তোমার করুণা যত অনাথায়,
ওহে বুঝেছি—আমি নামে রাজরাণী কাজে ভিখারিণী,
তোমাহীনা হয়ে পথে ঘুরি হে—"

* * *

ভক্তিশাস্ত্রকারগণ অনুরাগের গভীরতাভেদে কতকগুলি অবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন। প্রার্থনা, অভিমান প্রভৃতি স্তর পার হইবার পর এমন একটি চরম অবস্থা আসে যখন ইষ্টদেবতাকে না পাইলে ভক্তের জীবনধারণ দুর্বহ হয়।

"দেবতা আমার, আমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের? আমি ত অন্যায় করি নি, তুমি কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ? আমি যে পুরীর নাম শুনতে পর্যন্ত অক্ষম, আমার প্রাণপাখী যে আর দেহপিঞ্জরে থাকতে চাচ্ছে না নাথ। কবে তোমায় দেখবো? আমার শুধু দর্শনে তৃপ্তি, জগদীশ! আমি যে তোমার ঐ বিরাট মূর্তির পদতলে আত্মসমর্পণ করেছি নাথ, আমি যে সব বিকিয়ে দিয়েছি নাথ, ওহে, তুমি তো আমার প্রাণ বুঝ, তুমি যে অন্তর্যামী—স্বামী—পতি আমার প্রাণের দেবতা, আমার হৃদয়ের আরাধ্য! আমি যে তোমায় পাবার জন্য আজ কাঙ্গালিনী, ভিখারিণী। ঠাকুর, আমার বক্ষোভেদী যাতনা তোমার প্রাণকে স্পর্শ করতে পারে না, আমার করুণ ক্রন্দন তোমার কর্ণে পশে না। আমি তোমাকে চাই—দেবতা আমার!

"···দেবতা, আমি যে বহুদূরে একলা, আমি যে আজ একলা, তুমি যে সহায়!—অশ্রু মোর সাথী, দুঃখ মোর গৃহছাদ, বিমর্ষতা মোর

ঘরের মেজে। আর আমি? লোকে বলবে, আমার দুঃখ কি? হা হা, আমার দুঃখ কি? মাও বলেন, আমার চিন্তা বা কষ্টের কিছু নাই। দেবতা আমার, তুমি একবার বল 'নাই', তাহলেই আমি সব ফেলে দিই।···

দীনা"

*　　　　*　　　　*

এই পত্রপাঠে জগন্নাথদেব কি করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন, আর জানিতেন মা। কিন্তু পরবর্তী পত্রের ভাব ও ভাষা যেন বহুলাংশে শান্ত. আশ্রমকল্যাণই তখন তাঁহার প্রার্থনা।—

"দেব পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তোমার চরণতলে যার জীবন সমর্পিত, যে সুদীর্ঘ তেইশ বর্ষব্যাপী জীবনে প্রতি প্রভাত সন্ধ্যা তোমারি নামে বিভোর! যে তোমার প্রতিমূর্তিখানি না দেখলে পাগলিনী, যদিও—সাধনভজন জানি না হে, যদিও ভগবানলাভের উপযুক্ত হইনিকো, তবু তো তোমায়ই চাই—দেবতা জগন্নাথ!···

'দেবতা আমার, তোমার দয়াই যে জীবনে একমাত্র তরী! দেবতা!···আশ্রমের মঙ্গল কর···আমার যে জোর বল ভরসা তুমি। দেবতা! আশ্রমের মেয়েদের নারীত্ব, তাদের সতীত্ব, তুমি অক্ষুণ্ণ রাখ। রক্ষা করো দেব—তুমি রক্ষা করো।—দেবতা, পবিত্রতা রক্ষা করো তাদের—দেব! মৃত্যু ভাল, যেন পবিত্রতা না হারায়···দেবতা! ধর্ম যেন আশ্রমে অটুট থাকে। বিদ্যায় কি আছে দেব? যেন সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।"

*　　　　*　　　　*

১৩২৭ সালের নববর্ষ—

"নববর্ষে আজ কি প্রার্থনা করবো আমি, আমার ইষ্টদেব! তোমার বালকদের অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য তুমি রক্ষা করো। আজ আমার এই প্রার্থনা—তুমি তোমার দাসদের ধরে থেকো। অশ্রু আমার না শুখাক্, তারা উর্ধ্বগামী হোক্।"

আশ্রমের ভূমিক্রয়

শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থানকালে আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতি স্থায়ী ভবনের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিবার সংকল্প করেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও আশ্রমের জন্য একখানি বাটী অথবা কিছু জমি ক্রয় করিবার জন্য মাতৃদ্বয়কে উৎসাহ দিতেন। অর্থের সংস্থান নাই, তথাপি চেষ্টা চলিতে থাকে। টালা, উল্টাডাঙ্গা, মাণিকতলা প্রভৃতি স্থানে জমি দেখা হইল, কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনটিই তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। মনের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ইহাই যে, সারদামাতার বাসস্থান এবং গঙ্গার সমীপবর্তী একটি স্থান পাইলেই তাঁহারা পরিতুষ্ট। অবশেষে শ্যামবাজারে একটি জমির সন্ধান দিলেন পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। ইহা সকলেরই মনঃপূত হইল।

উত্তর-কলিকাতায় এই নির্বাচিত স্থানটি—অর্থাৎ তৎকালীন ২২।৬ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট-স্থিত তিন কাঠা এক ছটাক জমি—১৩২৪ সালের চৈত্র মাসে ক্রয় করা হয়।* মূল্য নির্দিষ্ট হয়—পাঁচ হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন টাকা। এই পরিমাণ টাকা আজিকার দিনে যৎসামান্য বিবেচিত হইলেও অর্থাভাবে সেইসময় ইহা একবারে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পাঁচ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হয়। তদুপরি, উক্ত এবং ইহার সংলগ্ন জমির উন্নতিবিধানের দাবীতে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট মাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে আদায় করেন অতিরিক্ত দুই হাজার ছয়শত বাইশ টাকা। ইহাতেও অবশ্য অব্যাহতি পাওয়া যায় নাই, এতদতিরিক্ত আবার নূতন বোঝা চাপাইলেন কলিকাতা কর্পোরেশন; এইস্থানে নূতন রাস্তা বাহির করিবার পর তাহাদের অংশের উদ্বৃত্ত এক কাঠা চারি ছটাক জমিও এইসঙ্গে ক্রয় করিতে বাধ্য করিলেন।

---

* এই স্থানটি পরে হয় ২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, এবং সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সদাশয়তায়—২৬ গৌরীমাতা সরণী।

অন্যথায়, কর্পোরেশনের কর্মচারিগণ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন,—এই ছোট জমিতে এমন কিছু করা হইতে পারে যাহা নারীপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হইবে। সুতরাং আরও তিন হাজার সাতশত উনসত্তর টাকার জন্য মায়েরা পুনরায় ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ অর্থসংগ্রহ করিতে খুবই কষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই, ইহাতে আশ্রমের জমির পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইল। পরিস্থিতিরও উন্নতি হইল, আশ্রমের পূর্ব ও উত্তর দিকে পাওয়া গেল দুইটি প্রশস্ত পথ। এই জমিক্রয়ের ব্যাপারে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন প্রখ্যাত এটর্নীদ্বয়—যতীন্দ্রনাথ বসু ও মণিলাল সেন, এবং আলিপুরের উকীল ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত।

জমিক্রয়ের অধিক পরিমাণ টাকাই দুর্গামাতা-প্রদত্ত। তাঁহার জন্য রক্ষিত জননী ব্রজবালার কিছু অলঙ্কার প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ সহোদর শিবকালী এবং পরে গৌরীমাতার নিকট গচ্ছিত ছিল। অধিকন্তু, মাতামহী, মাতুল এবং পিতা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, এই কন্যা আর বিবাহ করিবে না, তখন তাঁহারাও ভবিষ্যতে কন্যার যাহাতে অন্নবস্ত্রের অভাব না হয়, সেই উদ্দেশ্যে কিছু টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উদাসিনী সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতার উপর বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহারা খুব ভরসা করিতেন না। এইকারণে উক্ত অলঙ্কার ও টাকা অবশেষে স্বামী সারদানন্দজীর নিকট গচ্ছিত থাকে। নগদ টাকার তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে দুর্গামাতা মধ্যে মধ্যে সুদ পাইতেন। জমিক্রয়ের সময় যখন দারুণ অর্থাভাব, সারদানন্দজীর নিকট হইতে ঐ সমস্তই ফেরৎ লওয়া হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সহিত বিবাহের পূর্বে দুর্গামার উদ্দেশ্যে নির্মিত যে সকল অলঙ্কার সারদামাতা শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য সকল অলঙ্কার এই পরিস্থিতিতে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—দুর্গামার প্রদত্ত টাকা ঋণস্বরূপ গৃহীত হইবে এবং তাঁহাকে 'হ্যাণ্ডনোট' লিখিয়া

দেওয়া হইবে ; ভবিষ্যতে সুযোগমত তাঁহার ঋণের টাকা পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু আশ্রমের নিতান্ত প্রয়োজনে তাঁহার প্রদত্ত অর্থকে ঋণ বলিতে এবং গৌরীমা অথবা সদস্যগণের নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট গ্রহণ করিতে দুর্গামা কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না।

১৩২৫ সালের এক শুভদিনে গৌরীমা এবং দুর্গামা সর্বার্থসাধিকা শ্রীসারদামাতাকে উক্ত জমিতে লইয়া আসিলেন। আশ্রমের জমিতে পদার্পণ করিয়া শ্রীমাতা প্রসন্নচিত্তে বলেন, "খাসা জমি, বেশ বাড়ী হবে। মেয়েরা সুখে থাকবে।" মাতাঠাকুরাণী পঞ্চরত্ন-পঞ্চশস্যসহ একটি রৌপ্যাধার ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া স্বয়ং ভূমিপূজা এবং শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের নিজস্ব গৃহপ্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা করিলেন। গৌরীমা তাঁহাকে সেইস্থানেই মিষ্টিমুখ করাইয়া বলিলেন, "এই তো আশ্রমের বাস্তুপূজো আর দেবীর অধিবাস হয়ে গেল।"

শ্রীশ্রীসারদামাতার মহাসমাধি

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্বাস্থ্যের অবস্থা শেষ কয়েকবৎসর ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চলিতেছিল। ঔষধাদিতে বিশেষ কোন উপকার হইত না। লোককোলাহল অসহ্য বোধ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে তিনি নির্জন জন্মভূমিতে গিয়া বাস করিতেন। সারদানন্দজী এবং ভক্ত-বৃন্দের আকর্ষণে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতেন। একদিকে শান্ত নিভৃত পল্লীগৃহ এবং অপর দিকে প্রতিনিয়ত কোলাহলমুখরিত নগরভবন,—অনিবার্য কারণে তাঁহার যাওয়া-আসা চলিতেছিল এই দুই বিপরীত পরিবেশে।

এইসময়ে মাতৃভবনে একদা শ্রীশ্রীমা পদযুগল প্রসারিত করিয়া মুড়িমটরভাজাসহ জলযোগ করিতেছিলেন। দুর্গামা এবং আরও কয়েকজন নারীভক্ত তথায় উপস্থিত, তাঁহাদিগকেও মা দুই-এক মুঠা প্রসাদ বিতরণ করিতেছিলেন। এমনসময় তিনি সবিশেষ অর্থপূর্ণ কয়েকটি কথা দুর্গামাতাকে বলেন, "দেখ মা, আমি জীর্ণ হয়েছি, গৌরমণিও জীর্ণ হয়েছে, আমরা সব বৃদ্ধ হয়েছি। বটগাছগুলো বুড়ো হয়েও মরে না, তাদের ঝুরি নাবে, নেবে মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার রসপুষ্ট হয়, মূল গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। তোমরা রইলে এই গাছের ঝুরি।"

কিছুক্ষণ পরে ভাবাবেশে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "প্রচার কর মা, জনে জনে···নাম বিলিয়ে দাও। মেয়েরা কোটিতে গুটিক কেউ যেন সব ছেড়ে নিঃসঙ্গ হয়ে ঠাকুরকে ধরে। মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড়বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়িথোড় করতে আসে নি, তারাও সন্ন্যিসী হতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে।"

শ্রীমাতার অযাচিত করুণা।—

শেষবার জয়রামবাটী যাইবার পূর্বে শ্রীমাতা একদিন অযাচিতভাবে দুর্গামাতাকে এক মহামূল্য সম্পদ দান করেন। সন্ন্যাসিনী শিষ্যাকে

অতিনিকটে ডাকিয়া তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মাতাঠাকুরাণী আদর করিলেন এবং নিজের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দেখাইয়া বলেন, "এইটি ঠাকুরের জপের মালা, ষোড়শীপূজোর সময় তিনি আমায় দিয়েছিলেন, সেই থেকে এই পবিত্র বস্তু আমি গলায় রেখেছি। আমি এটি তোমায় দিচ্ছি।"

এমন আশাতীত ও অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া দুর্গামা অতিমাত্রায় বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন। এমন অমূল্য সম্পদ মা আমাকে দিবেন! পরক্ষণেই তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভাবনা হইল—শরৎদাদাকে না জানাইয়া এইটি গ্রহণ করা কি উচিত হইবে? কন্যার মনের ইতস্ততঃ ভাব বুঝিয়া অন্তর্যামিনী মাতা বলিলেন, "না, না, এটি তুমি গ্রহণ কর মা। আমি চলে গেলে শেষপর্যন্ত এটি কার হাতে গিয়ে পড়বে, এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে কি-না, কে জানে? সে আমার এক দুশ্চিন্তা। এ সিদ্ধ বস্তু তুমি নাও, এখনই। মন যখন অশান্ত হবে, এটি বুকে রাখবে, মন শান্ত হবে।"

দুর্গামা বলিয়াছেন, "আমার আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে, মা আমার হাত টেনে নিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দুহাতে অঞ্জলি করে মায়ের পদ্মহস্ত থেকে সেই পবিত্র বস্তু গ্রহণ করলুম, ভক্তিভাবে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলুম। মনে হল, দৈবীশক্তির এক বিদ্যুৎ প্রবাহ আমার দেহে বয়ে গেল। মা নিজেই সেই সিদ্ধমালা আমার আঁচলের কোণে বেঁধে দিলেন, কেউ যেন দেখতে না পায়। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমি ভূমিনত হয়ে মাকে প্রণাম করলুম, তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। জীবনে যে এমন সৌভাগ্য হতে পারে, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। দীনাহীনা কন্যার ওপর মা সারাজীবন এভাবে অযাচিত করুণা বর্ষণ করেছেন, সর্বতোভাবে আমায় পূর্ণ করে দিয়েছেন।"

১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে যখন শ্রীমাতা জয়রামবাটী হইতে

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার দর্শনমানসে দুর্গামাতাও গিয়াছিলেন। মাতার শীর্ণ দেহখানি দেখিয়া উপস্থিত ভক্তগণের কেহ কেহ অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। সকলের মনেই আশঙ্কা জাগিল—কল্যাণী মাতা এইবার শীঘ্রই নরলীলা সাঙ্গ করিবেন।

দেহের অবস্থা যখন আশঙ্কাজনক, তখনও সতর্ক সন্তানবৃন্দের মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাদের অজ্ঞাতে, করুণাময়ী মাতা কোন কোন ধর্মপিপাসুকে দীক্ষা দান করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাকুল দীক্ষার্থী এবং দর্শনার্থীকে সদাশয়া গোলাপমা গোপনে সহায়তা করিতেন। দীক্ষার প্রধান অংশ সম্পন্ন হইলে, কোন কোন দিন শ্রীমাতার নির্দেশে আনুষঙ্গিক ক্রিয়া বুঝাইয়া দিতেন দুর্গামা।

তৎকালীন অবস্থার কথায় দুর্গামা লিখিয়াছেন, "আশ্রম তখন দূরে নহে, শ্যামবাজারে; মনের উদ্বেগে প্রাতঃকালেই গৌরীমার সহিত মাতৃভবনে চলিয়া যাইতাম। অনেকদিনই ফিরিতে অধিক রাত্রি হইত। শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া কিছু সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ হইত; মায়ের মুখারবিন্দ দর্শন করাও ছিল এক প্রবল আকর্ষণ। দ্বিপ্রহরে একবার করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইত, ঠাকুরের পূজাভোগ এবং অন্যবিধ প্রয়োজনে। আবার কোন কোন দিন রাত্রিতে মায়ের চরণতলেই পড়িয়া থাকিতাম। মনের অবস্থা তখন এমন যে, কিভাবে দিবারাত্র আসিতেছে, যাইতেছে, বুঝিতে পারিতাম না।"

শ্রীমা একদিন গৌরীমাকে বলেন, "আমার তো যাবার সময় হয়ে এলো,···দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে রেখো। পাঁচখানা বাতাসা নিত্য ভোগ দিলেই হবে।" গৌরীমার আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই নরলীলা সংবরণ করিবেন। তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

জ্বরের প্রকোপেই হউক, পিত্তাধিক্যের জন্যই হউক, অথবা অসংখ্য পাপী, তাপী ও রোগীর ভারবহন করিয়াই হউক, শেষ অবস্থায়

শ্রীমা দেহে অসহ্য জ্বালা অনুভব করিতেন। কাহারও স্নিগ্ধ শীতল দেহ হইলে তাহার উপর হাত রাখিয়া কিছুটা স্বস্তিবোধ করিতেন। দুর্গামা নিকটে গেলে তাঁহার দুইখানি হাত আপনার দুই হাতের মধ্যে শ্রীমা চাপিয়া রাখিতেন, দেহের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করাইতেন; কখনও-বা সর্বাঙ্গ নিজের দেহে জড়াইয়া ধরিতেন। কোমল শীতল দেহস্পর্শে জ্বালার কিঞ্চিৎ উপশম হইত।

হোমিওপ্যাথিক, এ্যালোপ্যাথিক, কবিরাজী—কোন চিকিৎসাতেই শ্রীমাতার ব্যাধির ও কষ্টের উপশম হইল না। সন্তানগণের সেবাযত্ন, ভক্তবৃন্দের ব্যাকুল প্রার্থনা, কিছুই স্নেহময়ী মাতাকে আর মরজগতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাঁহার ইহজগতের কার্য এইবারের মত সুসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে যাইবার জন্য তাঁহার মন প্রস্তুত, দৃষ্টি উর্ধ্বলোকে প্রসারিত।

মায়ের রোগমুক্তির কামনায় স্বামী সারদানন্দজী শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন, বিশেষ পূজা করাইলেন। গৌরীমা কালীঘাটে কালীপূজা এবং আশ্রমে চণ্ডীপাঠ ও নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দুর্গামা তারকেশ্বরে গিয়া ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া বাবা তারকনাথের নিকট ধরণা দিলেন। আদেশ হইল,—আমিই জগতের কল্যাণে দেহধারণ করিয়াছিলাম, কাজ ফুরাইয়াছে, এবার আপন দেহ আকর্ষণ করিব।

জীর্ণ দেহপিঞ্জরকে এইবার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ধীর পদক্ষেপে সেই চরম দিনটি অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন চরমক্ষণেও কল্যাণময়ী মাতা অতিদয়ার্দ্র কণ্ঠে কন্যাকে একদিন বলেন, "যারা এসেছে, যারা আসে নি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, (২০-এ জুলাই, ১৯২০), মঙ্গলবার মহানিশায় প্রায় দেড় ঘটিকায় পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরী মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

পরদিবস শ্রীমাতার দিব্যদেহ সুসজ্জিত করিয়া বাগবাজার মাতৃ-ভবন হইতে বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশে নৌকায় শ্রীমাতার শ্রীচরণতলে কন্যা দুর্গা বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন।

শোকাকুলা কন্যার অন্তর মথিত করিয়া তখন বেদনার ঝটিকা প্রবহমাণ—'পৃথিবী আজ অন্ধকার হয়ে গেল, মাতৃহীন হয়ে এ-জীবনে বেঁচে থাকার আর কি প্রয়োজন? এ ব্যর্থ জীবন বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ।' একবার দুইবার চতুর্দিকে এবং গঙ্গার স্রোতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যেও তীক্ষ্ণধী সারদানন্দজী কন্যার চিত্তবিক্ষেপ অনুমান করিতে পারিয়া তাঁহার হাতের কব্‌জি ধরিয়া জোরে ধমক দিলেন, 'উঁহুঁ, স্থির হয়ে-বোস।'

বেলুড় মঠে উপস্থিত হইবার পর শ্রীমাতার অভিষেকাদি শেষ-কৃত্যের আয়োজন হইল। সারদানন্দজী একখণ্ড কাগজে মন্ত্র লিখিয়া শ্রীমাতার আদরিণী কন্যার হস্তে দিয়া বলেন, 'এই কাগজে লেখা মন্ত্র পাঠ করে মায়ের অভিষেক তোকে করতে হবে।' নির্দেশমত দুর্গামা তাহা করিলেন।

অতঃপর শত শত বেদনাবিহ্বল নরনারীর অশ্রুসিক্ত নয়নের সমক্ষে তাঁহাদের স্নেহময়ী মাতার দিব্যদেহ চন্দনকাষ্ঠের শয্যায় শায়িত করা হইল। অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যথাকালে তাহা নির্বাপিতও হইল। তাহার পর সর্বসমাপ্তি!

দুর্গামাতার ভাষায়ঃ

"পূর্ণাহুতির পর প্রকৃতিও যেন রুদ্ধশোকাবেগ আর সংবরণ করিতে পারিল না, দরবিগলিতধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই বর্ষণে মঠমন্দির সকল স্থান প্লাবিত হইল, হোমানলও নির্বাপিত হইল; নির্বাপিত হইল না শুধু শত শত হৃদয়ের মর্মদাহী শোকাগ্নি। যে-মায়ের দর্শন ও স্পর্শনে সন্তানগণ সকল সন্তাপ ভুলিয়া যাইত, যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করিয়া পরাশান্তির আস্বাদ

অনুভব করিত, স্নেহকরুণার খনি—সেই শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরী আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহেন, আজ তিনি ধ্যানগম্যা।”

শ্রীশ্রীমাতার পূতাস্থি বহন করিয়া মহাশোক-ভারাক্রান্ত অন্তরে গৌরীমা এবং দুর্গামা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আশ্রম তখন ৫৩।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের ভাড়াবাটীতে। পরমারাধ্যা মাতার মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানসূচী স্থির হয়। এই অনুষ্ঠানে দুর্গামা প্রাণের যেরূপ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, গৌরীমা তাহাই অনুমোদন ও ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম দিবসে শ্রীমাতার পূতাস্থি এবং একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বহু নারীভক্ত সশ্রদ্ধান্তঃকরণে এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করেন। দ্বিতীয় দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীসারদা মাতার আত্মীয়, শিষ্য ও ভক্তগণের অনেকে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এই দিবসে দুর্গামা স্বহস্তে ভোগরন্ধন সম্পন্ন করেন। তৃতীয় দিবসে পণ্ডিতসম্মেলন,—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আশুতোষ শাস্ত্রি-প্রমুখ অষ্টাদশজন প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দুর্গামাতার আমন্ত্রণে আশ্রমভবনে সমবেত হইয়া স্বস্তি-বাচন ও শাস্ত্রপাঠ করেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের অনুরোধে বেদগান করেন দক্ষিণভারতীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়। উপস্থিত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে বস্ত্র, উত্তরীয়, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ফল-মিষ্টান্ন এবং যথাসাধ্য দক্ষিণা দান করা হয়। আশ্রমকন্যাগণ ভূমিনত হইয়া প্রণাম করিলে পণ্ডিতবর্গ প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ এবং আশ্রমের কল্যাণকামনা করেন। এই দিবসের অধিবেশনটি হইয়াছিল গাম্ভীর্য এবং মাধুর্যপূর্ণ। চতুর্থদিবসে গৌরীমাতা স্বহস্তে নানাবিধ আহার্য রন্ধনপূর্বক বহুসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন করাইলেন। সমাপ্তিদিবসে আন্দুলের কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের মাতৃনাম কীর্তনে সমাগত ভক্তমণ্ডলী আনন্দলাভ করেন। সীমিত

অর্থ ও স্থানের মধ্যেও মাতৃদ্বয়ের পুণ্যে ও আন্তরিকতায় প্রতিদিনের অনুষ্ঠানই সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

দুর্গামা এই উপলক্ষে সংস্কৃত এবং বঙ্গ ভাষায় দুইটি কবিতা রচনা করেন, তাহার নির্বাচিত কয়েকটি স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

(১)

"পরমারাধ্য-জগজ্জনন্যাঃ শ্রীশ্রীসারদামণিদেব্যা মহাপ্রয়াণ-মুপলক্ষ্য শোকরুদিতম্"—

ভুবনং তমসা সমাবৃতং
বিরতা দীপ্তিকথাপি হা হতম্।
জননী জনশান্তিদায়িনী
ত্রিদিবং প্রাপ্তবতী বিহায় নঃ॥···
জগদর্চিত-পাদপঙ্কজা
জননী ত্বং ক নু মে পলায়িতা।
পরিহায় বিষাদ-বিহ্বলাং
তনয়াং তে বত দেবি ভারতে॥···
ত্বদনুস্মরণোত্থবেদনা
ন যথাস্মান্ পরিতো বিচালয়েৎ।
তনু তাদৃশমান্তরং বলং
করণীয়স্থ ন যেন বিচ্যুতিঃ॥

(২)

"পরমপূজনীয়া জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাতা সারদামণি দেবীর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে হৃদয়োচ্ছ্বাস"—

···কাহার বাণী মরমমাঝে
বাজিয়েছিল নীরব বীণা,
গর্বিত ছিল হৃদয়খানি
যদিও শত দীনা হীনা!···

হিয়ার মাঝে দারুণ ব্যথা
গরজি উঠে অনিবার,
তোমার বিজন দীর্ঘ বিরহে
ছিঁড়িলা জননী বীণার তার।···
প্রকৃতির লীলা করিয়া সাঙ্গ
কাঁদায়ে দীন অখিলজনে
চলিলে জননি, ভাসায়ে অকূলে
তব আশ্রিত ভকতগণে।···
বলিতে তুমি যখন তখন
'ফুলের মত থেকো';
চরণে তোমার প্রার্থনা আমার—
তেমনিতর রেখো।···

"জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥"

আশ্রমসেবা ও বিদ্যানুশীলন

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী লীলাসংবরণ করিলে গৌরীমা এবং দুর্গামা উভয়েই বেদনাবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইহেতু প্রায় দুই বৎসরকাল গৃহনির্মাণকার্যে আদৌ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে আশ্রমহিতৈষিগণের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহারা গৃহনির্মাণের অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রম তখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে ৫-বি, রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শিলঙ-নিবাসী ভক্তগণের আমন্ত্রণে ১৩২৩ সালে গৌরীমা তথায় গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জীবনকথা প্রচারে সকলকে পরমানন্দ দান করিয়াছিলেন। এইসময়ে তাঁহারা গৌরীমাকে পুনরায় শিলঙ যাইবার অনুরোধ জানাইলে তিনি স্বয়ং না যাইয়া দুর্গামাকে পাঠাইলেন। এতাবৎকাল দুর্গামাতা সাধারণতঃ গৌরীমাতা কিংবা শ্রীমাতার সঙ্গ ব্যতীত কোথাও যাইতেন না। ইদানীং গৌরীমা বলিতেন, "সন্তানদের কাছে যাবে বৈকি, মা, সঙ্গে দু-একটি মেয়েকে নিয়ে যাও।" ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মা এই প্রথম শিলঙ গমন করেন। সঙ্গে গিয়াছিলেন মায়ের স্নেহভাজন সন্তান শ্রীঅখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।*

শিলঙ-নিবাসী ভক্তবৃন্দের মধ্যে রায়সাহেব প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার, রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ অনেকেই ছিলেন মাতাঠাকুরাণীর শিষ্য, বয়সে প্রবীণ—দুর্গামাতার পিতৃতুল্য। কেহ

* অখিলচন্দ্র তখন ঢাকা জিলা-শাসকের অফিসে কর্মচারী। ঢাকায় লক্ষ্মী-বাজার অঞ্চলে অবস্থিত তাঁহার 'সিটি-হোম'-এ উভয় মাতা বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার গিয়া বাস করিয়াছেন। শিলঙ যাত্রার অব্যবহিত পূর্বেও মা ঐস্থানে কয়েকদিন বাস করেন। ইনি মায়ের সহিত পুরী, বারাণসী, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছেন।

আসাম-সরকার, কেহ-বা ভারত-সরকারের পদস্থ কর্মচারী। তাঁহারা দুর্গামাকে শ্রীমাতা অথবা গৌরীমাতার সহিত ইতিপূর্বে কয়েকবার অন্যত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই যাত্রায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার নিকট শ্রীমাতার কথা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। শ্রীমাতাই যেন শিষ্যার মধ্যে পুনরাবির্ভূতা,—এইরূপ ধারণাই অনেকের মনে হইল। তাঁহাদের প্রতি মায়ের আচরণ এবং মায়ের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তিবিশ্বাস দেখিয়া মনে হইত, তিনি তাঁহাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদা এবং স্নেহময়ী মাতা। বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের গৃহে মহাসমাদরে প্রায় দুই মাসকাল মা আতিথ্য গ্রহণ করেন। এইসময়ে শিলঙ-বাসী কয়েকজন নরনারীকে মা দীক্ষাদানও করিলেন। শ্রীমাতার মন্ত্রশিষ্য জয়গোবিন্দ চৌধুরীর অনুরোধে তাঁহার সহধর্মিণীকেও মা দীক্ষা দান করেন। দুর্গামাতার শিলঙ-বাসকালে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুর্গামাকে স্নেহ করিতেন। উভয়ের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত, মায়ের নিকট বসিয়া তিনি একাধিক দিন শ্রীমাতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

শিলঙ হইতে কলিকাতায় লিখিত মায়ের এক পত্র:

"দেশসুদ্ধ বালিকা সব ক্ষেপেছে 'দুর্গামার সাথে আশ্রম যাব'—এদের সঙ্গে বড় আনন্দ হয়। আমার এরা জগদম্বার প্রতিমূর্তি সব! ঠিক যেন সব ভোরের ফুল।"

মজুমদার মহাশয় গৌরীমাকে লিখিয়াছিলেন,—দুর্গামার ধর্মপ্রচার এবং ভক্তদিগের সহিত আলাপ আচরণ শিলঙে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমরা তাঁহার মধ্যে শ্রীশ্রীমাকেই দেখিতেছি।

মায়ের প্রত্যাবর্তনকালে কোন কোন ভক্ত তাঁহাদের কন্যাগণকে আশ্রমে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে মায়ের হস্তে অর্পণ করেন। দুর্গামাতার শিলঙ-গমনের ফলে আশ্রমের ছাত্রীসংখ্যা, তৎসহ আর্থিক সচ্ছলতাও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

সর্বসাধারণের সমক্ষে এবং স্বতন্ত্রভাবে ইহাই দুর্গামার প্রথম

আত্মপ্রকাশ। তাঁহার যোগ্যতায় গৌরীমার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। এইবার শিলঙে প্রচারকার্যে তাঁহার সফলতায় গৌরীমা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এইসময়ে তাঁহার উপর দুইটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।

দুর্গামার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতাহেতু গৌরীমাতা এবং কার্য-নির্বাহক সভার সদস্যগণ ১৩২৮ সাল হইতে দুর্গামাতাকে আশ্রমের সম্পাদিকা মনোনীত করেন। কেবল তাহাই নহে, ১৩২৯ সালে এক রেজিষ্ট্রী-কৃত ট্রাষ্ট-ডীড সম্পাদনপূর্বক আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরীমা তাঁহাকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে আশ্রম ও বিদ্যালয় পরিচালনার যাবতীয় ভার অর্পণ করিলেন।

গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, এই বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; গৌরীমাতা দেহত্যাগের প্রায় ষোল বৎসর পূর্বেই আশ্রমের সর্ববিধ দায়িত্ব এবং অধিকার দুর্গামার হস্তে ন্যস্ত করিয়া আইনতঃ নিঃস্বত্ব ও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন। অবশ্য, এইরূপ কার্যের জন্য সত্যদর্শিনী গৌরীমাকে, এবং আশ্রমের হিতৈষিগণকেও, কখনও অনুশোচনা করিতে হয় নাই। দুর্গামা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই তাঁহার সম্পর্কে গৌরীমা যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা কালের কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় সর্বতোভাবে নির্ভুল এবং সার্থক প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমাতাও বহুপূর্বেই দুর্গামার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাদানের দিনই—গৌরীমার কর্মভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া তাঁহার এই শিষ্যাকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় মাতৃদ্বয় এইবার গৃহ-নির্মাণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। তাঁহারা অনেকের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কেহ অর্থ সাহায্য করিলেন, কেহ-বা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর ইঞ্জিনীয়ার নরেশচন্দ্র বসুর সহায়তায় বাটীর প্ল্যান প্রস্তুত হয় এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদনও পাওয়া যায়।

ইহার কিছুকাল মধ্যেই আসাম-গৌরীপুরের রাণীমাতা তাঁহার পুত্রবধূ এবং কনিষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য দুর্গামাতার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। একজনকে পত্রে মা লিখিয়াছেন, "রাজার পুত্রবধূকে পড়াতেই হবে, দেওয়ান বাহাদুর অনুরোধ কল্লেন।··· রাণীমা কাতর হয়ে বল্লেন, আপনাদের হাতে সঁপে দেওয়া, দিদি, কর্তেই হবে।"

রাণীমাতা প্রতিদিন আশ্রমে গাড়ী পাঠাইয়া দিতেন, দুর্গামা তাঁহাদের বালিগঞ্জের বাটীতে গিয়া সস্নেহে অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু বিদ্যাদানের বিনিময়ে কোনপ্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। সদাশয়া রাণীমাতা ইহাতে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, এমনসময় আশ্রমের নিজস্ব গৃহনির্মাণের সংবাদপ্রাপ্তিতে তিনি এতদুদ্দেশ্যে এককালীন দশহাজার টাকা দান করেন। বিশেষ প্রয়োজনের সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই এই সাহায্য উপস্থিত হইল। আশ্রমের তৎকালীন অবস্থায় ইহাকে বিরাট দান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহা যেন দৈবকৃপা। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন,—একতলার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলেই ভাড়াবাটী হইতে আশ্রমকে নিজগৃহে স্থানান্তরিত করা হইবে, তাহাতে প্রতিমাসে বাটীভাড়ার অর্থের সাশ্রয় হইবে। তদনুসারে ১৩৩০ সালের জগদ্ধাত্রীপূজা-দিবসে গৃহনির্মাণকার্য আরম্ভ হয়।*

আশ্রম তখন ৭।২ বিডন রো-তে অবস্থিত।

প্ল্যান-অনুযায়ী ত্রিতলের ছাদের উপরিভাগে মন্দির, ভোগঘর

* দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে গৌরীমাকে একদিন শ্রীসারদামাতার প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—'ওর গড়ন জগদ্ধাত্রীর মতন।' দেবী জগদ্ধাত্রীর স্বপ্নাদেশে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং পল্লীভবনে তাঁহার পূজার প্রবর্তন করেন। গৌরীমা ও দুর্গামা শ্রীমাতাকে জগদ্ধাত্রীস্বরূপই মনে করিতেন। এইকারণে বিভিন্ন স্থানে আশ্রমের গৃহনির্মাণাদি শুভ কার্য তাঁহারা জগদ্ধাত্রীপূজা-দিবসেই আরম্ভ করিয়াছেন।

ইত্যাদি হইবে। সুতরাং বিশেষ সুদৃঢ় করিয়াই ভিত্তি পত্তন হয়, ভিত্তিমূল হইতে মন্দির পর্যন্ত লোহার ডবল-কলম স্থাপিত হইল। ফলে, রাণীমাতার প্রদত্ত দশহাজার টাকা এবং অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত টাকায় কোনপ্রকারে একতলার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। একতলা সমাপ্ত হইলে হিতৈষিগণ, ইঞ্জিনীয়ার এবং মিস্ত্রী সকলেই পরামর্শ দিলেন,—গৃহনির্মাণ একবার স্থগিত রাখিলে পুনরায় আরম্ভ করা দুঃসাধ্য হইবে। অতএব অবিলম্বে সমগ্র কার্য সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মাতৃদ্বয়ও মনে করিলেন,—মাতাঠাকুরাণীর কৃপায় এই দুরূহ কার্য অবশ্যই নিষ্পন্ন হইবে। সুতরাং নির্মাণকার্য চলিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহে তৎকালে মাতৃদ্বয় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, অন্তরে বেদনাও অনুভূত হয়। প্রত্যূষে তাঁহারা অর্থসংগ্রহে বাহির হইতেন, সমগ্র দিবস অনাহারে থাকিয়া বিভিন্ন স্থানে পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইতেন; মাতৃজাতির সেবা এবং গৃহনির্মাণ উপলক্ষে অর্থের প্রয়োজনের বিষয় তাঁহাদের নিকট বলিতেন। সন্ন্যাসিনী মায়েদের দেখিয়া, তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়া মহৎ কার্যে কেহ দান করিতেন, কেহ-বা নিরাশ করিতেন, কেহ নিরুৎসাহও করিতেন। কত দিন, কত মাস যে মায়েদের এইভাবে উদ্বেগে, পরিশ্রমে এবং অনাহারে অতিবাহিত হইয়াছে, কত অনিয়ম অত্যাচার যে দেহের উপর চলিয়াছে, তাহার সীমা নাই।

১৩২৯ সালে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গামা এই বৎসরই বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমতাবস্থায় অনেকেই তাঁহাকে এই বৎসর পরীক্ষা দান হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি কৃতসংকল্প, তাঁহার দৃঢ় ধারণা —বহুবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, কালক্ষেপ করা আর উচিত হইবে না। অর্থসংগ্রহে বাহির হইবার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে দুই-একখানি পাঠ্যপুস্তক সঙ্গে লইতেন। এক বাটী হইতে অন্য বাটী যাইবার মধ্যে যে সামান্য অবসর পাইতেন

তাহারই সদ্ব্যবহার করিতেন নিবিষ্টমনে। আশ্রমে ফিরিয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া পাঠ প্রস্তুত করিতেন। ইহারই মধ্যে কোন কোন দিন অধ্যাপকগণের সাহায্যও লইতেন।*

এইরূপে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা ও পরীক্ষার প্রস্তুতি যুগপৎ চলিতে থাকে। সমগ্র দিবসের ভিক্ষায় যাহা সংগৃহীত হইত সন্ধ্যাবেলা মাতৃদ্বয় অঞ্চল উন্মুক্ত করিয়া তাহা সমস্তই ঢালিয়া দিতেন। মিস্ত্রী, মজুর এবং মালমশলা-সরবরাহকারীদের মধ্যে সেই অর্থ ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন—মায়ীজীরা সারাদিন ঘুরিয়া যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, সবই তো দিয়া দিলেন, ঘরে কিছুই তুলিয়া রাখিলেন না। তাঁহারা বুঝিতেন—টাকার অভাব আছে সত্য, কিন্তু সাধুমায়ীরা কাহাকেও ফাঁকি দিবেন না। এইভাবে কোনদিন হয়তো প্রয়োজন মিটিত, কোনদিন-বা মিটিত না। অর্থাভাবে কিছু ঋণও করিতে হইয়াছিল।

এইসময়ে আশ্রমের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও প্রয়োজন দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়-প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ দেশবাসীর নিকট আশ্রমের জনহিতকর কার্যে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইলেন।

১৩৩০ হইতে ১৩৩৩ সালের মধ্যে আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতিদ্বয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ, অ্যাডভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন দাশ, ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র

* বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে যাঁহারা মাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-প্রমুখ অধ্যাপকগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বসু-প্রমুখ অনেক মাননীয় ব্যক্তি আশ্রমে আসিলেন এবং ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর সহিত পরিচিত হইলেন।

আশ্রমের অভাব তখনও মোচন হয় নাই, বরং অর্থাভাব ক্রমে তীব্রতর হইয়াছে। গৃহনির্মাণকার্যে সহায়তা করিবার জন্য যে-সকল সন্তান মাতৃদ্বয়ের আহ্বানে আপনাদের চাকুরীত্যাগ করিয়া আশ্রম-সেবায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়েদের কঠোর পরিশ্রম ও নিদারুণ অর্থাভাবে মর্মপীড়া অনুভব করিতেছিলেন। তদুপরি একদিন যখন শুনিলেন, জনৈক লৌহব্যবসায়ী অনাদায়ী প্রাপ্যের জন্য আদালত হইতে তাঁহার নামে 'হুলিয়া' বাহির করিয়াছেন, সেইদিন তিনি অতিক্ষোভের সহিত গৌরীমাকে বলেন, "জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবা করার উপদেশ দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বলেছিলেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।' আমি তো দিনের পর দিন দেখছি, কাদা চট্‌কাতে চট্‌কাতে দেহটা একেবারে ক্ষয় করে ফেললেন মা, আপনার ঠাকুর এখন কোথায়? তাঁর জল-ঢালা কি ফুরিয়ে গেছে?" এমন উদ্ধত মন্তব্যে গৌরীমা ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোদের ভারী অবিশ্বাসী মন। আশ্রম যে চলছে, এসব কি তোরা করে দিলি? না, আমি করলুম? সবই ঠাকুর-মাঠাকরুণ করাচ্ছেন।"

গৌরীমা আশ্রমাভ্যন্তরে চলিয়া গেলে, সন্তানকে ক্ষোভে দুঃখে বিচলিত দেখিয়া স্নেহময়ী দুর্গামা আসিয়া নিকটে বসিলেন, হাত-পাখা দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন, মস্তকে কল্যাণহস্ত রাখিলেন। অতঃপর চিত্ত শান্ত হইয়াছে বুঝিয়া বলেন, "গুরুকে, বুড়ো মাকে অমন কথা বলতে আছে, বাবা? ঠাকুরের নামে খোঁচা মারলে মায়ের মনে যে খুবই ব্যথা বাজে। ঠাকুর বৈরিগী মানুষ—কামকাঞ্চনত্যাগী সন্নিসী, না-ই-বা দিলেন তিনি টাকা! আমার রাজরাজেশ্বরী মা সারদা তো আঁজলা ভরে দিচ্ছেন। আশ্রমের অভাব আছে সত্যি, কিন্তু মা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তো! মায়ের ওপর বিশ্বাস রাখ, সব সুরাহা হয়ে যাবে। দেখবে, আশ্রমের ভালই

হবে।” ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণীর প্রতি মায়েদের এইরূপ ভক্তি-বিশ্বাস সন্তানকে মুগ্ধ করিল, অনুপ্রাণিতও করিল।

মাতৃদ্বয়ের অদম্য উৎসাহ ও নিরলস প্রচেষ্টায়, দেশবাসী নরনারীর সহৃদয়তায় এবং সর্বোপরি ঠাকুর-ঠাকুরাণীর করুণায় গৃহনির্মাণ কার্য সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইল। যাঁহাদিগের আর্থিক সহযোগিতায় এই বিরাট কার্য সুসম্পন্ন হইল তাঁহাদিগের মধ্যে গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী, হেমন্তকুমারী সেন, চারুশীলা দাসী, নির্মলাবালা দাসী, সুশীলাবালা দাসী, শ্রীনবকুমার সাহা, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সাহা, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, ভূতনাথ কোলে, রায়সাহেব প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য, রঘুনাথ দত্ত, জ্ঞানচন্দ্র বসাক-প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাতৃদ্বয় স্থির করিলেন, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার বার্ষিক জন্মোৎসব এইবার আশ্রমের নিজস্ব-ভবনেই অনুষ্ঠিত হইবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩৩১ সালের ২৭-এ অগ্রহায়ণ (ইংরাজি ১৯২৪) আশ্রমের বহুপ্রতীক্ষিত শুভ গৃহপ্রবেশ সুসম্পন্ন হইল। চারিতলায় নবনির্মিত মুখ্যমন্দিরে গৌরীমাতার আবাল্যপূজিত সিদ্ধদেবতা শ্রীশ্রীদামোদর-জীউ এবং অস্থিমন্দিরে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতা সাড়ম্বর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসহকারে অধিষ্ঠিত হইলেন।

আশ্রম স্ব-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও গৃহনির্মাণ বাবদ বহু-পরিমাণ ঋণ ছিল, বাটীর কিছু কিছু কার্যও অসমাপ্ত ছিল। তখনও প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। অর্থসংগ্রহ এবং আশ্রমের কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য দেশের বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহিগণকে লইয়া এইসময় একটি পরামর্শ-সভা গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তদনুযায়ী ১৩৩১ সালে আশ্রমের প্রথম পরামর্শ-সভা এবং ১৩৩২ সালে কেবল মহিলাদিগকে লইয়া কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।* এই সদস্য ও সদস্যাগণের

* নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া পরামর্শসভা গঠিত হয়—স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি), যতীন্দ্রনাথ বসু

আশ্রম-ভবন
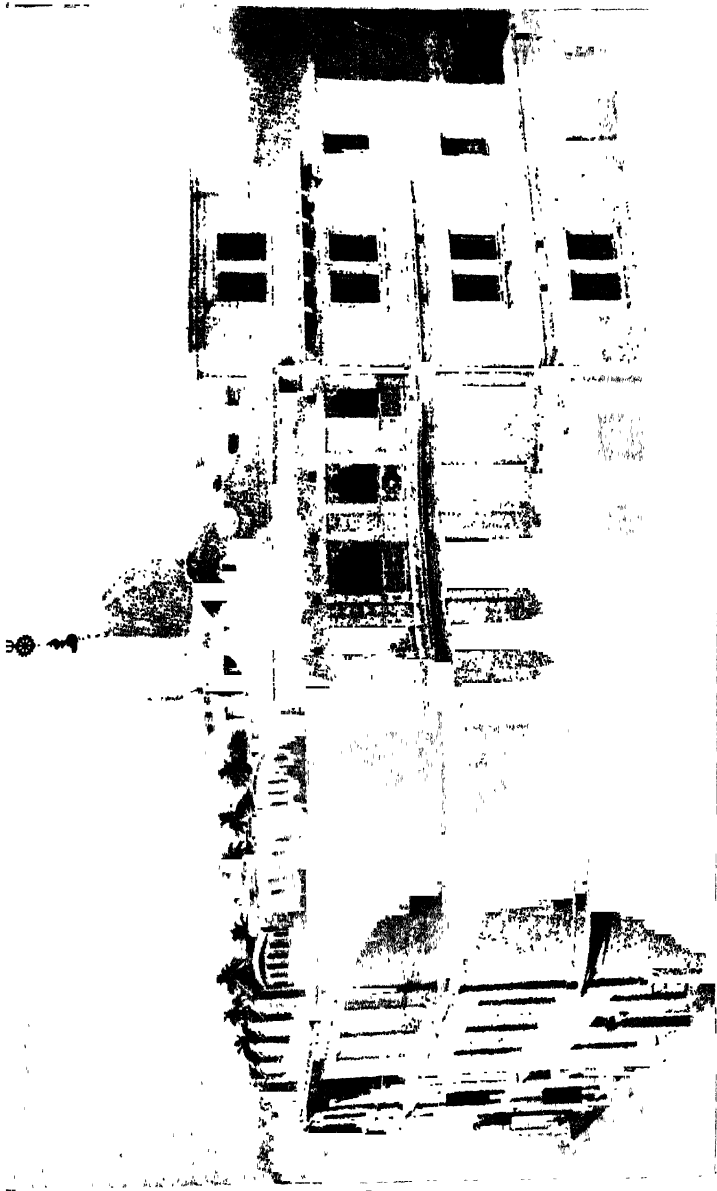
কেহ কেহ পূর্ব হইতেই গৌরীমা এবং দুর্গামার সহিত পরিচিত ছিলেন, আবার কেহ-বা নবাগত। তাঁহারা সন্ন্যাসিনী মাতৃদ্বয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এবং আশ্রমের আদর্শ ও কার্যকলাপের সহিত পরিচিত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন,—এইরূপ একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান যে এতদিন যাবৎ কলিকাতা সহরে মাতৃজাতির সেবা করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতেন না। বস্তুতঃ, নীরব কর্মসাধনাই ছিল মায়েদের আদর্শ। আশ্রমের বিষয় পত্রিকাদিতে প্রচার এই পর্যন্ত অতিসামান্যই হইয়াছে।

আশ্রমের প্রয়োজনে এই মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ নানাভাবে সহায়তা করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া গৃহনির্মাণকার্যে স্যার মন্মথনাথ, সতীশরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত দেশবাসীর গৃহে গৃহে গিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

(সলিসিটর), ডক্টর আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ), সতীশরঞ্জন দাশ (অ্যাডভোকেট জেনারেল), ডাক্তার রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর (কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ), স্যার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র), সুশীলচন্দ্র সেন (গভর্নমেণ্ট সলিসিটর), রায় নগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (ডেপুটী কমিশনার, বিহার), শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (তৎকালে কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট), শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত (অ্যাডভোকেট), শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু (সলিসিটর), শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মৎসিংহকা (সলিসিটর)।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যাবৃন্দ—

নীরদমোহিনী বসু (বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর পত্নী), ননীবালা দেবী (ডাক্তার স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর পত্নী), শ্রীস্নেহলতা দে (পি. সি. দে, আই. সি. এস, সেসন জজের পত্নী), শৈলবালা দে (তদীয়া ভ্রাতৃবধূ), শ্রীঅমিয়বালা দেবী (কলিকাতা ইউনিভারসিটির কণ্ট্রোলার রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের পত্নী), বিভাবতী বসু (ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী), নন্দরাণী দেবী (ডাক্তার বিভূতিভূষণ গোস্বামীর পত্নী), রাধারাণী দেবী (ললিতকুমার ঘোষের পত্নী), সরলাবালা বসু (সলিসিটর যতীন্দ্রনাথ বসুর পত্নী)।

এতদুদ্দেশ্যে স্যার মন্মথনাথ, যতীন্দ্রনাথ বসু এবং ডাক্তার চুণীলাল বসু এইসময় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভায় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী এবং বিত্তশালী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে টালার রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর বলেন,—তাঁহার এক মক্কেল বহুসহস্র টাকা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনা অনুসারে সৎকার্যে দান করিবার জন্য। তিনি তাহা হইতে আশ্রমের সাহায্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারিবেন। অপ্রত্যাশিত এইপ্রকার প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই মহা-উল্লসিত হইলেন। কারণ, ইহাতে আশ্রমের সমগ্র ঋণ শোধ হইয়া যাইবে, অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ হইবে, অধিকন্তু কয়েক সহস্র টাকা আশ্রম পরিচালনার জন্য উদ্বৃত্তও থাকিবে। গৌরীমা এবং দুর্গামা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। ডাক্তার বসু স্বয়ং আশ্রমে আসিয়া এই সুসংবাদ গৌরীমাকে জানাইলেন।

"তাহা শুনিয়া মাতাজী কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বলেন, 'টাকাও অনেক, আশ্রমের অভাবও অনেক, কিন্তু বাবা, আমার মনটায় খট্‌কা লাগ্‌ছে, কিছু গোলমাল আছে। দাতার বিষয় ভাল করে জেনে দেখ ত।' কয়েকদিন পর দাতার নাম এবং অর্থোপার্জনের বিবরণ শুনিয়া গৌরীমা বলিয়াছিলেন, 'এ রকম টাকা পঞ্চাশ লক্ষ হলেও আমি তা গ্রহণ করবো না।" দুর্গামাও ছিলেন অনুরূপ আদর্শনিষ্ঠ, তিনিও গৌরীমার কার্য সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন।

এইপ্রসঙ্গে এক আশ্রমহিতৈষীকে ডাক্তার বসু বলিয়াছিলেন, "কলকাতায় কত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে আমি রয়েছি, পাঁচশো টাকা পেলে কমিটি বর্তে যায়; আর, অভাবের দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকায় মায়েদের এমন নিস্পৃহ ভাব! এমনটি আমি জীবনে আর কখনও কোথাও দেখি নি।"

একদিকে অর্থসংগ্রহ, অপরদিকে গৃহনির্মাণের কার্য সমাপ্ত করা, —উভয়ই একত্রে চলিতে থাকায় ঋণ পরিশোধ করিতে বিলম্ব হইল। গৌরীমা এবং দুর্গামাকে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইসময়েও নানাস্থানে

যাইতে হইত। দুর্গামা চেষ্টিত হইলেন যাহাতে সর্বপ্রকার গুরুদায়িত্ব, বিশেষ করিয়া কায়িক পরিশ্রম হইতে গৌরীমাকে অব্যাহতি দেওয়া যায়। সুদীর্ঘকালের কঠোর পরিশ্রমে তিনি আশ্রমকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, বর্তমানে বার্ধক্যহেতু তাঁহার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন।

আশ্রমবাসিনীদিগের অন্নবস্ত্রের সংস্থান, বালিকাদিগকে আশ্রমে ভর্তি, তাহাদের অভিভাবকগণের সহিত আলাপ আলোচনা প্রভৃতি সর্বদায়িত্বই দুর্গামা গ্রহণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত, আরও একটি নূতন কর্তব্য তাঁহার নিত্যকর্মের তালিকাভুক্ত হইল। গৃহনির্মাণকার্যকে হেতু করিয়া নবপরিচিত অনেক নরনারী গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে আগ্রহান্বিত হইয়া আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। সকলকে আপ্যায়ন, সকলের সহিত আলাপনের দায়িত্বও তখন দুর্গামার। তিনি কখনও শ্রীসারদামাতার অনুপম চরিতকথা, কখনও গৌরীমাতার কঠোর তপস্যা ও তীর্থপর্যটনের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত-বর্ণনা এবং নানারূপ সদালোচনায় তাঁহাদের আনন্দবিধান করিতেন। এই কার্যটি ক্রমশঃ মায়ের অন্যতম মুখ্য কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, 'এ আমার লোকরঞ্জন ব্রত।'

গৃহনির্মাণকালেই মহাব্যস্ততার মধ্যে—অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়সংকল্পবলে—১৩৩১ সালে দুর্গামা বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পুনরায় কর্মব্যস্ততার মধ্যেই মা নূতন পাঠ আরম্ভ করিলেন—সাংখ্যদর্শন। ১৩৩৪ সালে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা একসঙ্গেই দিতে মনস্থ করিলেন। ব্যাকরণের উপাধি এবং বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে এই তিন পরীক্ষা একই বৎসরে দিবার প্রস্তাব সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইল। কিন্তু, ইহা ছিল দুঃসাহসিক প্রয়াস। কারণ, এইভাবে একত্রে তিনটি পরীক্ষা দিবার অন্যতম অসুবিধা বা বিপদ এই যে, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তিনটি পরীক্ষাই অগ্রাহ্য হইবে এবং পরীক্ষার্থী সকল পরীক্ষাতেই অনুত্তীর্ণ

বিবেচিত হইবে। আবার, আদ্য ও উপাধিতে উত্তীর্ণ হইয়াও যদি মধ্য পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় তবে তৃতীয় অর্থাৎ উপাধি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে। শেষপর্যন্ত মা তিনটি পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া 'সাংখ্যতীর্থ' হইলেন এবং বৃত্তি লাভও করিলেন। ইতিমধ্যে পণ্ডিত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, মা সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন পণ্ডিতপ্রবর দেবকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট।

এইবৎসরই মা পুনরায় সংস্কৃত 'ই' বিভাগে এম. এ পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। সংস্কৃতে তিনি এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতের কোন পরীক্ষায় আশঙ্কা বোধ করিতেন না। মে মাসে পরীক্ষার ফী আশী টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু দেহ হইল অন্তরায়। কিছুদিন যাবৎ নিঃশ্বাসের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেও এ বিষয়ে মা উদাসীন ছিলেন, অবশেষে চিকিৎসক ডাকিতে হইল। জনপ্রিয় ডাক্তার শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় আসিয়া মাকে পরীক্ষা করিলেন। অবস্থা সহজসাধ্য নহে বুঝিয়া তিনি প্রবীণ ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যকে লইয়া আসেন। পরীক্ষায় হৃদ্‌যন্ত্রের দোষ পরিলক্ষিত হইল। চিকিৎসক নির্দেশ দিলেন, দৈহিক এবং বিশেষ-ভাবে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে হইবে, পরীক্ষা স্থগিত থাকিবে। অতঃপর গৌরীমা কোনদিনই আর মাকে এম.এ. পরীক্ষায় অনুমতি দেন নাই। অবশ্য, ইহার পরও অবসরমত মা ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তবে তাহা পরীক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নহে।

মায়ের বিদ্যানুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল প্রবল, সেইকারণে বিবিধ কর্ম-ব্যস্ততাসত্ত্বেও পরীক্ষায় কখনও অকৃতকার্য হন নাই, বরং কোন কোন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। আশ্রমের ছাত্রীদের হউক অথবা অন্য কাহারও হউক, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংবাদ শুনিলে মা আনন্দিত হইতেন, তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতেন, 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।' তাঁহার তীব্র বিদ্যানুরাগই আশ্রমবাসিনী বালিকা-দিগকে বিদ্যার্জনে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রীতিমত পাঠ

প্রস্তুত না হইলে অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শাস্তি ছিল দুইটি—মায়ের ঘরে প্রবেশ ও তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। কেবল শিশুকুলই নহে, বয়স্কাগণের পক্ষেও মায়ের এই স্নেহের শাসন ছিল অসহনীয়। সাধারণতঃ এইপ্রকার শাস্তি সহ্য করিয়া কাহারও পাঠে অমনোযোগী হইবার দুঃসাহস হইত না। পক্ষান্তরে, বিদ্যার্জনে কৃতিত্বের জন্য মা নূতন বস্ত্র, অর্থ বা কখনও উত্তম ভোজ্য দ্বারা ছাত্রীদের উৎসাহ বর্ধন করিতেন। এইভাবে ক্ষেত্রবিশেষে পুরস্কার, আদরযত্ন বা তিরস্কার দ্বারা মা বালিকাদিগের পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি করিতেন। কেহ তাঁহার নিকট সহজে পরীক্ষা-পাসের কৌশল জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "যে পুজোয় যে মন্ত্র, পাস করার মন্ত্র— মনোযোগ দিয়ে বেশী সময় পড়াশুনো করা।"

পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল যেন তাঁহার প্রাণস্বরূপ প্রিয়। ব্যাকরণ, সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্ত, উপনিষৎ এবং বি. এ. ও এম, এ. পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য তিনি যত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, সেই সকলই অতিযত্নে অদ্যাপি মায়ের আলমারীতে রক্ষিত আছে। মা বলিতেন, "আমি মরে গেলে, আমায় তোরা ফুলমালা দিয়ে সাজাবি না, চারদিকে স্তূপাকার করে আমার সব বই সাজিয়ে দিবি, তাতেই আমি বেশী খুশী হবো।"

হাজারীবাগে

আশ্রমবাসিনী কন্যাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধানে কোন কোন বৎসর গৌরীমা অথবা দুর্গামা তাহাদিগকে লইয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থান বা তীর্থক্ষেত্রে গিয়া কিছুদিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া আসিতেন।

১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাসে কতিপয় আশ্রমবালিকাসহ দুর্গামা হাজারীবাগে গমন করেন। আশ্রমবাসিনী দুইটি বালিকার পিতা তথায় রিফরমেটরী স্কুলের কর্মচারী ছিলেন, তিনিই একখানি ভাড়াবাটী স্থির করিয়া দিলেন।

হাজারীবাগের বাটীখানি ছিল বাংলো ধরণের, সম্মুখে সবুজ তৃণে আচ্ছাদিত প্রশস্ত ভূমি। তাহাতে প্রবেশ করিয়াই মায়ের মন প্রফুল্ল হইল।* মায়ের দেহ তখন সুস্থ ছিল না, তথায় কিছুদিন বাসের পর

---

* হাজারীবাগ হইতে আশ্রমে লিখিত মায়ের একখানি পত্র—

"তোমাদের কাছ থেকে এখানে এসে নিরাপদে পৌঁছেছি। দেহ বড় দুর্বল একটুতেই হাঁপ ধরে। পথে কিছু কষ্ট হয় নি—ভাগ্যহীনের বোঝা তিনি বন—তাই গাড়ীখানি একেবারে রিজার্ভ মত ছিলো। মোটর আড়াই ঘণ্টার ভিতর বাসায় পৌঁছে দিয়েছে। দৃশ্য অতি চমৎকার, শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। পথে জবা কমলা আমায় অত্যন্ত যত্ন করেছেন। বাড়ীর সেই সেবাময়ীর সেবাপ্রিয় হাত দুখানি এখানেও যেন পাচ্ছি। হাজারীবাগ রোডে ছোটদের কিছু খাইয়েছিলাম।

"বাসাখানি অতি সুন্দর, সামনে পদ্মপুকুর, মনে হচ্ছে যেন ভূস্বর্গে আছি। নিকটেই ক্ষুদ্রকায়া নদী। কাল আর বাহির হই নি আজ দু'বেলাই বেড়িয়েছি।...চণ্ডীবাবু, রামরঞ্জনবাবু খুব যত্ন নিচ্ছেন। পাতকুয়ার জল খুব মিষ্টি।...আমাদের বাড়ীর আশেপাশে, অবশ্য দূরে—দেখা যায় দুইটি পাহাড়। এই জায়গাটি হাজারীবাগের শ্রেষ্ঠ জায়গা। আমি একটু সুস্থ হয়ে সবাইকে লিখবো—এখন কিছু ভাল লাগে না। চাই বিশ্রাম, দেহ মন দুইই অবসন্ন। মায়েদের বলবে—আমার দোষ না নিতে, আমি লিখছি।...

মাতাঠাকুরাণীকে প্রণতি দিও।...ইতি তোমাদেরই চিরবাঁধা।

স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইল। এইস্থান হইতে মা নিকটবর্তী কয়েকটি মনোরম স্থান দর্শনেও গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজরৌপ্পা, হুড্রু জলপ্রপাত এবং পরেশনাথ পাহাড় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মায়ের দর্শনে আসিয়া তথাকার দীর্ঘকালের প্রবাসী প্রতিবেশী রামরঞ্জন ঘোষ কথাচ্ছলে বলেন,—হাজারীবাগে এসে রাজরৌপ্পা দর্শন না করলে পরে কিন্তু অনুতাপ হবে। রাজরৌপ্পা—দেবীতীর্থ, মনোরম স্থান। দামোদরের তীরে রঙ্গীন পাথরগুলোও দেখতে ভুলবেন না যেন। তিনিই একজন বিশ্বাসী ট্যাক্সী ড্রাইভারের ব্যবস্থা করিলেন এবং কোন্ কোন্ পথে কোথায় যাইতে হইবে—সব বুঝাইয়া দিলেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মাকে মুগ্ধ করিত। ড্রাইভারের সহিত এইরূপ চুক্তি হইল যে, শেষরাত্রে যাত্রা করিতে হইবে এবং প্রথমে হাজারীবাগ ও রাঁচির মধ্যবর্তী চুচুবালি পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করিয়া মা সূর্যোদয় দর্শন করিবেন। এই দর্শন করাইতে পারিলে ড্রাইভারকে অতিরিক্ত দশটাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

হাজারীবাগ সহর হইতে চুচুবালি প্রায় সাঁইত্রিশ মাইল পথ। শীতের শেষরাত্রে নির্জন নির্বিঘ্ন পথে মোটর গাড়ী ছুটিল বিদ্যুৎবেগে। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া দেখা গেল, নিম্নস্থ ক্ষেত্রসমূহ তখনও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। শীর্ষস্থানে উপস্থিত হইয়া বুঝা গেল, কোন কারণে আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইলেই সেদিনের সকলপ্রকার উদ্যোগ ব্যর্থ হইত।

মায়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতেই যেন সুবর্ণমুকুট-শোভিত সূর্যদেবতা অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশিত হইলেন। ভাষায় অবর্ণনীয়, চিত্তমুগ্ধকর সেই দৃশ্য; বহুক্ষণ স্থায়ী নহে, ক্ষণস্থায়ী মাত্র; দর্শনে সকলের মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। যুক্তকরে মায়ের সঙ্গে সকলেই নতমস্তকে আবৃত্তি করেন,—

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অতঃপর গাড়ী পুনরায় দ্রুতগতিতে চলিল। রামগড় ও গোলা হইয়া রাজরৌপ্পা, চুচুবালি হইতে ত্রিশ মাইল দূরে। তৎকালে রাজরৌপ্পার মন্দিরের সান্নিধ্যে গাড়ী যাইত না। গাড়ীর শব্দে একজন পাহাড়ী কাঠুরিয়া আসিয়া জানাইল,—গাড়ী আর যাইবে না, পদব্রজে যাইতে হইবে। সে-ই পথপ্রদর্শক 'গাইড' এবং সঙ্গীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির বাহকও হইল।

চতুর্দিকে জনমানবহীন অরণ্যানী এবং অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী। তখনও শিশিরসিক্ত বৃক্ষপত্রসমূহ সূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছে, শাখায় শাখায় পুলকচঞ্চল পক্ষিকুল বিভিন্ন সুরে মধুর কাকলী তুলিয়াছে। অরণ্যের মধ্য দিয়া পাহাড়ীদের যাতায়াতের ছায়াচ্ছন্ন অপ্রশস্ত পথ ছিল বটে, কিন্তু মা যখন গাইডের নিকট শুনিলেন, স্থানটি শ্বাপদসঙ্কুল, তখন তাহা পরিহার করিয়া ভৈরবী নদীর শুষ্ক বালুকার উপর দিয়াই চলিলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া দেখা গেল, স্বল্পতোয়া ভৈরবী সোল্লাসসঙ্গীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে দামোদরের বক্ষে। এই দুই ধারার সঙ্গমস্থলেই দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির। স্থানটি যেন 'বাগর্থের মত সম্পৃক্ত' হরপার্বতীর মিলনের প্রতীক।

ছিন্নমস্তার সাধনা—অতি ভয়ঙ্কর সাধনা; শিব ও সুন্দরকে লাভের জন্য আত্মাহুতির সাধনা।

প্রাচীন জীর্ণ ইষ্টকনির্মিত একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষে একখানি চতুষ্কোণ শিলায় উৎকীর্ণ মাতা ছিন্নমস্তার মূর্তি। কেহ বুঝাইয়া না দিলে নবাগতের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

তথায় মায়েদের উপস্থিতির পরে মন্দিরের পূজারী আসিলেন। এই পুরোহিত-বংশ আট পুরুষ দেবীর পূজক, আদিতে তাঁহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। গৈরিকধারিণী বাঙ্গালী মাতৃবৃন্দকে এইপ্রকার দুর্গমস্থানে দর্শন করিয়া তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দেবী, মন্দির এবং স্থানমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে পূজারী বহু কাহিনী বলিলেন।

ভৈরবীর জলে স্নানান্তে সিক্ত বসনেই মা মন্দিরে পুষ্পপত্র ও নৈবেদ্যে দেবীর অর্চনায় পরমানন্দ লাভ করিলেন। পূজা, জপ

ও স্তবকীর্তনাদির শেষে তাঁহারা চলিলেন দামোদরের তীরে প্রস্তর-শোভা দর্শনে। এইস্থানে দামোদর অপ্রশস্ত, কিন্তু খরস্রোত। উভয় পার্শ্বের তীর উচ্চ, প্রস্তরময়। প্রকৃতিশিল্পী যেন তুলিকার সাহায্যে এবং বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে অতিনিপুণভাবে সেই প্রস্তররাজি চিত্রিত করিয়াছেন। অনাদৃত উন্মুক্ত স্থানে এইরূপ অপূর্ব শোভা যেমন বিস্ময়কর তেমনই মনোরম।

ইতিমধ্যে নদীতীরের বৃক্ষতলে সঙ্গিনীগণ রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—গৌরীমার বিখ্যাত জগাখিচুড়ী। রন্ধন সমাপ্ত হইলে ভৈরবী নদীর বক্ষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর এক একজন প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন। প্রত্যেকেই যেন এক একটি দ্বীপের অধিপতি! অতি আনন্দসহকারে মা সকলের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পূজারী এবং গাইডও বঞ্চিত হইলেন না।

অতঃপর হুড্রু-ফলস্। সেই গোলা হইয়া যাইতে হইবে, আঠারো মাইল পথ। পর্বতপাদদেশে পৌঁছাইতে একঘণ্টা সময় লাগিল। জলপ্রপাতের দূরত্ব এইস্থান হইতে প্রায় আড়াই মাইল। মা পদব্রজে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি ডুলী পাইলেন। বহুদূর হইতেই সমুদ্রগর্জনের মত শব্দ শ্রুতিপথে আসিতেছিল, নিকটবর্তী হইলে উহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। অবশেষে দেখা গেল—সমগ্র সুবর্ণরেখা নদীর বিশাল জলধারা সহসা প্রায় তিনশত ফুট নিম্নে পতিত হইয়া প্রচণ্ড শব্দে সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় এই বিস্তৃত জলপ্রপাতের অপূর্ব শোভা দর্শনান্তে মা রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকায় হাজারীবাগে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কয়েকদিবস পরেই পরেশনাথ। প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া বেলা সাড়ে সাত ঘটিকায় ট্যাক্সী গিয়া পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইল। মায়ের জন্য একখানি ডুলীর ব্যবস্থা করা হয়, অন্যসকলে চলেন পদব্রজে। শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে বেলা হইল দ্বিপ্রহর। কারণ, পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় চারি হাজার পাঁচ শত ফুট। সেইস্থান হইতে সমতলের দৃশ্য বড়ই মনোরম। তথায়

দেবালয় দর্শনের পর আরম্ভ হয় অবতরণ। সন্ধ্যার পূর্বে পাদদেশে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগের পর মা সকলকে লইয়া হাজারীবাগে ফিরিলেন রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায়। তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপিপাসু চিত্ত আগ্রহাতিশয্যে পথশ্রমকে আদৌ গ্রাহ্য করিত না।

হাজারাবাগ সহরের নিকটবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ও মায়েরা দেখিলেন। একদিন বোকারো জলপ্রপাত দেখিতেও যাওয়া হয়, কিন্তু তখন উহা ছিল জলশূন্য। রিফরমেটরী স্কুল দেখিতেও গিয়াছিলেন, দুর্দান্ত বালকদের শিক্ষাব্যবস্থা দেখিলেন।

মাতৃবৃন্দের কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একদিন গৃহস্বামিনী সৌজন্যবশে তাঁহার বাটীর ভাড়াটিয়াদিগকে দেখিতে আসিলেন। সন্ন্যাসিনী মাকে প্রণামান্তে মুখ তুলিলে মহিলাকে মা প্রশ্ন করেন, 'তুমি ইন্দু, না?'

উভয়েই কিছুক্ষণ বিস্ময়াভিভূত। পরে তিনি সহাস্যে উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, দিদি।'

—তুমি এখানে?

—এটা আমাদেরই বাড়ী।

—ও, তাই—বাড়ীর নাম 'ইন্দু-ভিলা!' বেশ, বেশ।

ইনি গোয়াবাগান আশ্রমের পুরাতন ছাত্রী। ইদানীং পতিসহ হাজারীবাগে অন্য বাটীতে বাস করেন। দীর্ঘকাল পরে পুনর্মিলনে উভয়েরই আনন্দ। মহিলা বলেন, 'আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে এ বাড়ীতে, আমাদের পরমসৌভাগ্য। আপনার যদ্দিন ইচ্ছে এ বাড়ীতে থাকুন, দিদি। ভাড়া লাগবে না।' অতঃপর তাঁহার গর্ভধারিণীসহ পরিবারস্থ সকলের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়. সাধুসেবার জন্য বহু দ্রব্যও আসে। মায়ের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিভালবাসা এতই গভীর হইল যে, অতঃপর মহিলা পতিপুত্রকন্যাসহ বহুবার কলিকাতা আশ্রমেও আসিয়াছেন।

এইযাত্রায় রাজরৌপ্পা মাকে সর্বাধিক মুগ্ধ করিয়াছিল। কেবল বাহিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নহে, অন্তরেও তিনি অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন রুদ্রের মধ্যে মাধুর্যকে। সেদিন আত্মসমাহিত অবস্থায় মা দেবীসকাশে নিজের মুক্তি যাচ্ঞা করেন নাই, মঙ্গল কামনা করেন নাই তাঁহার প্রিয় আশ্রম এবং কন্যাদের জন্য, একান্তভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'বিশ্বের কল্যাণ।'

অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে 'জ্যোতির্ময়ী রূপবতী রাজরৌপ্পা'র এবং মায়ের 'আত্মবিস্মৃত' ভাবের বর্ণনার কিয়দংশ তাঁহারই রচনা হইতে পরিবেশন করিতেছি।—

"আমি ভেবেছিলাম,— বুঝি রুদ্রতালের মধুর আনন্দ উপভোগ করব, কিন্তু দেখলাম কী? সে ত সেখানে রুদ্রদেবীর সৌন্দর্য নয়। সে যে সেই বৃন্দাবনের মধুবনে যিনি বাঁশী বাজিয়ে রাধাসুন্দরীর অন্তর দখল করে, আবার মৃদু হেসে বাঁশী বাজিয়ে পাষাণস্তূপ গোবর্ধনকে গলিয়ে দিয়ে নিজেও নিজেরই ভাবরূপে ভরপুর হয়েছিলেন,—এখানেও যেন সেই বাঁশীর ধ্বনি অপরূপ রূপ গ্রহণ করেছে। তাই বুঝি নাম রাজরৌপ্পা— রজতের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী—রূপবতী, কিন্তু এ যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। আমি বলি —সৌন্দর্যে তুমি রাজা,—হে রাজরৌপ্পা, তুমি নারী, কিন্তু তোমার রূপ কখনও একটুও ক্ষয় হয় নি—চিরদিন চিরযুগ যেন প্রথম অরুণ, যেন প্রথম আলো। তুমি স্বর্গের নও, তুমি পৃথিবীর;—তুমি ভোগের নও, অনুভবের। তোমার পরশ নাই, তবু যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়,—তোমার স্বজাতিরা তোমাকেই সিংহাসনে বসায়। তুমি কুমারী—তোমার আনন আনন্দছলছল, কিন্তু ভাবগাম্ভীর্যের অভাব নেই। ওগো, ওগো ব্রতধারিণি! তোমার জটা দিয়ে যে কলকল ছলছল করে হেথাহোথা জল উঠছে— সে কী তোমার নয়নের অশ্রু —না হৃদয়ের আনন্দ— না দানের অমৃতবিন্দু?···তোমার রং সে যে কাষায় বস্ত্রের দাগ লেগে লেগে নানারূপ আভাময় হয়েছে।···

"ছিন্নমস্তা দেবীর পূজা সকাম চিত্তে করা হোলো। নিষ্কাম

ব্রতধারিণী, তার আবার কামনা?…বহু উপচারে, আর্দ্রবস্ত্রপরিহিতা নয়নের জল বিল্বদল তোমার পায়ে দিয়ে চেয়েছিলো আশীর্বাদ শুধু 'বিশ্বের কল্যাণ।' মাথার ভিতর একটা শব্দ যতক্ষণ পূজা করলাম, হৃদয়ে একটা মহৎ তপোভাব,—মুহূর্ত যেন স্থির হয়ে রইলাম—আমি বিভোর। অঞ্জলি অর্ঘ্য দিয়ে কিছুকাল নীরব হয়ে রইলাম—চাইবার কিছু ছিল না তখন। দেবি! অতি সরল প্রাণের ব্যাকুল কত চাওয়া তুমি নিষ্কাম চকিতে করে নিলে, সে তোমার শক্তি—মুহূর্তের জন্য আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম।"

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তীর্থে

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তীর্থসমূহ – গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-জয়পুর-দ্বারকা দর্শন হিন্দুমাত্রেরই প্রাণের আকিঞ্চন। দুর্গা-মায়েরও দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি এইসকল তীর্থস্থানে যাইবেন। গৌরীমার অনুমোদনে ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসে তিনি তদুদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে রহিলেন তিনজন আশ্রমকন্যা এবং দুইজন সেবক।

কেবল তীর্থস্থান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নহে, ঐতিহাসিক স্থান দর্শনেও মায়ের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁহার ভ্রমণতালিকা অনুযায়ী প্রথম দ্রষ্টব্য—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রার তাজমহল। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্রী, সুতরাং আগ্রার দুর্গ, তাজমহল এবং আকবরের সমাধিস্থান সেকেন্দ্রা তিনি আগ্রহের সহিত দেখিলেন।

অতঃপর দর্শন করেন মথুরা ও বৃন্দাবনধামের বিখ্যাত দেবালয়-সমূহ। ক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার বিবাহের পর 'বউভাত' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে। অধিকন্তু, বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জে শ্রীসারদামাতা ও গৌরীমাতা একাধিকবার বাস করিয়াছেন। সেইসকল মধুর স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। সুতরাং এই তীর্থের প্রতি তিনি পোষণ করিতেন এক প্রবল আকর্ষণ। এইকালে তিনি প্রাপ্তবয়স্কা, মনের আনন্দে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, বঙ্কুবিহারীজী-প্রমুখ দেবতা এবং নিধুবন, নিকুঞ্জবন, যমুনাপুলিন, বংশীবট প্রভৃতি লীলাস্থানসমূহ মা পুনঃ পুনঃ দর্শন করেন। দূরবর্তী রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, রাওল, দাওজীতেও মা গিয়াছিলেন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান কংসরাজার কারাগার, মথুরানাথ, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামঘাট দর্শন করিলেন। যমুনাবক্ষে নৌকা হইতে সন্ধ্যাকালে যমুনাদেবীর মনোরম আরাত্রিকের দৃশ্য মাকে মুগ্ধ করিত।

তৎপর জয়পুর। বৃন্দাবনের আদি গোবিন্দবিগ্রহ বর্তমানে আছেন জয়পুরে। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ কর্তৃক নির্মিত এবং প্রভুপাদ রূপ গোস্বামী কর্তৃক পূজিত আদি গোবিন্দের নয়নাভিরাম রূপদর্শনে মায়ের অন্তর প্রসন্ন হইল। একদিন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, মা পার্শ্বেই উপবিষ্ট আছেন, এমনসময় দ্বারের অতিনিকটে একটি ময়ূর বিচিত্রবর্ণের পুচ্ছবিস্তার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গোবিন্দজীর সম্মুখে এমন অপূর্ব নৃত্যে মা এবং উপস্থিত সকলেই অতিশয় আনন্দ বোধ করিলেন।

জয়পুর হইতে সাত মাইল দূরে অম্বর পাহাড়ে মা গিয়াছিলেন। শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মাতা মহিষমর্দিনী—এক অতিসুন্দর দেবীমূর্তি। জয়পুরের যাদুঘর ও যন্তরমন্তর অর্থাৎ মানমন্দিরটিও মায়ের দেখা হয়। চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত, অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত জনহীন গল্‌তা পাহাড়েও মা একদিন গমন করেন। সূর্যাস্তকালে নিভৃত সেইস্থানে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা মায়ের ছিল, কিন্তু স্থানীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল,—মায়িজী, সন্ধ্যা হইয়াছে, আর এখানে থাকিবেন না, জানোয়াররা চলাচল করে এসময়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে তীর্থদর্শনের নিমিত্ত মা যে সময় নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেহের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল। চৈত্রমাসের শেষে মরুভূমির দেশে জয়পুর হইতে দ্বারকার পথে রেলগাড়ীতে প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁহার অসহ্য বোধ হয়। মেসানা ষ্টেশনে বরফের চেষ্টা করিতে বলিলেন,—মুখমণ্ডল ও হস্তপদে উহা রাখিলে শরীর শীতল হইবে। বরফের অনুসন্ধানকালে জনৈক বাঙ্গালী রেল-কর্মচারীর সহিত পরিচয় হয়। সন্তানটির সাদর আমন্ত্রণে মা তাঁহার আবাসে গিয়া স্নানভোজনাদির পর বিশ্রামে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। তাঁহারই পরামর্শে রাজকোটেও মা একদিন অবস্থান করেন।

ইহার পর জামনগর হইয়া দ্বারকাধাম। দ্বারকার পথে রেল

লাইনের উভয় পার্শ্বে ও বৃক্ষতলে আহারে রত অথবা রেলগাড়ীর শব্দে সচকিতভাবে পলায়মান হরিণযূথ দেখিয়া সকলে খুশী হইলেন।

সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নগরী সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মথুরা পরিত্যাগের পর শ্রীকৃষ্ণ উত্তরকালে যাদবকুলসহ দ্বারকা অর্থাৎ দ্বারাবতীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশ্য, ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদিগের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন দ্বারাবতী বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে বিলুপ্ত।

দ্বারকাধামের অধীশ্বর রণছোড়জী—কষ্টিপাথরে নির্মিত সুদর্শন চতুর্ভুজ বিগ্রহ। তাঁহার মন্দিরের সু উচ্চ শীর্ষ বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি সুন্দর। বস্ত্রাদি বিবিধ উপচারে মা দেবতার পূজা করিলেন। এখানে বিগ্রহের চরণ স্পর্শ করা যায়। ইনি দয়াল ঠাকুর, গৌরীমাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। রুক্মিণীদেবীর মন্দির এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠও মা দেখিলেন।

সেকালে দ্বারকায় সুপেয় জলের ছিল নিতান্তই অভাব। এই অভাবের প্রতিকারকল্পে স্থানীয় অধিবাসিগণ বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া রাখেন। মা যে-বাটীতে বাস করিতেছিলেন তাহার মালিকের নিকট হইতে রন্ধনের এবং পানীয় জল মূল্যদ্বারা ক্রয় করিতে হইত। অথচ তীর্থযাত্রায় ব্যয়ের অঙ্ক স্বভাবতঃই সীমিত, জলের উচ্চমূল্যহেতু পানীয় জলের দৈনিক বরাদ্দ ছিল অল্প। রণছোড়জীর নিকট মা অতিদুঃখে অভিযোগ জানাইয়াছিলেন,—ঠাকুর, তোমার রাজ্যে এসে এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে পিপাসায় প্রাণ ভরে জল খেতে পেলুম না!

দ্বারকায় সূর্যাস্তের দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। অপরাহ্নে মা সমুদ্রতীরে বসিয়া পশ্চিম সমুদ্রের আরক্তিম তরঙ্গভঙ্গ এবং উদার আকাশপথে সূর্যদেবের মহিমময় অস্তগমন প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতেন।

দ্বারকাধাম হইতে মায়েরা গমন করেন ভেরাবল বন্দরে। তৎপর প্রভাসতীর্থ। যে-মন্দিরে মা সোমনাথকে দর্শন করেন তাহা রাণী অহল্যাবাঈর অর্থে নির্মিত। সমুদ্রতীরবর্তী এক গ্রামের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরটি আয়তনে তেমন বৃহৎ নহে। মন্দিরে প্রবেশ

করিয়াই যে মহাদেবের দর্শন পাওয়া যায়, তিনি সোমনাথ নহেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সোমনাথের ধনৈশ্বর্যের লোভে বিদেশ হইতে বিধর্মী লুণ্ঠনকারিগণ বারংবার ভারতে আসিয়া এই মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস করিয়াছে, ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছে। দেবস্থান রক্ষা করিবার জন্য সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ ভারতীয় বীর জীবন বলি দিয়াছেন। যাহাতে ধ্বংসকারিগণ সহজে দেবতার সন্ধান না পায় সেই উদ্দেশ্যেই গোপন পথে অন্ধকার গৃহে মূলদেবতা সোমনাথকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইঁহারই নিয়মিত পূজা হয় ভূগর্ভে।

প্রভাসতীর্থে এক গাইড শ্রীকৃষ্ণের দেহবিসর্জনের স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। দুর্গামা বলেন,— গৌরীমা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রব্রজ্যাকালে এখানে এসে অজ্ঞাতকারণে মর্মযাতনায় কেঁদেছিলেন। পরে জানতে পারেন, এখানেই নিষ্ঠুর ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করেছিলেন।

প্রভাসের পর জুনাগড় হইয়া প্রায় চারি মাইল দূরে গিরিতীর্থ গিরনার। গিরনারকে কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিহারস্থান— রৈবতক পর্বত। পর্বতের পাদদেশে লম্বে হনুমানের মন্দিরের সদাশয় মোহন্ত সন্ন্যাসিনী মাতৃবৃন্দের জন্য দুইখানি কুঠরির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে পর্বতাধিরোহণ। উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট। পর্বতে আরোহণের পূর্বে ডুলীর ভাড়া ধার্য করিবার জন্য কয়লা মাপিবার মত একটা বৃহদাকার তৌলযন্ত্রের এক-দিকে মাকে বসিতে হইল, অপরদিকে রাখা হইল একখণ্ড প্রস্তর। দেহের ওজন অনুযায়ী মায়ের ডুলীভাড়া ধার্য হয় দশ টাকা দুই আনা। চারিজন বাহক ডুলী বহিয়া চলিল। অন্যসকলে পদব্রজে। ধর্মার্থীদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রস্তরাদি-নির্মিত আট-দশ হাজার সোপান আছে। পদযাত্রিগণ এই সোপানাবলী অতিক্রমণে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন সত্য, কিন্তু চতুর্দিকের মনোরম দৃশ্যদর্শনের আনন্দে সেই ক্লান্তি তেমন পীড়াদায়ক হয় না। পর্বতশীর্ষে মাতা অম্বা দেবীর মন্দির। মধ্যভাগে জৈনদিগের নেমিনাথের মন্দির ও

বিহার। গুরুদত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্নও পর্বতোপরি রহিয়াছে। বৌদ্ধ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষও বিদ্যমান।

জুনাগড়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা।—

গিরনার হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে, জুনাগড ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই দেখা গেল—চতুর্দিকে সহস্র সহস্র নরনারী ভিড় করিয়া আছেন। একটি মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে ইঁহারা সমবেত হইয়াছেন। মা এই সংবাদ জানিতেন না, জানা থাকিলে গিরনারের পাদদেশেই আরও দুইদিন অপেক্ষা করিতেন। ষ্টেশন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধানে জানা যায়, পরবর্তী গাড়ীর টিকেটবিক্রয় শেষ হইয়াছে, উক্ত দিবসের অন্যান্য সকল গাড়ীর টিকেটও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই দিবস এবং পরদিবসেরও দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রেলগাড়ীতে স্থান পাওয়া যাইবে না। আরও জানা গেল, সঙ্গতি-সম্পন্ন যাত্রিগণ প্রথমশ্রেণীর টিকেটের নির্দিষ্ট মূল্য দিয়াও স্থান সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না।

মাতৃবৃন্দের তখন বিপন্ন অবস্থা,—এইপ্রকার পরিস্থিতিতে তাঁহাদের প্রাত্যহিক স্নানাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা সম্ভব নহে। ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হইল,—এই মাতৃবৃন্দ কলিকাতা হইতে গিরনার তীর্থে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এইভাবে অনাবৃত স্থানে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর হইতেছে। আপ-ডাউন যে-কোন ট্রেণে ইঁহাদের অনুগ্রহ করিয়া তুলিয়া দিন। ষ্টেশনমাষ্টার মাতৃবৃন্দের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, কিন্তু জানাইলেন যে, তিনি নিরুপায়। যাঁহারা প্রথম দিকে টিকেট ক্রয় করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল প্ল্যাটফরমের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। অন্যান্য যাত্রীদিগকে পুলিস বাহিরে রাখিয়া পাহারা দিতেছেন।

অপরাহ্নে একটি গাড়ী ছাড়িবে, কিন্তু পূর্ব হইতেই যাত্রিগণ তাহার কামরাগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মাত্র ঘণ্টাখানেক

সময় বাকী। মায়ের এক সেবক পুনরায় গিয়া মিনতিপূর্ণ বচনে ষ্টেশনমাষ্টারকে অনুরোধ জানাইলেন,—সাধুমায়ীরা খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছেন, অনাহারে রহিয়াছেন, যেভাবে হয় কোনপ্রকার ব্যবস্থা করুন। এমনসময় অপর একজন রেল-কর্মচারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে ষ্টেশনমাষ্টার তাঁহাকে বাঙ্গালী সাধুমায়ীদের দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন। সেবকও অনুরূপ সকাতর অনুরোধ করেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক মাতৃবৃন্দকে প্ল্যাটফরমের মধ্যে মালপত্রসহ প্রবেশের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং অপেক্ষমাণ গাড়ীর প্রতিকামরায় উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন কোথাও একটু স্থান ইঁহাদের জন্য করা সম্ভব কি-না। কিন্তু স্থান কোথাও নাই। অবশেষে দেখা গেল,—দুইখানি বেঞ্চযুক্ত ক্ষুদ্র একখানিমাত্র কামরা আফগানিস্থানের আমীরের চিকিৎসকের জন্য রিজার্ভ করা রহিয়াছে। তিনি সপরিবারে দিল্লী হইয়া কর্মস্থলে ফিরিতেছেন। গাড়ীতে তাঁহার বোরখা-পরিহিতা বেগম, দুইটি বালক ও একজন চাপরাশি বসিয়াছিলেন। চিকিৎসক মহাশয় তখন অনুপস্থিত, চায়ের সন্ধানে গিয়াছেন। রেল-কর্মচারী সেই কামরাতেই মাতৃগণকে উঠিতে বলিলেন। চাপরাশি দরজায় দাঁড়াইয়া বাধা দিল। ইহাতে কর্মচারী ও চাপরাশির মধ্যে প্রথমে বাদপ্রতিবাদ, পরে ধাক্কাধাক্কি সুরু হয়। উত্তেজনাবশে চাপরাশি অভদ্রোচিত বাক্য প্রয়োগ করিল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া কর্মচারী হস্তস্থিত টিকেট-পাঞ্চিং যন্ত্রদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। চাপরাশির গণ্ড বাহিয়া রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল। চিকিৎসকের বেগম এবং পুত্রদ্বয় এতক্ষণ ভয়বিহ্বল অবস্থায় এই ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। প্রহরীকে আঘাত করিবামাত্র তাঁহারা আতঙ্কে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। চাপরাশি ছুটিয়া গেল তাহার মনিবকে ডাকিয়া আনিতে। এমন এক দুর্ঘটনার জন্য মা এবং তাঁহার সঙ্গিগণ কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা ইহার শেষ অঙ্কের অপেক্ষায় অদূরে মহা-উৎকণ্ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চিকিৎসক ও চাপরাশিকে দূরে দেখিবামাত্র মায়ের সেবকটি

সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন এবং করজোড়ে বলিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, একটু দাঁড়ান, আমার কথাটা শুনুন।' চিকিৎসক বিস্মিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। ষ্টেশনে আটক কলিকাতার সাধুমায়ীদের দুরবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সেবক বলেন,—মায়ীদের একটু স্থান সংগ্রহ করিবার জন্যই এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং যেহেতু আমরাই ইহার কারণস্বরূপ, সেইজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের রিজার্ভ-কামরায় নিশ্চয়ই অন্যের প্রবেশের অধিকার নাই, বিশেষতঃ আপনার বিনা-অনুমতিতে। অধিকন্তু, আপনার চাপরাশি ক্রোধবশতঃ অভদ্র বাক্য বলিলেও তাহার মস্তকে এইরূপ আঘাত এবং রক্তপাত করা অবশ্যই নিন্দনীয়। আমাদের মায়িজী এরূপ ঘটনায় অতিশয় লজ্জিত এবং দুঃখিত। আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, আশা করি, এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

আমীরের চিকিৎসকটি সত্যই ভদ্রলোক, এইপ্রকার ক্ষমাপ্রার্থনা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। অতঃপর সেবকটি উক্ত রেল-কর্মচারীর নিকট গিয়া বলিলেন,—ডাক্তার সাহেব শান্ত হইয়াছেন, আপনি আর উত্তেজিত হইবেন না; আমাদের জন্য আপনার প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে বহু রেলযাত্রী সমবেত হইয়াছেন, ষ্টেশন-মাষ্টারও উপস্থিত। চিকিৎসক সংযত ভাষায় কর্মচারীকে তিরস্কার করিলেন। ষ্টেশনমাষ্টারের ইঙ্গিতে তিনিও দুঃখপ্রকাশ করিলেন। উত্তেজনা প্রশমিত হইল।

চিকিৎসক তখন জানিতে চাহিলেন, মায়িজীর দলে যাত্রিসংখ্যা কত এবং তাঁহারা কতদূর যাইবেন। বলা হইল, সংখ্যায় ছয় জন এবং গন্তব্যস্থল আপাততঃ রাজকোট ষ্টেশন। সেই স্থান হইতে যে-কোন গাড়ীতে তাঁহারা যাইবেন আজমীর। চিকিৎসক একখানি বেঞ্চ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। মায়ের মন কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক হয় নাই; গোপনে সেবককে জিজ্ঞাসা করেন,—ওদের সঙ্গে একই কামরায় যে যাবো, যদি পথে অপমান করে। কিন্তু অবস্থা-বিপাকে শেষপর্যন্ত এক কামরাতেই যাইতে হইল। অবশ্য, অতঃপর

আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নাই, বরং মাতৃবৃন্দের জিনিষপত্রের আধিক্যে অপর পক্ষেরই যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছিল। মা প্রভৃত প্রশংসা করিয়াছিলেন এই চিকিৎসকের সদাশয়তার।

তীর্থভ্রমণের প্রসঙ্গে মা সন্তানদিগকে বলিয়াছেন,—কোন কোন রেলষ্টেশনে এমন হয়েছে যে, গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো, কিন্তু আমাদের মুটেমজুরদের দেখা নেই। আমাদের হাতে রেখে তারা ইত্যবসরে অতিরিক্ত টাকা রোজগারের আশায় অন্য যাত্রীর মোটঘাট নিয়েই ব্যস্ত। এমতাবস্থায় একাধিক স্থানে ভদ্রবংশের ছেলেরা প্ল্যাটফরমে বেড়াতে এসে আমাদের বাক্সে 'সারদেশ্বরী আশ্রম, কলিকাতা' ছাপানো লেবেল দেখেছে, আমাদের সন্ন্যাসিনীর বেশ দেখেছে, লক্ষ্য করেছে আমাদের উদ্বেগ। স্বেচ্ছায় তারা আমাদের ভারী ভারী বাক্সবিছানা গাড়ীতে তুলে দিয়েছে। আমি তাদের প্রাণ-খুলে আশীর্বাদ করেছি, সঙ্গে যা-কিছু থাকতো একটু পেসাদ তাদের হাতে দিয়েছি। ভারী খুশী হয়েছে তারা। দূরদেশের অপরিচিতের প্রতি তাদের এই অযাচিত সেবা ও মমতার স্পর্শ আমার অন্তরকে আনন্দে অভিভূত করেছে। আমার মনে হয়েছে, এসব ছেলেরা আমাদের স্বামিজীর দেশপ্রেমের প্রাণস্পর্শী বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়েছে, সকল ভারতবাসীকে ভালবাসতে শিখেছে, অপরের সেবা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। ছেলেদের মধ্যে এই সুন্দর ভাবটি বজায় থাকলে তাদের মঙ্গল হবে, দেশেরও কল্যাণ হবে।

রাজকোট হইতে আজমীর। সেইস্থান হইতে সাত মাইল দূরে তীর্থরাজ পুষ্কর। পথিমধ্যে মা বিস্তৃত হ্রদ 'আনাসাগর' দেখিলেন। পুষ্করে যাইবার পথ পাহাড়ের মধ্য দিয়া এবং অতিশয় আকর্ষণীয়। পুষ্করকে বলা হয় 'আদি তীর্থ'। এই পবিত্র ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুষ্কর হ্রদের তীরেই ব্রহ্মার মন্দির অবস্থিত। বহু মুনিঋষি এইস্থানে তপস্যা করিয়াছেন। গায়ত্রী পাহাড় দেবীর পীঠস্থান। উঠিবার পথ সুগম সাবিত্রী পাহাড়ের, সুতরাং পাণ্ডাগণ

যাত্রীদিগকে এইস্থান দর্শন করাইয়া থাকেন। ডুলীর সাহায্যে এই পাহাড়েও মা উঠিয়াছিলেন। শেঠজীর মন্দিরও দর্শন করেন।

অতঃপর ইন্দ্রপ্রস্থ—ভারতের বর্তমান রাজধানী দিল্লী, যেখানে মহাভারতের যুগে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন এবং রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দিল্লীতে মা ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখিলেন। যমুনার তীরবর্তী মুঘল বাদশাহদিগের নির্মিত লালকেল্লা এবং ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিত পুরাতন কেল্লা, হুমায়ুন বাদশাহের সমাধিস্থান, ইংরাজ-নির্মিত নূতন দিল্লী দেখিবার পর মা যন্তরমন্তর ও ফিরোজ শাহ কোটলার দুর্গোপরি অশোক-স্তম্ভটি দেখিতেও গিয়াছিলেন।

কুতবমিনারের উচ্চতা প্রায় আড়াইশত ফুট। পৌনে চারিশত সোপান অতিক্রম করিলে তবে ইহার শীর্ষস্থানে আরোহণ করা যায়। পরবর্তিকালে যাঁহারা মাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা সহজ হইবে না যে, তিনি অতগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া এবং বদ্ধ ও অল্পপরিসর স্থানের মধ্য দিয়া কুতবমিনারের শীর্ষদেশে উঠিতে পারিয়াছিলেন। বামদিকের প্রাচীরগাত্রে হাত রাখিয়া ধীর পদক্ষেপে মা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গিগণের নিষেধ কোনমতেই গ্রাহ্য করিলেন না। মিনারটি পাঁচটি তলায় বিভক্ত। মা অতিকষ্টে এক-একটি তলা অতিক্রম করিয়া বারান্দার মুক্ত বাতাসে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করেন, পুনরায় উঠেন। উত্তাপে ও পরিশ্রমে তাঁহার বস্ত্রাদি ঘর্মসিক্ত হইতে লাগিল, তথাপি সংকল্পে অটল থাকিয়া—বিলম্বে হইলেও শেষপর্যন্ত শীর্ষস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমসঙ্গিনীদিগের সহিত তথায় মিলিত হইয়া বিজয়ের আনন্দে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মা বলিলেন, 'আমিও এসেছি।'

অতঃপর হরিদ্বার। গঙ্গাতীরেই মায়ের বাস করিবার ইচ্ছা, তদনুযায়ী প্রথমে সুখবীর সিং ধর্মশালায়, পরে হৃষীকেশ হইতে ফিরিয়া শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরির ধর্মশালায় দুই সপ্তাহ বাস করেন। এই বাসস্থান হইতে চণ্ডিকাদেবীর পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য নয়নগোচর হইত। ভীমগোড়ার মন্দির, মনসা পাহাড়ের

মন্দির, গুরুকুল এবং ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও মা দর্শন করেন। সন্ধ্যাবেলা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বসিয়া তিনি জপ করিতেন, গঙ্গামায়ীর আরাত্রিকের দৃশ্য তাঁহাকে প্রভূত আনন্দ দান করিত। আজিকার হরকী পৈড়ী, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি, ক্লক টাওয়ার এবং গঙ্গার উপরিস্থিত সেতু—তখনও নির্মিত হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দজীর মধ্যম সহোদর শ্রদ্ধেয় পরিব্রাজক মহেন্দ্র নাথ দত্তের পূর্বনির্দেশানুযায়ী হরিদ্বার হইতে এক অপরাহ্ণে সঙ্গিগণ-সহ মা বিল্বকেশ্বর মহাদেব দর্শনে গমন করেন। উক্তস্থানের পাহাড়ের একটি গুহায় সন্ত মথুরাদাস সাধনভজন করিতেন। অনুসন্ধান করিয়া মা তাহাও দেখিলেন। স্থানটি অতি নির্জন, মাতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু স্থানীয় এক ব্যক্তি নিষেধ করিলেন।

সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সকলে রেল-লাইনের পথে পদব্রজে চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখা যায়,—পাহাড়ের মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে,—অর্থাৎ টানেল। কৌতূহলবশতঃ এবং অত্যধিক উৎসাহে তাঁহারা তাহার ভিতর দিয়াই চলিলেন। ভিতরে অন্ধকার, সুতরাং সকলেই বেশ ভীত ও সতর্ক,—এমন সময় দূর হইতে কিসের যেন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইনের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত এবং বিকট ধ্বনিতে টানেল কম্পিত করিয়া একটা রেলগাড়ী একেবারে নিকটে আসিয়া উপস্থিত। সকলের উৎসাহ-কৌতূহল মুহূর্তে আতঙ্কে পরিণত হইল। পলায়নেরও উপায় নাই, দৌড়াইলে বিপদবৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। মা চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'পাহাড়ের গায়ে পিঠ ঠেসে বসে পড় সবাই, কেউ দাঁড়িয়ে থেকো না।'

ভূমিকম্পের মত স্থানটিকে বিকম্পিত করিয়া ক্ষণিকের মধ্যে গাড়ীটা হরিদ্বার ষ্টেশন-অভিমুখে চলিয়া গেল। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু বিপদ তখনও

সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই,—বাহিরে আসিবামাত্রই একজন গাড়োয়ালী সিপাহী উদ্ধতকণ্ঠে প্রশ্ন করে,— তোমরা অন্দরে গেলে কেন ? কার হুকুমে গিয়েছিলে ?

কোমলকণ্ঠে মা মিশ্র-হিন্দীতে বলেন,—বাবা, আমাদের ভেতরে যেতে কেউ বলে নি, নিষেধও করে নি। এখানে কেউ ছিল না।

সিপাহী বলিল,—তোমরা বাঙ্গালী আদমী আছ, আংরেজী জানা আছে। ঐ তো আংরেজী হরফে মানা লিখা আছে, অন্দরে গেলে শাস্তি হবে। গার্ডসাহেব যদি নালিশ করে, আমার নোকরী ছুটে যাবে। তোমরা ষ্টেশনমাষ্টারের কাছে চল।

এইবার সকলে প্রমাদ গণিলেন, ইহার পরেই হয়তো থানা-পুলিস ! মা বলিলেন,—বাবা, আমরা এখানে নতুন এসেছি, তোমাদের আইনকানুন আমরা জানি না। আর কোনদিন এখানে আসব না।

—ঐসব কথা আমি বুঝি না। আপিসে চল।

মা ভরসা দেন,—আমরা সাধুমায়ী বলছি, তোমার নোকরী যাবে না, তোমার ভাল হবে।

মায়ের সুমিষ্ট বচনে সিপাহীটির মেজাজ শেষপর্যন্ত শান্ত হইল। মা সদলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কনখলের সতীকুণ্ডে গিয়া মা সতীদেবীকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানাইলেন। কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেও গিয়াছিলেন।

হরিদ্বারের পরে হৃষীকেশ।

এইস্থানেও মা গঙ্গাতীরস্থিত এক ধর্মশালায় অবস্থান করেন। হৃষীকেশে বাবা কালী কমলীওয়ালার এবং পাঞ্জাবী সত্র দেখিয়া তিনি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এইসকল স্থানে ভজনশীল বহু সাধু এবং অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সেবা হইয়া থাকে। একদিন গঙ্গার অপর তীরে স্বর্গাশ্রমে সাধুদিগের কুটীর দর্শনে গিয়া কোন কোন কুটীরে সাধনরত তপস্বিগণকে দেখিয়া মায়ের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইল। স্থানটি যেমন নির্জন, পরিবেশও তেমন সুন্দর,—তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

হৃষীকেশে মা পাঁচদিন বাস করেন। একদিন বলেন,—চল, আমরা কেদারবদরীর পথটা কিছুদূর দেখে আসি, সারাদিন সেখানে থাকবো। প্রস্তাবটি সকলেই সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন এবং পরদিবস সূর্যোদয়কালেই যাত্রা আরম্ভ হইল। লছমনঝোলা পর্যন্ত গাড়ী, তৎপর পদব্রজে গমন। দ্রব্যাদি লইয়া একজন বাহক চলিল। লছমনঝোলার পরেই যে প্রশস্ত সড়ক তাহার দক্ষিণদিকে স্বর্গাশ্রম ও বহু মন্দির এবং বামদিকে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের পথ। তখনও ওপারে বাসের যাতায়াত প্রবর্তন হয় নাই। বর্তমানে সেখানে একটি সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য সেতু নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু, সেকালে ঐ ঝোলা অর্থাৎ সেতুটির এমন জীর্ণ অবস্থা ছিল যে, একজন মানুষের পদক্ষেপেই উহা আন্দোলিত হইয়া মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিত।

কেদার-বদরীর পথে দুই, তিন অথবা চারি মাইল পরপর অনেকগুলি চটি অর্থাৎ পান্থশালা আছে। তীর্থযাত্রিগণ সাময়িকভাবে ঐ চটিতে বিশ্রাম ও ভোজন করিতে পারেন। দেহের অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় তাঁহারা অগ্রসর হন। ঐ পথে যাইতে যাইতে কয়েক মাইল পর গরুড়-চটি। চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী,—স্থানটি মায়ের মনঃপূত হইল। অপেক্ষাকৃত একটি উচ্চস্থানে বৃক্ষচ্ছায়ায় জিনিষপত্রসহ মা সকলকে লইয়া বসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই ছিল একটি ঝরণা, তাহার নির্মল জলে সকলের শ্রান্তি অপনোদন হইল।

হরিদ্বারের গঙ্গা প্রশস্ত, কিন্তু লছমনঝোলার চড়াইএর দিকে পাহাড়ের প্রস্তরবহুল পথে গঙ্গা অপ্রশস্ত। এই কারণে স্রোতের বেগ উপরের দিকে খরতর। মাতৃগণ গঙ্গার একটি নিরাপদস্থানে স্নান করিলেন। তাহার পর সেবাপূজা সমাপ্ত হইল। প্রত্যাবর্তনের সময় দেখা গেল,—সেই সুন্দর ঝরণাটি সহসা অদৃশ্য! সকলেই বিস্মিত। অনুসন্ধানে জানা গেল—উহার জল অপরাহ্ণে অন্যপথে প্রবাহিত করা হইয়াছে। চাষের সুবিধার জন্য তাহার গতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইয়া থাকে।

সূর্যদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ। কিন্তু তখনও হিমাচলের

অরণ্যানীকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে নাই। লছমনঝোলার দিকে মাতৃবৃন্দ পদব্রজে অগ্রসর হইতেছেন, মধ্যপথে দৃষ্টিগোচর হয়—এক বৃদ্ধা তীর্থযাত্রী। মস্তকোপরি নাতিবৃহৎ পুঁটলি, বামহস্তে জলপাত্র, দক্ষিণহস্তে যষ্টি। ধীর পদক্ষেপে তিনি উচ্চপথে আরোহণ করিতেছেন। নিকটে আসিলে স্পষ্ট দেখা গেল—বৈধব্য বেশ, শুভ্র কেশ, গৌর বর্ণ, লোল চর্ম। কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন বদনমণ্ডলে অভীষ্টসিদ্ধির—আত্মপ্রত্যয়ের প্রকাশ। সকলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ, যেন তাঁহার অন্তরের এক স্বর্গীয় মাধুর্য সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেছে।

দর্শনমাত্র মনে হয়—বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি কত সুন্দর! আর, যেন কত আপনার জন! তাঁহার জন্য সকলের কত ভাবনা, কত দুশ্চিন্তা! নিকটে কোন সঙ্গী বা তীর্থযাত্রীকে দেখা যাইতেছে না। এমন সুদীর্ঘ পথ—ইনি একাকিনী! চারিদিকের অরণ্য ক্রমশঃই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতেছে। কাহার ভরসায় ইনি অগ্রসর হইতেছেন এইরূপ নিশ্চিন্তমনে!

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জনৈক সঙ্গীকে মা বলেন,— দেখতে পাচ্ছ?

—দেখছি তো।

— কি বুঝছ?

—মনে হচ্ছে, ইনি মানুষ নন, দেবী ধূমাবতী।

—ঠিকই বলেছ। আমার আরও কি মনে হচ্ছে, জান? আমি যে ওঁর আদ্দেক বয়সে বছরের পর বছর কেদার-বদরী যাবার কেবল আলোচনাই করে চলেছি, যেতে আর পারছি না। এতটা কাছে এসেও আর অগ্রসর হতে ভরসা পেলাম না, তারই জীবন্ত প্রত্যুত্তর এই বৃদ্ধা। ইনি আশ্বাস দিচ্ছেন—আমি যদি যেতে পারি, তুইও পারবি। ভগবানে বিশ্বাস রেখে চলে আয়।

যখন পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতেছেন, মা বলেন,— 'ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করে বিঘ্ন করো না।' বিপরীতপথগামী মাতৃকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধা মৃদু হাস্য করিলেন। অতি

মিষ্ট হাসি, কিন্তু তিনিও বাক্যব্যয় করিলেন না, ক্ষণিকের জন্যও গতি মন্থর করিলেন না। মাতৃবৃন্দ সকলে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে—এই দেবী-মানবীর প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণজীকে দর্শন করিবার অভিলাষ বহু পূর্ব হইতেই মায়ের প্রবল ছিল, কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা, বিশেষতঃ হৃদ্‌রোগের জন্য হিমালয়ের শিরোদেশে অবস্থিত তীর্থদর্শনে যাইতে গৌরীমা নিরুৎসাহ করিতেন। অতি উচ্চস্থানে ডুলী বা ডাণ্ডীর সাহায্যে যাইতেও চিকিৎসকের আপত্তি ছিল।

গৌরীমার নিষেধাজ্ঞা লোকমাধ্যমে পুনরায় গিয়া উপস্থিত হইল হৃষীকেশেও। তাঁহার দুই দীক্ষিত সন্তান—রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ রায় এবং জহরলাল ঘোষ এইসময়ে হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রখ্যাত চিকিৎসক ক্ষেত্রনাথ রায়ও ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গী। দুর্গামাতার তীর্থপরিক্রমার সঠিক নির্ঘণ্ট তাঁহাদের জানা ছিল না, অকস্মাৎ হৃষীকেশের পথে সাক্ষাৎ। উভয় পক্ষেরই পরম আনন্দ। গঙ্গাতীরে লক্ষ্মণদাস জাঠিয়ার ধর্মশালায় তাঁহারা মায়ের নিকট বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। উভয়তই তীর্থপরিক্রমার অনেক প্রসঙ্গ চলিল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা দুর্গামাকে জানাইলেন, 'মা (গৌরীমা) বলে দিয়েছেন আপনাকে বলার জন্য যে,—এবার হিমালয়ে খুবই দুর্যোগ, ঝড়তুফানের উৎপাত, জায়গায় জায়গায় পাহাড় ধ্বসে পড়ছে। আপনারা এ যাত্রায় কেদার-বদরী যাবেন না, শীগ্যির শীগ্যির কলকাতায় ফিরে চলুন, এটাই মার ইচ্ছে। মা খুব চিন্তায় আছেন আপনার জন্য।'

হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বারে, হৃষীকেশে এইপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংবাদ জানা গেল না, অথচ কলিকাতায় বসিয়া গৌরীমা এমন দুঃসংবাদ কিভাবে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

প্রকৃত অবস্থা হয়তো ইহাই যে, দুর্গামাকে গৌরীমা আশৈশব লালনপালন করিয়াছেন, গত দেড়মাসের অনিয়মিত আহার, বিশ্রামের অভাব, অত্যধিক গ্রীষ্মে ও শারীরিক পরিশ্রমে হয়তো তাঁহার কত কষ্ট হইতেছে, এবম্বিধ চিন্তায় গৌরীমার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সুতরাং তিনি যে অনতিবিলম্বে কন্যার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরে কিন্তু জানা গেল, গৌরীমার অনুমানই সত্য, ঐ বৎসর কেদারনাথের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।

হৃষীকেশ হইতে হরিদ্বারে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক সপ্তাহ বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মা দেরাদুন গমন করেন। এইস্থানে আর ধর্ম-শালায় নহে, ষ্টেশনের নিকট গুরুদোয়ারায় সদাশয় মোহন্ত মায়ের জন্য দুইখানি কক্ষের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্থানটি উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত, চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী মনোরম। অসংখ্য ইউকেলিপটাস বৃক্ষ হইতে সর্বদা সুগন্ধ ভাসিয়া আসিত। কিন্তু দেরাদুনেও বিশ্রাম ভোগ হইল না। মা টপকেশ্বর মহাদেব, রবার্স কেভ, কাগজের কল এবং ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট দেখিলেন। চৌদ্দ মাইল দূরে সাতহাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত মুসৌরী শৈলনগরীতেও মা একদিন গিয়াছিলেন।

মুসৌরী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মধ্যপথে রাজপুরের অনতিদূরে সহস্রধারা পাহাড়। আভ্যন্তরীণ কোন ঝরণা হইতে পাহাড়ের চতুর্দিকে সহস্রধারায় সর্বক্ষণ অল্প অল্প জল ঝরিতেছে। পাদদেশে উন্মুক্তস্থানে শিবমন্দিরের চত্বরে মা গিয়া উপবেশন করিলেন। নিকটেই গুহার ন্যায় একটি প্রশস্ত স্থান। উপরদিকে একখানি পাথর স্থানটিকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। বহির্দেশের উচ্চতাও মন্দ নহে, ভিতরে হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। মায়ের এক সন্তান সেইভাবে ভিতরে গিয়া বসিলেন, কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সেই স্থান হইতে ব্যস্তভাবে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

তাঁহার গতিবিধিতে মায়ের সন্দেহ হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হলো তোমার? অমনভাবে বেরিয়ে এলে কেন?

—কি হলো জানেন ? আপনারা তো এত কাছে বসে আছেন, তবু ওখানে আমার ভয় হচ্ছিল, কে যেন ঠেলা দিল। আর বসে থাকতে পারলুম না, ভয়ে গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে।

—তা হতে পারে। তুমি যেখানে গিয়ে বসেছিলে, ওখানটায় হয়তো কোন সাধু বসে সাধনভজন করেন। সাধুদের জপের নির্দিষ্টস্থানে অন্য কেউ বসে, এটা তাঁদের পছন্দ নয়।

দেরাদুনের পর গোমতীতীরে লক্ষ্ণৌ সহরে মা একদিন মাত্র বাস করেন। আশ্রমহিতৈষী রায়সাহেব শচীন্দ্রনাথ সিংহের এক ভ্রাতা তখন তথায় কাগজের কলের ম্যানেজার ছিলেন। দুর্গামাকে অকস্মাৎ তাঁহাদিগের গৃহে সমাগত দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার পত্নী যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন।

স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দর্শনে গিয়া তথায় এক ভক্তের সহিত মায়ের পরিচয় হয়। তিনি শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর কলিকাতায় অবস্থানকালে গৌরীমা ও দুর্গামার দর্শনে প্রায়শঃ আশ্রমে আসিতেন।

লক্ষ্ণৌর তসবীরখানা, রেসিডেন্সী, বেলী গার্ড গেট প্রভৃতি মা দেখিলেন। পরবর্তী কালে মা বলিয়াছিলেন,—বিদেশী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সংকল্পে সিপাহীবিদ্রোহের প্রচণ্ড আগুন যখন দিকে দিকে জ্বলে উঠেছিল, তখন ইংরেজদের হত্যা করার জন্যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চলেছিল। তার চিহ্ন লক্ষ্ণৌতে এখনো স্থানে স্থানে দেখা যায়।

লক্ষ্ণৌ হইতে মা আসেন প্রয়াগতীর্থে। বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল গোকুলদাস তেজপাল ধর্মশালায়। যমুনার জলে নিয়মিত স্নান করিয়া মা তৃপ্তিবোধ করিতেন। ত্রিবেণী সঙ্গমেও স্নান করিলেন। অক্ষয় বট, অশোক স্তম্ভ, ঝুসিমঠ, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম প্রভৃতিও মায়ের দর্শন হয়।

এই পরিক্রমায় সর্বশেষ তীর্থ গয়াধাম। 'গয়া গঙ্গা গদাধর হরি।' বিদেহীর পারলৌকিক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি গয়াধামে। এই কারণ

ব্যতীতও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর অন্তরে গয়াধাম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তদীয় পিতৃদেব ধর্মনিষ্ঠ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গয়াধামে আসিয়াছিলেন তীর্থদর্শন-মানসে। রাত্রে তিনি এক দিব্যস্বপ্ন দর্শন করেন,—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীনারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "আমি পুত্ররূপে তোর ঘরে যাব।" বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আবিষ্ট ব্রাহ্মণ দেবতার এইরূপ অহেতুকী করুণার কথা চিন্তা করিয়া সেইদিন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন।

পরবর্তী বসন্তকালে সত্যই শ্রীনারায়ণ সেই ভক্ত ব্রাহ্মণের কুটীর উজ্জ্বল করিয়া আবির্ভূত হইলেন। গয়াতীর্থে দেব গদাধরের করুণার কথা স্মরণ করিয়া পিতা পুত্রের নাম রাখিলেন 'গদাধর'। বিশ্ববাসী তাঁহাকে জানেন—যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের প্রেমাবতার 'শ্রীরামকৃষ্ণ'।

ভাবাবেশে দুর্গামা বলিয়াছিলেন, "গয়াধামের গদাধর জীবের কল্যাণে আমাদের অতি কাছে নরদেহে এসেছিলেন। গয়াতীর্থের কাছে আমরা ঋণী, ঋণী সারা বিশ্ব।"

বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণামকালে মা শ্রীবিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্রের সহিত "অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ"—মন্ত্রটিও উচ্চারণ করেন।

গয়াধামের অক্ষয়বটকে প্রণাম জানাইয়া মা ফল্গুনদীর পুণ্যবারি স্পর্শ করেন। রামশিলা, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি নিকটস্থ কয়েকটি পাহাড়েও যাওয়া হইল। সাতমাইল দূরবর্তী বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ বুদ্ধগয়াও মায়ের দর্শন হয়।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শনান্তে আষাঢ় মাসের তৃতীয় দিবসে দুর্গামা কলিকাতার আশ্রমভবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীদামোদরলাল, শ্রীমাতার পট ও গৌরীমাকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ জানাইলেন। গৌরীমা তাঁহাকে অনেক আদর করিলেন, আশীর্বাদ করিলেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর কন্যাকে নিকটে পাইয়া স্নেহময়ী মাতা পরম নিশ্চিন্ত এবং উৎফুল্ল হইলেন।

নবদ্বীপধাম ও ক্ষেত্রধামে

গৌরীমাতার স্নেহভাজন সন্তান নগেন্দ্রনাথ রায় ইতিমধ্যে তাঁহার গুরুমাতার বাসের জন্য নবদ্বীপধামে দুই বিঘা ভূমির উপর একখানি ইষ্টকনির্মিত গৃহ করিয়া দিয়াছেন। স্থানটি নবদ্বীপ সহরের উপকণ্ঠে, গঙ্গাতীরে অবস্থিত; রাণী রাসমণির জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া নাম 'রাণীর চড়া'। উক্ত স্থানে তখন জনবসতি ছিল বিরল। এই ভূমি ক্রয়কালে নগেন্দ্রনাথ এবং গৌরীমাতা উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, উহা দুর্গামাতার নামে ক্রয় করা হয়। কিন্তু দুর্গামা কোনমতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তিনি নগেন্দ্রনাথকে বলেন, 'আপনি ভূমিদান করুন আপনার গুরুমাতাকেই।' অগত্যা তাহাই করিতে হইল। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই গৌরীমা দলিল সম্পাদন করিয়া উক্ত ভূমি দুর্গামাতার নামে হস্তান্তর করেন।

এইসময় হইতে দুর্গামা প্রায় প্রতিবৎসর স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে গৌরীমাকে পুরীতে এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রিয়স্থান নবদ্বীপের এই বাসগৃহেও পাঠাইতেন। কিন্তু বৃদ্ধা মাতাকে দূরে পাঠাইয়াও কন্যা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিয়মিত সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন।

মাতৃদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণকে হেতু করিয়া পুরীতে বাসকালে একবার এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে।—গৌরীমা পুরীতীর্থে গমন করিয়াছেন, একমাস তথায় অবস্থান করিবেন। কিন্তু কয়েকদিবস পরেই সহসা তিনি বলেন, 'দুর্গার শরীর বড্ড খারাপ, আমি আজই কলকাতা চলে যাব।' সেইদিনই তিনি পুরীত্যাগ করেন। কিন্তু, কলিকাতায় ফিরিয়া দেখেন, দুর্গামা অনুপস্থিত। কিছুদিন যাবৎ গৌরীমার কোন সংবাদ না পাইয়া মা চিন্তিতমনে পূর্বরাত্রেই পুরী চলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, এই সংবাদ মা পূর্বেই তারযোগে গৌরীমাকে জানাইয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার হস্তগতও

হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই সংবাদের বিষয়টি স্বয়ং খুলিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই বা সহযাত্রীদিগকে ইহা জানান নাই ; কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল যে, তারবার্তার অর্থই কোন অশুভ সংবাদ, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা দুর্গামাতা সম্পর্কেই। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌরীমা ব্যাপারটি সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন এবং অনুশোচনার সহিত তখন বলেন, 'আমি আজই আবার পুরী যাব।' আশ্রমবাসিনী কন্যাগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

অপরদিকে, দুর্গামা পুরী গিয়া যখন দেখেন যে, তাঁহার জন্য কেহই ষ্টেশনে উপস্থিত নাই, তখনই তাঁহার মনে নানাপ্রকার উদ্বেগের সঞ্চার হয়। গৌরীমার ভাড়াবাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাটী জনমানবশূন্য। তাঁহার মন তখন আতঙ্কিত হইল, সহসা মায়ের শরীর অসুস্থ হয় নাই তো! জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সেই সন্ধ্যাতেই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। পরদিবস প্রত্যূষে—দুর্গামার প্রত্যাগমনে উভয়ের সাক্ষাতে যত-বা দুঃখ, তত-বা আনন্দ! অন্তরালে আশ্রমকন্যকাদিগের মধ্যে তখন উচ্ছল হাস্যরোল।

আর একবারের ঘটনা। গৌরীমা নবদ্বীপ যাইবেন। ধীরে-সুস্থে দামোদরলাল এবং পূজাভোগের দ্রব্যাদি গুছাইয়া তিনি ষ্টেশনে যাইয়া শুনিলেন নবদ্বীপের গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তিনি আর আশ্রমে ফিরিলেন না, পরবর্তী গাড়ীর অপেক্ষায় ষ্টেশনেই বসিয়া রহিলেন। এই অবসরে যাঁহারা তাঁহাকে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সন্তান আশ্রমে আসিয়া মাকে এই সংবাদ দিলেন। মা তৎক্ষণাৎ ছুটিলেন হাওড়ায়। বহু মিনতি করিয়া গৌরীমাকে আশ্রমে ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহার সংকল্পে তিনি অটল। পরবর্তী গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগ করিলে মা ফিরিলেন ; অবশ্য, ইতিমধ্যে গৌরীমাকে তিনি কিছু ভোজন করাইয়া আসিলেন।

নবদ্বীপে বাসকালে একবার অনবধানতাবশতঃ তক্তপোষ হইতে নামিবার সময় গৌরীমা পড়িয়া গিয়াছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র

জনৈক চিকিৎসকসহ মা তথায় গিয়া উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে গৌরীমার দেহে গুরুতর আঘাত লাগে নাই। আর একবার বালিকাগণসহ পূজাবকাশে মা মধুপুরে গিয়াছিলেন। গৌরীমা ছিলেন কলিকাতায়। মায়ের নিকট সংবাদ পৌঁছিল—গৌরীমা অসুস্থ। অবিলম্বে মা কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসাদ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিলেন।

আবার, স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে দুর্গামা অন্যত্র কোথাও গেলে গৌরীমা কখন কখনও অকস্মাৎ সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। মাতা কন্যায় দুই-চারি দিবস একত্রে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে যে-কেহ একজন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেন।

দুর্গামাও মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে গিয়া বাস করিতেন। তথায় নিত্য গঙ্গাস্নান এবং কন্যাদিগের সহিত গঙ্গাবক্ষে নৌকাভ্রমণ ছিল তাঁহার অতিশয় প্রিয়। ভক্ত জহরলাল ঘোষ প্রাণস্পর্শী কীর্তন গাহিয়া সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন। কখনও অবকাশসময়ে নগেন্দ্রনাথও আসিয়া এই আনন্দে যোগ দিতেন। তিনি দুর্গামাতা অপেক্ষা বয়সে ছিলেন প্রবীণ। স্বভাবতঃ অতিশয় গম্ভীর এবং পদমর্যাদায় জিলা-শাসক। দুর্গামা তাঁহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। কিন্তু ইদানীং সন্ন্যাসিনীমাতার এইরূপ সম্মানপ্রদর্শনে নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেন, বিশেষতঃ তাঁহারই সমবয়স্ক বন্ধু জহরলালকে মা নাম ধরিয়াই ডাকেন। অবশেষে তিনি গৌরীমার নিকট আবেদন জানাইলেন,—ছোটমা যেন তাঁহাকেও নাম ধরিয়া ডাকেন। গৌরীমার নির্দেশে তদবধি দুর্গামা তাঁহাকে 'নগেনবাবা' বলিয়া ডাকিতেন। অচিরেই মাতাপুত্রের সম্বন্ধ এইরূপ হইল যে, মায়ের নিকট তিনি তাঁহার পারিবারিক বহু সমস্যাও ব্যক্ত করিয়া নির্দেশ প্রার্থনা করিতেন, যেমন মাতৃভক্ত সন্তান করেন স্বীয় জননীর নিকট। দুর্গামাতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি গুরুভক্তি অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন ছিল না।

গৌরীমা সন্তরণবিদ্যায় ছিলেন অনভিজ্ঞ। দুর্গামাকেও তিনি এইবিষয়ে শিক্ষার সুযোগ ও অনুমতি দান করেন নাই। নদীপথের যাত্রায় উভয়েরই ছিল মহা আতঙ্ক। নবদ্বীপে একবার অল্পবয়স্কা আশ্রমবালিকাদিগের সন্তরণশিক্ষা দেখিয়া উহা আয়ত্ত করিতে মায়ের আগ্রহ হয়। তাহাদের সহিত অনুশীলন করিতে করিতে মা ইহা শীঘ্রই আয়ত্ত করিলেন। তখন গঙ্গায় সন্তরণে মায়ের কী আনন্দ!

ঝুলনযাত্রার সাড়ম্বর অনুষ্ঠান দর্শনোদ্দেশ্যে মা একবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, সঙ্গে কতিপয় আশ্রমবাসিনী এবং একজন সেবক। কিন্তু, তথায় পৌঁছিয়া দেখা গেল,—রাণীর চড়া বন্যার জলে প্লাবিত। আশ্রমবাটীর অভ্যন্তরেও আজানু জল। স্নানাগারে যাইতে হইলে জল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তদুপরি সর্পভয়ও আছে। সকলেরই মনে হইল, মা এইরূপ অবস্থায় নবদ্বীপে থাকিবেন না। ইতিমধ্যে সন্তানটি কলাগাছের একটি ভেলা প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ মা ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দাও তো আমায় একবার, আমি ওটা চালাতে পারি কি-না দেখি।' মায়ের দেহ স্থূল, কিন্তু ধীরতার সহিত ভেলার উপরে উঠিলেন এবং নাতিদীর্ঘ একটি বংশদণ্ডের সাহায্যে স্বচ্ছন্দে উহা চালাইলেন। বলা বাহুল্য, মা কলিকাতায় ফিরিলেন না। প্রতিদিন নৌকার সাহায্যে সহরে গিয়া বিভিন্ন দেবালয়ে ঝুলনের বিশেষসজ্জামণ্ডিত দেবদর্শন, কোথাও-বা ভাবমধুর কীর্তন শ্রবণে যাইতেন। 'শেষঝুলন' দর্শনান্তে মা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। যে-কোনপ্রকার পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্যবিধানের এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল দুর্গামার।

এইসময়ে মা প্রায়শঃ পুরীতীর্থে গমন করিতেন। জগন্নাথদর্শনে মায়ের যেরূপ আনন্দ হইত, তাহা অন্য তীর্থে দেখা যাইত না। পূর্বে তিনি সারদামাতা ও গৌরীমাতার সহিত তথায় গিয়াছেন। এখন গৌরীমার অনুমতিতে তিনি দুই-চারিটি আশ্রমবালিকা এবং সন্তানসহ পুরীধামে চলিয়া যাইতেন।

পুরীতে মা বাটীভাড়া করিয়া থাকিতেন। পরবর্তিকালে তিনি বালিগঞ্জনিবাসী ভক্ত গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষের সমুদ্রতীরস্থ 'সিন্ধু নিবাসে' অনেকবার বাস করিয়াছেন। গোবিন্দপ্রসাদের পিতা ললিতমোহন এবং মাতা রাধারাণী দেবী উভয়েই গৌরীমা ও দুর্গামার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। আশ্রমকে তাঁহারা যথেষ্ট অর্থসাহায্যও করিয়াছেন। রাধারাণী দেবী কিছুকাল আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যাও ছিলেন।

ইতিপূর্বে জলভীতির কারণে মা কখনও সমুদ্রস্নানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। একবার তিনি অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হন। কোনপ্রকার চিকিৎসাতেই আরোগ্যলাভ না করায় মা পুরীধামে গমন করিলেন এবং সমুদ্রস্নানে উপকার বোধ করেন। সেইসময় হইতেই সমুদ্রস্নানে মা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

পুরীতে মায়ের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত জগন্নাথ প্রভুর অনুধ্যানে। প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়াই মা যাইতেন শ্রীমন্দিরে। সিংহদ্বারে পতিতপাবনকে প্রণামের পর মূল মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইতেন। যতক্ষণ মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত না হইত, সেইস্থানে একাগ্রচিত্তে বসিয়া জপ করিতেন। যথাসময়ে পাণ্ডাজী অথবা তাঁহার ছড়িদারগণ আসিয়া যত্নসহকারে মাকে লইয়া যাইতেন মন্দিরাভ্যন্তরে। তথায় প্রভুর মঙ্গলারতি এবং পরে অবকাশ— এই দুইটি কৃত্য মা দর্শন করিতেন। মণিকোঠায় তিনি সাধারণতঃ উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাচীরপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতেন। সেইস্থান হইতে চলিত দর্শন— অপলক দর্শন,—পিপাসার যেন পরিতৃপ্তি নাই। সঙ্গিগণ ক্লান্ত, কিন্তু মায়ের কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকিত না। দর্শনার্থীদের যাতায়াত যখন সমাপ্তপ্রায়, প্রহরিগণ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন,—মা, এইবার বাহিরে যাইতে হইবে। বাধ্য হইয়া মাকে তখন সেই স্থান ত্যাগ করিতে হইত। প্রস্থানের পূর্বে দেবতা-ত্রয়ের সম্মুখে রত্নবেদীতে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদনান্তে একবার করিয়া তাঁহাদের মুখারবিন্দ দর্শন করিতেন। সোপানাবলী অতিক্রম-

কালে এবং 'কাঠগড়া'র নিকট দাঁড়াইয়াও পুনঃ চলিত এই দর্শন। মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদনের পর মা যাইতেন শ্রীবিমলা দেবী, শ্রীলক্ষ্মীমাতা, মহাবীর, গণেশজী ও সত্যনারায়ণ-প্রমুখ দেবদেবীর মন্দিরে। প্রত্যেক মন্দিরেই প্রবেশের পূর্বে প্রদীপ, পুষ্পমাল্য ক্রয় করিয়া মাল্যটি পুরোহিতের হস্তে প্রদানপূর্বক প্রদীপের আলোকে আরাত্রিক করিতেন মা স্বয়ং। লক্ষ্মীমাতার পূজার আয়োজন হইত সর্বাপেক্ষা অধিক সমারোহপূর্ণ। কখন কখন ষোড়শোপচারে মা তাঁহার অর্চনা করিতেন। মূল্যবান বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি সহযোগেও মা তাঁহার ও বিমলাদেবীর পূজা বহুবার করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবীর নাটমন্দিরে বসিয়া মা জপ করিতেন এবং সঙ্গীয় সকলকেই সেই সময় ইষ্টনাম স্মরণের নির্দেশ দিতেন। এই দেবীর প্রতি মায়ের ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ।

প্রভু জগন্নাথ, বলরাম এবং মাতা সুভদ্রা—এই দেবতাত্রয়কেও মা বহুবার বহুমূল্য পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। কখনও-বা বাজার হইতে ক্রীত চাউল, ডাইল, ঘৃত, তরিতরকারী ইত্যাদি সহযোগে মন্দিরের সূপকারদ্বারা পৃথকভাবে বিবিধ রুচিকর ভোজ্য রন্ধন করাইয়া দেবতার নিকট ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীমন্দিরের শীর্ষদেশে ধ্বজাস্থাপনে ছিল মায়ের মহা-আনন্দ। মন্দিরের চত্বরে বসিয়া উত্তুঙ্গস্থানে ধ্বজাবাহীর ধীর সতর্ক আরোহণ এবং অবরোহণ সশঙ্কচিত্তে মা লক্ষ্য করিতেন। আবার, কোনদিন পশ্চিমদ্বারের পার্শ্বে পুষ্পোদ্যানে মালিনীদিগের মাল্যরচনা দেখিয়া বলিতেন, 'ওরা কি ভাগ্যবতী, ভগবানের সেবা নিয়ে পড়ে আছে!'

পশ্চিমদ্বারে অবস্থিত মহাবীরের প্রতি মায়ের ছিল বিশেষ আকর্ষণ। কোন কোন দিবসে তিনি অষ্টোত্তর শত অথবা সহস্র রামনাম-লিখিত সচন্দন তুলসীপত্র তাঁহার দেহে 'লাগি' করাইতেন। খৈ, মুড়কী, কলাসহ তাঁহার ভোজ্যও নিবেদন করা হইত। ব্রহ্মচর্যকে যাঁহারা জীবনের ব্রতরূপে বরণ করিয়াছেন, সেইসকল সন্তান এবং

কন্যাকে মা মহাবীরের নিকট ব্রতরক্ষার জন্য সভক্তি প্রার্থনা জানাইতে উপদেশ দিতেন।

শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পুরীধামে উপস্থিত থাকিলে মা সত্যভামার মন্দিরে অবস্থিতা সরস্বতীদেবীকে পূজা করিতেন। অক্ষয়বটের নিকটস্থ গণেশজীকেও মা অর্চনা করিতেন সোপচারে।

প্রাতঃকালে জগন্নাথজীকে দর্শনের পর বিভিন্ন দিবসে সন্তানগণকে লইয়া মা শঙ্করমঠ, হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান, গম্ভীরা, গুণ্ডিচামন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, আঠারনালা, লোকনাথ, টোটা গোপীনাথ প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনেও যাইতেন। ইতিমধ্যে শ্রীমন্দিরে রাজভোগ সম্পন্ন হইলে স্নানবেদীর পার্শ্বস্থিত আনন্দবাজারে বসিয়াই মা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আনন্দবাজারে প্রবেশপথে পতিত প্রসাদকণা তিনি ভক্তিভরে তুলিয়া লইতেন। মহাপ্রসাদের মধ্যে সাধারণতঃ আদা-হিং-মিশ্রিত খিচুড়ী, অড়হর ডাল, কান্তিপিঠা, শাকভাজা ও বড়াভাজা ছিল মায়ের প্রিয়। প্রসাদ গ্রহণের পর মা বিশ্রাম করিতেন লক্ষ্মীদেবীর নাটমন্দিরে। কোন কোন দিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত তাঁহার অতিবাহিত হইত শ্রীমন্দিরেই। পুনরায় প্রভুর দর্শনের পর মা যাইতেন সমুদ্রতীরে, সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিতেন বাসস্থানে।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ তিথিতে জগন্নাথদেব নানাপ্রকার আড়ম্বরপূর্ণ মনোহর বেশ ধারণ করেন। তন্মধ্যে স্বর্ণ-নির্মিত হস্তপদ, মুকুট ও বহুমূল্য কণ্ঠাভরণ-শোভিত তাঁহার রাজবেশ, গজোদ্ধারণ বেশ, গণেশ বেশ, পদ্মধারী বেশ দর্শনে মা অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। কিন্তু মায়ের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল প্রভুর নিরাভরণ অবকাশ বেশ। ষড়ৈশ্বর্যশালী রাজাধিরাজ অতিসাধারণ একখানি সূতিবস্ত্র পরিধান করিয়া তখন মুখপ্রক্ষালন, স্নানাদি প্রাতঃকালীন নিত্যকর্মে রত। পুরীতীর্থে শ্রীমন্দিরেই একবার সারদামাতাও মাকে জগন্নাথদেবের এই নিরাভরণ অবকাশ বেশকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখিতে বলিয়াছিলেন।

আশ্রমের প্রসার

স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যেই আশ্রমের কর্মপরিধি বহুল প্রসার লাভ করে। পত্রিকায় বিবরণাদি প্রকাশ, অর্থসাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন এবং মাতৃদ্বয়ের বহুস্থানে যাতায়াতের ফলে আশ্রম ক্রমশঃ কলিকাতা তথা বাংলাদেশে পরিচিত এবং জনপ্রিয় হইয়া উঠে। প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অন্তেবাসিনী সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আশ্রমের জনহিতকর কর্মানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন ইহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুর একবার কলিকাতায় আসিয়া স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিতরণের জন্য বাংলার গভর্ণরের তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করেন। আশ্রম অযাচিতভাবেই সরকারী-নির্বাচনে অন্যতম সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানরূপে তাহার কিয়দংশ লাভ করে। আশ্রমের নানাবিধ উন্নতিকল্পে তখনও আরও অর্থের প্রয়োজন। ম্যাডান থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় উত্তর-কলিকাতায় ক্রাউন সিনেমা-গৃহে দুইবার সাহায্য-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। এই সম্পর্কে পরম উৎসাহী বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ হাইকোর্টে এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গের নিকট বহু টিকেট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করেন। দুর্গামা এবং কতিপয় সহযোগীও গৃহে গৃহে গিয়া টিকেট বিক্রয় করিয়াছিলেন।

এযাবৎ আশ্রমে বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। কেরোসিনের আলোকে রাত্রের পঠনপাঠন ও রন্ধনাদির কার্য চলিত। সদাশয়া পূর্ণশশী দাসী বৈদ্যুতিক আলোর ব্যয়ভার বহন করিয়া আশ্রমের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্তে অধিকসংখ্যক ছাত্রী বহনোপযোগী একখানি মোটর বাসের প্রয়োজন মাতৃবৃন্দ অনুভব

করিতেছিলেন। কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে ১৩৩৬ সালে একখানি মোটরবাসও ক্রয় করা সম্ভব হয়।

আশ্রমে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি, অন্তেবাসিনী শিক্ষার্থিনীদিগের জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং মাতৃদ্বয়ের মহান্ ব্রত ও উচ্চভাবে আকৃষ্ট হইয়া বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি স্থান হইতে কোন কোন ভক্ত বিভিন্নসময়ে দুর্গামাকে তাঁহাদিগের অঞ্চলে আশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ জানাইতে থাকেন। শাখা-আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, গৃহ এবং অর্থাদি সাহায্যের আশ্বাসও তাঁহারা দেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পুরুষদিগের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অপেক্ষাকৃত সহজ, সেই অনুপাতে নারীপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অন্তরায় অধিকতর জটিল। অধিকন্তু, আশ্রমের প্রাপ্তবয়স্কা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্না সন্ন্যাসিনীর সংখ্যার অল্পতাহেতু দূরদৃষ্টিসম্পন্না দুর্গামার পক্ষে ঐ সকল অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এইপ্রসঙ্গে মা বলিতেন, 'বন রক্ষেয় শিশির, শিশির রক্ষেয় বন।' অর্থাৎ—সংঘকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন ব্রতধারী সেবকসেবিকার প্রয়োজন, তেমন সেবকসেবিকাকে রক্ষা করিবার জন্যও সংঘের প্রয়োজন। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়ই উভয়কে রক্ষা করে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করিয়াও আশ্রমের বহুল প্রচার হয়। তাঁহার জীবিতকালে গৌরীমা ও দুর্গামা বস্ত্রমাল্যভোজ্যাদিসহ মাতৃভবনে গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবে অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর হইতে প্রতিবৎসর আশ্রমে এই শুভতিথিটি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। এই উৎসবের সমারোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং আশ্রম স্বগৃহে স্থানান্তরিত হইবার পর শ্রীমন্দিরে মায়ের পূজা, ও আশ্রম-পার্শ্ববর্তী উত্তর দিকে অবস্থিত প্রশস্ত উন্মুক্ত ভূমিতে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। স্থানীয় ও বহিরাগত ভক্তবৃন্দ, ছাত্রীগণের আত্মীয়স্বজন এবং অন্য বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদানপূর্বক উৎসবক্ষেত্রকে আনন্দমুখরিত করেন।

মাতৃদ্বয় ছিলেন প্রধানতঃ প্রাচীনপন্থী। শিক্ষার্থিনীদিগের চরিত্র-গঠনের বিষয়ে তাঁহাদের আদর্শও তদনুরূপ। তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণই অধ্যাপনা করেন, এই কারণে রক্ষণশীল পরিবারের বহু কন্যা এই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে আসেন। প্রখ্যাত সলিসিটর ও জননেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের এক কন্যার শিক্ষা-প্রসঙ্গে তাহার পিতামহী বলিয়াছিলেন, 'মেয়েদের যদি ইস্কুলে যেতেই হয়, তবে একমাত্র গৌরীমার ইস্কুল। নইলে আর কোথাও নয়।' অবশ্য, আরও অনেক অভিভাবক এইরূপ মত পোষণ করিতেন।

বহিরাগত শিক্ষার্থিনীদিগের প্রতি আশ্রমের শিক্ষয়িত্রীদিগের স্নেহযত্নের সুখ্যাতি করিয়া এক পত্রে প্রথিতযশা সাহিত্যিক উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দুর্গামাতাকে লিখিয়াছিলেন, "আশ্রমের শিক্ষয়িত্রীগণের প্রতি ছাত্রীগণের মনোভাব সম্পর্কে একটি কথা বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে। আমার তিনটি কন্যা·· আশ্রমে অধ্যয়ন করে। কিছুদিন পূর্বে একবার আমার বাসা পরিবর্তন করিবার কথা উঠিয়াছিল। তাহাতে আমার কন্যারা বিশেষ চিন্তিত হইয়া আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে যে, নূতন বাসা যেন সারদেশ্বরী আশ্রমের বাস্-এলাকার বাহিরে কিছুতে লওয়া না হয়, পাছে তাহাদের বাধ্য হইয়া সারদেশ্বরী আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হয়। যত্ন এবং ভালবাসার গুণে আপনারা যে আমার কন্যাগুলিকে বশীভূত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ সর্বদাই পাই।"

আশ্রমের আদর্শনিষ্ঠা এবং শিক্ষার সার্থকতার বিষয়ে তিনি উক্ত পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন, "আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহার একটি কন্যার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সারদেশ্বরী আশ্রমে শিক্ষার ফলে তাঁহার কন্যার চিত্ত এবং প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি শ্বশুর-গৃহের অপরিসীম নির্যাতন কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"*

* ইহা তিনি একখানি মাসিক পত্রিকাতেও অন্যপ্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

আশ্রমবাসিনী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের মধ্যে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ ক্রমশঃ একটি উৎসবে পরিণত হয়। ছাত্রীগণ এতদুপলক্ষে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়াদি করেন। ইহা কেবল মহিলাদিগের মধ্যে সীমিত থাকায় সমাজের বিশিষ্ট পরিবারের বহু মহিলা ইহাতে যোগদান করেন। এইরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে হেতু করিয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী যোগমায়া দেবী, স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী বসন্তকুমারী দেবী, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী, বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জননী, নাটোরের মহারাণী, নদীয়ার মহারাণী, দীঘাপতিয়ার মহারাণী, সুসঙ্গের রাণী এবং আরও অনেকে আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেন। সুসাহিত্যিকা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, সরলাবালা সরকার, প্রভাময়ী মিত্র-প্রমুখ বিদুষী মহিলাবৃন্দ আশ্রমের সংস্পর্শে আসিয়া আনন্দলাভ করেন।

নিরুপমা দেবী দুর্গামাতার এবং আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসিনী-দিগেরও ত্যাগোজ্জ্বল জীবন ও নারীসেবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, "···আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জন্য যে মুক্তির স্বপ্ন—যে জীবনলাভের দুরাশা আমার মনের নিভৃত কোণের কল্পনাতে মাত্র পর্যবসিত ছিল, সেই স্বপ্ন যে···জীবন্ত সত্যরূপে আমাদের দেশের বুকে তাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—একথা যদি সময়ে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইত, তাহা হইলে বুঝি আজ নিজের জীবনেরও কোন শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্যলাভ আমার দুর্লভ হইত না।"···

গৌরীমা, দুর্গামা এবং আশ্রমবাসিনীদিগকে দেখিয়া প্রাচীন কালের গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী-প্রমুখ মহীয়সী নারীদিগের কথাই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল।

একবার পুরস্কারবিতরণ-সভায় সরলাবালা সরকার সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেন, "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের পুরস্কার বিতরণী সভায় বিপুল মহিলা সমাবেশ দেখিয়া এই আশ্রমের উপর বঙ্গনারী-গণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ

সারদেশ্বরী আশ্রম দেশের এক মহার্ঘ সম্পদস্বরূপ।...কেবল সম্পদ নয়, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে গর্বের বস্তু। সন্ন্যাসিনীদিগের দ্বারা এই বৃহৎ আশ্রম পরিচালিত হইতেছে এবং যথারীতি ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে।...ভারতীয় নারীর যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, যাহা তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিতর দিয়া আজিও সমস্ত নারীজাতির জীবনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, মাতৃজাতির সেই পবিত্রতা, ত্যাগ ও সেবাপথে আশ্রমনিকেতন এক পরম প্রেরণার ক্ষেত্র।”...

মাতৃদ্বয়ের আকর্ষণে এবং পূর্বোক্ত নানাকারণে বহু নরনারী আশ্রমের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা আশ্রমের ব্যয়নির্বাহের বিষয়েও প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। এই সাহায্যকারীদিগের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়া সরোজবাসিনী কোলে—বেলেঘাটার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের পত্নী। আশ্রমের গৃহনির্মাণকালে কোলে মহাশয় নিজেও অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং অপরের নিকট হইতেও অর্থসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। যতদিন তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন, সেইস্থানে আশ্রমের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। আর, তাঁহার পত্নীর কথা মনে হইলে অন্তরে জাগিয়া উঠে এক স্নেহময়ী পরমাত্মীয়ার মূর্তি। আশ্রমের কোন কন্যার পরিধানে কদাচিৎ ছিন্ন বস্ত্র দেখিলে তিনি ব্যথিত হইতেন এবং অচিরে তাহার প্রতিকার করিতেন। শারদীয়া পূজায় আশ্রমিকাবৃন্দ যাহাতে নববস্ত্র পরিধান এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে উপাদেয় ভোজ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। একাদিক্রমে বহুবৎসর ব্যাপিয়া এইপ্রকার অকুণ্ঠ সেবা আশ্রমের ইতিহাসে বিরল। কোলে-পরিবারই আশ্রমের প্রধান ‘রসদ্দার’ এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সরোজবাসিনী গৌরীমাকে দেবীজ্ঞান করিতেন এবং দুর্গামার প্রতিও তাঁহার ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসার কোন পরিমাপ ছিল না। আশ্রমের প্রতিটি কন্যা ছিল তাঁহার অতিস্নেহভাজন। অপরপক্ষে, আশ্রমবাসিনীগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ‘বৌদি’

বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা রেখারাণী ও দৌহিত্রী চিন্ময়ী আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যা এবং জামাতৃবর্গ সকলেই দুর্গামার একান্ত স্নেহাস্পদ। পুণ্যশীলা সরোজ-বাসিনীর একান্ত অভিলাষ ছিল—তাঁহার অবর্তমানেও পুত্রবধূগণ যেন আশ্রমের সেবা করেন। তাঁহার সেই অভিলষিত সেবা ভক্তিমতী পুত্রবধূগণ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে, গৌরীমার নিষ্ঠাবান এবং সদাশয় সন্তান নগেন্দ্রনাথ রায়ের কথা। আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার কিছুকাল পরেই গৌরীমার সহিত তাঁহার পরিচয়। গৌরীমার শিষ্য সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীগুরুর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব ভক্তের ন্যায় কঠোর জীবনযাপন করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রখ্যাত চিকিৎসক ক্ষেত্রনাথও ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ। আশ্রম-কন্যাদিগকে তিনি বিনা-দর্শনীতে চিকিৎসা করিতেন।

নগেন্দ্রনাথের এক কন্যা কিছুকাল আশ্রমবাস করিয়াছেন। পিতার নিকট কখনও কন্যার কিছু দাবী থাকিলে— সাড়ী, সূচীশিল্পের দ্রব্যাদি বা অন্যবিধ বস্তু,—পিতা তাহা কেবল কন্যার জন্যই আনিতেন না, তাহার আশ্রমবাসিনী বান্ধবীগণের জন্যও আনিতেন। প্রতিমাসে তিনি আশ্রমে অর্থসাহায্য করিতেন। আশ্রমের অবস্থা তখন সচ্ছল নহে, কোন মাসে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে, তিনি সেই অভাব পূরণ করিতেন। শ্রীশ্রীদামোদরলালের সেবার জন্যও পৃথকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেন। নানাভাবে তিনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার দেহান্তে তদীয় পুত্র শ্যামসুন্দর ও গদাধর এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণচন্দ্র আশ্রমসেবায় সহযোগিতা করিতেছেন।

দেশবাসীর সহিত আশ্রমের যোগাযোগ যে ক্রমশঃ কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে তাহা আলোচিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, মহিলাগণ মাতৃদ্বয়কে

দর্শন করিতে আসিয়া আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন। পরে একের পর এক তাঁহাদের আত্মীয়পরিজনকেও লইয়া আসিয়াছেন। এইভাবে বহু পরিবার আশ্রমের আপন হইয়াছে।

স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু একদিন আশ্রমে আসিলেন। আকাঙ্ক্ষা—গৌরীমাতার নিজমুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ শুনিবেন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ও সন্ন্যাসিনীসংঘ যে কলিকাতায় রহিয়াছে তাহা তিনি পূর্বে জানিতেন না। ইহার মহৎ আদর্শ এবং কার্যপ্রণালী জানিয়া তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। যতদিন-না তিনি রাজরোষে পতিত হইয়া দূরদেশে অন্তরীণে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ততদিন প্রতিমাসে দুইটি দুঃস্থা আশ্রমকন্যার মাসিক ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার রত্নগর্ভা জননী এবং পত্নী বিভাবতী বসুও আশ্রমে আসিতেন। বিভাবতী বসু গৌরীমাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, তিনি দুর্গামারও ছিলেন অতিশয় প্রিয়পাত্রী। অনতিবিলম্বে আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যারূপে তিনি মনোনীত হন। ক্রমে তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবধূও আসিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রী হইলেন। ভ্রাতৃবধূর জননী—বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী—নীরোদমোহিনী বসুও আসিলেন। সুদীর্ঘকাল তিনি আশ্রমকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। বিভাবতী বসু এইভাবে পরিবারস্থ বহু আত্মীয়াকে আনিয়া দুর্গামার নিকট উপস্থিত করেন।

এইসময়কার একদিনের ঘটনা, বিভাবতী বসুর নিকট আমরা যেরূপ শুনিয়াছি।—দূরে মান্দালয়ের বন্দিশালা হইতে মুক্তি পাইয়া সুভাষচন্দ্র স্বগৃহে ফিরিয়াছেন, দেহ অসুস্থ, শয্যাশায়ী। বিভাবতী দেবী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। ইতিমধ্যে একদিন আশ্রম-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান যায়। ইতস্ততঃ করেন তিনি,—তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঔষধপথ্য কে দিবে? সমস্যা বুঝিতে পারিয়া সুভাষচন্দ্র বলেন,—বৌদি, তুমি আশ্রমে যাও, নইলে দুর্গামা দুঃখিত হবেন। ওষুধপথ্য

সব আমার হাতের কাছে গুছিয়ে রেখে যাও। আমার কোন অসুবিধে হবে না, তুমি একবারটি ঘুরে এসো গে।'

তাঁহাদের ভবানীপুরের বাটীতে সুভাষচন্দ্রের সহিত গৌরীমা ও দুর্গামার একাধিকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিকটে বসাইয়া তাঁহাকে আশ্রমদেবতার প্রসাদও তাঁহারা ভোজন করাইয়াছেন, এবং দিয়াছেন অশেষ আশীর্বাদ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি দুর্গামার ছিল স্নেহবাৎসল্যের ভাব। মা বলিতেন,—ছাত্রজীবন হতেই সুভাষ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, আদর্শ ও ত্যাগপূত জীবনের ওপর শ্রদ্ধাশীল। স্বামিজীর শক্তিই সুভাষকে একনিষ্ঠ আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের পথে আকর্ষণ করেছে।

১৩২৭ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গৌরীমার জনৈক দক্ষিণদেশীয় শিষ্য রাজা রাও কলিকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত গৌরীমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। দুর্গামাতাও গৌরীমাতার সহিত সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন,—সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতামায়ীর আদর্শ প্রচার একান্তভাবে আবশ্যক।

অতঃপর তিনি মাতাজীর নিকট কিছু শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৈশিষ্ট্যের বিষয় গৌরীমা আলোচনা করিলেন। পরিশেষে তিনি বলেন, দেশের ও সমাজের সেবাকে যাঁহারা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা পবিত্র এবং ভগবানে বিশ্বাসী না হইলে পরিণাম শুভ হইবে না।

গান্ধীজীর সহধর্মিণী কস্তুরবাঈর আগ্রহে গৌরীমা সন্ন্যাসিনী দুর্গামার জীবন এবং ব্রতের কথা তাঁহাদিগের নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন। গৌরীমার নির্দেশে দুর্গামা গীতার একটি অধ্যায় আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার শান্ত সরল ভাব ও জীবনের মহান ব্রতের কথা কস্তুরবাঈকে আনন্দ দান করে। দুর্গামাতাকে নিকটে টানিয়া তিনি আদর করিলেন, এবং নারীজাতির কল্যাণে তাঁহার পূতজীবন সার্থক হউক,—এই শুভেচ্ছা জানাইলেন।

দক্ষিণ-ভারতের তীর্থে

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি,—দুর্গামাতার তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অতিশয় প্রবল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা, শিল্পকলা ও ঐতিহাসিক স্থানগুলির প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ ছিল অনুরূপ।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তীর্থদর্শনের পর এইবার তিনি দক্ষিণ-ভারতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। যাত্রীদিগের ভ্রমণস্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তখন রেল-কোম্পানী নানাপ্রকার সচিত্র পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করিত। সেইসকল পুস্তিকায় বিভিন্ন স্থানের দর্শনীয় বস্তু, যাতায়াত এবং বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক তথ্য থাকিত। মা ঐরূপ বহু পুস্তিকা সংগ্রহ করিলেন। অবশ্য, দক্ষিণ-ভারতের তীর্থসমূহের অধিকাংশ বিবরণই মা ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছিলেন গৌরীমাতার নিকট। তদুপরি, পরিচিত ভক্ত কেহ দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণান্তে মায়ের সাক্ষাতে আসিলে তাঁহার নিকট হইতেও তিনি সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতেন।

১৩৩৭ সালের ফাল্গুন মাসে মা পুরীধামে গিয়া ভক্ত বলরাম বসুদের 'শশী নিকেতনে' অবস্থান করেন। এই গৃহেই পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যস্মৃতি তাঁহার মনোরাজ্যে জাগ্রত হইল। প্রতিদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনের পর শ্রীক্ষেত্রের সর্বজনমান্য সাধু বাসুদেব-বাবার দর্শনে মা যাইতেন। তাঁহার নিকট হইতে দক্ষিণভারত-সম্বন্ধে বহুবিধ বিবরণ জানিতে পারিলেন। তিনি অল্পদিন পূর্বেই দক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বাসুদেব-বাবাও মাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। এই-বারের তীর্থযাত্রায় মায়ের সহিত ছিলেন দুইজন আশ্রমকন্যা এবং একটি পুরুষ সন্তান। পাণ্ডা বৃন্দাবনচন্দ্র শৃঙ্গারীর ছড়িদার ভিখারী-চরণ দাসকে তাঁহার নিকট হইতে মা চাহিয়া লইলেন। এই

ছড়িদারটি মাকে বিশেষ ভক্তি করিত। এত দূরদেশে এবং অপরিচিত স্থানে একটিমাত্র সেবকের ভরসায় যাত্রা করা মা সমীচীন বোধ করেন নাই, সুতরাং ভিখারীচরণকে দ্বিতীয় সেবকরূপে পাইয়া তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইল। অধিকন্তু, পাণ্ডাজীর যাত্রী সংগ্রহ ব্যপদেশে সে ইতিপূর্বে কয়েকবার দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছিল এবং তেলেগু ভাষায় তাহার জ্ঞানও কিছু ছিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অনুমতি লাভ করিয়া চৈত্রমাসের শেষার্ধে ওয়ালটেয়ার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে দক্ষিণ-ভারতের অভিমুখে মা পুরী হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দ্রষ্টব্য চিল্কা হ্রদ। মায়ের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল চিল্কার শোভা দর্শনের। প্রথম দৃষ্টিতে হ্রদটিকে বড়ই মনোরম লাগিল, কিন্তু পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অফুরন্ত জলরাশির আর তেমন আকর্ষণ রহিল না। সকলেই নিদ্রামগ্ন হইলেন। পরদিবস প্রভাতে আসিল সীমাচলম। ষ্টেশন হইতে গো-শকটে তিন-চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মা পাহাড়ের উপর অবস্থিত প্রহ্লাদপুরীতে উপনীত হইলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে নৃসিংহ-দেবের বিরাট মূর্তি। পূজাদি সম্পন্ন করিয়া মা তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেও পুরীতীর্থের ন্যায় অন্নভোগের ব্যবস্থা। পুরী হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের সকল মন্দিরেই অন্নভোগ সুলভ। অবশ্য, পুরীর ভোগের মত বিরাট ব্যবস্থা অন্য কোথাও নাই।

সীমাচলম হইতে অপরাহ্নে টাঙ্গাযোগে ওয়ালটেয়ারে গিয়া 'টার্নার চোলট্রি'তে রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত হয়। উত্তর-ভারতবাসীদিগের নিকট দক্ষিণদেশের 'চোলট্রি' জিনিষটি অভিনব মনে হইবে। ইহা যাত্রিনিবাস, কিন্তু ধর্মশালা নহে। এইস্থানে বাস করিবার জন্য ভাড়া দিতে হয়। তৎকালে এই চোলট্রিগুলির একটি কামরার ভাড়া ছিল দৈনিক ছয় হইতে আট আনা মাত্র। টার্নার চোলট্রিতে দুইটি শয়নঘর, রন্ধনশালা ও স্নানাগারসমেত একটি ফ্ল্যাট দৈনিক দেড় টাকা হিসাবে ভাড়া লওয়া হইল। পরদিন প্রভাতে মা সমুদ্রতীরে

বেড়াইতে গেলেন। সমুদ্র সেইস্থানে বহু নিম্নে এবং প্রচুর প্রস্তর-খণ্ড সমাকীর্ণ। স্নানের কোন সুবিধা নাই।

মায়ের ভ্রমণসূচী এমনভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল, যাহাতে চলন্ত রেলগাড়ীতেই রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন পরবর্তী তীর্থে দেবদর্শনাদি সম্পন্ন হয় এবং সম্ভব হইলে সেইস্থান হইতেও পুনরায় রাত্রিকালে গাড়ীতে যাত্রা করা যায়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও হইয়াছে, কোন কোন বিশেষ স্থানে মায়েদের দুই-এক দিবস অপেক্ষাও করিতে হইয়াছে। মায়ের আরও একটি পরিকল্পনা ছিল—যাত্রাপথেই যেন সেই অঞ্চলের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন হয় এবং প্রত্যাবর্তনকালে পুনঃ পুনঃ গাড়ী পরিবর্তন করিতে না হয়।

ওয়ালটেয়ার হইতে মা গমন করেন গোদাবরী জিলার প্রধান সহর রাজমাহেন্দ্রীতে। তথায় পুণ্যসলিলা গোদাবরী নদীতে মা অবগাহনস্নানে তৃপ্ত হইলেন।* অতঃপর বালাজী গোবিন্দ। এই দেবতারই অন্য নাম—বেঙ্কটেশ্বর। ইঁহার প্রতি ছিল মায়ের এক প্রবল আকর্ষণ। গৌরীমা এবং বাসুদেব-বাবা উভয়েই এই দেবতাকে দর্শনের কথা মাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ সহর হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে তিরুপতি ওয়েষ্ট ষ্টেশন। সেইস্থান হইতে চারিঘণ্টাকাল ক্রমাগত পাহাড়ে আরোহণ ও অবরোহণের পথ অতিক্রম করিয়া তবে দেবমন্দিরে

* গোদাবরী হইতে জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে মা লিখিয়াছেন,—

"···তোমাদের সবার কল্যাণে নৃসিংহদেবকে দর্শন করে ওয়ালটেয়ার, ভিজাগাপট্টম দেখে আমরা এখানে এসে স্নান করে ধন্য হয়েছি। সমুদ্র কি সুন্দর ওয়ালটেয়ারে—আর পাহাড় ও সমুদ্রে মিলেছে—আমার মনের কল্পনার রূপ দেখে বড় আনন্দ পেলুম মা। তারপর গোদাবরী—বড় মনোরম, বড় সুন্দর। তোমাদের শুভকামনা, সঙ্গে রয়েছে মাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ ও ৺জগন্নাথদেব—তাঁর অযোগ্যা দাসীকে অসীম করুণা, এই তিনটী জিনিস আমার পাথেয়।···"

পৌঁছাইতে হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মা যাত্রা করিলেন একটি ডুলীতে, অন্য সকলে পদব্রজে। বহু নরনারী পরম ভক্তিভরে 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই ভক্তি-মিশ্রিত মধুর গোবিন্দ নাম সকলের অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বেলা আট ঘটিকায় সকলে উপস্থিত হইলেন পর্বতশীর্ষে সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত সেই মহান্ দেবতা চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে। তাঁহার পুণ্যদর্শনমাত্রই সকলের শ্রমভার লাঘব হইল, চিত্ত আপ্লুত হইল স্বর্গীয় আনন্দে। প্রাণ ভরিয়া দেবদর্শনান্তে মা তাঁহার নিকট পূজা নিবেদন করিলেন।

মন্দিরের পুরোহিতের সহিত আলোচনায় মা জানিলেন যে, বেঙ্কটেশ্বরের মোহন্তকে আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিতে হয়। তখন যিনি মোহন্ত—তিনি যুবক। তাঁহার সহিত বাক্যালাপে মা প্রীত হইলেন এবং মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যভাব মোহন্তের প্রতি প্রকাশ পায়। কায়মনোবাক্যে পবিত্র ব্যক্তিদের প্রতি এই স্নেহ এবং আশীর্বাদ ছিল মায়ের এক বৈশিষ্ট্য। মা বলিতেন, 'নিঃসঙ্গ থেকে ভগবানকে ডাকার মত আর কি কিছু আছে!'

পর্বতের শীর্ষদেশেও জলাভাব নাই। সুবিশাল বৃক্ষসমন্বিত অরণ্যানীতে স্থানটি সমাচ্ছন্ন। মায়ের পূজাভোগাদি সম্পন্ন হইলে পুনরায় মন্দিরে গমন করিলেন তিনি। দেবতার রূপমাধুর্যপানে মায়ের আর পরিতৃপ্তি হয় না, মন্দির হইতে প্রত্যাবর্তনেরও যেন কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু, অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় পুনর্যাত্রা করিতেই হইবে, সুতরাং দেবতার নিকট বিদায় লইতে হইল।

পর্বতের পাদদেশে উপনীত হইয়া পথপ্রদর্শক এক ব্রাহ্মণের গৃহে মাতৃগণ রাত্রিযাপন করিলেন। ব্রাহ্মণটি ছিলেন সরল ও সজ্জন। যাত্রাকালে তিনি বলেন, "মা, আপনি যখন দেশে ফিরবেন, তখন আপনার সাড়ীখানার মত একখানা সাড়ী আমার স্ত্রীর জন্য পাঠাবেন।" তাঁহার এই আবেদন মা বিস্মৃত হন নাই, কলিকাতা

হইতে উত্তম একখানি সাড়ী তাঁহার নিকট ডাকযোগে মা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে তীর্থস্থান ও মন্দিরের বিপুল সমাবেশ। মন্দিরসমূহ আকৃতিতে যেমন বিরাট, প্রকৃতিতেও তেমনই শিল্পনৈপুণ্যসমৃদ্ধ, কয়েকটি আবার সহস্রস্তম্ভশোভিত। পূজাব্যবস্থাতেও সমারোহপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত আর একটি বৈশিষ্ট্য যাত্রীদিগের অন্তরে রেখাপাত করে, —পাণ্ডা ও পূজারীদিগের সৌজন্যপূর্ণ আচরণ। অধিকাংশ মন্দিরই একটি করিয়া ট্রাষ্টের পরিচালনাধীন। যাত্রীদিগের অর্থসামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্পব্যয়ের কর্পূর আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যয়বহুল ষোড়শোপচার পূজা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার দেবার্চনার জন্য নির্দিষ্ট হার প্রকাশ্য স্থানে লিখিত থাকে। ঐ পরিমাণ অর্থ মন্দিরের কার্যালয়ে জমা দিলেই পুরোহিত তদনুযায়ী পূজা সম্পন্ন করেন এবং যাত্রীর নিকট অতিরিক্ত আর কিছু দাবী করেন না। এইরূপ সুব্যবস্থায় দেবতার দর্শন ও পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, এবং ফলে পূজার এই তৃপ্তি যাত্রীর স্মৃতিপটে দীর্ঘকাল জাগরূক থাকে।

দাক্ষিণাত্যে তখন জাতিভেদ প্রথা এবং মন্দিরে প্রবেশের বিধিনিষেধ ছিল অত্যন্ত কঠোর, ইহা সত্ত্বেও সন্ন্যাসিনী মাতাজী যখনই যে মন্দিরে গিয়াছেন পূজারিগণ তাঁহাকে সমাদরে দেবতার সম্মুখে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে দর্শনাদি করাইয়াছেন।

দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে যে-সকল দেবস্থান মাকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে মাদুরা, শিবকাঞ্চী, পক্ষিতীর্থ, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, শ্রীরঙ্গম, তাঞ্জোর ও কুম্ভকোণমের মন্দিরগুলি প্রধান। বাসন্তী পূজার সময় মা মাদুরায় মাতা মীনাক্ষী দেবী এবং সুন্দরেশ্বর মহাদেবকে নববস্ত্রাদি উপচারে পূজা নিবেদন করেন। অপরাহ্লে মন্দিরসংলগ্ন সরোবরে দেবীর নৌকাবিহারও দর্শন করিলেন। দাক্ষিণাত্যের গোপুরম অর্থাৎ প্রবেশমণ্ডপের অপূর্ব শিল্পকলা ও উচ্চতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় বস্তু। মীনাক্ষী দেবীর গোপুরমের উচ্চতা প্রায় দেড়শত ফুট। মাদুরা ভারতবর্ষের অতি

বিখ্যাত এবং প্রাচীন নগরী। ইহার অপর নাম দক্ষিণদেশের 'মথুরাপুরী'। মা এই নগরীতে ত্রিরাত্র যাপন করেন।

আলগর কোয়েল নামক স্থানে আলগরজী নারায়ণের মন্দির মাদুরা হইতে প্রায় বারো মাইল দূরে অবস্থিত। প্রব্রজ্যাকালে গৌরীমা এই দেবতার বিশেষ কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে মা তথায় যাইয়া চতুর্ভুজ নারায়ণের মনোহর বিশাল মূর্তি দর্শন করেন।

আনন্দে পরিপূর্ণা দুর্গামাতা মাদুরা হইতে জনৈক আশ্রমসেবককে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "তুমি প্রার্থনা করিও যেন প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া ফিরিতে পারি। এখনো বাকী কন্যাকুমারী. ৺রামেশ্বর। দর্শন যেন পাই, অনেক দিনের আশা। যে যে স্থান দেখিতেছি পরম আনন্দ পাইতেছি। বহুস্থান দেখা হইল। সমুদ্র যেমন ভালবাসি, গুহা যেমন ভালবাসি, তেমন দেখিতেছি।...এবার নববর্ষে কি দেবে? প্রাণভরা মা ডাক, আদর যত্ন, কেমন!"

একদা মাদুরার ধর্মশালায় কান্তারাও নাইডু নামে জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক মায়ের কক্ষে শ্রীসারদামাতার পট-দর্শনে তাঁহার সহিত আলাপে আগ্রহান্বিত হইলেন। ইনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর শিষ্য। মায়ের সহিত অল্পপরিচয়েই এমন মুগ্ধ হইলেন যে, মাদ্রাজে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য মাকে অনুরোধ জানাইলেন। অবশ্য, পূর্বব্যবস্থানুযায়ী মাদ্রাজে গিয়া অন্য এক ভদ্রলোকের গৃহে মা অবস্থান করিয়াছিলেন। তথাপি তথায় উপনীত হইয়া অপরাহ্নেই নাইডুর সহিত মা সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদিগের সুপরিচ্ছন্ন গৃহে সস্ত্রীক তিনি মাকে সেদিন যে সাদর ও সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন, তাহা মা উত্তরকালেও অনেকের নিকট উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে মায়ের পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। পক্ককেশ এই বৃদ্ধ দুর্গামাকে স্বীয় জননীর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

উভয়ত এই পরিচয় ক্রমশঃ এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরিণত হইয়াছিল যে, তিনি তিন-চারিবার সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া মায়ের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা বাঙ্গালোরের ব্যারিষ্টার শ্রী পি. সূর্যকান্তমণিকেও মাতৃদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সূর্যকান্তমণি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জনৈক আশ্রমসেবক তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। স্বামিজীর বাটীর প্রাচীর দেখাইয়া সেবকটি যখন বলেন, "এই স্বামিজীর বাস্তুভিটা, তখন তাঁহারা পতিপত্নী অত্যন্ত ভক্তি-ভরে সেই বহিঃপ্রাচীরেই পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

গৃহাভ্যন্তরে স্বামিজীর মধ্যম সহোদর শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং বারংবার বলিতে থাকেন,—same figure, same cut, অর্থাৎ স্বামিজীর সহিত তাঁহার ভ্রাতার আকৃতির কী সাদৃশ্য! মহেন্দ্রনাথের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিয়া তাঁহারা নিজেদের সেদিন কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছিলেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব দক্ষিণদেশে প্রব্রজ্যাকালে পানা-নরসিংহের স্তুতিবন্দনাদি করিয়াছিলেন। গৌরীমা এই দেবতাকে দর্শন করিতে মাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই দেবতার এইরূপ নামকরণের তাৎপর্য ইহাই যে, সর্বক্ষণ তিনি কেবল নানাপ্রকার সরবৎ অর্থাৎ গুড়ের পানা, চিনির পানা, মিছরির পানা প্রভৃতি পান করেন। বৃহৎ বৃহৎ হাণ্ডাপূর্ণ পানা-ই নৃসিংহদেবের ভোগের একমাত্র উপকরণ। এলাচ, মরিচ, কর্পূরাদি মিশ্রিত এক ঘটী উৎকৃষ্ট মিছরির পানা মা দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিলেন। নৃসিংহদেবের মুখগহ্বরে ঐ পানা প্রদান করিবামাত্র অধিকাংশই তাঁহার উদরস্থ হইল, অবশিষ্টাংশ মা এবং সঙ্গিগণ প্রসাদ পাইলেন।

দেবতার সম্মুখে মা যখন দশাবতার স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন, মায়ের সেবকটি তখন মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নিম্নভাগে দেখেন যে, সেস্থলে একটি জলাধার

(চৌবাচ্চা) পানাতে পূর্ণ হইয়া আছে এবং বহু লোক সেই প্রসাদ ক্রয় করিতেছেন।

ত্রিচিনাপল্লীতে কাবেরী নদীর মধ্যে শ্রীরঙ্গম-দ্বীপে শ্রীরঙ্গনাথজীর সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট মন্দিরটি যেন পরিখাবেষ্টিত একটি দুর্গবিশেষ। সপ্তপ্রাকার অতিক্রম করিয়া তবে মূলমন্দিরে দেবতার সমক্ষে উপস্থিত হওয়া যায়। সেস্থানে বেদীর উপর অনন্তশয্যায় শায়িত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ, পার্শ্বদেশে উপবিষ্টা দুই মাতৃমূর্তি—শ্রীলক্ষ্মী দেবী ও শ্রীভূমি দেবী। নারায়ণের নাভিকমল হইতে উদ্গত মৃণালযুক্ত এক পদ্মের উপর আসীন ব্রহ্মা। বিশাল মূর্তি, বিপুল বৈভব, সাড়ম্বর পূজার্চনার ব্যবস্থা—সমস্তই মনকে মুগ্ধ করে। কনক হীরা জহরতের প্রচুর সমাবেশ। মন্দিরের বহির্দেশের ঊর্ধ্বাংশ স্বুবর্ণমণ্ডিত। বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ এই স্থানটি। প্রভুপাদ রামানুজাচার্যের সমাধি এই মন্দিরপ্রাকার-মধ্যেই অবস্থিত।

অদূরে রক্-টেম্পল দাক্ষিণাত্যের দুর্গমন্দিরগুলির অন্যতম। সুরক্ষিত পর্বতের শীর্ষদেশে গণেশ-শিবাদি দেবতার মন্দির। গণেশমন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে নিম্নে অবস্থিত সমগ্র সহর এবং কাবেরী নদীর দৃশ্য অতীব মনোরম।

পঞ্চগোপুরম্-শোভিত জম্বুকেশ্বর শিবমন্দিরে মা তাঁহাকে এবং পার্শ্ববর্তী পৃথক মন্দিরে অধিষ্ঠিত মাতা পার্বতীকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এমন বিরাটকায় শিবমন্দির দাক্ষিণাত্যেও বিরল।

অতঃপর সুবিখ্যাত পক্ষিতীর্থ। ইহা দর্শনের নিমিত্ত বহু পূর্ব হইতেই মায়ের মনে অতিশয় আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল। এতদিনে তাহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এক যাত্রিনিবাসে মায়েদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ভক্তগণের বিশ্বাস—প্রতিমধ্যাহ্নে হিমালয় হইতে হরগৌরী এই পর্বতশীর্ষে আগমন করেন পূজাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই মায়ের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মা ডুলীতে এবং অন্যসকলে আরোহণ করিলেন পদব্রজে। পর্বতশিখরে শত শত দর্শনার্থী ভক্ত নরনারী চক্রাকারে অপেক্ষমাণ। মধ্যস্থলে

দুইখানি আসন, সম্মুখে ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি সজ্জিত। পুরোহিত উপকরণসহ পূজাসনে উপবিষ্ট,—ঢাক ঢোল কাঁসর ইত্যাদি বাদ্য বাজিতেছে। সকলের দৃষ্টিই ঊর্ধ্বদিকে নিবদ্ধ—কোন্ দিক হইতে পক্ষিদ্বয় নামিয়া আসিবেন। সহসা দৃষ্টিগোচর হয়—ঊর্ধ্বাকাশে দুইটি শ্বেতবর্ণ পক্ষী। বৃত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পর্বতশিখরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব আসনে উপবেশনপূর্বক নৈবেদ্য হইতে কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের যথারীতি আরতি করিলেন পূজারিগণ। আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে পক্ষিদ্বয় পুনরায় অদৃশ্য হইলেন আকাশপথে। যুক্তকরে মা প্রণাম জানাইলেন হরগৌরীর উদ্দেশে।

এইস্থানে কয়েকদিবস মা স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, রন্ধনের সুযোগ তাঁহার অল্পই আসিয়াছে। আশ্রমে গৌরীমা স্বহস্তে ভোগ প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতেন। জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে রন্ধন করিতেন শ্রীমাতা স্বয়ং অথবা মাতুলানীগণ। শ্রীমাতা একবারমাত্র মাকে দিয়া কাঁকুড়ের ডালনা এবং আরও কয়েকপ্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করাইয়াছিলেন। এইবার পক্ষিতীর্থে মায়ের স্বহস্তপ্রস্তুত ভোগপ্রসাদ গ্রহণে সঙ্গিগণ সকলে ধন্য হইলেন। এমন সুযোগ তাঁহাদের জীবনে আর কখনও আসে নাই। শ্রীমাতার ন্যায় মায়ের রন্ধনও ছিল সাত্ত্বিক ও সুস্বাদু।

পক্ষিতীর্থের অনতিদূরে সমুদ্রতীরে মহাবলীপুরম্। এই স্থানটি প্রাচীন প্রস্তরশিল্পের বিস্ময়জনক নিদর্শন অদ্যাপি বহন করিতেছে। এক-একটি বিপুলকায় শিলার সাহায্যে মহাভারতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে—পাণ্ডবদিগের রথ, গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছেন তদানীন্তন কুশলী শিল্পিগণ। আবার গুহার অভ্যন্তরে প্রস্তরগাত্রে অতিনিপুণভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি খোদিত হইয়াছে। এইসকল শিল্পসৌন্দর্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

দাক্ষিণাত্যের তীর্থরাজির মধ্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বরই প্রধান। লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই স্থানে মা ত্রিরাত্র বাস করেন এবং হরিদ্বার হইতে আনীত গঙ্গোদকে অর্চনা করেন শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীর। সহস্রস্তম্ভশোভিত এই দেবমন্দিরটি ভারতের মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে অবস্থিত। তবে রেল-সেতুদ্বারা মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকায় যাত্রীদিগকে গাড়ীবদলের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। রেলগাড়ী হইতেই দেখা যায় যে, মধ্যে মধ্যে শিলানির্মিত ভগ্নপথ বা সেতু রামেশ্বর হইতে যেন দক্ষিণে লঙ্কা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। জনশ্রুতি—ইহাই ত্রেতাযুগে নির্মিত শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধ।

লক্ষ্মণ যে স্থানে সমুদ্রশাসন অর্থাৎ লঙ্কা-অভিযানে সেতুনির্মাণের উদ্দেশ্যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গরাজিকে বাণনিক্ষেপে স্তব্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ধনুষ্কোটি বা ধনুষ্কোডি; শ্রীরামেশ্বরজীর মন্দির হইতে ইহা রেলপথে কয়েকমাইল দূরে অবস্থিত। সেইস্থানে সমুদ্র প্রকৃতই শান্ত। বাসুদেববাবা বলিয়াছিলেন,—ওখানে দান করলে কোটিগুণ ফললাভ হয়। একদিন পূর্বেই মা ধনুষ্কোডি গিয়া পরদিবস সূর্যোদয়কালে সমুদ্রস্নান করেন; সমুদ্রকে অর্ঘ্য এবং ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান করিয়া পুনরায় রামেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

দক্ষিণদেশে প্রধান দেবতা দুইটি—শিব এবং নারায়ণ; তথাপি মহাবিনায়ক (গণেশ) এবং সুব্রহ্মণ্যের (কার্তিকেয়) মন্দিরও সেদেশে অসংখ্য। সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি প্রায় সর্বত্রই। শিবমন্দিরের একটি পৃথক মহলে মাতা পার্বতীর এবং নারায়ণের পৃথক মহলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। রামেশ্বরে পার্বতী-মহলের অভ্যন্তরে আছেন অতি সুদর্শন এক গণেশমূর্তি। সামান্য দূরে হইলেও তাঁহার দৃষ্টি জননীর প্রতি নিবদ্ধ। কিন্তু কার্তিকেয়ের মন্দির সদর-মহলে। পার্বতী-গণেশের এই একান্ত একাত্মতা, শরণাগত পুত্রের প্রতি জননীর অত্যধিক বাৎসল্য আমাদের মায়ের হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করিত।

গণেশ সম্বন্ধে মা একটি গল্প বলিতেন,—

একবার দেবী দুর্গা গণেশ ও কার্তিককে বলেছিলেন,—'তোমরা ত্রিভুবন পরিক্রমা করে কে আগে আমার কাছে আসতে পার দেখি। যে আগে আসবে আমার গলার এই হার তাকে পুরস্কার দেবো।' কার্তিক তখনই তাড়াতাড়ি ছুটলেন তাঁর ময়ূরে চড়ে, আর সগর্বে ভাবলেন,—দাদার তো ঐ ছোট্ট ইঁদুর, কখ্‌খনো পারবে না আমার সঙ্গে। এদিকে গণেশ কিন্তু কোথাও গেলেন না। তিনি জানেন, মায়ের মধ্যেই ত্রিভুবন, সুতরাং মাকে তিনবার প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে মায়ের কোলে বসে রইলেন। কার্তিক ত্রিভুবন পরিক্রমা শেষ করে ফিরে এসে দাদাকে মায়ের গলার হারটি পরে তাঁর কোলে বসে থাকতে দেখে বিস্ময় আর অভিমানে জিজ্ঞাসা করেন, এ কি করে হলো?

গণেশ উত্তর দেন,—তুমি কোথায় ত্রিভুবন ঘুরতে গেছ, মায়ের ভেতরেই তো ত্রিভুবন।

মাতা দুর্গাও গণেশের কথাই সমর্থন করলেন।

দুর্গামার অন্তরটিও ছিল এইরূপ মাতাসারদা-সর্বস্ব। তাঁহার হৃদয়ে, মনেপ্রাণে এবং বোধ হয় প্রতিরক্তবিন্দুতে সদা বিরাজিতা ছিলেন মাতা সারদা। মাতৃগতপ্রাণ গণেশকে মা সেইকারণেই অতিশয় ভালবাসিতেন। রামেশ্বরে নববস্ত্র ও উত্তরীয়াদি উপচারে তিনি এই গণপতির অর্চনা করিলেন।

তীর্থপর্যটনে দৈহিক ক্লেশভোগ যতই হউক, মনের প্রসন্নতা মায়ের অক্ষুণ্ণ ছিল। রামেশ্বর হইতে জনৈক সন্তানকে মা লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের শুভেচ্ছায় এবং মার আশীর্বাদে আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। ৺বাবার দর্শন ও নানা বিভূতি দর্শনে আমি বড় শান্তি পাচ্ছি।...প্রার্থনা কর যেন আরও ২।৩টি স্থান দর্শন হয়। জীবনে আমার আর হবে না, প্রভু দয়া করে এবার যেন নিজে অদৃশ্যশক্তিরূপে আমায় টেনে নিয়ে এসেছেন।... বড় দূরে এসেছি ফিরে যেতেও সময় লাগবে—পনেরশো মাইল

দূরে যে! তা ছাড়া শ্রীজগন্নাথ দেবের হুকুম, তাঁর কাছ হয়ে যেতে হবে।"

রামেশ্বরের পর শিবকাঞ্চী। মায়ের ভক্ত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন তথায় ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহার গৃহেই মা আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। শিবকাঞ্চীতে উপনীত হইবার পরদিবস প্রাতেই সকলকে লইয়া মা মন্দিরে গেলেন। মা একান্ত ভক্তিভরে পূজা ও শিবস্তোত্র পাঠ করিলেন। অপরদিকে, মন্দিরে প্রবেশমাত্র এক অজ্ঞাতকারণে মায়ের সঙ্গীয় সেবকটির সর্বদেহমনে এক বিমল আনন্দানুভূতি হয়। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়—মন্দির হইতে বাহির হইয়াই মা সেবকটিকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার কিছু অনুভূতি হলো?" সেবকটি উত্তর দেন, "মা, এ রকম আনন্দ জীবনে কখনও অনুভব করি নি।" মা বলিলেন, "ঠিক হয়েছে।"

শিবকাঞ্চীর অনতিদূরে বিষ্ণুকাঞ্চী বৈষ্ণবদিগের পরম তীর্থ। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই দেবতাকে বলেন, 'দক্ষিণের বালাজী।' মায়ের প্রতি বাসুদেব-বাবার নির্দেশ ছিল—এই নারায়ণ দর্শনের। অপরাহ্নে মা তথায় গমন করেন।

এইসময় মায়ের অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় কলিকাতার আশ্রমে তারযোগে তাহা জানাইলেন। সেইদিনই অপরাহ্নে টাকা মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত। পরে, কলিকাতায় ফিরিয়া জানা যায় যে, তারবার্তা প্রাপ্তিমাত্র গৌরীমা উক্ত কাগজখানি ও তাঁহার নিকট নগদ যাহা ছিল, সেই সমুদয় অর্থসহ স্বয়ং পোষ্ট আফিসে যাইয়া পোষ্টমাষ্টারকে ব্যাকুলভাবে বলেন, "বাবা, আমার মেয়ে দক্ষিণতীর্থে গিয়ে অর্থাভাবে অসুবিধেয় পড়েছে, তুমি এই টাকাগুলি এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।" পোষ্টমাষ্টার মহাশয় গণনা করিয়া দেখেন—প্রায় পাঁচশত টাকা; বিস্ময়ে তিনি বলেন, "টেলিগ্রাম এসেছে দুশো টাকার জন্যে, আপনি দুশো টাকা পাঠিয়ে দিন, আর বাকী টাকা ফেরৎ নিয়ে যান।" মানসিক দুশ্চিন্তায় সরলস্বভাবা গৌরীমা টাকাগুলি গণনা করিয়া দেখেন নাই। বৃদ্ধা সাধুমাতার ব্যাকুলতা

বুঝিয়াই পোষ্টমাষ্টার মহাশয় হয়তো বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যাহাতে টাকা অতিসত্বর মায়ের হস্তগত হয়।

ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গনাথজীর ন্যায় ত্রিবান্দ্রামের শ্রীপদ্মনাভজীও —অনন্তশায়ী নারায়ণ। দুইই কষ্টিপাথরে প্রস্তুত বিরাট মূর্তি। ইনি রঙ্গনাথজী অপেক্ষা বৃহত্তর—দৈর্ঘ্যে প্রায় চৌদ্দ হাত। ত্রিবাংকুরের রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সহস্রস্তম্ভযুক্ত দেবালয়টি অবস্থিত; এই রাজ্যের প্রকৃত মালিক পদ্মনাভজী। ত্রিবাংকুরের রাজা স্বয়ং প্রত্যহ সর্বপ্রথমে মন্দিরে পূজা নিবেদন করেন।

ত্রিবান্দ্রাম হইতে কুমারিকা। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে তিন দিকে সমুদ্রবিধৌত মনোরম স্থানে কন্যাকুমারীর মন্দির অবস্থিত। রেলযোগে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত গিয়া তৎপর বাস্ বা ট্যাকসিতে তথায় যাইতে হয়। নৈষ্ঠিক ধর্মার্থিগণ কেহ কেহ পদব্রজেও কুমারিকায় গমনাগমন করিয়া থাকেন।

মা মোটর-বাসে ত্রিবান্দ্রাম হইতে কুমারিকায় গমন করেন। তিনি স্বয়ং কৌমার্যব্রতধারিণী এবং এই ব্রতে অতি শ্রদ্ধাশীলা, এইকারণে দেবী কুমারীর প্রতি ছিল মায়ের প্রগাঢ় আকর্ষণ। তাঁহার বাসস্থানটিও নির্দিষ্ট হইয়াছিল মন্দিরের সন্নিকটে একটি যাত্রি-নিবাসে। এইস্থানে সঙ্গীয় জনৈকা কন্যা সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় মাকে চারি দিবস বিলম্ব করিতে হয়। নির্ধারিত সময় অপেক্ষা দেবীর দর্শন এবং পূজার অধিক সময় পাইয়া মা আনন্দিতই হইলেন। কলিকাতা হইতে তিনি দেবীর জন্য বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

অপূর্বসুন্দরী কিশোরীমূর্তি, তদুপরি মাতৃদত্ত নববস্ত্রে সুশোভিতা মৃদুহাস্য-বদনা দেবী কুমারীর সৌন্দর্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। দেবীর সেই মূর্তি দর্শনে মায়ের অন্তরও পূর্ণ হইল এক অভূতপূর্ব পরিতৃপ্তিতে। মন্দিরে প্রতিদিন দেবীর সম্মুখে বসিয়া মা নিবিষ্টমনে চণ্ডীপাঠ করিতেন।

দেবী কুমারিকার বিচিত্র আখ্যান, মা যেমন শুনিয়াছেন :

সুদূর অতীতে ভারতভূমির দক্ষিণপ্রান্তে রাজত্ব করিতেন এক ধর্মপ্রাণ রাজা। তাঁহার ছিল একটিমাত্র কন্যা, রূপে গুণে অতুলনীয়া। রাজার ঐকান্তিক বাসনা—কন্যাকে কোন যোগ্য রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া স্বীয় রাজ্যভার কন্যা-জামাতার হস্তে অর্পণ করিবেন। কিন্তু, কন্যা বাল্যাবধি শিবপূজায় মগ্ন, অন্য কাহাকেও তিনি পতিত্বে বরণ করিবার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। রাজকুমারীর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেবও অভয় দিলেন যে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন।

বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কন্যার মনের কথা অবগত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলেন এবং শিবের সহিতই বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেবতা গন্ধর্ব সকলকে নির্দিষ্ট দিবসে কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য শিব নিমন্ত্রণ জানাইলেন।

সেই রাজ্যের অনতিদূরে থাকিত এক অসুর। অমরত্বলাভের উদ্দেশ্যে সে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবতা তাহাকে বর দিলেন,—কুমারী ব্যতীত অপর কাহারও হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে না। সে তাহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিল, সংসারে কোন কন্যাই তো শেষপর্যন্ত অবিবাহিতা থাকে না, সকলেই বিবাহ করে, অতএব তাহার আর ভয় কি? অন্য কেহ তো আর তাহাকে মারিতে পারিবে না! ইহা চিন্তা করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল, এবং ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত দুর্বার হইয়া উঠিল। কখন কখন স্বর্গরাজ্যে গিয়াও সে উৎপাত করিত। তাহাকে নিহত করিতে দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিতেন, কিন্তু সে তাহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিত, পরাস্ত করিত। এইরূপ অবস্থায়—যখন ইন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সেইসময় শিবের বিবাহ-নিমন্ত্রণ পাইলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও আনন্দিত না হইয়া নৈরাশ্যে মুহ্যমান হইলেন। কারণ, তিনি খুবই আশা করিয়াছিলেন—এই রাজকন্যা চিরকুমারী থাকিবেন এবং তাঁহার হস্তেই অচিরে অসুরটির নিধন হইবে।

সুতরাং তাঁহার বিবাহের সংবাদে ইন্দ্র শঙ্কিতই হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মস্তকে এক কূটবুদ্ধি আসিল। তিনি নারদ মুনিকে অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিলেন, "নারদঠাকুর, শিবের এই বিয়ে আপনি কোনরকমে পণ্ড করতে পারেন? না হলে তো আমাদের আর নিস্তার নেই।" উত্তরে নারদ বলেন, "সে আর এমন কঠিন কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেবরাজ, আমি এ বিয়ে ভেঙে দেবই।"

বিবাহের নির্ধারিত দিবসে বৃষভবাহনে শিব সানন্দচিত্তে যাত্রা করিলেন কৈলাস হইতে। যথাসময়ে কন্যার পিত্রালয়ের অনতিদূরে শুচিন্দ্রম পর্যন্ত আসিলেন। তথায় দেখিলেন,— ভক্ত নারদ ভাবে বিভোর হইয়া বীণাযন্ত্রে রামনাম কীর্তন করিতেছেন। রামনামের মধুরধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া শিব ভাবাবিষ্ট হইলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই রাজার কন্যা দক্ষিণহস্তে একগাছি অক্ষমালা এবং বামহস্তে নানাশস্যপূর্ণ বরণের ডালা লইয়া বধূবেশে বরের জন্য অপেক্ষমাণা। বহু দেশ হইতে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া রাজবাটী আনন্দকোলাহলমুখর করিয়া তুলিয়াছেন। রাজা পরমযত্নে সকলকে ভোজন করাইতেছেন, আর মুহুর্মুহু সংবাদ লইতেছেন—বর আসিলেন কি-না। কিন্তু বরের দেখা নাই। ক্রমে রাত্রি অধিক হয়, রাজা এবং নিমন্ত্রিতগণ সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন।

কন্যা তখন ক্ষুব্ধচিত্তে সংকল্প করিলেন— প্রভাতের পূর্বে দেবাদি-দেব মহাদেব আসিয়া উপস্থিত না হইলে তিনি জীবনে আর কখনও বিবাহ করিবেন না, চিরকুমারীই থাকিবেন।

ওদিকে, নারদের ভাবভঙ্গ হইলে শিব বলেন, "চল, আজ আমার বিয়ে, তুমি সেই সভায় গান গেয়ে শোনাবে।" নারদ বলিলেন, "সে তো ভাগ্যের কথা, কিন্তু বিবাহের লগ্নের তো এখনও অনেক দেরী। আপনি একটু বিশ্রাম করুন, ততক্ষণ আমি আপনার সেবা করি, তারপর যাবেন।" নারদ বিবিধ উপচারে শিবপূজার আয়োজন করিতে করিতে মধুর রামনাম গাহিতে লাগিলেন। বিবাহবাসরে

যাইবার জন্য মহাদেবের মন চঞ্চল, বিলম্বে বিবাহের শুভলগ্ন অতীত হইয়া না যায়! কিন্তু নারদের পূজার আয়োজন দেখিয়াও আশুতোষ অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। পূজা সমাপ্ত হইলে নারদ এইবার অধিকতর মধুরস্বরে পুনরায় রামনাম কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সে নামসঙ্গীত শ্রবণে ভোলানাথ একেবারে সমাধিস্থ—বিবাহের কথা তাঁহার আর স্মরণেই রহিল না।

এদিকে, রাজকন্যা আকুল অন্তরে দেবাদিদেবের আগমনের আশায় প্রতীক্ষমাণা। কিন্তু নির্দিষ্ট লগ্নের পূর্বেই ব্রহ্মা ছদ্মবেশী বায়সরূপে 'কা' 'কা' রবে তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া উড়িয়া গেলেন। চমকিত হইলেন রাজকুমারী,—কাক ডাকছে! ভোর হয়ে গেল, তবে! শুভলগ্ন তো পার হয়ে গেল! এলেন না মহাদেব।

অপমান এবং অভিমানে আহত রাজকুমারী বামহস্তের বরণ-ডালাটি ফেলিয়া দিলেন সমুদ্রতীরে, দক্ষিণহস্তের সেই অক্ষমালাটি তাঁহার হস্তেই রহিল--তাঁহার জীবনব্যাপী ব্রতের প্রতীকরূপে।

অতঃপর রাজকুমারীর হস্তে অসুরের নিধন হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু শুচিন্দ্রমের বিরাট মন্দিরে শিবের পূজা অদ্যাপি চলিতেছে নির্বিঘ্নে; অধিকন্তু, শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত মহাবীরও যথাকালে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন সেইস্থানে। কন্যাকুমারী যাইবার পথে যাত্রিগণ পূর্বে শিব এবং মহাবীরকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ত্রিবান্দ্রাম হইতে সমুদ্রতীরস্থ ভারকলাতীর্থে জনার্দনকেও মা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মায়ের মনে হইয়াছিল—এই জনার্দন এবং কন্যাকুমারী—যেন দুইটি ভ্রাতাভগিনী।

ভারকলার অনতিদূরে কোর্টালাম জলপ্রপাত। প্রায় তিনশত ফুট উচ্চ হইতে পর্বতগাত্র বাহিয়া জলধারার সে অবতরণ দর্শনীয়। মা এই জলপ্রপাতটিও দেখিয়াছিলেন।

চিদাম্বরমে একদিন বাস করিয়া মা নটরাজ শিবকে পূজা করিলেন। কিন্তু এইস্থান হইতে যাত্রাকালে এক বিভ্রাট ঘটে।

গো-শকটে জিনিষপত্রসহ পুরীধামের সেই ভিখারীচরণকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া মা সকলকে লইয়া আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখেন, ভিখারীচরণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ভূমিতে শায়িত, তাহার সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ। কুলী এবং গাড়োয়ান তাহার মস্তকে জল ঢালিয়া ও বাতাস করিয়া সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। জানা গেল—অতিরিক্ত সূর্যতাপের ফলে ইহা 'সান-ষ্ট্রোক'। মা মহাদুর্ভাবনায় পড়িলেন। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় রেলগাড়ী আসিবার পূর্বেই সে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করায় কুলীদের সাহায্যে তাহাকে গাড়ীতে তোলা হইল।

এইরূপে দক্ষিণ-ভারতের তীর্থদর্শন সমাপ্তপ্রায়। এখনও মায়ের একটি ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়াছে—নীলগিরি পর্বতমালার শীর্ষে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত সুন্দরী উটী নগরী—অর্থাৎ উতকামণ্ড দর্শন। যাত্রাশেষে তাহাও পূর্ণ হইল। নীলগিরি পর্বতের অপরূপ সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করিল। কিন্তু উতকামণ্ডে বাস করা অতিব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। দুইদিনেই স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলি মা দেখিলেন। উতকামণ্ডের শীতল জলবায়ুতে ভিখারীচরণও সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল। উতকামণ্ডে মা গিয়াছিলেন বাসে, ফিরিলেন ট্রেণে। উভয় পথের শোভাই অপূর্ব।

উটীশৃঙ্গের স্নিগ্ধ-মোহকর পরিবেশ হইতে নিম্নদেশে আসিয়া মেট্টুপালায়াম ষ্টেশনে যখন মাদ্রাজগামী 'ব্লু মাউণ্টেন এক্সপ্রেস' গাড়ীতে সকলে পুনর্যাত্রা করিলেন তখন অত্যধিক ভিড়ে এবং অসহ্য গরমে মনে হইল স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এ কোথায় আসা হইল।

পরদিন মাদ্রাজ পৌঁছিয়া শিবকাঞ্চীর পূর্বোক্ত অবিনাশচন্দ্রের ব্যবস্থানুযায়ী জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে মা আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মাদ্রাজ সহরে কপালেশ্বর শিব, পার্থসারথির মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রভৃতি মায়েদের দর্শন হইল। পূর্ববর্ণিত কান্তারাও নাইডুর সহিতও সাক্ষাৎ হয়। তৃতীয় দিবসে মাদ্রাজ-হাওড়া মেল গাড়ীতে মা মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। বিদায়কালে মাতাজীর সেবার জন্য নাইডু প্রচুর

সুস্বাদু ফল উপহার দেন। মধ্যপথে ওয়ালটেয়ারে একদিন বিশ্রাম এবং খুর্দা রোডে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া জ্যৈষ্ঠের এক অপরাহ্ণে মা পুনর্বার আসিলেন পুরীধামে।

দক্ষিণ-ভারতের তীর্থভ্রমণ সুসমাপ্ত। প্রত্যাগমনের প্রণাম নিবেদন করিতে মা সেই সন্ধ্যাতেই গেলেন প্রভু জগন্নাথের সমীপে। তৎপর প্রত্যহ দেবদর্শন এবং প্রসাদগ্রহণ। এক সপ্তাহ পুরীতে আনন্দে অতিবাহিত করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যভাগে মা আসিয়া উপনীত হইলেন কলিকাতায়।

মা বলিয়াছেন,—দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে সর্বত্র প্রভু জগন্নাথের একান্ত সান্নিধ্য এবং করুণা তিনি অনুভব করিতেন।

আশ্রম-মাতা

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলার প্রকৃত তাৎপর্য বিগত শতাব্দীতে অনেকেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ ইহা সুবিদিত যে, তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—অতি মহান্, গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি কেবল কঠোর সাধনভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া এবং তত্ত্বকথা প্রচার করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন নাই, 'স্রষ্টা এবং তাঁহার সৃষ্টি অভেদ' এই অনুভূতিতেও তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পরিসমাপ্ত হয় নাই। আর্ত, অবজ্ঞাত এবং নির্যাতিতের দুঃখেও তাঁহার হৃদয় সত্যই কাতর হইত। ইহা কেবল দয়ার্দ্র হৃদয়ের সাময়িক এক ভাবাবেগমাত্র ছিল না। ইহার পশ্চাতেও ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। জীবে ও শিবে, নরে নারায়ণে,—এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই মাত্র নহে, এক একান্ত আত্মিক সম্বন্ধ তিনি অনুভব করিতেন। তিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সর্বপ্লাবী এক পরম চৈতন্যের আলোকেই। এবং তাহাই বুঝাইয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গদিগকে—মানবজীবনে সাধনভজনই সব নয়, শেষ কথাও নয়, ব্যক্তি-মুক্তিই একমাত্র কাম্য নয়, সমষ্টির কল্যাণ—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করাও ধর্ম।

সত্য, প্রেম ও করুণার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ অপূর্ব চিন্তাধারা ও অনুপ্রেরণার মধ্যেই তাঁহার আশিস্‌ধন্য সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ নূতন আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং গুরুর এই যুগধর্মের মর্মবাণীই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন অনুপম ভাষায়,—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই সত্যোপলব্ধির বাণীই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে শুনাইয়াছিলেন শিষ্যা গৌরীমাতাকে, "সাধনভজন ঢের হয়েছে, এবার এ তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগবে।

ওদের বড় কষ্ট।” শ্রীগুরুর নির্দেশেই “জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায়” আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন গৌরীমা।

বহুবৎসর পূর্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী ঠাকুরের এবং তাঁহার ত্যাগী অন্তরঙ্গদিগের পূর্বোক্ত অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন, “শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে দুইটি থাক আমরা দেখিতে পাই। একদল তাঁহার নিকট শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া কেবল তপস্যায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন; আর একদল শুধু তপস্যায় সত্যোপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদের সাধনালব্ধ শক্তি পরার্থে নিয়োজিত করিয়া সন্ন্যাসীর মহান্ আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে পুরুষগণের অগ্রণীরূপে আমরা দেখিতে পাই শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে, আর স্ত্রী-সম্প্রদায়ের পুরোভাগে দেখিতে পাই সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতাকে।···তিনি এমন এক নারীসংঘ গঠন করিয়া গিয়াছেন, যাহা অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।”

তপস্বিনী গৌরীমাতার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সাধনভজন এবং ভগবান-লাভ, সেই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াও তিনি গুরুর নির্দেশে ‘বহুজনহিতায়’ ‘জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায়’ ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরসাধিকা দুর্গামাতাও আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই মহান্ ব্রতে। আশ্রমকে তিনি স্বীয় দেহপ্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। আশ্রমের সেবা, আশ্রমকন্যাগণ এবং মাতৃজাতির কল্যাণসাধন—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। ইহার সিদ্ধিতেই তাঁহার পরম আনন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট ‘জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবা’কে তিনি বীজমন্ত্রের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করিতেন। জনৈকা আশ্রম-সন্ন্যাসিনীকে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছেন, “আশ্রমের প্রতিটি কন্যা আমার বুকের পাঁজর। ভাল মন্দ, উঁচু নীচু, সুন্দর কালো, জড় প্রতিভাময়ী বুঝি না আমি,—শ্রীরামকৃষ্ণের ‘জ্যান্ত জগদম্বা।”

অন্য এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "দেশের ইতিহাসে পুরুষের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু গৌরীমা নারীকে পরমশ্রদ্ধার পাত্রী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাঁহাদেরই হস্তে দিলেন। এ আশ্রম যাহাতে জগতের কল্যাণে দাঁড়ায় তাহা দেখিতে হইবে মা।··· সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, ভাল মন্দ এবং মোক্ষসাধন অর্থাৎ মোক্ষ লাভের উপায় সবই এই আশ্রমকল্যাণ।···যাকে বা যাদের পার এই মন্ত্র দান কর—যেন আশ্রমগত-প্রাণা হন।

"একটা জীবন সংসারসেবা না করে আশ্রমসেবা, ইহাতে অনেক দর্শন বিজ্ঞান এবং আত্মত্যাগের সারমর্ম আয়ত্ত হইবে। আশ্রম-মাতাগণের কল্যাণ চাই।"

আশ্রমকন্যাদের প্রতি মায়ের স্নেহ কত গভীর ও ব্যাপক ছিল এবং স্নেহভালবাসা দ্বারা মা তাহাদের স্বভাবচরিত্র কিভাবে গঠন করিতেন, অপরপক্ষে কন্যাকুলও তাঁহার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হইতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হইতেছে।

আশ্রমবাসিনীগণ দুই শ্রেণীর—প্রথম : যাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য—ত্যাগের পথে থাকিয়া ধর্মসাধন ও সমাজসেবা। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্দেশ্য—শিক্ষাসমাপনান্তে স্বগৃহে ফিরিয়া সুগৃহিণী হওয়া, এবং সংসারধর্মের মাধ্যমে শান্তি ও শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হওয়া। এই দুই শ্রেণীর বালিকাদিগের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য থাকিলেও, স্নেহের ক্ষেত্রে মা কোন প্রভেদ রাখিতেন না। বিশেষতঃ যাহারা মাতৃ-হীনা, তাহাদিগের প্রতি স্বভাবতঃই মায়ের স্নেহাধিক্য প্রকাশ পাইত।

যাঁহাদিগকে অন্তেবাসিনীরূপে গ্রহণ করা হয়, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই আশ্রমজীবনের সূচনা বাল্যকালে। ইঁহাদের গঠন করিবার দায়িত্ব থাকিত প্রধানতঃ দুর্গামাতার উপর। তিনি তাঁহাদিগকে যত্ন করিতেন, ভালবাসিতেন, শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ঠাকুরদেবতার গল্প বলিয়া উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেন, আবার বহুভাবে শিশু-চিত্তের আনন্দবিধানও করিতেন। তাঁহার যে ভালবাসার আকর্ষণে কন্যাগণ স্বীয় মাতাপিতার স্নেহমমতা ভুলিয়া পরমানন্দে আশ্রম-

জীবন যাপন করিতেন, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে একদা আশ্রমের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা—অদ্য প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা জনৈকা সন্ন্যাসব্রতধারিণী তাঁহার মধুর বাল্যস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাস, আমার বয়স তখন ছয়। একদিন প্রাতঃকালে পিতার সহিত আশ্রমে আসিলাম। দুর্গামা তখন উপরে ছিলেন, গৌরীমা নবদ্বীপে। আশ্রমবাসিনী একজন আমাকে মায়ের নিকট লইয়া গেলে মা আমাকে দেখিয়াই দুই হাত বাড়াইলেন। আমিও দুইহাতের মধ্যে ধরা দিয়া একেবারে তাঁহার কোলে বসিলাম। মা আমার গালে চুমা দিয়া, মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর আমার নাম, পিতার নাম, অ, আ, ক, খ, আর ইংরিজি এ, বি, সি, ডি, কতটা চিনিয়াছি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এবং গল্প করিতে লাগিলেন। অনেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসার সময় কাঁদ নি?' আমি 'না' বলায় সন্তুষ্ট হইয়া মা বলিলেন, 'বেশ, বেশ, তুমি সাধু হতে পারবে।'

পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার মা কি বলে দিলেন আসার সময়?' উত্তরে বলিলাম, 'মা বলে দিয়েছেন, বড়মা এখন আশ্রমে নেই, নবদ্বীপে আছেন। গিয়ে ছোটমাকে পেন্নাম করবি। আর, ওঁদের সবার কথা শুনে চলবি, যেন নিন্দে না হয়।' মা হাসিয়া বলিলেন, 'তা কৈ, আমার সেই পেন্নামটা কই?' আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। মায়ের আদরে মায়ের কোলেই এতক্ষণ বসিয়া আছি, প্রণামের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এইবার প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে মা বলিলেন, 'থাক্, থাক্, আর পেন্নাম করতে হবে না। এবার তুমি সন্দেশ খাও।' নিজহাতে একটি কৌটা খুলিয়া সন্দেশ খাওয়াইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইবার পর একদিকে আমাকে এবং অপরদিকে আমারই সমবয়সী এক বালিকাকে লইয়া একই মাদুরে মা শয়ন করিলেন। অপরাহ্ণে জলযোগ এবং রাত্রের আহারও স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়াই করাইলেন।

"তাহার পর ক্রমেই মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ও আকর্ষণী শক্তি

আমাকে তাঁহার একান্ত অনুগত করিয়া তুলিল। তখন তিনি প্রায়ই গঙ্গাস্নানে যাইতেন। যাহারা আশ্রমে নূতন আসিত, তাহাদিগের সদ্যঃস্বজনবিরহকাতর মনের প্রসন্নতার জন্য কাহাকে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কিন্তু, মা শিশুদের জলে নামিতে দিতেন না। যোগ্যতা অনুসারে কাহাকেও তাঁহার চাবি, কাহাকেও চশমা, কাহাকেও কাপড়-চাদর লইয়া ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিতে বলিতেন। সকলেই মায়ের কিছু কিছু জিনিষ চৌকীদারির অধিকার পাইয়া গর্ববোধ করিত, তবে মায়ের আঁচলের চাবি রাখিবার দায়িত্ব যে পাইত তাহারই গর্ববোধ হইত সর্বাধিক। স্নানান্তে শিশুর দলটিকে লইয়া মা গাড়ীতে ফিরিতেন। ইতঃপর কোন কোন দিন গাড়ী গিয়া থামিত দোকানে। মায়ের নির্দেশে দোকানী উত্তম শাঁখা, পাথরের হার, পাথরের দুল, মুক্তার চুড়ি প্রভৃতি আনিয়া মাকে দেখাইত। মা শিশুদের মনোমত জিনিষ পরাইয়া মূল্য পরিশোধ করিতেন। আশ্রমে ফিরিয়া নবলব্ধ গহনাগুলি সকলকে দেখাইতে শিশুদের উৎসাহের অন্ত থাকিত না। তাহাদের উল্লাসকলরবে তিনিও অন্তরে অনুভব করিতেন অপরিসীম আনন্দ। এইকারণে বাল্যকালে মায়ের সহিত গঙ্গাস্নানে যাওয়া আমাদের ছিল এক লোভনীয় ব্যাপার।

"বিদ্যালয়ের ছুটীর পর কোন কোন দিন বাসে করিয়া আমার মত আশ্রমের অনেকগুলি ছোট ছোট কন্যাসহ মা মহিলা-উদ্যান বা দেশবন্ধু পার্কে বেড়াইতে যাইতেন। চিকিৎসকের নির্দেশে তিনি জোরে জোরে সেখানে পদচারণা করিতেন। আমরা ছুটাছুটি করিয়া খেলিতাম, মা ঐ হাঁটা-অবস্থাতেই 'বুড়ী' হইতেন। ফিরিবার পথে দেখা যাইত, পার্কের ফটকে চিনাবাদাম-বিক্রেতা বসিয়া আছে। মা তাঁহার চাদরে বাদাম কিনিতেন এবং গাড়ীতে উঠিয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। শিশুদের সহিত এই দিল-খোলা খেলার সাথীর ভাব মায়ের আজীবন ছিল। নানাপ্রকার কর্মভারে জড়িত হইয়াও তাঁহার এই সরস মনটির পরিবর্তন কখনও হয় নাই।

"কন্যাগণ মাতৃস্নেহ অধিক পরিমাণে অনুভব করিত তাহাদের অসুস্থতার সময়। বয়স্কা কন্যাদের দ্বারা বিছানা করাইয়া, অসুস্থতার উপযোগী পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া মা স্বয়ং কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাওয়াইতেন। মধ্যরাত্রে উঠিয়া হয়তো দেখিলেন, অসুস্থ কন্যাটি ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার মাথার কাছে বসিয়া 'কি কষ্ট হচ্ছে, মা', সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেন। মাকে দেখিলেই যেন সর্বযন্ত্রণার লাঘব হইত। অত রাত্রিতেও মা রোগীর শিয়রে বসিয়া আঙুর, কমলালেবু, সন্দেশ প্রভৃতি খাওয়াইতেন। তাহাকে প্রসন্ন দেখিয়া তবে উঠিতেন। চিকিৎসক আনাইয়া, তাহার কষ্ট বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। দোকানে গিয়া পুতুল, ছবি কিনিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া বলিতেন, 'এবার তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো, মা।' কন্যাগণ মায়ের এই আদরে ডুবিয়া থাকিত। তাহারা জানিত, আশ্রমই জগতের গণ্ডী, আর এই দুর্গামা—তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরের মা। এই মা ছাড়া তাহাদের একদিনও চলিতে পারে, ইহা তাহারা ভাবিতেই পারিত না।

"গৌরীমা যাহাদিগকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত আধারের বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদিগকে তিনি বাল্যকাল থেকেই পৃথক পরিবেশে রাখিতেন। দুর্গামাকে বলিতেন, 'এরা আমার দামোদরের সেবায়েত হবে, মা। তুমি আলাদাভাবে এদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দিও। নানাপ্রকৃতির মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করলে, সংসারের রঙীন ছবির গল্প শুনলে এরা অকালে সেয়ানা হয়ে যাবে।' এইসকল কন্যাদের কেবল বিদ্যাশিক্ষা নহে, সর্বশিক্ষার দায়িত্বই দুর্গামা স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। বয়স এবং যোগ্যতা অনুসারে স্তব স্তোত্র, গীতা চণ্ডী পাঠ হইতে সুরু করিয়া পূজাহোম পর্যন্ত মা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। দেবসেবার ছোট ছোট কাজ করাইতেন, কখনও-বা গল্প বলিয়া আনন্দ দান করিতেন। কিন্তু কাহারও সহিত বাজে গল্প করিতে দেখিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। শাস্তি দিতেন,—'যাও, দোতলায় নেমে যাও', ইহার অর্থ হইল—মায়ের সান্নিধ্যে যাওয়া

নিষিদ্ধ। এই শাস্তিটি যে কিরূপ বেদনাবহ ছিল তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহই সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অনুশোচনা এবং কান্নার পর মায়ের নির্দেশে গৌরীমার নিকট গিয়া প্রণামান্তে তাঁহার আশীর্বাদলাভ করিলে তবে হইত পুনর্গ্রহণ। তখন মা সস্নেহে বুঝাইয়া বলিতেন, 'তোমরা ঠাকুরদেবতার সেবা করবে, আশ্রমের মহৎ কাজ করবে, বাজে কথা তোমরা বলবে বা শুনবে কেন?'

"মা কাহাকে কাহাকেও গলার হার, হাতের চুড়ি গড়াইয়া পরাইয়াছেন। তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিতেন, 'মা, সন্ন্যাসী হবে বলে এসব মেয়ে তৈরী হচ্ছে, এদের আবার সোনার হার, চুড়ি দিয়ে সাজানো কেন?' হাসিয়া মা উত্তর দিতেন, 'ছাড়ার দিন এলে এরা সহজেই ছাড়তে পারবে, মা। ওরা আর তো মাত্র ক'টা দিন এসব সাজে সাজবে, তারপর তো আসল অলঙ্কার—গৈরিকবস্ত্র অঙ্গে ধারণ করবে। এতেই এদের বাহ্যিকের আকর্ষণ কেটে যাবে।'

"মায়ের অপার্থিব স্নেহ, শুভাশিস এবং সদুপদেশই আমাদিগকে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে পরমার্থসন্ধানে।"

কখন কখনও মাতৃহীনা তিন-চারি বৎসরের শিশু কন্যাকেও আশ্রমে আশ্রয় দিতে হইয়াছে। অনেককাল আশ্রমবাসের পর তাহাদের অনেকেই স্বগৃহে ফিরিয়াও গিয়াছে। সকলেই মায়ের স্নেহযত্ন লাভ করিয়াছে। অবাঙ্গালী কন্যাদিগকেও মা আশ্রম-বাসিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। জনৈকা মহারাষ্ট্রীয় বালিকার নাম ছিল হীরা। তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য মা সুর করিয়া বলিতেন, 'হীরাসোনা, হীরামণি, হীরা চিন্তামণিরে।' 'মাইজী মাইজী' বলিয়া সেও আনন্দ প্রকাশ করিত। মা বালিকাদিগকে আদর করিয়া 'মা সোনা', 'ফুলরাণী', 'রাঙা মা', 'প্রাণ মা' প্রভৃতি সুমিষ্ট নামে ডাকিতেন। আবার কন্যাদের মধ্যেই কেহ ছিল তাঁহার 'রাজা ব্যাটা', কেহ বন্ধু, কেহ-বা ব্রাদার।

শিশুদের মধ্যে কাহারও চুরি করিয়া খাইবার লোভকে মা গুরুতর অপরাধ মনে করিতেন না। নিজহস্তে প্রসাদ দিয়া, ভালবাসিয়া

তাহাদের কু-অভ্যাস সংশোধন করিয়াছেন। ইহাদের প্রসঙ্গে স্নেহ-মিশ্রিত কণ্ঠে মা বলিতেন, সব বাড়ীতেই শামী-বামী থাকে তো। ছেলেবেলার এই স্বভাব এমন কিছু সাংঘাতিক দোষের নয়।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "মা, আপনি শামী-বামীর কথা বলেন, তারা কারা ?" মা বলেন, "তবে শোন, সে গল্প।—

"এক ব্রাহ্মণের ছিল দুই মেয়ে—শ্যামা আর বামা। ব্রাহ্মণ বিপত্নীক, মেয়ে দুটিই তাঁর ঘরসংসার দেখে, যা হয় দুটি রান্না করেও খাওয়ায়। বাড়ীতে মা-কালীর সেবা আছে, পূজোর জোগাড়ও ওরাই করে দেয়। মেয়ে দুটির বয়স বেশী নয়—আট-দশ। জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণ যজমানী করেন। কখনও যজমানের বাড়ী থেকে ফলটা মিষ্টিটা আনেন মা-কালীর ভোগের জন্য। কিন্তু পূজোয় বসে যখন সে সব দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে বলেন, তখন তা কিছুই পাওয়া যায় না; দুই মেয়েই বলে,—আমি তো জানি না কি হয়েছে। ব্রাহ্মণ সবই বোঝেন, কিন্তু মা-মরা মেয়েদের কোন দুর্বাক্যও বলেন না। এইভাবেই দিন যায়। একদিন ব্রাহ্মণ এক যজমানের কাছ থেকে খুব ভাল একছড়া মর্তমান কলা এনেছেন মায়ের ভোগের জন্য। সেদিনও যথারীতি কলাগুলি মেয়েদের হাতে দিয়ে বলেন,—কাল মায়ের ভোগ হবে, সাবধানে তুলে রাখ। পরদিন পূজোয় বসে যখন সেই কলা চাইলেন তখন শ্যামা বলে—আমি জানি না; বামা বলে,—তাই তো কলাগুলো কোথায় গেল! সেদিন আর ব্রাহ্মণ ধৈর্য রাখতে না পেরে মা-কালীকে উদ্দেশ করে বলেন,—হে মা-কালী, তুমি কত শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করেছ, আর এই শামী-বামীর কিছু করতে পারছ না তুমি ?"

গল্পটি বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন, উপস্থিত সকলেই তাহাতে যোগ দেন। মা পুনরায় বলিলেন, "শিশুবেলার অনেক দোষ বড় হলে কেটে যায়।"

অবাধ্য দুরন্ত কন্যাদের আচরণে যদি কেহ বিরক্তি বোধ করিত অথবা মায়ের নিকট অভিযোগ জানাইত, মা বলিতেন, "মাগো, যে

ভাল, সে তো নিজেই ভাল, তার জন্য তোমার তো কিছু করণীয় নেই। কিন্তু যে দুষ্টু, তাকে ভাল করতে পারলে তবেই তো তোমাদের বাহাদুরী।" মা দুষ্টু কন্যাদিগকেও আদর করিতেন, বলিতেন, "এদের ভেতর প্রাণ আছে, শুধু একটু মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া।" প্রায়শঃ দেখা যাইত, মা ইহাদিগকে আপনার সান্নিধ্যে রাখিয়া নানাবিধ কার্য করাইয়া, ভালবাসা দ্বারা তাহাদের আচরণ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন। মায়ের নিকটে থাকিবার সুযোগ লাভ ও তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়া ইহারাও আনন্দ অনুভব করিত।

একদিন একটি দুরন্ত কন্যা প্রাচীরসংলগ্ন গাছ হইতে ফুল তুলিবার জন্য রাত্রিকালে প্রাচীরে উঠিয়াছিল। জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের নিষেধ সে গ্রাহ্য করে নাই। মা এই কথা শুনিলেন, অপরাধিনীকে ডাকা হইল, সকলেই ভাবিতেছেন, মা না-জানি ওকে কতই তিরস্কার করিবেন! কিন্তু দেখা গেল, মা তাহাকে নিকটে টানিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "তুই যে এত ফুল ভালবাসিস, তা আমাকে এতদিন বলিস নি কেন? আমি কালই তোকে গোলাপফুল এনে দেব। আর কোনদিন পাঁচিলে উঠবি না তো, মা?" অপরাধিনী শাস্তির পরিবর্তে মায়ের আদর পাইয়া আপনার দোষ বুঝিতে পারিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিজ্ঞা করিল, "এমন কাজ আর কখনো করব না।" পরদিবস মা তাহাকে এক গুচ্ছ গোলাপফুল উপহার দিলেন। তদবধি এই দুরন্ত কন্যাটি শান্ত হইয়া গিয়াছিল।

শিলঙ হইতে মা জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "মায়েদের প্রাণাধিক করিয়া স্নেহ কর। ভগ্নিদের দোষ ঢাকিয়া গুণ প্রকাশ কর।...এরা তোমার দক্ষিণহস্ত হউক। তুমি মার খাইয়া স্নেহ দাও, আমি এই চাই।...আশ্রমসেবা বড় কঠিন। মার পায়ে সব মান অভিমান দিয়া নিজে রিক্ত না হইলে তিনি সেবা নেন না।"

কন্যাদিগকে তিনি আশ্রমে গ্রহণই করিয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহাকেও আশ্রমত্যাগ করিতে বলিতেন না। তাঁহারা যে জগদম্বা!

কোন কন্যা বা অভিভাবক অন্যায় আচরণ করিলে, তাহাতে মা অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তথাপি রূঢ় আচরণ তিনি করিতে পারেন নাই। যে-সকল কন্যা নিজেদের ব্যয়ে আশ্রমে রহিয়াছে, তাহাদের কোন অভিভাবক সামর্থ্যসত্ত্বেও কন্যার মাসিক ব্যয় দীর্ঘকাল পরিশোধ করেন নাই, অথবা চিকিৎসায় ঔষধপত্রের মূল্য বাকী রাখিয়াছেন ; তাঁহাদের পক্ষে ইহা প্রবঞ্চনামূলক এবং আশ্রমের পক্ষে ক্ষতিজনক জানিয়াও মা অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই। বরং অনেকসময় কোন অভিভাবক অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে, আশ্রমকে দেয় অর্থের দায় হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন ; বলিয়াছেন, "আমি যদি দুটি খেতে পাই, ওরাও দুটি খাবে।" কেহ কেহ অনুযোগ করিয়াছেন,—পুত্রদের বেলায় অন্য প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন যাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে সাহস পান না, তাঁহারা সহজেই আপনাকে ফাঁকি দিয়া যান। মা বলিতেন, "জগদম্বাদের সেবার জন্যই আশ্রম, আমি নিমিত্তমাত্র। আশ্রমের প্রাপ্যটাকা শোধ না করে অভিভাবক যদি কন্যাকে নিয়ে যেতে চান, আমি ছেড়ে দেব ; কিন্তু টাকা না দেবার কারণ দেখিয়ে আমি কন্যাদের আশ্রম থেকে চলে যেতে বলতে পারি না।"

আশ্রম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে শিক্ষার্থিনীদিগকে মা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেন,—প্রসন্নমনে মাতাপিতার সেবা করবে, ভাই বোনদের আদরযত্ন করবে। কোন অবস্থাতেই গুরুজনের অবাধ্য হবে না। বাড়ী গিয়েও প্রতিদিন ভোরে আশ্রমের মত ঈশ্বরের নাম স্মরণ করবে, অসম্ভব না হলে গীতার কয়েকটি শ্লোক পাঠ করবে। অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সকলকে শোনাবে।

বিবাহযোগ্যা কন্যাদিগকে মা বলিয়া দিতেন,—শ্বশুরশাশুড়ী যতদিন জীবিত থাকবেন তাঁদের সেবাযত্ন সর্বপ্রধান কর্তব্য, তারপর স্বামী আর আত্মীয়পরিজন। তোমার স্বামী—আগে তোমার শাশুড়ীর ছেলে, তারপর তোমার স্বামী। সাবধান, তোমাকে হেতু করে যেন তাঁদের মধ্যে অপ্রীতির ভাব না আসে। তাঁদের সকলকে

নিয়েই তোমার নতুন সংসার হবে, মা, সকলেই যেন তোমার ব্যবহারে প্রসন্ন থাকেন। আমার মা সারদার শিক্ষা—সকলকে খাইয়ে তবে নিজে খাবে, অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আগে দেখবে। স্বামীর কুটীরকেও স্বর্গ বলে মনে করবে, অভাবে বিচলিত হবে না। স্বামীর ভাইবোনের পুত্রকন্যাকে আপনার সন্তানের থেকে আলাদা মনে করবে না। তবেই সংসারে শান্তিতে থাকতে পারবে, মা। আর একটি কথাও সর্বদা মনে রেখো, আশ্রমের প্রশংসা বা নিন্দে তোমাদের আচরণের ওপর নির্ভর করে। তোমাদের গুণে যেন আশ্রমের প্রশংসা হয়, তোমাদের মাতাপিতারও প্রশংসা হয়।

বস্তুতঃ, যাঁহারা মায়ের শিক্ষানুসারে চলিয়া স্ব স্ব পতিগৃহের শান্তি ও আনন্দবর্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে। বহু শ্বশুরশাশুড়ী মায়ের নিকট আসিয়া তাঁহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন, "মা, আপনার হাতে-গড়া মেয়েকে বধূরূপে পেয়ে আমরা যে কত সুখী হয়েছি, তা কি বলবো!" কেহ কেহ আবার স্ব স্ব কন্যাগণকেও আশ্রমে শিক্ষার্থিনীরূপে দিয়াছেন, আশ্রমের পরমহিতৈষী হইয়াছেন। আবার, কোন কোন কন্যার পতি পত্নীর নিকট দুর্গামায়ের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, ক্রমে শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশেষে মায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মপথের সন্ধানলাভ করিয়াছেন। বিবাহ হইয়াছে তখন তাঁহাদের পক্ষে ইহসংসারে শান্তিলাভের হেতু এবং সংসারপারে যাইবার সেতুস্বরূপ।

আশ্রমবাসিনী প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীবীণাপাণি রায় লিখিয়াছেন:

"বয়স তখন আমার দশ, ছিলাম অত্যন্ত চঞ্চল। বাবা মা থাকতেন বৈদ্যনাথে। আমার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁরা আমায় পাঠালেন নিকটস্থ একটি স্কুলের বোর্ডিংয়ে। সেখানকার শিক্ষার পরিবেশ আমার বাবার মনোমত না হওয়ায় কিছুদিন পর আমাকে বাড়ী নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সংবাদ পেয়ে আমাকে এই আশ্রমে ভর্তি করে দিলেন।

সম্ভবতঃ বাংলা ১৩২৯ সালে। আশ্রম তখন কলিকাতার এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে।

"আজও মনে পড়ে সে বাল্যস্মৃতি। আশ্রমকে একেবারে নিজের বাড়ী, আশ্রমবাসিনীদের নিজের দিদি আর ছোট বোন, আশ্রম-সম্পাদিকা ৺শ্রীশ্রীদুর্গামাতাকে আপন গর্ভধারিণী এবং আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী ৺শ্রীশ্রীগৌরীমাতাকে যেন আপনার ঠাকুমার মত করেই পেলাম। কোন স্কুল বোর্ডিং যে এইরূপ আপন গৃহের ন্যায় প্রিয়স্থান হতে পারে এবং তথাকার অধিবাসিনীগণ যে এমন আপন হতে পারেন আজ পরিণত জীবনেও ভেবে বিস্ময় অনুভব করি।

"আশ্রমে ছিলাম পাঁচ বছর। সন্ন্যাসিনী মা ও দিদিরা ছাড়া সে সময় আশ্রমে আমরা প্রায় চল্লিশটি মেয়ে ছিলাম। এই আশ্রমেই আমরা লেখাপড়ার সাথে সাথে দৈনন্দিন জীবনের সবরকম কাজকর্ম আচারব্যবহার শিখেছি,—গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করা, সমবয়সীদের সাথে প্রীতির ব্যবহার, ছোটদের স্নেহযত্ন করা—এ সবই আমরা শিখেছিলাম দিদিদের কাছে। আর পেয়েছিলাম সকলের কাছে এত স্নেহভালবাসা যে চল্লিশ বছর আগে আশ্রম ছেড়ে এসে আজও সে সব কথা মনে হলে কত আনন্দ পাই।

"আজ বারবার মনে পড়ে মায়ের (শ্রীশ্রীদুর্গামার) ভালবাসা তাঁর কন্যাদের উপর কত গভীর ছিল।...যে কেহ মার কাছে এসেছে প্রত্যেকে মনে করেছে যে, মা তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, তার কল্যাণচিন্তাই মা সর্বাপেক্ষা বেশী করে থাকেন, এই ছিল তাঁর মাতৃত্বের এক অপরূপ মাধুর্যময় ধারা। সর্বদুঃখের প্রশান্তি মিলত মার স্নেহক্রোড়ে।

"সেই মহিমময়ী মায়ের অহেতুক স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে আজ আমার জীবন ধন্য। আমার জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল সকলই ধন্য হয়েছে মাতৃকৃপালাভে।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার জনৈক ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ একবার আশ্রমে

আসিয়াছেন, আলোচনাপ্রসঙ্গে দুর্গামাকে বলেন,— শুনেছি আপনারা আশ্রমের মেয়েদের খুব সেবাযত্ন করেন, তাদের জন্য যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করেন। এর প্রতিদান কিছু পান কি?

মা বলিলেন,—বহুর মধ্যে একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। এই তিন-চার দিন আগেই চট্টগ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসেছিল। মাতৃহীনা, পিতা বর্মায় চাকরী করতেন। কন্যাকে আশ্রমে রেখেছিলেন, বিবাহের পূর্বে আশ্রম থেকে নিয়ে যান। মেয়েটি সুশীলা, আমার খুবই অনুগত ছিল। স্বামী বোম্বেতে চাকরী করেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে ক'দিনের জন্যে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। শিয়ালদায় এক হোটেলে এসে উঠেছেন। কলকাতা-বাসের মেয়াদ একটি দিন মাত্র, অনেক জিনিষ কেনাকাটার ফর্দ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ছাত্রী অনুরোধ করে স্বামীকে,— আমায় একটিবার আশ্রমে নিয়ে চল। মাকে আর দিদিদের দণ্ডবৎ দিয়েই চলে আসব, দেরী হবে না। স্বামীর আপত্তি— সময়াভাব। ছাত্রীও কাকুতিমিনতি জানায়,—কলকাতা হয়ে যাচ্ছি, মার সঙ্গে একবার দেখা হবে না! আবার ক'বছর পর আসব কে জানে! লক্ষ্মীটি চল। স্বামীকে অগত্যা লইয়া আসিতেই হয়। পথিমধ্যে মায়ের জন্য একখানি লালপাড় সাড়ী, দামোদরজীর জন্য কিছু মিষ্টি কিনে এনেছে। সময় সংক্ষেপ, কিন্তু এই সাক্ষাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দের সীমা রইলো না।

চট্টগ্রাম থেকে বোম্বে, কলকাতায় মাত্র কয়েকঘণ্টার বিশ্রাম। কাজও প্রচুর, তার মধ্যেই আমাদের মেয়ে যে অনিচ্ছুক স্বামীকে নিয়ে ক্ষণিকের জন্যও একবার আশ্রমে এলো, আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেল, এতেই তো প্রমাণ দিচ্ছে, আশ্রম থেকে দূরে গিয়েও আশ্রমের প্রতি তার আকর্ষণ এবং কৃতজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, আমাদের ভালবাসা সে ভুলতে পারে নি। অধিকাংশ ছাত্রীই, এমন-কি বিদ্যালয় বিভাগের ছাত্রীগণও অনেকে যে আমাদের ভুলে যায় না, আশ্রমের প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভালবাসা অব্যাহত থাকে,

এটাই আমাদের কাছে মস্ত বড় প্রতিদান। শিক্ষয়িত্রীদের প্রতি ছাত্রীদের এই ভাবটিই অমূল্য সম্পদ!

স্পর্শমণির সংস্পর্শে রূপান্তরিত এক দুরন্ত কন্যা।—

ভক্তিমতী এক বৃদ্ধা আশ্রমে আসিতেন, আমরা তাঁহাকে পিসীমা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার ভ্রাতার এক দৌহিত্রীর কথা দুর্গামাকে প্রায়শঃ বলিতেন। কন্যাটি মাতৃহীনা, মাতামহ তাহার অভিভাবক। বড়ই দুরন্ত কন্যা, বিদ্যার্জনে অনিচ্ছুক। এইপ্রকার নানাকথা শুনিয়া দুর্গামা তাহাকে আবাসিক ছাত্রীরূপে আশ্রমে গ্রহণ করিতে ভরসা পাইলেন না। একদিন মায়ের নিকট পিসীমা আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলেন, "জানো দুর্গামা, মেয়েটাকে···হোষ্টেল থেকে নাম কেটে দিয়েছে। এমন অবাধ্য অমনোযোগী মেয়েকে ওরা আর রাখবে না। মা-বাপ নেই, কে ওকে দেখবে এখন? দুর্গামা, তুমি ওকে পায়ে স্থান দাও, লেখাপড়ার দরকার নেই, ওকে শুধু একটু আশ্রয় দাও।"

বৃদ্ধার অনুরোধ উপেক্ষা করা আর সম্ভব হইল না মায়ের পক্ষে। কন্যাকে আশ্রমে স্থান দিতেই হইল। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাহার আচরণে আশ্রমবাসিনীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, অথচ মা তো কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, বলিলেন, "বেশ, ও আমার কাছেই থাকবে, আমিই ওর দায়িত্ব নিলুম।" ক্রমে কন্যা এইস্থানের পরিবেশ এবং মায়ের স্নেহের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। মাও বুঝিলেন, তাহার মধ্যে কোমলভাব আছে, অন্যের জন্য প্রাণে দরদ আছে। দুই-একটি শিশুর স্নানাহার, লালনপালনের দায়িত্ব তাহাকে দেওয়া হইল। মায়ের সেবাও সে করিত। দৌরাত্ম্য ধীরে ধীরে শিষ্টতায় পরিণত হয়, পাঠ্যপুস্তক লইয়াও সে মায়ের নিকটে বসে।

এইভাবে অতিবাহিত হয় তিন-চারি বৎসর। বৃদ্ধ মাতামহ একদিন আসিয়া বলেন, "দুর্গামা, আমি মরে গেলে ওর কি উপায় হবে, ভেবে ওর বিয়ের চেষ্টা করছি। পাত্রপক্ষরা পশ্চিমে থাকেন। পরে হয়তো অবোধ মেয়েটাকে তাঁরা বিদেয় দেবেন, আমায় দুষবেন,

এই ভয়ে আগেভাগেই আমি পাত্রের পিতাকে ওর গুণের সম্বন্ধে নির্ভেজাল সত্যি কথা বলে এসেছি। বলেছি—পড়াশুনোয় রুচি নেই, বড়ই দুরন্ত মেয়ে। প্রথমে যে স্কুল-হোষ্টেলে ভর্তি করে দিয়েছিলুম, তাঁরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সারদেশ্বরী আশ্রমে দুর্গামা ওকে আশ্রয় দিয়েছেন, ওকে স্নেহ করেন, বলেন—ও দুষ্টু হলেও, ওর প্রাণটা সরল। এ ছাড়া ওর কোন ভাল সার্টিফিকেট নেই। সব শুনে পাত্রের পিতা বললেন, "আমার এক বন্ধুর কন্যা সারদেশ্বরী আশ্রমে ছিল, শুনেছি, ওঁদের শিক্ষা ভাল। আমার ঘরে আই. এ., বি. এ. পাস-করা পুত্রবধূরা রয়েছেন, এবার আশ্রমের বে-পাস একটি মেয়ে নিয়ে দেখি।"

দুর্গামার আশীর্বাদ, কন্যাটিরও সৌভাগ্য, শীঘ্রই তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইল। প্রায় দুই বৎসর পরে মাতামহ আসিয়া বলেন, "শুনুন দুর্গামা, আপনার মেয়ের খবর। অত দূরের পথ, খুশিমত তো যেতে পারি না, এবার নাত্‌নীকে দেখতে গিয়েছিলুম। ছেলের বাপকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমার বে-পাস নাত্‌নী আপনাদের একটু সেবাযত্ন করতে পাচ্ছে কি?' কি জবাব পেলুম, জানেন? তিনি সহাস্যে বললেন, 'চাটুয্যে মশাই, বড় ছেলেদের বে দিয়ে আমি পুত্রবধূ এনেছি। ছোট ছেলেকে বে দিয়ে আমি 'মা' পেয়েছি। মায়ের সেবাযত্নে তার বুড়ো ছেলে ভরে আছে।"

বৃদ্ধ মাতামহের নয়নকোণে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়, বলেন, "দুর্গামা, ভাগ্যিস্, মেয়েটাকে আপনার আশ্রয়ে রেখেছিলেন! আপনার আশীর্বাদে মেয়েটা তাই উতরে গেল।"

এইরূপে, একদিকে যেমন দুরন্তপ্রকৃতি ও শিক্ষাবিরাগী অনেক কন্যা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই সুসংস্কারসম্পন্না উচ্চ আধারের কন্যাও অন্তেবাসিনী হইয়াছেন। আশ্রম-মাতারূপে দুর্গামা সকলকেই স্নেহক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন, কন্যানির্বিশেষে পালন করিয়াছেন, এবং তাহাদের মানসিক, চারিত্রিক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনে সহায়তা করিয়াছেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দুর্গামা যখন মাত্র কৈশোরোত্তীর্ণা, সেই সময় হইতেই বালক-যুবক-বৃদ্ধ-নরনারী সকলকে তিনি পুত্রকন্যাবৎ জ্ঞান করিতেন এবং 'মা' সম্বোধনে সাতিশয় প্রীত হইতেন। তাঁহার অন্তরের অপর এক আকিঞ্চন ছিল—বালক ও যুবকদিগকে পবিত্রতা এবং ত্যাগমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। স্বামিজী যেমন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—'লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস-রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া' সমাজের সেবা করিবে, দুর্গামার আন্তরিক অভিলাষও ছিল তদ্রূপ।

জীবনের প্রথমপাদে মায়ের এই মহৎ অভিলাষ ছিল অতিশয় ব্যাপক। কেবল স্নেহভাজন সন্তানগোষ্ঠী সম্পর্কেই নহে, পরিচিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেও মা ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদের সকলেই দেহমনে পবিত্র থাকুক, কৌমার্য পালন করুক। সন্তানদিগের কল্যাণে তিনি ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেন।

তৎকালে মায়ের সন্তানসংখ্যা ছিল স্বল্প। প্রবাসী সন্তানগণকে অশেষ আশীর্বাদ ও উৎসাহ দান করিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি স্বহস্তে পত্র লিখিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এইসকল পত্রমধ্যে উচ্চভাবই পরিস্ফুট থাকিত। জনৈক সন্তানকে লিখিত নববর্ষের একখানি পত্রের কিয়দংশ—"বাপ আমার, নববর্ষের স্নেহাশীষ গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও তোমাদের মা এই তিনের আশীষ সহায়তা করে তাঁদের দিকে টেনে নিক। ত্যাগী থেকে পবিত্র থেকে তাঁকে ডাক, তাঁকে পাও,—এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা দুঃখী মায়ের আর কিছু নেই। গুরুইষ্টের করুণায় সবই সফল হয়। মন যেন কভু নিম্নগ না হয়, তার জন্যই সাধন। বর্তমান মনটি যেমন মা-কাঙ্গাল, এমনতর কাঙ্গাল থেকেই জগন্মাতার চরণে শরণাগত হও।··· শ্রীভগবান শক্তি দিন, ভক্তি দিন। আর মায়ের প্রতি—দিন।"

মায়ের বয়স যখন বিশ বৎসর হয় নাই, তখন এক পত্রে লিখিয়াছেন, "মনে খুব দৃঢ়তা রাখিবে যে, যে পথে নামিয়াছি, এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে পারি ভাল, না হয় ক্রমশঃ হইবে, কিন্তু পিছন দিকে না ফিরি। ভাবটি ঠিক রাখা চাই, উদ্দেশ্য ঠিক রাখা চাই।"

পরবর্তিকালেও মা সন্তানদিগকে অনুরূপ পত্র লিখিয়াছেন, "স্নেহের আধার বাপধন, গৌরীদামোদরের পদারবিন্দে মনপ্রাণ সঁপিয়া দাও বৎস, 'মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে'। বাবাগো, সন্তানের জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে। কাঙ্গাল ছেলের অকপট মাতৃবন্দনা এই মাতৃবন্দনা সূচনা হয়ে পুত্র মাধবের চরণপরশের সার্থকানুভূতি লাভে ধন্য হউন। 'বহু জন্মানি পুণ্যানি রতি শ্যামসুন্দরে'— সব সরে যাক —বিষয়মধু তুচ্ছ হোক। শুধু—ইষ্ট সাধন—শুধু 'ধ্যানমূলং গুরোঃ পদম্'।...প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা উন্নত জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছ বা হবে—এ কথা ভেবেও আমার পরম শান্তি হয়। প্রভু তোমায় সুযোগ দিন, সাধনভজন সময় পেলেই করবে বাবা।"

মায়ের নিকট হইতে এইরূপ প্রেরণা লাভ করিয়াও অবশ্য সকল সন্তানের পক্ষে তাঁহার অভিলষিত ত্যাগের পথে অবিচল থাকা সম্ভব হয় নাই। উত্তরকালে অনেকেই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সৌভাগ্যেই শেষরক্ষা হইয়াছে। স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের জীবনপথের এই ব্যর্থতা মায়ের আদর্শনিষ্ঠ প্রাণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আদর্শকে খর্ব করিয়া স্নেহকে তিনি কখনও প্রাধান্য দেন নাই। কেহ যদি বলিত যে, আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করিতে হইলে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। মা বিস্মিত হইয়া বলিতেন, "সংগ্রাম! কিসের সংগ্রাম? আমার জীবনে তো কখনও কোন সংগ্রাম বুঝতে পারি নি।"

অভিজ্ঞতা হইতে মা যখন বুঝিলেন, গুরুকৃপায় যদিও কোন কোন সুকৃতিসম্পন্ন সাধকের জীবনে ইন্দ্রিয়ের জাগরণই হয় না, তথাপি সকল নরনারীর ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা দিতেন—'রাজার রাস্তা' অর্থাৎ সমাজানুমোদিত

বিবাহ। ইহার সহিত এই নির্দেশটিও দিতে ভুলিতেন না, 'এক-নারী সদাব্রতী, একাহারী সদাযতি, অপর সকল নারী মাতৃবৎ।' সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা যাহাতে আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করেন, সংসারে থাকিয়াও সাধনভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সেই শিক্ষা তিনি চিরকালই তাঁহাদিগকে দিয়াছেন।

কন্যাগণ সম্পর্কেও ব্রহ্মচর্যের পথে অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়া মা যে সর্বক্ষেত্রেই সফলকাম হইয়াছেন, এমন নহে। তিনি জানিতেন —এই ত্যাগবৈরাগ্যের পথে থাকিবে মাত্র 'কোটিতে গুটিক', তথাপি তিনি ইচ্ছা করিতেন, এই মহান্ উদ্দেশ্যে তাঁহার নির্বাচিত কোন কন্যাই যেন আশ্রম ত্যাগ করিয়া সংসারমুখী না হন। এই কারণেই আশ্রমের শুদ্ধ পরিবেশ এবং তাঁহার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন কন্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। মনে করিতেন, "আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, যুদ্ধে আমি পরাজিত।"

সহকর্মিণী জনৈকা সন্ন্যাসিনীকে তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমি ব্যর্থ, আমি পরাজিত, অতি সত্য। তত্রাচ আমি আশ্রম-কল্যাণচিন্তায় ডুবিয়া গেলাম। উন্মাদনা—কন্যাদের কল্যাণচিন্তায়। মন্ত্রের সাধন আমার শরীরপতন পর্যন্ত।—আমি পশ্চাৎপদ নহি। যদি দেশের লোক একটাকে বোঝাতে পারি, মেয়ে শুধু বিষয়চিন্তার জন্য নহে, ব্রহ্মজ্ঞা নারী, গুরুমাতা নারী, নিষ্কাম নারী জাতিকে আলো দেখায়ে নিয়ে যায়…।"

উক্ত পত্রে ব্যর্থতার পীড়া তীব্র হইলেও সফলতার প্রসন্নতাতেও মায়ের মন যে কতখানি পরিপূর্ণ ছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার লিখিত বহু পত্রে।

বিদেশ হইতে জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে মা লিখিয়াছেন, "মাগো, এমন মা-কাঙ্গাল আমি আর দেখি নাই, যেন খুকীর মত মন, যেন মাখনের মত নরম, ফুলের মত সৌরভযুক্ত। মনে হয়, মা এনেছেন

আমার জন্য। কত কন্যা মানুষ করলুম, এমনটি যে বিরল, জননি। বিড়ালীর ছানা মা-বিনা জানে না…।”

গিরিডি হইতে অন্য একজনকে লিখিয়াছেন, “আশ্রম উদ্যানে তুমি শ্বেত রজনীগন্ধা, মায়ের করুণাসায়রে জলপদ্ম। স্থলে তুমি শিউলিবৃক্ষ, একটু নাড়া দিলেই ঝর ঝর করে অশ্রু পড়ে সুবাসিত পুষ্প। জগন্নাথ তোমায় আমায় দিয়াছেন, আমার সকল প্রীতি দিয়ে তোমায় গড়েছি।…”

কিন্তু, ব্যর্থতার বেদনা এবং সাফল্যের আনন্দ,—কোনটিই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। আংশিক বিফলতা তাঁহাকে সাময়িক নিরুৎসাহ করিলেও, অন্তরে তিনি বিশ্বাস করিতেন – যে মহান্ মাতৃকল্যাণ-যজ্ঞে তিনি ব্রতী হইয়াছেন, তাহার হোমশিখা অম্লান রাখিতে প্রয়োজন ত্যাগ ও পবিত্রতার মন্ত্রে দীক্ষিত কন্যাকুল, এবং এক এক করিয়া তাঁহারা আসিবেই। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাসই প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার আর এক পত্রে “আমি যে…তাঁর – সেই পুরুষোত্তমের আশ্বাস পেয়েছি,…পেয়েছি তাঁর আশীর্বাদ, করুণা,— দেখেছি অন্ধকারে লক্ষ প্রদীপের আলো।”

শিলঙে

প্রশস্ততর স্বভবনে আসিয়াও আশ্রমে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনানুযায়ী স্থানাভাব অনুভূত হইতেছিল। কারণ, আশ্রমের এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আশ্রমের পশ্চিমদিকে কিঞ্চিদধিক তিন কাঠা পরিমিত ভূমি শূন্য পড়িয়াছিল। এই ভূমিক্রয় বিষয়ে পরামর্শসভার সদস্যদিগের সহিত মায়ের আলোচনা হয়। কিন্তু, জমির স্বত্বাধিকারী উহা বিক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় সদস্যগণের পরামর্শে কলিকাতা কর্পোরেশনের মাধ্যমে ল্যাণ্ড একুইজিশন কালেক্টরের নিকট ভূমি অধিকার করিবার জন্য আশ্রমের পক্ষ হইতে আবেদন করা হয়। এই বাবদে প্রয়োজন হয় প্রায় বারো হাজার টাকা।

১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে দুর্গামা প্রধানতঃ এই অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই শিলঙ গমন করেন। অবশ্য, তথাকার কতিপয় ভক্ত মাকে আমন্ত্রণও জানাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মা বাসন্তী মহাষ্টমী দিবসে কামাখ্যাপীঠে পূজাভোগ নিবেদন করিয়া দেবীর তুষ্টিবিধান করেন।

এই যাত্রাতেও মা প্রথমে ভক্ত বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের বাটীতেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই-তিন দিন পরেই রায়-সাহেব প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্যের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার নবনির্মিত গৃহে মাকে যাইতে হইল। মজুমদার মহাশয় ইহাতে সখেদে বলেন, "আমার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। মা যে ক'দিন থেকে গেলেন, তাতেই আমি কৃতার্থ।" রায়সাহেব তখন বিপত্নীক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত, পুত্রকন্যাগণও কেহ নিকটে ছিলেন না। সুতরাং মাকে স্বগৃহে পাইয়া বৃদ্ধ আনন্দিত হইলেন। ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ স্বীয় ব্যবহারের জন্য রাখিয়া সমগ্র বাটীই তিনি মাতৃবৃন্দের ব্যবহারের জন্য দিলেন। মাতৃদর্শনে সমাগত ভক্তবৃন্দের পক্ষেও এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইল।

শিলঙ-বাসী নরনারী মায়ের সান্নিধ্যলাভে মহাপ্রসন্ন। কেহ কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করিলেন। অর্থসংগ্রহ ব্যাপারেও অনেকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মিসেস পি. সি. দত্ত, জে. এন. চক্রবর্তী ও তদীয়া পত্নী, কুসুমলতা দেবী, সুহাসিনী রায়, গিরিবালা রায়, লাবণ্যপ্রভা বড়ুয়ানী, হরিদাস গোস্বামী, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ দে-প্রমুখ অনেক সহৃদয় নরনারী তাঁহাকে আর্থিক এবং নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহে গৃহে গিয়াও অর্থসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে মিসেস পি. সি. দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈশাখমাসে স্থানীয় রামকৃষ্ণমঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তবৃন্দের আমন্ত্রণে মা তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নাতি-দীর্ঘ একটি ভাষণ দেন। স্থানীয় হরিসভার অধিবেশনেও শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ বলিয়া মা সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন। লাবান মহিলা সমিতিতেও আমন্ত্রিত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কথা ও ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন।

শিলঙে অবস্থানকালে আসামী এবং বাঙ্গালীনির্বিশেষে সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তগণ মায়ের দর্শনে আসিতেন। এক পত্রে মা এই সময়ে লিখিতেছেন, "আসাম প্রদেশের মিঃ কে. এল বড়ুয়া ও তৎপত্নী যথেষ্ট অভ্যর্থনা দিয়াছেন। শিলঙ প্রবাসী কলিকাতা অঞ্চলের লোকের স্নেহযত্নের সীমা নাই। শ্রীহট্টের ভক্ত সন্তানগণ স্নেহনীড় রচনা করিয়া দিয়াছেন।··· আসাম দেশীয় মহিলারা বেশ, খুব ভাল লাগিয়াছে আমার।" তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরে মায়ের দর্শনার্থে কলিকাতা আশ্রমেও আসিয়াছেন।

শিলঙ হইতে অন্য এক পত্রে মা লিখিয়াছেন,—

"মা, এখান হইতে মন বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানকার নরনারীর চোখের জল আমার যাবার গতি ২।১ দিন কেবল পিছাইতেছে। কি করি, পিতৃসম বৃদ্ধ, পুত্রসম বালক, প্রৌঢ়া

মায়েরা, ছোট ছোট বধূরা সবাই বলেন,—চুপ থাকি। আমি যদি বলি 'আমি যাঁদের লোক তাঁরা টানিতেছেন, বৃদ্ধা মাতার জন্য প্রাণ অধীর হইয়া কাঁদিতেছে,' কেহ বিশ্বাস করে না। সবাই বলেন, 'পাষাণীর আবার মায়া দয়া!' শেষে তাঁহাদের চক্ষু আর্দ্র হয়—আমিও বিচলিত হই।"

শিলঙ হইতে প্রত্যাগমনকালে বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার তাঁহার অপর দুই কন্যাকেও শিক্ষার্থিনীরূপে মায়ের হস্তে অর্পণ করেন।

তাজহাটের ভক্তিমতী রাণী রাধারাণী দেবীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্গামাকে একবার স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। মায়ের শিলঙ হইতে ফিরিবার পথে তিনি তাহা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন।

রংপুর ষ্টেশনে রেলগাড়ী পৌঁছাইলে রাণীমাতার ভ্রাতা শ্রীভবানী প্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় বয়-স্কাউট সংঘ কুচকাওয়াজ-সহকারে দুর্গামাতাকে অভিনন্দন জানাইলেন। রাণীমাতার আতিথ্য মা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজবাটীর অভ্যন্তরে বাস করিলেন না। রাজবাটীর অদূরবর্তী একটি অতিথিভবনে মায়েদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল।

রাণীমাতার সাধুসেবার আয়োজন ছিল এক বিরাট ব্যাপার। প্রাতঃকালে পূজার উপচার—পুষ্প, মাল্য, ফলমিষ্টান্ন ও নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী বহন করিয়া আনিতেন পরিবারের কন্যাগণ এবং পরিজনবর্গ। রাণীমাতাও সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীভৈরবলাল এবং কখনও-বা রাজা বাহাদুর গোপাললাল রায়ও আসিতেন। সমগ্র দলটিকে যেন একটি সুন্দর শোভাযাত্রা মনে হইত। ভবানীপ্রসাদ স্বয়ং মোটর গাড়ী চালাইয়া প্রতিদিন মাকে বিভিন্ন স্থান দর্শনে লইয়া যাইতেন। কোন কোন দিন মা রাজবাটীতেও গমন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণী ও গৌরীমাতার জীবনকথা এবং ধর্মপ্রসঙ্গে তথায় সকলকে আনন্দ দান করিতেন। আশ্রমকন্যাগণ স্তবস্তোত্র ও সঙ্গীত শুনাইতেন। রংপুর সহরের মহিলা-সমিতির সদস্যাগণও

একদিন মাকে তাঁহাদের সমিতিগৃহে আমন্ত্রণ জানাইলেন এই স্থানেও মা শ্রীমাতার জীবনকথা আলোচনা করেন।

কলিকাতার আশ্রম এবং গৌরীমার জন্য মায়ের মন তখন উদ্বিগ্ন। চারিদিবস তাজহাটে অবস্থানের পর মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার স্বল্পকাল মধ্যেই রাণীমাতা তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আশ্রমের আবাসিক ছাত্রীরূপে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী

অদ্বৈতনিত্যবিগুণং পরমাত্মতত্ত্বং
শ্রীভক্তচিত্তসগুণং ভজনানুরূপম্।
কারুণ্যপুণ্যনিলয়ং যুগধর্মনিষ্ঠং
দীনার্তদুঃখিশরণং ভজ রামকৃষ্ণম্॥

বঙ্গাব্দ ১২৪২ সালের ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব, ১৩৪২ সালের এই তিথিতে তাঁহার নরদেহ ধারণের শততমবর্ষের জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা। গুরুদেবের প্রতি গৌরীমাতার ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম এবং অতুলনীয়। এই শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী পুণ্যোৎসব উপলক্ষে গৌরীমাতার নির্দেশানুযায়ী দুর্গামাতা বিভিন্ন সময়ে পঞ্চ-দিবস ব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

১১ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিথিপূজা দিবসে আশ্রমভবনে সন্ন্যাসিনী মাতৃমণ্ডলী বিশেষ পূজা, ভোগারতি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীসপ্তশতী পাঠ এবং হোমাদিকৃত্য উদ্‌যাপন করেন। সেই সন্ধ্যায় আশ্রমভবন আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব রূপ ধারণ করে; এতদ্ব্যতীত, আরাত্রিক, স্তবস্তুতি ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠানও হয়। এইভাবে দিবসব্যাপী বিবিধ মাঙ্গলিক কৃত্যসহযোগে জয়ন্তী মহোৎসবের উদ্বোধন হইল।

পরবর্তী ৯ই আশ্বিন তারিখে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের প্রশস্ত গৃহে নাটোরের মাননীয়া মহারাণী ইন্দুমতী দেবীর সভানেত্রীত্বে এক "মহিলা সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। সুলেখিকা নিরুপমা দেবী, প্রভাময়ী মিত্র, মিসেস্ কে. সি. দে এবং প্রাক্তন ছাত্রীবৃন্দ সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা আলোচনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। সঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ এবং আবৃত্তি করেন আশ্রমকুমারীবৃন্দ।

১১ই আশ্বিন উক্তস্থানেই মনস্বী অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় "সাধারণ সম্মেলনে" পৌরোহিত্য করেন। নবযুগ-প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান বিষয়ে ভাষণ দান করেন বহুগ্রন্থরচয়িত্রী অনুরূপা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ বক্তা। উভয় দিবসেই গৌরীমাতা, দুর্গামাতা এবং বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই আশ্বিন আশ্রমভবনে শাস্ত্রপাঠ এবং ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে এক সভার অধিবেশন হয়। ১৮ই আশ্বিন তারিখে সহস্রাধিক নরনারী আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে গৌরীমা একটি মনোজ্ঞ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা আকাশবাণী হইতে তাহা বেতার-যোগে প্রচারিত হয়, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল: "প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতায় আচ্ছন্ন ও জড়তায় অভিভূত হয়ে মানুষ তার নিত্য কর্তব্য ভুলে যায়, সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ হয়ে স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি মোহমুগ্ধ মানুষকে বুঝিয়ে তার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর শতবার্ষিকীও আজ তেমনি সমগ্র মানবকে সেই শাশ্বত সত্য স্মরণ করতেই বলছে।···কত মত, কত পথ, কত বিপরীত ধারা,—সব এসে মিলেছে তাঁর মাঝে। ভেদ নেই, দ্বেষ নেই, সংঘর্ষ নেই,—এক মহাসমন্বয়, এক বিরাট পূর্ণতা··· ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্যোগে মধ্য-কলিকাতায় আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর "মহিলা-সম্মেলনে" ভাষণদানের জন্য দুর্গামা আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলামাহাত্ম্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুর্গামার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল,—

"···আমি মনীষী নই, বাগ্মী নই, নূতন কিছু বাণী শুনাইবার ধৃষ্টতাও আমার নাই। কিন্তু তাঁহার পুণ্য কথা যত বেশী বলা যায়, যত বেশী শুনা যায়, ততই মঙ্গল।···

"আজি হইতে শতবর্ষ পূর্বে সেই অনাদি অনন্ত মহাপুরুষ নশ্বর নরদেহ ধারণপূর্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জীবের কল্যাণে।...

"তিনি বিশ্ববাসীকে নিজের সত্যানুভূতি শুনাইলেন, 'পবিত্র দেহমনে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। মানুষ যেমন মানুষকে চর্মচক্ষে দেখিতে পায়, তেমনি তাঁহাকেও দেখা যায়। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে জানিয়াছি, তাঁহাকে পাইয়াছি। উপযুক্ত লোক পাইলে তাঁহাকেও দেখাইতে পারি।...

"কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, নারীকে তিনি ধর্মসাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ মনে করিতেন, নারীকে তিনি অবজ্ঞা করিতেন।"

এই কথার প্রতিবাদে দুর্গামা বহু দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন, "যাঁহারা এমন কথা প্রচার করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে সঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মানবহৃদয়ের কামনা-পশুকেই ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, নারীকে নহে।

"এই যুক্তির স্বপক্ষে তাঁহার জীবনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়া গিয়াছে।—(১) প্রথমতঃ, মায়ের গর্ভে যাঁহার জন্ম এমন কোন জ্ঞানী মাতৃজাতির নিন্দা করিতে পারেন না...। (২) দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করিলে সকলের বড় যে কথাটি মনে আসে তাহা—'শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের পূজারী'। (৩) নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের পুত্র—সমাজের অবজ্ঞাত নারী ধনী-কামারনীর স্বহস্তপ্রস্তুত আহার্য তিনি সমাজের বিধি অগ্রাহ্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন অস্পৃশ্যা শবরীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রেমের দান ভক্তবৎসল রাঘব সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪) নারায়ণ সাক্ষী করিয়া পঞ্চমবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীকে সহধর্মিণীত্বে বরণ করিয়া লইলেন। (৫) তারপর দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে কৈবর্তবংশীয়া পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে—পূজারিরূপে। (৬) দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর আবির্ভাব হইল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া একখানা, দুইখানা করিয়া

চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধন সন্তানকে আয়ত্ত করাইলেন। এই 'নারী'ই সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার' বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। (৭) শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নারীগুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীকে শিষ্যার গৌরবও দিয়াছেন।...(৮) এমন কি, সামান্যা পতিতা রমণীর মধ্যেও তিনি জগজ্জননীর প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সমাধিস্থ হইতেন। (৯) দক্ষিণেশ্বরের লীলার সময়ও পরমহংসদেব পত্নীকে ত্যাগ করেন নাই, অথবা অবহেলা করেন নাই। বরং তাঁহাকে নিজের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে নহবতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন।...নারীতে কামিনীবোধ তাঁহার কখনও ছিল না। সহধর্মিণীতে স্ত্রীবোধও ছিল না। বিশ্বের যত নারী সকলেই শক্তিরূপিণী মা...।

"এইবার মাতৃ-সাধনায় পূর্ণাহুতি দিলেন। নিজের তরুণী ভার্যাকে, তথা শিষ্যাকে, জগজ্জননীরূপে ষোড়শোপচারে 'ষোড়শী পূজা' করিলেন। পায়ে অঞ্জলি দিলেন, প্রণাম করিলেন, মায়ের মহিমায় সমাধিস্থ হইলেন। নারীকে এত সম্মান আর কেহ কোনদিন দেন নাই, এমন শ্রদ্ধা কেহ নিবেদন করেন নাই।...

"করুণার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পবিত্রতাস্বরূপিণী মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী এবার বিশেষ করিয়া ভারতের লুপ্তগৌরব নারীজাতিকেই টানিয়া তুলিতে আসিয়াছিলেন...।"

এতদ্ব্যতীত, দুর্গামা শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' এবং 'জ্যান্ত জগদম্বার সেবা'র কথাও তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন।*

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

* দুর্গামার সম্পূর্ণ অভিভাষণটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (৪-ঠা বৈশাখ, ১৩৪৪) প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিভিন্ন স্থানে

আশ্রমসংলগ্ন একখণ্ড ভূমিক্রয়ের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূমির স্বত্বাধিকারী প্রবল আপত্তি ও বিরোধিতা করায় এবং আইনের নিয়মতান্ত্রিকতার জন্যও প্রায় 'তিন বৎসর কালক্ষেপ হয়। 'সপারিষদ লাটসাহেব মনে করেন যে, জনসাধারণের হিতার্থে —অর্থাৎ সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রসারকল্পে এই ভূমিখণ্ড প্রয়োজন'— এইপ্রকার বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন সময়ে তিনবার কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। সহৃদয় দেশবাসীর অর্থানুকূল্যে এই বাবদে প্রায় বারো হাজার টাকা আশ্রমের পক্ষ হইতে যথাসময়ে রাজকোষে জমা দেওয়াও হইল। অবশেষে, কলিকাতার ল্যাণ্ড একুইজিসন কালেক্টর 'আশ্রমের পক্ষে অত্যাবশ্যক' বলিয়া এই ভূমিখণ্ড অধিকার করেন এবং ১৩৪৩ সালের ১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার আশ্রমের নিকট ইহার স্বত্বস্বামিত্ব হস্তান্তর করেন। এই ভূমিক্রয়ের ব্যবস্থাদিতে এবং আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এটর্নী সুশীলচন্দ্র সেন যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সালেই বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে দুর্গামা কিছু সংখ্যক ছাত্রীসহ চুনার গমন করেন।

গঙ্গাতীরে অবস্থিত জনবিরল স্থান চুনার। মা তথায় নিত্য গঙ্গাস্নান এবং সকাল সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু চুনারের জল সহ্য না হওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ভীষণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্থানীয় চিকিৎসক 'এমেটিন' ইনজেকসন দিলেন, ফলে আমাশয়ের উপশম হইল বটে, কিন্তু অন্য এক কষ্টদায়ক উপসর্গ দেখা দিল। পাদমূল স্ফীত হইয়া এমন ব্যথা হইল যে, মা চলচ্ছক্তিরহিত হইলেন। তথাকার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রেল কোম্পানীর বিশেষ ব্যবস্থায় একখানি

রিজার্ভ কামরায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হইল। ষ্টেশনে 'ইনভেলিড চেয়ারে'র সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ রোগনির্ণয় করিলেন—পাদমূলের অস্থির অভ্যন্তরে দোষ জন্মিয়াছে। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় রোগ হইতে মা অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু অতঃপর চিকিৎসকের নির্দেশেই পদযুগল কর্মক্ষম রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন তাঁহাকে প্রাতর্ভ্রমণ করিতে হইত। সঙ্গে একজন কন্যা থাকিতেন। অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলে পথিমধ্যে কোনও স্থানে বসিয়া মা বিশ্রাম লইতেন এবং পরে প্রত্যাবর্তন করিতেন রিক্সায়। মায়ের এই অভ্যাস উত্তর-কালেও অব্যাহত ছিল এবং এই সূত্রে বহু নূতন লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইত।

কিন্তু চিকিৎসাসত্ত্বেও মা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না-হওয়ায় গৌরীমা চৈত্রমাসে তাঁহাকে গিরিডি পাঠাইলেন। মা তথায় গিয়া বাস করেন বারগণ্ডার 'গোলকুঠী' নামক বাটীতে।

জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর পর শারদীয়া পূজা-অন্তে পুরী যাত্রার অবকাশ পাইলেন। এই যাত্রায় তথায় 'সিন্ধুনিবাসে' মা অবস্থান করেন।

কার্তিক মাসে জগন্নাথদেবের বিশেষ পূজা প্রচলিত। রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে ডালকেয়া, খেয়াকেয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজবেশ হয়। এই কয়দিবসই জগন্নাথদেব ও বলভদ্রদেব তাঁহাদিগের স্বর্ণময় হস্তে যথা-ক্রমে শঙ্খচক্র ও হলমুষল ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত, দেবতাত্রয়কে সুবর্ণচরণ, বিরাটাকার সুবর্ণমুকুট ও কণ্ঠমাল্যে সুসজ্জিত করা হয়। লোকসমাগমও অধিক হইয়া থাকে এইসময়।

প্রাতে এবং সন্ধ্যায় জগন্নাথদর্শনে মায়ের দিনগুলি অতি আনন্দে অতিবাহিত হয়।

পুরী হইতে জনৈকা কন্যাকে মা লিখিয়াছেন (১৩৪৪)—

"মাগো, আমি বড় আনন্দে বড় তৃপ্তিতে দীর্ঘকাল পর আনন্দ-ময়ের দরশন পাচ্ছি। তাঁর শান্ত প্রসন্নতা আমায় সাময়িক বিষয়চিন্তা

হতে বিরতি দিয়েছে মা। মনে হয় এখন দীর্ঘদিনের পর প্রথম সাক্ষাতের আভাষ কাটে নি, যা নিবেদন করবার তা ভুল হয়েছে। তাঁকে দেখে ভরপুর হয়েছি। মা আমার! বিষয়বিশেষে মন ন্যস্ত থাকলেও তিনি মহারাজ, তিনি আরাধ্য, তিনি নিজ ইষ্ট – তাঁর দর্শনে ক্ষোভ দূরীভূত, তিক্ততা তিরোহিত। উদার প্রসন্নতায় আমিও সৌম্যতা লাভ করেছি—কিন্তু সাময়িক। কবে আমি স্থায়ীভাবে তাঁর অনুভূতিরূপ বিভূতিতে ঢেকে থাকবো · আমার সত্তায় পৃথকতা থাকবে না। তোমরা সবাই বল আমি তাঁর বিরাটে মিশে যাই।··· প্রশান্ত দেবতা আমায় দেখে বড় খুশী, ইহার অনুভূতি আমি পেয়েছি ···এ আমার অহং নয়, এ আমার অবলম্বন—উপায়—আশ্রয়। আমায় তিনিও চান, তাই অন্য কিছু আমায় স্থায়ীভাবে নিতে পারে না।”

একদা মধ্যাহ্নে সমুদ্রস্নানকালে সহসা মহাবিপদ উপস্থিত হইল। প্রতিদিনের মত সেইদিনও মা সমুদ্রে স্নান করিতেছেন। সঙ্গে কয়েকটি কন্যা, তন্মধ্যে অল্পবয়স্কা বালিকাও কয়েকটি রহিয়াছে। সকলেই স্নানান্তে তটভূমিতে উঠিয়া আসিলেন। মা বলিলেন, “মায়েরা, তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আরও একটু স্নান করে আসি।” সুতপাদেবীসহ মা পুনরায় গেলেন। সেইদিনের তিথিটি ছিল অমাবস্যার নিকটবর্তী, সমুদ্র উত্তাল। তথাপি সমুদ্রস্নানের কৌশল অনুসারে তাঁহাদের স্নান চলিতেছিল। কিন্তু অতর্কিতে একটি প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে তাঁহারা উভয়েই দূরে ভাসিয়া গেলেন। ক্রমশঃ দূর হইতে বহুদূরে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, সমুদ্রের প্রতিকূল স্রোত তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যখন বুঝিলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা আর তীরের নিকটবর্তী হইতে পারিতেছেন না। অবস্থা তখন আয়ত্তের বাহিরে। আশ্রমের জনৈক সেবক এবং একটি ভৃত্য নিকটেই স্নান করিতেছিলেন। সঙ্কটজনক অবস্থা বুঝিয়া তাঁহারা

উভয়েই সাহায্যের জন্য দ্রুত নিকটে গেলেন বটে, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে মাতৃদ্বয়কে লইয়া তীরের দিকে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

জীবন ও মরণের সন্ধিক্ষণে যখন এইরূপ এক অনিশ্চিত অবস্থা, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেহের সর্বশক্তি যখন নিঃশেষিত-প্রায়, সেই চরম মুহূর্তেও সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের আত্মসংবিৎ বিলুপ্ত হয় নাই। মা সেইসময় উচ্চৈঃস্বরে সন্তানটিকে বলিতেছেন, "বাবা, সুতপাকে বাঁচাও, ওর জীবন আগে রক্ষে কর।" অপরদিক হইতে সুতপাদেবীও চীৎকার করিতেছেন, "যেমন করে পারো তোমরা দুজনে মাকে বাঁচাও, আমার দিকে কাউকে আসতে হবে না। মায়ের জীবনের আগে কেউ নয়।"

নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও কোনপ্রকার ভীতিবিহ্বলতা নাই, স্বীয় জীবনরক্ষায় অগ্রাধিকারের কাতর দাবী নাই! আছে কেবল আশ্রমের কল্যাণে অপরের জীবনরক্ষার ব্যাকুল প্রার্থনা। উভয় মাতারই কয়েকটিমাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্য—কিন্তু বীজাকারে উহাই যেন মৃত্যুকে জয় করিবার অভীঃ মন্ত্র।

সমুদ্রের অবস্থা বিপজ্জনক বুঝিয়া স্থানীয় মৎস্যজীবী নুলিয়াগণ সেইদিন পূর্ব হইতেই দীর্ঘরজ্জু ও লাইফ-বেল্ট সহ তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। সন্তানটি উপায়ান্তর না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ও হস্তের ইঙ্গিতে তাহাদের ডাকিলেন। মুহূর্তমধ্যে তাহারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাতৃদ্বয়ের জীবন রক্ষা করিল। বাটীতে ফিরিয়া যথোপযুক্ত বখশিস্ দানে মা উদ্ধারকারীদিগকে তুষ্ট করিলেন।

এইপ্রসঙ্গে মা পরে বলিয়াছিলেন, "ঢেউ উত্তাল। বুঝতে পারছি যে, তীর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। কিন্তু তার মধ্যেও যতবার বড় বড় ঢেউ ওঠে ততবারই তাদের চূড়ায় রত্নবেদীর তিনমূর্তিকে দেখছি। বিপদের মধ্যে প্রভুর অতিনিকট স্পর্শ পেয়েছি তখন। কী জ্যোতির্ময় অপরূপ রূপ তাঁর! তিনিই যেন হাত ধরে কোলে করে তুলে আমায় তীরে নিয়ে এলেন।"

গৌরীমাতার মহাপ্রয়াণ

১৩৪৪ সালের পৌষমাসে গৌরীমাতার দেহ অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়ে। দুর্গামা ইহাতে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ বারাণসী গুপ্ত, কবিরাজ জ্যোতির্ময় সেন-প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ দ্বারা তিনি গৌরীমার দেহ পরীক্ষা করাইলেন। চিকিৎসকগণের মতে রোগ বার্ধক্যজনিত কাসি এবং দুর্বলতা। ঔষধপথ্যাদি পূর্বাপর চলিতে লাগিল আয়ুর্বেদমতেই। আশ্রম-বাসিনীগণও প্রাণপণে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অশীতিবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধার দেহের অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ আশ্চর্যবোধ করিতেন। কবিরাজ জ্যোতির্ময় সেন বলেন, "নাড়ীর যা অবস্থা, দেহ যে কিসের জোরে টি঺ঁকে আছে, তা তো বুঝতে পাচ্ছি না। তবে, এঁদের যোগের দেহ, সঠিক কিছু বলা যায় না।" ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "ইলেকট্রিকের তার পুড়ে গেলেও যেমন ঝুলতে থাকে, ছিঁড়ে পড়ে যায় না, মায়ের দেহের অবস্থা অনেকটা তাই। আমাদের ডাক্তারী জ্ঞানে দেখ্‌ছি, শরীরে কিছুই নেই, অথচ জীবিত আছেন, ভেতরে জ্ঞানচৈতন্য ঠিকই আছে। অদ্ভুত এক অবস্থা!"

১৬ই মাঘ, অমাবস্যার গভীর নিশীথে গৌরীমাতা এক আশ্চর্য স্বপ্নদর্শন করেন,—

স্বর্গরাজ্য হইতে দেবগণের প্রতিনিধিস্বরূপে এক দেবতা আসিয়া গৌরীমাকে বলেন,—আপনার ইহলোকের কর্ম সুসম্পন্ন, এক্ষণে আপনাকে স্বস্থানে লইয়া যাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

গৌরীমা সেই দেবতার সহিত গমনোদ্যত হইলে এক বাধা উপস্থিত হয়। কোথা হইতে দুর্গামা ছুটিয়া আসিয়া দেবতাকে

গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—আমার মাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

দেবতা নিরুত্তর। মা তখন গৌরীমাকে বলেন,—আপনি আমাদের ছেড়ে ওর সঙ্গে কেন যাচ্ছেন ?

গৌরীমা সহাস্যে বলেন,—ইনি স্বর্গের দেবতা, আমায় নিতে এসেছেন, তাই যাচ্ছি।

মা প্রতিবাদ করিলেন,—ইনি বল্লেই আপনি চলে যাবেন ? না, আমি যেতে দেবো না।

স্বপ্নে দৃষ্ট সেই দুর্গামা বয়সে বালিকা, চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া নহেন। বালিকা তাঁহার প্রসারিত দুইহস্তে গৌরীমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন এবং পথরোধ করিয়া দেবতাকে বলেন,—আপনি চলে যান।

ঈষৎ হাসিয়া দেবতা একাকী ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেবাদিদেব মহাদেব, সঙ্গে পরমেশ্বরী ভবানী। মহাদেব গৌরীমাকে বলেন, তোমার সাধনায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবার পূর্ণাহুতি দাও। গৌরীমা তখন এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে দেব-দেবীগণ আসিলেন, ইষ্টদেবও আসিলেন। অসংখ্য সাধু, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, কুমারী এবং সধবা তাহাতে যোগদানপূর্বক পূজা ভোগ বস্ত্র ও দক্ষিণাদি গ্রহণ করেন। স্বপ্ন শেষ হইল।

পরদিবস গৌরীমা সকলকে শুনাইলেন সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত। দৈবাদেশ এবং অলৌকিক বৃত্তান্ত শ্রবণে অনেকেই পুলকিত হইলেন, কিন্তু দুর্গামা হইলেন শঙ্কিত। স্বপ্নাদিষ্ট মহোৎসব বাস্তবে সম্পাদন করিতে হইবে এবং কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইবে গৌরীমা স্বয়ং তাহার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী দুর্গামা বিরাট আয়োজন করিলেন।

পরবর্তী মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী—গৌরীমাতার শুভ জন্মতিথি দিবসে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। বহু কুমারী, সধবা, সাধু, ব্রাহ্মণ এবং

পণ্ডিত প্রসাদ, বস্ত্রাদি ও দক্ষিণা গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ, সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ এবং আরও কতিপয় সন্ন্যাসী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর দৈহিক অসুস্থতাহেতু তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সন্তানসন্ততিবৃন্দ এবং অনেক নরনারী এই উপলক্ষে সমবেত হইলেন। বহু দরিদ্রনারায়ণও প্রসাদ পাইলেন। দুর্গামাতা এবং আশ্রমবাসিনী কন্যাকুলের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ভক্তিমতী সরোজবাসিনী কোলের অকৃপণ অর্থানুকূল্যে উৎসবটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

সাধুসন্ন্যাসীদিগের দেহাবসানে যে প্রকার 'ভাণ্ডারা' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, গৌরীমার নির্দেশে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাহা পালিত হইল। অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইলে গৌরীমা প্রসন্নচিত্তে বলেন, "বাঃ, সুন্দর হয়েছে! যেমনটি ভেবেছিলুম ঠিক তাই হয়েছে।" এই শুভদিনে তিনটি অল্পবয়স্কা আশ্রমকুমারীকে বিশেষ আশীর্বাদ করিয়া তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসের গৈরিক বস্ত্র রাখিয়া দিলেন,—যথাকালে ইহারা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিতা হইবেন।

এইসময়ের বর্ণনায় 'গৌরীমা' গ্রন্থে দুর্গামা লিখিয়াছেন,—

"অমাবস্যার স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার পর হইতেই মায়ের সন্তান-গণের অনেকেরই মন আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। মঙ্গলময় শিব কি তাঁহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া মাকে কাড়িয়া লইবেন? আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ স্থির করিলেন, শিবরাত্রি উপলক্ষে ১৬ই ফাল্গুন, সোমবার এবং ১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, উভয় দিবসই উপবাসী থাকিয়া সমগ্র দিবসরজনী ভজন-পূজনদ্বারা দেবাদিদেবকে তুষ্ট করিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইবেন, 'বাবা আশুতোষ, তুমি প্রসন্ন হও, নিজেদের জীবন আহুতি দিয়াও আমরা মাকে ধরিয়া রাখিব।"

“কিন্তু, যাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এত আয়োজন, এত আর্তি, তিনি একেবারে নির্বিকার। একটিবারও বলিলেন না যে, এই প্রিয় আশ্রম, এই স্নেহাস্পদ শিষ্য শিষ্যা ভক্ত সন্তান—কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে তাঁহারও ইচ্ছা নাই। আশ্রমকে কত ভালবাসিয়াছেন, অসংখ্য নরনারীকে কত স্নেহ করিয়াছেন,- সেই স্নেহ ভালবাসার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতার স্থান ছিল না, তথাপি সুদীর্ঘ জীবনে একদিনের জন্যও মায়ামোহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের কোন মমতা নাই, মৃত্যুর কোন বিভীষিকা নাই,—আত্মানন্দে তিনি পরিপূর্ণ।”

কিছুদিন যাবৎ তাঁহার আচরণে আমাদের এই কথাই মনে হইয়াছে,—কর্মময় জীবন হইতে বিদায় লইয়া ভাবরাজ্যে তিনি ফিরিয়া গিয়াছেন। দিবারাত্র দিব্যভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। কোন-দিন শ্রীরামচন্দ্রের ভাবে বিভোর, সীতারামের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করিতেন। কোনদিন মানসে চলিয়া যাইতেন বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে, শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত চলিত রহস্যময় আলাপন, ফুলখেলা খেলিতেন তাঁহার সঙ্গে।

সেবিকাবৃন্দও তাহার কিছু আভাস অনুভব করিতেন। জনৈকা সেবিকা একদিন তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া যেন তড়িতাহত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভাবের বিঘ্ন হইবে ভাবিয়া সরিয়া গেলেন দূরে। বাহিরে যেন চৈতন্যহীন, অন্তরে পূর্ণ চৈতন্যদীপ্ত, সর্বাঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে দিব্যভাবের শক্তিপ্রবাহ।

দুর্গামা আসিয়া শিশুর মত ডাকিতে থাকেন,—মা, ওমা, কথা বলছেন না কেন?

চক্ষুদ্বয় ঈষৎ উন্মীলিত হয়।

—আমায় চিনতে পাচ্ছেন?

মৃদুহাস্যে উত্তর দেন গৌরীমা,—হাঁ গো, হাঁ। তুমি দুর্গাপুরী, আমি গৌরীপুরী, এখন তুমিই গৌরীপুরী। কেন ভয় পাচ্ছ মা, আমি তো ভালই আছি।

সত্যই, গৌরীমাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার অসুস্থতা আছে অথবা কোন কষ্ট আছে। বরং তাঁহাকে প্রফুল্লই দেখাইত।

শিবচতুর্দশীর রাত্রি। বাবা বিশ্বনাথের তুষ্টিবিধানে আশ্রমের সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ নিরত। সমগ্র রজনী তাঁহারা দেবতার পূজা ও স্তবকীর্তন করিলেন।

শেষরাত্রে গৌরীমা দামোদরলালকে দর্শন করিতে চাহিলেন। সিংহাসনসহ দেবতাকে সম্মুখে স্থাপন করা হইল। অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন, তৎপর তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিলেন; অবশেষে দুইহস্তে পরম অনুরাগে বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পর। আবাল্যপূজিত প্রাণাধিক প্রিয় দেবতাকে ইহজন্মের মত দুর্গামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলেন, "আমার দামুর ভার তুমি নাও, মা।"

পরমভক্তিভরে মা শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীর সেবাপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্তে আশ্রমমন্দিরে তখন মঙ্গলারতির বাদ্য বাজিতেছে।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ (১লা মার্চ, ১৯৩৮), মঙ্গলবার।

গৌরীমার দৈহিক অবস্থা স্বাভাবিক। দামোদরজীর ভোগের জন্য প্রাতঃকালে 'ডাল ভাত' রন্ধন করিতে বলিলেন। ভোগ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকট আনা হইল। স্বয়ং তাহা নিবেদন করিয়া সকলকে প্রসাদ পাইতে নির্দেশ দিয়া কণামাত্র তিনি নিজেও গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে স্বাভাবিক মনে হইলেও, সমগ্র দিনটি সকলের গভীর উদ্বেগের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। সূর্যদেব অস্তাচলে, অন্ধকার আচ্ছন্ন করে অসহায় পৃথিবীকে। সম্মুখে অমাবস্যা রজনী।

সন্ধ্যাকালে প্রতিদিনের মত বহু মহিলা আসিয়া গৌরীমাকে প্রণাম করিলেন। তিনি বলিলেন, "আজ আন কথা হবে না মা,

কেবল ঠাকুরের কথা হবে।" ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে বারত্রয় উচ্চারণ করিলেন, 'গুরু রামকৃষ্ণ, গুরু রামকৃষ্ণ, গুরু রামকৃষ্ণ।' অতঃপর জপ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া দুর্গামা অতিশয় করুণকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন, "ওমা, মাগো।"

প্রশান্তভাবে বলেন গৌরীমা, "আমায় আর ডেকো না, মা।"

জপ তখনও চলিতেছে।

সহসা সরোজবাসিনী কোলে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, দেখুন, মায়ের চোখের দৃষ্টি কেমন! মুখে কি সুন্দর হাসি, কেমন জ্যোতিঃ!"

গৌরীমা ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইতেছেন বুঝিয়া আশ্রমে মর্মভেদী আর্তনাদ উত্থিত হইল। দুর্গামা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি আপনাকে সংযত করিলেন। তাঁহার নির্দেশে বিভিন্নকণ্ঠে "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ", "জয় মা সারদেশ্বরী", "জয় রাধাদামোদর" নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। কেহ রামনাম, কেহ-বা গীতাপাঠ করিতে লাগিলেন।

পূর্বনির্দেশানুযায়ী দুর্গামা মন্দির হইতে দামোদরজীকে আনয়ন করিয়া গৌরীমার বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত তিন গণ্ডুষ গঙ্গোদক গৌরীমা পান করিলেন। অতঃপর সম্মুখে গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি এবং বক্ষোপরি শ্রীশ্রীদামোদরলালকে দর্শন করিতে করিতে রাত্রি আট ঘটিকা পনর মিনিটের সময় সিদ্ধা তপস্বিনী মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

প্রভাতে এই নিদারুণ সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিয়া অসংখ্য নরনারী শেষবারের মত এই মহাসাধিকাকে দর্শন এবং শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে আশ্রমে আসিলেন।

বুধবার পূর্বাহ্ণে তাঁহার মরদেহ বহন করিয়া সন্তানগণ কীর্তন-সহযোগে ভাগীরথীর তীরে কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে লইয়া গেলেন। সুরধুনীর মুক্তধারায় অভিষিক্ত গৌরীমাতার দিব্যদেহ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিমন্দিরের সম্মুখে চন্দনশয্যায় শায়িত হইল। সন্ন্যাসিনীগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল বৈদিকমন্ত্র।

জনমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে ঘৃতকর্পূরাদি-সংযোগে শেষ আহুতি প্রদান করা হয়। স্বর্ণ আভায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই প্রদীপ্ত হোমানলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহীয়সী মাতার গৌরবরণ দেহখানি মানবচক্ষুর অন্তরালে—শাশ্বত আনন্দময়লোকে লইয়া গেলেন।

মাতৃতর্পণ

কাশীপুর মহাশ্মশানক্ষেত্র পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজনে, লৌকিকতার কারণে এবং সর্বোপরি কঠোর কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত দুর্গামা আপনার অন্তরের অন্তস্তলের অসহনীয় ভাবাবেগটি যথাসাধ্য সংযত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌরীমার পরমধন শ্রীশ্রীদামোদরলালের পূজা করিতে বসিয়া তিনি এইবার অসহায় শিশুর ন্যায় অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। দেবতাকে বক্ষে চাপিয়া ব্যথাবিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহার অভিষেক করিলেন, তাঁহার পূজা সমাপন করিলেন। গৌরীমাতার নিত্যপাঠ্য ভাগবত, গীতা, চণ্ডী এবং নানা স্তবস্তোত্রাদি পাঠও সম্পন্ন করেন অশ্রুসিক্তনয়নে। অতঃপর তাঁহার প্রতিকৃতির সম্মুখে মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "ওমা, তুমি ছবি হয়ে গেলে মা, তুমি শুধু কথা হয়ে রইলে! একবারটি তুমি এসো মা, ওমা, তুমি কথা বল।"

মন্দিরের বাহিরে আসিলে আশ্রমবাসিনী কন্যাগণও মায়ের চতুর্দিকে বসিয়া আকুল হইয়া কাঁদেন। বহু চেষ্টাতেও সেইদিন তাঁহাকে কেহ আহার্য গ্রহণ করাইতে পারিলেন না।

মায়ের এই নিদারুণ দুঃখের সময় কেশবমোহিনী দেবী, দুর্গেশ-নন্দিনী দেবী, শৈলবালা চৌধুরী-প্রমুখ প্রাচীনাগণ—যাঁহারা মাকে অতিশৈশব হইতে দেখিয়াছেন, অশেষ স্নেহ করিয়াছেন,—তাঁহাদের এই প্রিয় পাত্রীটির সংবাদ লইতে প্রায় নিত্যই আশ্রমে আসিতেন, তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

সরোজবাসিনী কোলে প্রতিদিন আশ্রমে আসিয়া মাকে সান্ত্বনা দিয়া কিছু আহার্য গ্রহণের জন্য কত অনুরোধ করিতেন, মিনতি জানাইতেন। তাঁহার আচরণে মনে হইত—তিনি যেন স্নেহময়ী জননী এবং দুর্গামাতা তাঁহার কন্যা। শিশুকন্যাকে তিনি নানাবাক্যে

ভুলাইতেন। মা-ও তাঁহাদের সকলের স্নেহে হৃদয়ে সাময়িক শান্তি অনুভব করিতেন।

প্রত্যূষে দামোদরজীর মঙ্গলারতি ও ভোগনিবেদনান্তে মা কাশীপুর মহাশ্মশানে গিয়া গৌরীমার শেষকৃত্যস্থানে দীর্ঘসময় বসিয়া থাকিতেন। মনে যেন আশা—একবার যদি পলকের জন্যও গৌরীমার দর্শন লাভ করা যায়। অবশেষে হতাশ হইয়াই আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন।

আশ্রমের প্রাত্যহিক প্রার্থনার সময় ত্রিতলের ঘরে কন্যাগণ গৌরীমাতা-রচিত 'রামকৃষ্ণ গোবিন্দ', 'সারদেশ্বরী গোবিন্দ', 'রাধা-দামোদর গোবিন্দ' প্রভৃতি নামোচ্চারণে 'ঠাকুরনাম' করেন। মা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন, ধীরে ধীরে বলেন, "বল—গৌরী-দামোদর গোবিন্দ।" গৌরীমার রাধাদামোদরের নূতন নামকরণ করিলেন মা—"গৌরীদামোদর।"

একদিন গঙ্গাতীরে কয়েকজন অপরিচিত ব্রজবাসী মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ মায়ী, এক বুড্ঢী সাধুমায়ী হম লোগকো ভেজ দী, তু তেরী বেটী হ্যায়। ভনডরা কঁহা পর হোগা? হম সব জায়েঙ্গে।" মা বিস্ময়ে হতবাক্। আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদিগকে ফলপ্রসাদ দিলেন এবং ত্রয়োদশ দিবসের ভাণ্ডারায় উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণও জানাইলেন। আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

গৌরীমার দেহাবসানের তৃতীয় দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি—শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়া। দুর্গামার প্রতি গৌরীমার শেষ নির্দেশ ছিল—"গুরুদেবের জন্মতিথি সাম্‌নে, যেন ভাল করে হয়, মা।" মা সেই আদেশ যথাবিধি পালন করিলেন। অধিকন্তু, কাশীপুর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিমন্দির ও গৌরীমাতার শেষকৃত্যস্থানে আরতি করাইয়া ভোজ্যনিবেদনান্তে প্রসাদ বিতরণ করেন।

পরদিন গৌরীমার দেহরক্ষার চতুর্থ দিবস। সেইদিনও ঠাকুর-

ঠাকুরাণী ও দামোদরজীর বিশেষ পূজাভোগ আশ্রমে সম্পন্ন করিয়া মা মধ্যাহ্নে গঙ্গাতীরে গিয়া দরিদ্রনারায়ণদিগকে আহার্য ও অর্থ দান করেন। সন্ধ্যায় কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও তদীয়া শিষ্যার প্রতিকৃতির সম্মুখে আরাত্রিক, ভোগ ও নামকীর্তনের পর ভক্তবৃন্দ ও গঙ্গাপুত্রগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দুর্গামার জীবনে দুইটি ঘটনা তাঁহাকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল। প্রথমটি—গুরুমাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীদেবীর মহাপ্রয়াণ, দ্বিতীয়টি—আশ্রমপ্রতিষ্ঠাত্রী মা গৌরীর তিরোধান। এই মহীয়সী মাতৃদ্বয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অতুলনীয়। একজন তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক উভয়কালের আশ্রয়, জীবনরথের সারথি, দীক্ষাদাত্রী গুরু। অপরজন স্নেহময়ী জননীসদৃশা পালয়িত্রী, সর্বকর্মে প্রেরণাদাত্রী এবং আদর্শ শিক্ষার পথপ্রদর্শিকা।

গুরুমাতা শ্রীসারদাদেবীর মহাপ্রয়াণের মর্মন্তুদ বেদনার দিনে গৌরীমা শোকবিহ্বলা দুর্গামাকে সর্বতোভাবে সান্ত্বনা ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আশৈশব পালয়িত্রী গৌরীমার তিরোধানে দুর্গামা যে আঘাত পাইলেন তাহাতে সান্ত্বনা দিবার মত অনুরূপ আর কেহ ছিলেন না। সুতরাং সেই আঘাত তিলে তিলে মায়ের স্নেহকোমল অন্তরকে বিদীর্ণ করিয়াছে। তথাপি আজ গৌরীমাতার সম্পর্কে যাহা করণীয় তাহা তো সুসম্পন্ন করিতেই হইবে; বেদনা-মথিত অন্তরে মা পরমশ্রদ্ধার সহিত তাঁহার তিরোধানের ত্রয়োদশ দিবসে ভাণ্ডারার সুষ্ঠু ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইলেন।

২৯-এ ফাল্গুন, ১৩৪৪, গৌরীমাতার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্য-মিলন-উৎসব মহাসমারোহে দুর্গামা সম্পন্ন করেন। আশ্রমের সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ সমগ্র দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং পূজা, ভোগ ও হোমাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সহিত আশ্রমভবনে গৌরীমাতার পূত অস্থি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কাশীপুর মহাশ্মশানে সমাধিস্থানেও প্রাতঃকালে কীর্তন এবং পূজাদি-কৃত্য সম্পন্ন হয়।

এই ত্রয়োদশদিবসের ভাণ্ডারা উপলক্ষে আশ্রমভবনের উত্তরভাগে অবস্থিত উন্মুক্তস্থানে একটি মণ্ডপ নির্মিত হয়। তথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদেশ্বরী দেবী এবং গৌরীমাতার সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক পূর্বাহ্নে "গোষ্ঠলীলা", দ্বিপ্রহরে "কালীকীর্তন" এবং অপরাহ্ন হইতে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী" গীত হয়। আশ্রমের পূর্বভাগে নির্মিত অন্য একটি মণ্ডপে সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বহু সাধু, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ব্রজবাসী, কুমারী এবং দরিদ্র-নারায়ণ এই পুণ্যোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গৌরীমাতার মহাপ্রয়াণের পরবর্তী অমাবস্যা তিথি হইতে মা কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গৌরীমাতার স্মৃতিপূজার প্রবর্তন করেন। তদবধি তাঁহাদিগের সমাধিস্থানে প্রতি-অমাবস্যায় আশ্রমের পরিচালনায় নিয়মিতভাবে পূজা, আরাত্রিক ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিষ্প্রদীপ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতি-কূলতাসত্ত্বেও তাঁহাদের করুণায় ও দুর্গামাতার আন্তরিকতায় ত্রিশ বৎসরের অধিককাল যাবৎ এই অনুষ্ঠান যথারীতি উদ্‌যাপিত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ অমাবস্যা তিথিতে তথাকার সমাধিমন্দিরসমূহ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়, প্রখ্যাত গায়কবৃন্দ ও কীর্তন সম্প্রদায় সঙ্গীতাদি পরিবেশন করেন এবং বহু নরনারীর সমাগমে শ্মশানভূমি উৎসবের শ্রী ধারণ করে।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী একদিন কাশীপুর মহাশ্মশানের প্রসঙ্গে দুর্গামাকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর কতকাল এখানে রয়েছেন, আমরা কিছুই করতে পারিনি। এখন ঠাকুরের মেয়ে এসেছেন, তাই ঠাকুর মাসে একদিন আরতি আর ভোগ পাচ্ছেন।"

স্বনামধন্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় গৌরীমাতার সমাধিস্থানের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

কৃত্বা তাবকমন্দিরং পিতৃবনে কাশীপুরে সাদরং
ভক্তৈস্ত্বং প্রতিপূজ্যসে প্রতিকুহূরাত্রৌ পটে চিত্রিতা।

লুপ্তা ভীষণতা শ্মশানবপুষঃ কামং । [illegible]
মাতৃস্নেহসুধা-প্রবাহমধুরং তদ্ভাতি বিশ্বোত্তরম্ ॥*

শ্মশানভীতি মানবমনের একটি স্বাভাবিক সংস্কার। কিন্তু কাশী-পুর মহাশ্মশান ছিল দুর্গামাতার অতি প্রিয়স্থান। সুযোগ পাইলেই তিনি এই পুণ্যতীর্থে যাইতেন, এবং ইহার শুচিশান্ত পরিবেশে সন্তান-দিগকে জপধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন। শ্মশানবাসী গঙ্গাপুত্রদিগের প্রতি মায়ের ছিল অকৃত্রিম স্নেহ, তিনি বলিতেন, "ওরা আমার মায়ের প্রহরী, সেবক ও সন্তান।" বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে গঙ্গাপুত্রগণ, তাহাদের পত্নী এবং সন্তানসন্ততিদিগকে মা অর্থবস্ত্রাদি দান করিতেন, সস্নেহে ভোজন করাইতেন।

কাশীপুর মহাশ্মশানে যে-স্থানে পরহিতব্রতধারিণী গৌরীমাতার দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেইস্থানে তাঁহার পুণ্যস্মৃতিরক্ষা-কল্পে কলিকাতা কর্পোরেশন একটি সমাধিমন্দির-নির্মাণের অনুমতি দান করেন। এই সম্পর্কে রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতনাথ কোলে-প্রমুখ কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণের সদাশয়তা এবং সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩৪৫ সালের ১৩ই পৌষ তারিখের এক শুভক্ষণে দুর্গামাতা শাস্ত্রাদিপাঠ এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসহ উক্তস্থানে গৌরীমাতার পূতাস্থি স্থাপন করেন। অগৌণে অগণিত ভক্তবৃন্দের, প্রধানতঃ গৌরীমাতার মন্ত্রশিষ্য নগেন্দ্রনাথ রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তথায় একখানি সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাণকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঠাকুরদাস রায় এবং অলংকরণ কার্য সমাপ্ত করেন প্রখ্যাত স্থপতি মেসার্স মার্টিন কোম্পানী।

"মন্দির নির্মাণ করি কাশীপুরে তোমার শ্মশানে
প্রতি অমা-রজনীতে চিত্রে তোমা পূজে ভক্তগণ
শ্মশান বিনোদস্থান আজি মাতৃস্নেহের স্পর্শনে
শ্মশানের ভীষণতা কোথা যেন করেছে গমন॥"

এই মন্দির উৎসর্গ উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী এক উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৩৪৬ সালের ২৪-এ ফাল্গুন, অমাবস্যা তিথিতে শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী, সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ-প্রমুখ দ্বাদশজন বিশিষ্ট পণ্ডিত কাশীপুর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি মাঙ্গল্যকৃত্যসহকারে গৌরীমাতার নবনির্মিত মন্দিরের উৎসর্গ কার্য সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়।

দ্বিতীয় দিবসে (২৬-এ ফাল্গুন) বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। মহীয়সী গৌরীমাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন, "হিন্দু বালিকাগণের বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা আমাদের সামাজিক জীবনে যে একটী প্রধানতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই মনে হয় গৌরীমাতা উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।... যুগাবতার শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রেরণায়...তাঁহারই সর্বপ্রধান নারী-শিষ্যা...এই অত্যাবশ্যক মহৎ কার্যের পথ সমস্ত হিন্দু জাতিকে দেখাই-বার জন্য শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।...তাঁহার আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত পথ ধরিয়া, তাঁহারই আশীর্বাদে বাঙ্গালী হিন্দুনারী বাঙ্গালার নব হিন্দু জাতীয় জীবনগঠনে সমর্থ হউন।" তিনি আরও বলেন, "সুখের বিষয়, তাঁহার বড় সাধের, বড় স্নেহের শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও বিদ্যালয়ের গুরুতর ভার তিনি যাঁহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে শান্তির সহিত ভৌতিক দেহ বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শচরিতা আবাল্যব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীমাতা শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর সুদক্ষ পরিচালনায় আশা করি আশ্রম ও বিদ্যালয় বাঙ্গলায় আদর্শ নারীগঠন কার্যে পূর্ণ সহায়তাপ্রদানে সর্বথা সমর্থ হইবে।"

রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ পূজনীয়া গৌরীমাতার প্রতি সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশনের গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, "তিনি এমন এক নারীসংঘ গঠন করিয়া গিয়াছেন, যাহা অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার আরব্ধ কার্য সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। আপনারা সকলে মাতাজীর এই কার্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সহায়ক হউন, তবেই তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।"

বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন,…"শুধু এতদ্দেশেই নহে, যে-কোন দেশের পক্ষেই গৌরীমার মত লোকোত্তর চরিত্র গৌরবের বিষয় এবং জাতির ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ থাকিবার যোগ্য। আশ্রমের সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী… প্রভৃতি অচার্যাগণ গৌরীমার আহ্বানে আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া সমাজের কল্যাণে আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। শত শত নারী আশ্রমের পুণ্যময় আবেষ্টনীর সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতেছেন।"…*

এতদ্ব্যতীত, সুলেখিকা সরলাবালা সরকার ও প্রভাময়ী মিত্র, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর হরিদাস চৌধুরী এই সমাবেশে গৌরীমার পুণ্যচরিত আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিবসে (২৭-এ ফাল্গুন) প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত আশ্রমভবনের সম্মুখে নির্মিত মণ্ডপে কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। দুর্গামা এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সাধুসন্ত, ব্রজবাসী, কুমারী এবং দরিদ্রনারায়ণকে ভোজ্য, বস্ত্র ও দক্ষিণাদি দানে তুষ্ট করেন। ভক্ত নরনারীগণ এই পুণ্যকর্মে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করেন। তাঁহাদের সকলের এবং বিশেষ করিয়া সদাশয়া সরোজ-বাসিনী কোলের অর্থানুকুল্যে এই শুভ অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দররূপে

---

* স্যার মন্মথনাথের সম্পূর্ণ অভিভাষণ কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতেও প্রচারিত হয়, পাঠ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

সম্পন্ন হয়। এইপ্রসঙ্গে আশ্রমসেবায় তদীয়া দেবরপত্নী শ্রীমাখন-নলিনী কোলের সহযোগিতার কথাও উল্লেখযোগ্য।

সদ্যঃশোককাতরতা এবং কর্মব্যস্ততাসত্ত্বেও ২৯-এ ফাল্গুন ভাণ্ডারা দিবসে গৌরীমার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী দুর্গামা প্রকাশ করেন—"শ্রীশ্রীগৌরীমাতা।" অতঃপর একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত "গৌরীমা" প্রকাশ করেন ১৩৪৬ সালে। গৌরীমার অলোকসামান্য এবং বৈচিত্র্য-বহুল জীবনবৃত্তান্তের জন্যই প্রধানতঃ এবং দুর্গামার রচনানৈপুণ্যের জন্যও বটে, "গৌরীমা" ভক্তসংঘে এবং জনসাধারণের মধ্যে অল্পকাল মধ্যেই সমাদর লাভ করিয়াছে।

রাজগৃহে

দেহমনের ক্লান্তি ও বেদনা উপশমের জন্য এইসময় দুর্গামার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল নির্জন এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ। এতদ্ব্যতীত, বয়োবৃদ্ধির সহিত দুর্গামার বাতের প্রকোপও বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন,—রাজগিরের উষ্ণধারায় স্নান করিলে উপকার হইবে। তদনুসারে ১৩৪৬ সালের শেষভাগে কয়েকটি কন্যা এবং দুইজন সেবকসহ মা রাজগিরে গমন করেন। মায়ের বাসস্থান স্থির করা হয় জৈন ধর্মশালার অধীনস্থ একটি ভাড়াবাটীতে।

রাজগিরের পথে বক্তিয়ারপুরে তখন রেলের ডাক্তার ছিলেন মাখনলাল চৌধুরী নামক মায়ের জনৈক ভক্তসন্তান। তাঁহার একটি কন্যা দীর্ঘদিন আশ্রমে বাস করিয়া তখন গৃহস্থাশ্রমে ব্রতী হইয়াছেন। বক্তিয়ারপুর হইয়া মা যাইবেন সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সকলেই ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ, উভয় পক্ষই অতি আনন্দিত। রাজগিরেও ইহারা প্রায়ই মায়ের নিকট আসিতেন।

চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণীশোভিত রাজগির দর্শনে মায়ের চিত্ত প্রসন্ন হইল। বাসগৃহটিও মনঃপূত হইল।

ইহাই সেই পুরাকালের মগধের রাজধানী রাজগৃহ, যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী জরাসন্ধ প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন এবং মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কর্তৃক মল্লযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে ইহা ছিল করুণার অবতার গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের তপস্যাক্ষেত্র। পুরাতন সেইসকল কীর্তির বহু নিদর্শন তথায় অদ্যাপি বিদ্যমান।

তখন নিদারুণ শীত। প্রত্যূষে পর্বতশীর্ষসমূহ শিশির বিন্দুর আস্তরণে শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। তীব্র শীতল বায়ুপ্রবাহ যেন অস্থিমজ্জাতে কম্পন ধরাইয়া দেয়। তৎসত্ত্বেও মা প্রত্যহ শেষরাত্রে স্নানান্তে দামোদরজীর মঙ্গলারতি ও ভোগ নিবেদন করিতেন। ইহার

পরই কন্যাদের সহিত উষ্ণধারার উদ্দেশ্যে বাহির হইতেন। কয়েক-দিবস দুইবেলা স্নানে মায়ের বাতের যন্ত্রণার উপশম হইল।

রাজগির হইতে মা একদিন প্রাতে রেলযোগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাকীর্তি দেখিতে গেলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধযুগের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ দর্শনে মায়ের কত বিস্ময়, কত অনুসন্ধিৎসা! কন্যাগণ চলিলেন পদব্রজে, মায়ের শ্বাসকষ্ট হইতে থাকায় একটি ডুলী ভাড়া করা হইল। মহাস্থবির শীলভদ্রের প্রস্তরাসনের উদ্দেশে মা যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। বৌদ্ধ বিহার, ছাত্রাবাসসমুদয় দেখিলেন এবং বিস্মিত হইলেন মন্দিরের বিরাটকায় বুদ্ধমূর্তিসমূহ দর্শনে। প্রত্যেকটি মন্দির, সংগ্রহশালায় রক্ষিত মহারাজ হর্ষবর্ধনের শিলালিপি, তদানীন্তন নানাপ্রকারের মুদ্রা, শীলমোহর, বিবিধ মৃৎশিল্প ও শস্যাদি দেখিলেন। অষ্টকোণাকৃতি কূপের নিকট গিয়া মা কন্যাদের বলিলেন, "এই জল সবাই একটু খাও বিদ্বান হবে।" তাঁহারা পথশ্রমে তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং মাতৃ-আদেশ সানন্দে পালন করিলেন।

মা স্থির করিয়াছিলেন,—সন্ধ্যার পূর্বেই রাজগিরে প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু একটি কন্যা অতিশয় মন্থরগতি। অন্য সকলকে লইয়া যখন মা ষ্টেশনের নিকটে পৌছিয়াছেন, তখনও উক্ত কন্যাটি দৃষ্টির বাহিরে। মা তাঁহার নিজের ডুলীটি পাঠাইয়া দিলেন তাঁহাকে শীঘ্র আনিবার জন্য। দূরে যখন তিনি দৃষ্টিগোচর হইলেন, রেলগাড়ী ততক্ষণে ষ্টেশন ত্যাগ করিয়াছে।

মা চিন্তিত হইলেন। পরবর্তী গাড়ীর সময় রাত্রি নয় ঘটিকায়। সঙ্গে এতগুলি কন্যা, জনমানবহীন নির্জন স্থান, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনীভূত হইতেছে। ষ্টেশনমাষ্টার তাঁহার অফিসঘরে একাকী বসিয়া কেরোসিনের আলোতে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। একদল মায়ীলোকের এমন বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সহৃদয়তাবশে তিনি তাঁহার অফিসঘরেই সকলকে স্থান দিলেন, এবং গাড়ী আসিলে উঠাইয়া দিবেন,—এই ভরসাও দিলেন।

মায়ের সহিত দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা ছিল। সমগ্র দিবসের ক্লান্তিতে তাহাদের নিদ্রার আবেশ আসিতেছিল। মা বলিলেন, "তোমরা জোরে জোরে গান গাও, ঘুমিয়ে পড়ো না মা, বিদেশ বিভুঁই জায়গা।" বালিকা দুইটি মায়ের আদেশে গান আরম্ভ করিল,—'মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন, ত্রিভুবন মাঝে প্রভু বাণীবিহীন।' গানটি সমাপ্ত হইলে মা বলিলেন, "বেশ বেশ, গাও, আরও গাও।" এইভাবে আনন্দের সহিত সময় অতিবাহিত হইল। যথাসময়ে গাড়ী আসিল, বাসস্থানে পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইল।

এত রাত্রে ফিরিয়াও মায়ের ক্লান্তি বোধ নাই। কণ্ঠদেশ হইতে দামোদরজীকে সিংহাসনে রাখিয়া তাঁহার অভিষেক, আরতি ও ভোগ সম্পন্ন করিলেন। পরদিবস যথাসময়েই আবার প্রাতঃকালীন পূজা অন্তে মা কুণ্ডস্নানও করেন।

ইতিমধ্যে শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথি সমাগত হইল। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কয়েকদিবস পূর্বে মায়ের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ জানাইয়া গিয়াছেন। পূজাদিবসে মা কন্যাগণকে লইয়া দেবীদর্শনে বিদ্যালয়ভবনে উপস্থিত হইলেন। পুষ্পাঞ্জলির উপকরণ কন্যারাই লইয়া গিয়াছিলেন। মা অঞ্জলি দেওয়াইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আগন্তুক কয়েকজন ধর্মার্থীও আসিয়া বিল্বপত্রপুষ্পহস্তে দাঁড়াইলেন। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাঁহাদের অঞ্জলিদানকৃত্যও মা সম্পন্ন করাইলেন।

রাজগিরে একদিন দেখা যায়, একটি স্থানে মণ্ডপ নির্মিত হইতেছে। পথচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল,—রামদেবী নামে এক জাতিস্মরা কন্যা ঐস্থানে আসিয়াছেন। গতজন্মের মাতাপিতাকে তাঁহার স্মরণ আছে। অদ্য দ্বিপ্রহরে উক্ত জাতিস্মরার গত এবং বর্তমান জন্মের মাতাপিতা একত্র হইবেন। রামদেবীও আসিবেন। বক্তৃতা হইবে, কীর্তন হইবে। ইহা শুনিয়া মায়ের কী উৎসাহ! বাটীতে ফিরিয়া যথারীতি পূজাভোগ সমাপনান্তে কতিপয় বালিকাসহ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইলেন।

সহসা কোলাহল—"রামদেবীজী আয়ী হ্যায়", সকলের কণ্ঠে হর্ষধ্বনি। দেবীজী আসিয়া নির্দিষ্ট মঞ্চে আসনগ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার গতজন্মের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। গতজন্মের মাতাপিতা তখন কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামদেবীর সান্ত্বনায় তাঁহারা শান্ত হইলে পর তিনি পুনরায় বলেন,—তাঁহার ইহজন্মে আগমনের কি উদ্দেশ্য। হিন্দীভাষায় তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ ইহাই যে, তিনি দুঃখময় এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না, সুতরাং পুনঃপুনঃ দেহ পরিবর্তন করিয়া নবদেহ ধারণের প্রয়োজন বোধ করেন। তবে যে-কয়দিন দেহে থাকিবেন, মানুষকে শান্তির পথ দেখাইয়া যাইবেন। সেই শান্তি ঈশ্বরের নাম কীর্তনে, আনন্দ তাঁহার অনুধ্যানে,—ইহাই তিনি সকলকে শুনাইয়া যাইতেছেন। সকলেই সেই শান্তিময়কে লাভ করিবার পথ অবলম্বন করুন,—ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক আবেদন।

তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত হইলে ইহজন্মের মাতাপিতা তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এ সভায় রামদেবীর পিতৃমাতৃতুল্য বহুলোক উপস্থিত আছেন, সকলে আশীর্বাদ করুন, রামদেবী যেন দীর্ঘজীবী হন।

কিন্তু, এইসকল কথা কাহাকেও চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া রামদেবী যুক্তকরে সুরসহযোগে গাহিতে লাগিলেন,—

"সীতারাম সীতারাম সীতারাম বোল্।
তু রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম বোল্॥"

জনগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, 'আপ সব বোলিয়ে'। মহামন্ত্রটি তিনি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনগণও সমবেতকণ্ঠে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। পুণ্যনামকীর্তনে সভাস্থলটি যেন ঋষির তপোবনের ন্যায় দেবভাবে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। অতঃপর রামদেবী সকলকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন জানাইলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

বাহিরে আসিয়া জনৈকা কন্যা মাকে প্রশ্ন করেন, "মা, এ সব সত্যি? সত্যিই ওঁরা ছ'জন ছ'জন এজন্ম আর গতজন্মের মা বাবা? ওঁদের থেকে কিন্তু চেহারায় রামদেবী দেখতে আলাদা।"

মা বলেন, "সবসময়েই কি মা বাবার মত সন্তান একরকম দেখতে হয়? তবে এরকম জাতিস্মর যে মাঝে মাঝে জন্ম নেন না তা নয়। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুব কম। এ মেয়েটির মুখের ছাপে ধর্মলক্ষণ রয়েছে। এঁকে উপলক্ষ্য করে সভাস্থলে খানিকক্ষণ ঈশ্বরের নাম-গুণগান হলো। যাঁরা উচ্চারণ করেন নি, তাঁরা তো অন্ততঃ শুনলেনও। কেউ যদি স্বীয় শক্তিদ্বারা খানিকক্ষণের জন্যও অতগুলো লোকের মনকে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত রাখতে পারেন, তিনি অ-সাধারণ বৈকি, মা!"

শ্রীপঞ্চমীর পর ধীরে ধীরে রাজগিরের অবশিষ্ট বিশেষ স্থানগুলি মা দর্শন করিলেন। বিপুলাচলম্ পর্বতশীর্ষে কন্যারা আরোহণ করিলেন, মা কিছুদূর উঠিয়া দুই-একটি কন্যার সহিত একস্থানে বসিয়া থাকিলেন। বৈভবগিরি, গৃধ্রকূট, জরাসন্ধের যজ্ঞগৃহ দর্শনান্তে এক-দিন সকলে গো-শকটে বানগঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। ঐস্থান হইতে বুদ্ধদেবের তপস্যাভূমি ও বোধিদ্রুমের উদ্দেশে সকলে প্রণাম করেন।

স্বামী কৃপানন্দজী নামক জনৈক সন্ন্যাসী কুণ্ডের উপরিস্থিত একটি গুহাতে বাস করিতেন। রাজগিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি মন্দির ও একটি ধর্মশালা নির্মাণে তখন তিনি উদ্যোগী। মায়ের সহিত প্রতিদিনই তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। মা তাঁহাকে প্রায়ই প্রসাদ দিতেন। মাতৃস্নেহে সন্তানটিও পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

পরবৎসরও সারদা মাতাঠাকুরাণীর শুভ জন্মোৎসব অন্তে মা পুনরায় রাজগির গমন করেন। এই যাত্রায় মায়ের সহিত কন্যাসংখ্যা ছিল অধিক। এইবার মা মোটরযোগে নালন্দা ও মহাবীরের সমাধিস্থান পাবাপুরীও দর্শন করেন। শেষোক্ত স্থানটি পূর্ববার দেখা হয় নাই।

রাজগিরের ধ্যানগম্ভীর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মা যেন কাহাকে দর্শন করিতেন! কোন কোন দিন এমন হইয়াছে, পূজাকক্ষে বসিয়া মা দামোদরজীকে বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ আকাশের নির্মল আলোকস্নাত পর্বতমালার শীর্ষে। মায়ের এরূপ তদ্‌গতভাব দর্শনে তাঁহার ভাবভঙ্গের আশঙ্কায় পূজার উপকরণাদি লইয়া কন্যাগণ দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতেন, মা ডাকিলে তবে ভিতরে প্রবেশের সাহস পাইতেন।

নবদ্বীপ-আশ্রমের সূচনা

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাস্থান—গৌরীমাতার প্রিয় নবদ্বীপধামে রাণীর চড়ার বাটীতে তাঁহার পূতাস্থি স্থাপনা করিয়া একটি স্মৃতিমঞ্চ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা দুর্গামাতার অন্তরে জাগ্রত হয়।

রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ১৩৪৮ সালে রাণীর চড়ার বাটীতে মায়ের পরিকল্পিত সমাধিমঞ্চটি নির্মিত হয়। জগদ্ধাত্রী পূজাদিবসে পূর্বাহ্ণে কীর্তন, পূজা ও হোমাদিকৃত্যসহ মা উক্তস্থানে অস্থি স্থাপনা করিলে উপস্থিত নরনারী তদুপরি গঙ্গামৃত্তিকা অঞ্জলি প্রদান করেন। অপরাহ্ণে সঙ্গীত, কীর্তন ও বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান হয়। সুগায়িকা শ্রীউত্তরা দেবী কয়েকখানি কীর্তন গাহিলেন। তমাললতা বসু এবং প্রভাময়ী মিত্র গৌরীমাতার পুণ্যজীবনের কথা আলোচনা করেন। স্থানীয় বহু ভক্ত এবং কলিকাতা হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় উৎসবটি সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপোড়ামা এবং শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে গৌরীমাতার স্মৃতিতে বস্ত্র, ভোজ্য ও দক্ষিণাদিসহ উক্তদিবসে বিশেষ পূজা নিবেদনের ব্যবস্থাও হয়। গৌরীমাতার স্নেহাস্পদা পরম ভক্তিমতী ললিতাসখীকেও একখানি উত্তম নীলাম্বরী সাড়ী ও নানাপ্রকার ভোজ্য দেওয়া হয়। গৌরী-মাতার স্মৃতিতর্পণের অনুষ্ঠানাদির প্রসঙ্গে অতিশয় প্রীত হইয়া তিনি দুর্গামাকে বলিয়াছিলেন, "মা যোগ্যকন্যা রেখে গেছেন তোমায়। দিদি, এত বড় কাজ তুমি করলে!"

সমাধিমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এমনসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসতরঙ্গ ভারতের পূর্বসীমান্তে আসিয়া উপস্থিত। যেদিন সংবাদ প্রচার হইল যে, রেঙ্গুন সহরে জাপানের বোমায় তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছে, এখানেও অনেকেই আতঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা আশঙ্কা করিলেন—যেহেতু ইংরাজের

বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ ইংরাজ-শাসিত দেশ, সেইহেতু শীঘ্রই ভারতবর্ষও আক্রান্ত হইবে, কলিকাতা সহর ধ্বংস হইবে। তদুপরি বাংলা সরকারও কলিকাতাবাসীদিগকে রক্ষা করিবার কোন ভরসা দিতে পারিলেন না। সুতরাং স্ব স্ব ধনপ্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে অসংখ্য নরনারী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ধাবমান হইলেন।

নানাবিধ গুজব এবং আতঙ্ক বিস্তারলাভ করিল। এমতাবস্থায় আশ্রমকন্যাদিগকে লইয়া কলিকাতায় অবস্থান করা দুর্গামা আর সমীচীন বোধ করিলেন না। অনেকের পরামর্শে নবদ্বীপে যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু নবদ্বীপের নিজগৃহে এত অধিক সংখ্যক কন্যা ও জিনিষপত্রের স্থানসঙ্কুলান হইবে কিভাবে! এই সমস্যা ও দুশ্চিন্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হইল না, অথচ চিন্তারও অবসর নাই।

আশ্রমের হিতাকাঙ্ক্ষী কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন—অল্পবয়স্কা কন্যাদিগকে সাময়িকভাবে নিজ নিজ পিতৃগৃহে প্রেরণ করিবার জন্য। কিন্তু এই পরামর্শ দুর্গামা অনুমোদন করিতে পারিলেন না। অভিভাবকগণও অনেকেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কন্যাদের লইতে আসিলেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, পিতৃগৃহ অপেক্ষা এই দেবস্থানে দুর্গামাতার তত্ত্বাবধানেই কন্যাগণ অধিকতর নিরাপদে থাকিবে।

অনন্যোপায় হইয়া মা পৌষমাসে অধিকাংশ আশ্রমিকাকে লইয়া নবদ্বীপযাত্রা করিলেন। দেবতার সেবাপূজাদি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কয়েকজনমাত্র বয়স্থা আশ্রমবাসিনী কলিকাতা-আশ্রমে রহিলেন। এইপ্রকার পরিস্থিতিতে স্থানান্তরে যাত্রাও ছিল বিপজ্জনক। তথাপি সকলেই নবদ্বীপে গঙ্গাতীরের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যাবশ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুবিধ জিনিষপত্র নৌকাযোগে তথায় প্রেরিত হইল। কিন্তু নবদ্বীপে উপস্থিতির পরই দেখা দিল অনেক সমস্যা। প্রথমতঃ স্থানের স্বল্পতা, দ্বিতীয়তঃ সহরের উপকণ্ঠে নির্জন পরিবেশে নিরাপত্তারও অভাব। সর্বোপরি, অনভ্যস্ত পারিপার্শ্বিকতার প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। কিন্তু মা তাঁহার অসাধারণ সংগঠনী

শক্তি, দূরদর্শিতা ও তিতিক্ষাবলে এই অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের সহিত যথাসাধ্য সঙ্গতিবিধান করিলেন।

মাতৃবৃন্দের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া গৌরীমাতার শিষ্য শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী নবদ্বীপ আশ্রমে প্রহরীরূপে থাকিবার উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট হইতে আসিলেন। গৌরীমাতার অপর এক শিষ্য শিক্ষকতার চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে নবদ্বীপে গমন করিলেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর জনৈক শিষ্যসন্তানও এইসময় আত্ম-নিয়োগ করেন নবদ্বীপে আশ্রমসেবায়।

কলিকাতা হইতে নবদ্বীপে গমনের পূর্বেই দুর্গামা কাশীপুর মহাশ্মশানে প্রতি-অমাবস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গৌরীমাতার সমাধি মন্দিরে আরাত্রিকাদি কৃত্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন গৌরীমাতার দুই শিষ্য—জহরলাল ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর। তাঁহাদের একজনের নিবাস টালিগঞ্জে ও অপরজনের ঢাকুরিয়ায়। কলিকাতায় তখন সন্ধ্যাকাল হইতেই নিষ্প্রদীপের অন্ধকার এবং দিনে রাত্রে যে-কোন সময়েই শত্রুবিমানের আগমনসূচক সাইরেনের বিপদসঙ্কেত। এই অবস্থার মধ্যেও এই দুই ভক্ত সন্তান অসাধারণ নিষ্ঠা ও সাহসের সহিত নিয়মিতভাবে কাশীপুর শ্মশানে গিয়া কীর্তন-আরাত্রিকাদির কার্য সুসম্পন্ন করিতেন। এই সেবায় মা বিশেষ স্বস্তি বোধ করিতেন। জহরলাল বয়োবৃদ্ধ হইয়াও নবীন উৎসাহে প্রহরীরূপে কখনও আশ্রমে বসবাস করিতেন, কখনও-বা নবদ্বীপে গিয়া কীর্তনগানে সকলকে আনন্দ দিতেন।

মা নবদ্বীপে আসিয়া কয়েকখানি চালাঘর নির্মাণ করাইলেন। যদিও ইহাতে সকলের বাসের উপযুক্ত সঙ্কুলান হইল না, তথাপি আশ্রমবাসিনীদের কাহারও মনোবল সেদিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

নগেন্দ্রনাথ রায় তখন সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের আশ্রমবাটীর পার্শ্বেই স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের কলিকাতার বাটীস্থ মাতৃবৃন্দ ও বালকবালিকারাও ইতিমধ্যে

যুদ্ধের আশঙ্কায় তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন। গৌরীমার অন্যতম শিষ্যসন্তান ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও আশ্রমবাটীর সন্নিকটে বাটী ভাড়া করিয়া তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে রাখিলেন এবং অবসরমত আশ্রমপূজিত দেবদেবীর সেবাপূজার জন্য প্রচুর পুষ্প ও ভোজ্যাদিসহ গিয়া দুর্গামা ও স্ত্রীকন্যাকে দেখিয়া আসিতেন।

কিন্তু মা চিন্তিত হইলেন—কলিকাতার ভক্তগণের নিকট হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া আশ্রমের বিরাট ব্যয়নির্বাহ করিবেন কিরূপে? নগেন্দ্রনাথ মাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, "মা, আমি সাতশো টাকা পেনসন পাই, যা-হোক করে মায়েদের শাক-অন্ন ওতেই হয়ে যাবে, আপনি ভাববেন না।" মহাপ্রাণ সন্তানের এই সান্ত্বনায় মা আশ্বস্ত হইলেন, তবে আশ্রমের চাঁদাদাতা ও শুভার্থিবৃন্দ অতঃপর নবদ্বীপ আশ্রমেই শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাইতে লাগিলেন। ইহাতে অর্থাভাবের চিন্তা প্রশমিত হইল।

শ্রীমাতা সারদা একদা দুর্গামাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বনে গেলেও রাজত্ব করবে।" সেই বাক্যের সত্যতা অনতিবিলম্বে প্রমাণিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই এখানেও ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নবদ্বীপ পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ও সদস্য অনেকেই মায়ের সহিত পরিচিত হইয়া আশ্রমে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কৃষ্ণনগরের সদাশয় ব্যবসায়ী বৈদ্যনাথ পাত্র মহাশয় এইসময়ে চাউল, বস্ত্র, অর্থ ও শীত-বস্ত্রাদি দ্বারা নানাভাবে আশ্রমকে সাহায্য করিয়াছেন। নদীয়ার ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিস অরুণোদয় চক্রবর্তী মাকে দর্শন করিয়া এতই শ্রদ্ধান্বিত হইলেন যে, তাঁহার ব্যবস্থায় নবদ্বীপ থানা হইতে সিপাহীগণ আশ্রমের চতুর্দিক টহল দিতেন। এইসূত্রে নবদ্বীপ সহরের বড় দারোগাবাবুও আশ্রমের সহিত পরিচিত হইয়া প্রায়ই সংবাদাদি লইতেন।

পল্লীর নিকট-প্রতিবেশিগণও আশ্রমকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। একদা দ্বিপ্রহরে এক প্রতিবেশীর বাসগৃহে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। গ্রীষ্মকাল, তদুপরি প্রবল বাতাস; অগ্নি অতিদ্রুত ব্যাপক আকার ধারণ

করে। পল্লীর সকলের তখন ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, করুণ আর্তনাদ। কিন্তু সেই বিপদের সময়ও অগ্নির আক্রমণ হইতে আশ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য পল্লীবাসীদিগের কী আন্তরিক প্রচেষ্টা। ভগবৎ-কৃপায় এবং সকলের শুভেচ্ছায় শেষপর্যন্ত আশ্রমের কোন ক্ষতি হয় নাই।

আশ্রমবাটীতে স্থানাভাবের অসুবিধা, অধিকন্তু প্রাচীর অনুচ্চ হওয়ায় বাটীর অভ্যন্তরে শৃগাল, সর্প, ভেক ও মূষিকাদির উপদ্রব অবাধে চলিত। ইহারা যদি প্রাণাধিক প্রিয় দেবতা শ্রীশ্রীদামোদর লালজীর কোনপ্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ইহা ছিল মায়ের এক মহা-দুর্ভাবনা। রাত্রিতে একাধিকবার শয্যা ত্যাগ করিয়া লণ্ঠনের আলোকে তিনি নিরীক্ষণ করিতেন—লালজী কেমন আছেন।

রাণীর চড়ার আশ্রমে তখন আট-দশটি গরু প্রতিপালিত হইত। কয়েকবৎসর পূর্বে জনৈক ভক্ত ঠাকুরের সেবার উদ্দেশ্যে একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করেন। গৌরীমা উহার নামকরণ করেন ধবলী। ইহারা ছিল তাহারই বংশধর। দুর্গামা আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিয়াছিলেন—শ্যামলী, করবী, নন্দিনী, কস্তুরী, জগদ্ধাত্রী। ইহাদের প্রতি মায়ের যত্নও ছিল অসামান্য।

কয়েকমাস অতিবাহিত হইল। কিন্তু বর্ষার অগ্রগতির সহিত এক উৎকণ্ঠায় সকলের মন ভারাক্রান্ত। আশ্রম যে অঞ্চলে অবস্থিত, সে পল্লীটি প্রায় প্রতিবৎসরই বন্যার জলে প্লাবিত হয়। বর্ষাগমের পূর্ব হইতেই মা সন্তানদিগকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করিতে লাগিলেন, "এবার খুব বন্যা হবে। সহরের ভেতর আশ্রমের উপযোগী একখানা প্রশস্ত বাড়ী তোমরা খুঁজে বের কর, বাবা।" সন্তানগণ উপযুক্ত বাটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবদ্বীপসহর তখন অসংখ্য উদ্বাস্তু কলিকাতাবাসীর আশ্রয়স্থল, সুতরাং উপযুক্ত বাটী সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না।

ইতিমধ্যে গঙ্গার জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেহ কেহ আশ্বাস দিলেন, এই বৎসর বন্যা হইবে না, রাণীর চড়ার বাটীতেই কন্যাগণের বাস করা চলিবে। মা ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন

না। তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল যে, কোন কিছু করিবার পূর্বে ধীরভাবে তিনি বহু চিন্তা করিতেন, কিন্তু একবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা কার্যে পরিণত না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। এমতাবস্থায় একখানি উপযুক্ত বাটীর সন্ধানে তিনি নিজেই বাহির হইলেন। কয়েকদিবস পর অবশেষে একদিন মনোমত একখানি দ্বিতল বাটীর সন্ধান পাইলেন বুড়াশিবতলায়। বাটীর অন্যতম মালিক ছিলেন বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দিবসেই মাত্র কয়েকঘণ্টা পূর্বে বাটীখানি খালি হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেইসময় তথায় উপস্থিত। মা তাঁহাকে অনুরোধ করেন, "বাবা, আপনার বাড়ীখানি আমরা ভাড়া নিতে চাই।" বিজয়বাবু নম্রভাবে বলেন, "মা, আমি এ বাড়ী এখন ভাড়া দেবো না। আমার মেয়ের বিয়ে। আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন।" মা নিরুৎসাহ না হইয়া আশ্রমকন্যাগণসহ নিজেদের বিপন্ন অবস্থা এমন মর্মস্পর্শীভাবে তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, সন্ন্যাসিনী মায়ের আবেদন সন্তানের অন্তর স্পর্শ করিল। মায়ের স্নেহমধুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শেষপর্যন্ত বাড়ী ভাড়া দিতে স্বীকৃত হইলেন বিজয়বাবু। কেবল তাহাই নহে, তদবধি তিনি হইলেন আশ্রমের একজন পরম হিতৈষী সন্তানও। কিছুকাল মধ্যেই তিনি বাড়ীভাড়ার পরিমাণও অর্ধেক করিয়া দিলেন।

রাণীর চড়ার আশ্রমবাটী হইতে নূতন ভাড়াটিয়া বাটীতে যখন জিনিষপত্র স্থানান্তরিত হইতেছিল এবং শ্রীশ্রীসারদামাতার একখানি প্রতিকৃতিসহ কতিপয় আশ্রমবাসিনীও নূতন বাটীতে আসিয়াছেন, এমনসময় এক অমাবস্যা তিথির সন্ধ্যায় রাণীর চড়া গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়। এইরূপ অতর্কিত পরিস্থিতিতে সকলেই মহা-উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় রাত্রি এগারো ঘটিকায় আশ্রমবাটীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাত্র দুইজনকে রাখিয়া অবশিষ্ট কন্যাগণসহ মা উপস্থিত হইলেন বুড়াশিবতলার বাটীতে। গৌরীমাতার দেহরক্ষার পর হইতেই দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া মা অমাবস্যা তিথি পালন করিতেন। সেইদিনও তাঁহার ঐরূপ উপবাস, তদুপরি এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা;

তথাপি অবিচল ধৈর্যের সহিত সময়োপযোগী সকল কর্তব্য সম্পাদন করিতে মধ্যরাত্র অতীত হইল।

সমগ্র রাত্রি জল প্রবেশের ফলে পরদিবস সহরের চতুষ্পার্শ্বে যেন অকূল সমুদ্র। পরে বন্যার জল সহরের মধ্যেও প্রবেশ করে। কলিকাতা-বাসীদের নিকট সেই দৃশ্য কল্পনাতীত। এইপ্রকার অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও বিস্ময়কর দক্ষতার সহিত মা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিলেন।

বন্যা এবং বর্ষার অবসানে ভাড়াবাটীতে আশ্রমের কর্মপরিধি ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করে। স্থানীয় ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ মহিলাদিগের সহিত আশ্রমের ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। আশ্রমের উৎসবাদিতে নরনারীগণ অধিকসংখ্যায় যোগদান করিতে লাগিলেন। তখন উক্ত পল্লীতে বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। দুর্গামা তথাকার বালিকাদিগকে শিক্ষার সুযোগদানের নিমিত্ত আশ্রমে ক্ষুদ্রাকারে একটি বিদ্যালয় এবং তৎসহ সংস্কৃত শিক্ষার একটি টোলও স্থাপন করিলেন। আশ্রমের আদর্শানুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক। ক্রমশঃ শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্থানাভাবে তখন বৃক্ষতলেও শিক্ষাদান চলিত। শিক্ষয়িত্রীগণের অধ্যাপনার গুণে অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি ছাত্রী সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষায় সাফল্যলাভও করিল। কার্য-পরিচালনার সুবিধার জন্য নবদ্বীপস্থ কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলাকে লইয়া আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। আশ্রম ও বিদ্যালয় এইভাবে জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে। স্থানীয় নরনারী কেহ কেহ দুর্গামাতার নিকট দীক্ষাগ্রহণও করিলেন।

পরবর্তী পৌষমাসে শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্মোৎসব উপলক্ষে মা কয়েকজন কন্যাসহ কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই কলিকাতায় বোমা বর্ষিত হয়। আশ্রমের সন্নিকটে হাতীবাগান বাজারে বোমাপতনের প্রচণ্ড শব্দ এবং বিস্ফোরণের সুতীব্র আলোকচ্ছটা শ্যামবাজার অঞ্চলকে ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত করিয়া

তুলিল। মা উদ্বিগ্নচিত্তে পুনরায় শ্রীশ্রীদামোদরলাল ও কন্যাগণসহ কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হইলে উদ্বাস্তু নরনারী প্রায় সকলেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু মা নবদ্বীপ-আশ্রম ও বিদ্যালয়ের বিলোপ ঘটাইলেন না। এই আশ্রমের কার্য যথাপূর্ব চলিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মা এইস্থানে আসিয়া বাস করিতেন। এইরূপে নবদ্বীপে একটি শাখা-আশ্রম গড়িয়া উঠে।

কিন্তু এই সম্প্রসারণের সহিত দেখা দিল সেবকসমস্যা। আশ্রমের প্রথম অবস্থায় প্রায় সকল কর্মই গৌরীমা স্বয়ং সম্পাদন করিতেন। সুতরাং স্থায়ী পুরুষ সেবকের প্রয়োজন তখন বিশেষ ছিল না। প্রধানতঃ ভক্তদিগের গৃহে গিয়া সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের জন্যই কেবল দুই-চারিজন সেবকের প্রয়োজন হইত। কিন্তু আশ্রমের প্রসারের সহিত, বিশেষতঃ গৃহনির্মাণের সময় হইতে, বাহিরের নানাপ্রকার কার্যে স্থায়ী সেবক অত্যাবশ্যক বোধ হইল। মুষ্টিমেয় ত্যাগী সন্তান সেইসময় হইতেই আশ্রমসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেবাতেই এতাবৎকাল কলিকাতা আশ্রমের বাহিরের কার্য চলিতেছিল। নবদ্বীপে শাখা-আশ্রম স্থাপিত হইলে সেবকসংখ্যা বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কয়েকবৎসর পরে বিহারপ্রদেশে গিরিডিতেও শাখা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রয়োজন তীব্রতর হয়।

মায়ের স্নেহভাজন কয়েকজন উচ্চপদস্থ সন্তান এই আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের অধীনস্থ কোন কোন কর্মচারীকে ছুটী মঞ্জুর করাইয়া আশ্রমসেবায় পাঠাইতেন। এইসকল সন্তানের মধ্যে কাপড়কলের ম্যানেজার শ্রীসুধীরকুমার দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসকল কর্মচারী স্থায়ী আশ্রমসেবক না হইলেও ইঁহাদের সশ্রদ্ধ সেবা এবং আচরণে মা তুষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ কর্মিসংগ্রহে শ্রীসুধীরকুমার রায় এবং শ্রীজয়কুমার দাশও যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

কিন্তু, এইপ্রকার অল্পসংখ্যক এবং অস্থায়ী সেবকদ্বারা সম্প্রসারিত আশ্রমের বহুধাবর্ধিত কর্মসমূহ আর সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং মা স্থায়ী এবং একনিষ্ঠ সেবক সংগ্রহে চেষ্টিত হইলেন। মায়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া কেহ কেহ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আশ্রমসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সংখ্যায় অধিক না হইলেও তাঁহাদের সহায়তায় আশ্রমের কার্যনির্বাহ অব্যাহত রহিয়াছে।

অন্য একশ্রেণীর আশ্রমসেবকের সাহায্যও মা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ চাকুরীজীবী, কেহ-বা স্কুলকলেজের ছাত্র। ছুটির দিনে এবং অন্য কোন কোন নির্দিষ্ট দিনেও তাঁহারা বিভিন্ন বাজারে বেপারীদিগের নিকট হইতে তরিতরকারী এবং অন্যবিধ ভোজ্যসামগ্রী আশ্রমসেবায় ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং অদ্যাপি আনিতেছেন। মায়ের আশ্রম-পরিচালনার বিরাট কার্যে এইসকল কিশোর এবং বয়স্ক সেবকের অবদান অবশ্যই নগণ্য নহে।

বহিরাগত কোন কোন মহিলাও আশ্রমের প্রাত্যহিক অতি-সাধারণ গৃহস্থালির কার্যকে গুরুসেবার অঙ্গরূপে জ্ঞান করিয়াছেন এবং এই সেবায় আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীতরুণবালা ঘোষ, শ্রীলাবণ্যপ্রভা রায়, শ্রীসুধাংশুবালা দে এবং কৃপাময়ী দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত, মায়ের আহ্বানে আশ্রমকন্যাগণের সঙ্গীত শিক্ষায় শ্রীউত্তরা দেবী, শ্রীমায়া দেবী (সেন), শ্রীকান্তি মিত্র এবং বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্যে শ্রীগৌরী সিংহ ও তাঁহার ভগিনীবৃন্দ, শ্রীমৃদুলা বিশ্বাস, শ্রীগৌরী মিত্র, স্মৃতি বসু দীর্ঘদিন হইতেই সহায়তা করিয়াছেন—কেহ কেহ অদ্যাপি করিতেছেন।

মায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পরবর্তিকালেও কোন কোন বিদুষী মহিলা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং অন্যভাবেও আশ্রম-সেবায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে

নবদ্বীপে আশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে ব্যয়ভার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এই আর্থিক সমস্যায় মা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং নানাভাবে তাহা সমাধানের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। তদুপরি স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলা দেশে উপস্থিত হইল পঞ্চাশের সেই ভীষণ মন্বন্তর। জাপানী আক্রমণের ভয়ে ইংরাজ সরকার বাংলা-দেশের খাদ্যশস্য যথাসম্ভব অন্যত্র স্থানান্তরিত করেন। ফলস্বরূপে দেখা দিল নিদারুণ খাদ্যাভাব। চারিটাকা মূল্যের চাউল চল্লিশটাকায় বা তদূর্ধ্বে বিক্রয় হইতে লাগিল, ক্রমে তাহাও হইল দুর্লভ। ধনীর সহর কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরেও চতুর্দিক হইতে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার শিশু ও বালক, জীর্ণবাস নরনারী দলে দলে আসিয়া গৃহস্থের রুদ্ধদ্বারে এক মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশায় হাহাকার তুলিল। বুভুক্ষুর সেই হৃদয়বিদারক আর্তনাদ অহর্নিশ আবর্তিত হইতে থাকে আকাশে বাতাসে। সহৃদয় বহু গৃহস্থ সামর্থ্যানুযায়ী দান করিতেন সত্য, দুর্গামাতাও অন্ন, রুটী, পয়সা ও বস্ত্রাদি যথাসাধ্য দান করিয়াছেন, কিন্তু, বলা বাহুল্য, তৎকালিক প্রয়োজনের তুলনায় তাহা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ভয়ঙ্কর এই পঞ্চাশের মন্বন্তর আশ্রম পরিচালনার ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করিল। কলিকাতা কেন্দ্র এবং নবদ্বীপ শাখায় তখন আশ্রমবাসিনী এবং বাহিরের কর্মীদিগের মিলিত সংখ্যা প্রায় একশত। দুইবেলা কিরূপে মা সকলের আহারসংস্থান করিবেন!

অগ্নিমূল্যের বিনিময়েও পর্যাপ্ত চাউল, আটা ইত্যাদি সংগ্রহ করা সেইসময়ে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার; সুতরাং আলু, মিষ্টি আলু, কচু পরিপূরক খাদ্যরূপে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। দিনের পর দিন আহারের এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা, এবং তাহাও কোন কোন দিন পূর্ণ মাত্রায় নহে। সকলের পক্ষেই ইহা দুশ্চিন্তার বিষয় হইল।

কারণ, সর্বত্যাগী এবং কষ্টসহিষ্ণু সন্ন্যাসিনীগণ ব্যতীত আশ্রমে বহু অল্পবয়স্কা শিক্ষার্থিনীও বাস করেন। এই বিপর্যয়েও কোন কন্যা দুর্গামাতার স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে যাইতে চাহেন নাই।

এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে,—বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদিগের আলমবাজারে বাসকালীন অন্নবস্ত্রের নিদারুণ অভাবের কথা, মহান আদর্শের সাধনায় দুঃখকষ্টকে সানন্দে বরণের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "সে কষ্ট দেখলে ভূত পালিয়ে যেত। দিনের পর দিন তেলাকুচোর পাতা সেদ্ধ আর ভাত, তাও পেটভরা নয়। কচু পাতায় করে খাওয়া।···কিন্তু তাতেই সকলে কি আনন্দে থাকতেন! ধ্যানধারণা, ঠাকুরের কথা আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সকল কষ্টকে ভুলিয়ে দিত।" আশ্রমবাসিনীগণও মায়ের আনন্দময় সান্নিধ্যে এবং ত্যাগ বৈরাগ্যের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকিয়া এইপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে ধৈর্যচ্যুত হন নাই, অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।

কন্যাগণের আন্তরিকতা এবং সন্তান ও ভক্তগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় মা মনে অপরিসীম বল পাইতেন। সন্তানগণ যথাসম্ভব খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মাকে দিতেন। সে সময়ে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট যে কিছু পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত ছিল না, তাহা নহে। নবদ্বীপের কোন কোন ব্যবসায়ী এইসময় কিছু চাউল ক্রয় করিয়া রাখিতে মাকে পরামর্শ দেন। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যেই মাকে চাউল সরবরাহ করিলেন।

কলিকাতায় এতাবৎকাল চাউল, ডাল, আটা ও ময়দা কিনিবার প্রয়োজন হইত না। বদান্য নরনারীর দানেই আশ্রমের প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। কিন্তু, মন্বন্তরের এইসময়ে সকলেরই অবস্থা অতীব শোচনীয়। অপরদিকে, পুলিসও সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন —যাহাতে সরকারের অনুমতি ব্যতীত খাদ্যশস্য লইয়া কেহ একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে না পারে।

মায়ের জনৈক সদাশয় গুজরাটী ভক্তসন্তান একদিন মাকে বলেন, "মা, আমি বারো মণ চালডাল আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু আনিয়ে নেবার দায়িত্ব আপনার। আমি এনে দিতে পারবো না, পুলিসে ধরবে।" খাদ্যবস্তু ছিল বড়বাজারের এক গুদামে। ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনিয়া মায়ের দুঃসাহসী এক সন্তান উহা আনয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। মায়ের পদধূলি লইয়া তিনি মধ্যাহ্নে যথাস্থানে গমন করেন। সেইস্থান হইতে একটি ঠেলা গাড়ীতে দানের জিনিষ লইয়া আসিবার পথেই বড়বাজার পুলিস ফাঁড়ি। একজন সিপাহী গাড়ীর পথরোধ করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল যে, অভাবের দিনে সাধুমায়ীদের আশ্রমে একজন দয়ালু ব্যক্তি খাদ্যগুলি দান করিয়াছেন, সুতরাং সিপাহীজীর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তিনি গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই অন্য একজন ট্রাফিক পুলিস পথ অবরোধ করিলেন। এইস্থানে কিঞ্চিৎ বচসা হয়, অবশেষে তিনিও পথ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে তিন-চারিস্থানে পুলিসের বাধা অতিক্রম করিয়া দানেপ্রাপ্ত খাদ্যবস্তু আশ্রমভবনে আসিয়া পৌঁছাইল। মা সন্তানটিকে প্রভূত আশীর্বাদ করিলেন।

এইকালে রাজ্যসরকার কলিকাতায় এবং আরও অনেক স্থানে অত্যাবশ্যক খাদ্যবস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং 'রেশনিং' ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ইহাতে খাদ্যবস্তু সংগ্রহের দুর্ভাবনা এবং অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইল সত্য, কিন্তু প্রতিসপ্তাহে রেশনের দোকান হইতে উহা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর অর্থের প্রশ্নটিও এক নূতন উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

মাতৃ-সংঘ

ভারতীয় নারীর আদর্শ এবং আশ্রমের ভাবধারা সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে এমন এক শ্রেণীর কন্যার প্রয়োজন যাঁহারা এই উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় ব্রতধারিণীর জীবন বরণ করিবেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুঘরের কন্যাগণ চিরকুমারী থাকিয়া সমাজের সেবা করিবেন, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সাধনভজনে রত থাকিবেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া ভবিষ্যতে যে এক সন্ন্যাসিনী-সংঘ গড়িয়া উঠিবে,—ইহা ছিল অভাবনীয়। কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ গৌরী-মাতার এবং অনতিবিলম্বে দুর্গামাতার ত্যাগ ও সাধনবলে এই দুরূহ কার্য বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। রক্ষণশীল মাতাপিতা যে নিজেদের আদরিণী কন্যাকে সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল তাঁহাদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও মাতৃস্নেহ।

আশ্রমে এই সন্ন্যাসিনী-সংঘের সূচনা হয় দুর্গামাতার সন্ন্যাসগ্রহণে। অতঃপর গৌরীমা কোথাও কোন উত্তম আধারের কন্যা দেখিলে তাহার ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া মাতাপিতার নিকট হইতে তাহাকে চাহিয়া আনিতেন। তিনি কাহাকেও বলিয়াছেন, “ও আমার দামুর সেবা করবে,” কাহাকেও বলিয়াছেন, “তোমার এই মেয়েটিকে আমায় দাও, ও আমার আশ্রমের হিসেব লিখবে।” কোন কোন পিতা গৌরীমার এইরূপ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। গৌরীমার জীবিতকালেও এইসকল কন্যার শিক্ষা ও গঠনের দায়িত্ব দুর্গামার উপরই ন্যস্ত থাকিত। এই কন্যাগণের অনেকে মাতৃদ্বয়ের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যথাসময়ে আশ্রমসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষালাভ করিয়াছেন। এই সন্ন্যাসিনীবৃন্দকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে আশ্রমের ‘মাতৃসংঘ’। নিজভবনে আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকালমধ্যে ১৩৩৫ সালে গৌরীমাতার নেত্রীত্বে এবং দুর্গামাতারই উদ্যোগে এই মাতৃসংঘ

আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত এবং সন্ন্যাসিনীদিগের পালনীয় বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হয়।*

এইরূপে গৌরীমার জীবদ্দশাতেই দুর্গামা কিছুসংখ্যক সন্ন্যাসিনী সহকারিণীরূপে পাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্রমের কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃই বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন। দুর্গামাও কোন কোন মাতাপিতার নিকট কন্যা যাচ্ঞা করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলকামও হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যথার্থ প্রার্থনা ছিল শ্রীমাতার নিকট। তিনি সর্বার্থসাধিকা শ্রীসারদামাতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেন—যেন কন্যারূপে আসিয়া স্বয়ং শ্রীমাতাই সুষ্ঠুভাবে আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেবল পূজায় বসিয়াই যে তিনি এমন প্রার্থনা জানাইতেন তাহা নহে; ইহা ছিল তাঁহার সর্বসময়ের আন্তরিক এবং ব্যাকুল নিবেদন।

জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে মা এই কথা একপত্রেও লিখিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমা কন্যারূপে এসে আশ্রম পালন করুন, এই মন্ত্র তুমিও জপ। মা আসুন, আমাদের আশ্রমে যুগে যুগে মা আসুন। তিনি কন্যারূপে আশ্রম পালন করুন, রক্ষা করুন,—জগদম্বা আসুন। এ মন্ত্র আমি জপিতেছি। মা এলে এত বড় বিরাট জিনিষের বৈশিষ্ট্য মর্যাদা রক্ষা পাবে।"

তাঁহার প্রার্থনা যথাস্থানে পৌঁছিয়াছিল। কারণ, পর পর এমন

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রাচীন ভক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিয়াছেন (মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৬৩),—

"বাংলাদেশে অতীত এবং আধুনিক কালেও কোন সন্ন্যাসিনী সংঘ ছিল না। কচিৎ কোথাও দুই একজন সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনী সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনী ব্রতে দীক্ষিত করা পূর্বে ছিল না। ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনী সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতবর্ষে গৌরীমাই প্রথম করেন। এবং এই সন্ন্যাসিনী সংঘের আদর্শ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী।...বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীমার কথা প্রচার করিয়া নারীসমাজকে তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।"

কতিপয় কন্যা আশ্রমে আগমন করেন যাঁহারা অতিসহজেই মায়ের উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া উঠিতে পারিয়াছেন। আশ্রমের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগের সূত্রও বিচিত্র। কেহ মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় আসিয়াছেন; আবার কোন মাতাপিতা হয়তো নিজজীবনে যথাকালে ব্রহ্মচর্য পালনের সুযোগ লাভ করেন নাই, পরিণত বয়সে কন্যাকে আশ্রমে ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপনে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছেন। কন্যাগণ প্রথম দর্শনেই মায়ের ভিতরে দেখিতে পাইয়াছেন তাঁহাদের পরম আশ্রয়। সকলের মুখেই এক কথা,—মাকে দেখিয়াই মনে হইল,—ইনিই আমাদের জন্মজন্মান্তরের মা। মা-ও প্রথম দর্শনেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন যে, এইসকল কন্যা তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্যই আশ্রমে আসিয়াছেন।

কতিপয় অন্তেবাসিনীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধি হইবে—দুর্গামা কিরূপ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে কন্যাকুলকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং কন্যাগণও কি অপার্থিব সম্পদের উদ্দেশ্যে নিজেদের দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।

গৌরীমাতার দেহাবসানের স্বল্পকাল পরে আশ্রমে আগতা জনৈকা কিশোরী, বর্তমানে আশ্রমের সেবাভারপ্রাপ্তা সন্ন্যাসিনী, তাঁহার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা লিখিয়াছেন,—

"আমাদের পূজনীয়া মায়ের কথা মনে হলেই সবকিছুর আগে মনে পড়ে, তাঁর অফুরন্ত ভালবাসার কথা। মা ছিলেন স্নেহমমতার আধার।...অদ্ভুত এক আকর্ষণীশক্তি ছিল তাঁর! মাকে প্রথম দর্শনের কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

"একদিন সকালবেলা মাকে দেখতে এলাম। কলকাতা আশ্রম-বাড়ীর একতলার হল-ঘরে বসে রইলাম মাতৃদর্শনের অপেক্ষায়। সামান্যক্ষণ পরেই একজন আমায় তেতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন মার কাছে। মা তখন একটি জলচৌকীতে বসেছিলেন, কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণামান্তে উঠতে যাব, মা আমাকে দু'হাত দিয়ে

বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মা, তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। আমি তোমায় স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আসবে আমি জানতাম। আজ থেকেই তুমি আশ্রমে থাকবে।' একথা শুনে আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'কিন্তু মা, আমি তো আজ কাপড়জামা কিছু নিয়ে আসি নি।' উত্তরে মা হেসে বললেন, 'কাপড়ের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, আমি সব দেব।' আমি তখনও মার স্নেহডোরে আবদ্ধ। সে-যে কি অমৃতময় স্পর্শ! কি যে অপরিসীম আনন্দ আমার হয়েছিল, সে কথা মনে হলে আজও প্রাণে আনন্দ পাই।

"মার কাছে আসার মাত্র কয়েকমাস আগে আমার গর্ভধারিণী জননী পরপারে যাত্রা করেছেন। কিন্তু মাকে দেখে, মায়ের স্পর্শ পেয়ে প্রাণটা আমার জুড়িয়ে গেল। সদ্যমাতৃহীন অন্তরে এক অপার শান্তি পেলাম, আর মনে হল যে, গর্ভধারিণীও এত ভালবাসতে পারেন না। এই মা-ই আমার বেশী আপনার। আমি সেদিন থেকেই আশ্রমে থেকে গেলাম।

"মায়ের চরণপ্রান্তে যিনি আমায় এনেছিলেন তিনি আমার পিতার গুরুমাতা। সংসারে বাস করেও তিনি ছিলেন সাধিকা। মা তাঁকে চিনতেন, 'সুন্দর মা' বলে ডাকতেন। পরে বুঝেছি, তিনি আশ্রমের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীলা এবং আশ্রমের সকলেও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। মনের গোপনে তাঁর এই উদ্দেশ্যই ছিল যে, আশ্রম যদি আমার ভাল লাগে, তবে আমি যেন আশ্রমবাসিনী হয়ে যাই, আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করি। কিন্তু, প্রথম দিনেই যে মায়ের এবং আমার মধ্যে এমন প্রীতির ভাব জমে যাবে, এতটা তিনি অনুমান করতে পারেন নি। পরে অবশ্য পিতাও এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন।

"আমার বয়স তখন বারো। সেই থেকে ২৩।২৪ বছর মায়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে দিবারাত্র বাস করেছি, প্রত্যেক দিনের ছোটবড় সকলরকম আচরণ দেখে এটাই বুঝেছি, এমন মমতাময়ী ও আদর্শবতী মা পাওয়া মহাভাগ্যের কথা। মার ভালবাসার আকর্ষণই

ছিল বড়, তাঁর মহৎ আদর্শের কথা তখন অত ভেবে দেখি নি। সে ভাব পরে মা আমাদের ভেতর 'ইনজেকশন' করে ঢুকিয়েছেন।

"এক একদিন শ্রীশ্রীদামোদর শিলাকে সুন্দর করে সাজিয়ে আমাদের ডেকে মা দেখাতেন, আর বলতেন, 'ছ্যাখো মা, কি সুন্দর সেজেছেন মহারাজ, কী রূপ! প্রাণ ভরে দর্শন কর, ভালবাস এঁকে। এঁর চেয়ে সুন্দর কেউ নেই পৃথিবীতে। যদি সোনার পুরুষও তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তার দিকে চাইবে না। সে দামোদরলালের চেয়েও নিশ্চয়ই সুন্দর নয়। তোমরা সব মা-মানুষ, মেয়েমানুষ নও। যত সন্তান আসবে সকলকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখবে, শ্রীমার দিকে সবাইকে এগিয়ে দেবে। আমার কাছে বহু সন্তান এসেছেন তোমাদের মত বয়সে, আমি সকলকে শ্রীমার কাছে নিয়ে গেছি। তোমরা সব দেবতার পায়ের ফুল। নিজেরা শুদ্ধ পবিত্র থাকবে। নিজে পবিত্র থাকলে সেই পবিত্র অন্তর দিয়ে যে কাজ করবে মা, তাতে আপনা থেকেই সিদ্ধি আসবে, কল্যাণ হবে। শ্রীমা বলতেন, 'পুড়বে মেয়ে, উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।' সাধু সাবধান, বার বার সাবধান, ফের কহ সাবধান। এটি সতীতীর্থ—মাতৃপীঠ, এর শুচিতা রক্ষা সবার আগে।'

"আবার আশ্রমসেবায় উপদেশ দিতেন, বলতেন—'মা, বহু-লোকের সঙ্গে থাকা, সকলকে মানিয়ে চলতে হবে, স্বার্থত্যাগ করতে হবে। দল পাকাবে না কখনও। 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।' আমি কিছু চিরকাল থাকব না, কিন্তু এই আশ্রম থাকবে; এখানে যিনিই প্রধান হয়ে থাকবেন, তাঁকেই মান্য করে চলবে। যাঁর যেমন সম্মান তাঁকে তা দিতে হয়। আশ্রমটি রক্ষা পেলে আবার বহু কন্যা আশ্রয় পাবে।'...এই সব ছিল আমাদের প্রতি মার প্রতিদিনের কথা।"

মায়ের প্রসঙ্গে অধিকবয়স্কা এক সন্ন্যাসিনীর উক্তি :—

"আশ্রমবাসিনী হইনি তখনও, বাইরে থেকে আশ্রমে এলাম, বেলা ৯-টা হবে। চারতলায় গিয়ে মন্দিরে পূজারতা মাকে দেখলাম,

মনে হল যেন—স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী নারায়ণ পূজো করছেন। মাকে দেখেই অনুভব করলাম, ইনি আমার জন্মজন্মান্তরের মা। সেই মুহূর্ত হতেই তাঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণও অনুভব করলাম। চোখ থেকে অবিরলধারে জল পড়তে লাগল। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে মাকেই দেখছি কেবল, আর সব ঠাকুর-দেবতাদের প্রণাম করতেও ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে, এঁকে ছেড়ে বাড়ী যাব কি করে। কিছুক্ষণ পর মা হেসে বললেন, 'কি রে, দীক্ষা নিবি?' তারপর মা মহামন্ত্র দান করলেন। মন্ত্রশ্রবণে দেহমনে অনুভূত সেই পুলক ও শান্তির কথা আজও মনে পড়ে। আমায় কাঁদতে দেখে বহিরাগতা এক ভদ্র-মহিলা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, এর কি দুঃখ, এত কাঁদছে কেন?' করুণামিশ্রিত হাসিমুখে মা বললেন, 'ওগো, ও শোকে দুঃখে কাঁদছে না, ভক্তিতে প্রেমেতে কাঁদছে, ও আমার বৈরিগী মেয়ে।'

"তারপর আর একদিন আশ্রমে এসেছি। মা তেতলার হলে চৌকীতে বসেছিলেন। প্রণাম করে বললাম, 'মা, রামকৃষ্ণকে দেখতে পাবো তো?' এ কথায় মার মুখ এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরে গেল, আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এ কথা তো কেউ বলে না, নিশ্চয় পাবে মা। তাঁকে যে আন্তরিকভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে ডাকবে, সে পাবে তাঁকে।' মা পুনরায় বললেন, 'মাগো, কাকে ভালবাস? বাবা মা ভাই বোন—কার ওপর আকর্ষণ?' আমি বললাম, 'আমার ছোটভাইকে আমি মানুষ করেছি, ওকে সব থেকে বেশী ভালবাসি।' মা বললেন, 'রামকৃষ্ণকে ভালবাসবে, তিনিই বাপ মা ভাই বোন বন্ধু, তাঁর চেয়ে আপনার আর কেউ নেই।'

"তারপর একদিন আশ্রমে ভর্তি হলাম। মনে হল যেন বৈকুণ্ঠে এসেছি।...মার কাছে সর্বক্ষণ থাকতাম, আমার সকাল সন্ধ্যা রাত্র কাটতো তাঁর পূতসান্নিধ্যে।"

অপর এক সন্ন্যাসিনীর কথা :—

"ছোটবেলায় গর্ভধারিণীর সঙ্গে আশ্রমে আসতাম। ঠাকুমাকে (অর্থাৎ গৌরীমাকে) বড় ভাল লাগতো। প্রসাদ দিতেন, আদর

করতেন, আর বলতেন, 'দামুকে ভালবাসবি, বুঝলি?' আবার কখনও বলতেন, 'আশ্রমে থাকবি?' আমিও 'হ্যাঁ' বলতাম। আর ইচ্ছে হতো—যদি থাকতে পেতাম, কি ভালই হতো! আমার মাকে গৌরীমা বলতেন, 'তোর একটি দুটি মেয়েকে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিস্।' মায়েরও খুব আগ্রহ ছিল—তাঁর দু-একটি কন্যা ত্যাগী থেকে ভগবানের পথে অগ্রসর হয়। ঠাকুমাও ভরসা দিতেন,—'ভাবিস্ নি মা, ওরা ঠিকই আসবে সময় হলে।'

"কিছুদিন পর আমরা দেশে ফিরে যাব। রাত্রে ট্রেন, মায়ের ইচ্ছা যাবার দিন ঠাকুমাকে প্রণাম করে যাবেন। আমাদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে ঠাকুমার কাছে এলেন। তখন বেশ বেলা হয়েছে। ঠাকুমা পুজো করতে যাবেন মন্দিরে। বললেন, 'ছুঁস্ নি, মা, এমনি প্রণাম কর্।' মায়ের খুব দুঃখ হল, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারবেন না ভেবে। আমার কি মনে হল, ঠাকুমার পা দুখানি আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ধরে প্রণাম করলাম। ঠাকুমা খুব হাসতে লাগলেন, আর বললেন, 'তোর এই মেয়েটা তো খুব চালাক, ও কেমন ছুঁয়ে নিল। তবে আয়, তোরাও সবাই ছুঁয়ে প্রণাম কর।' ঠাকুমাকে আমাদের সেই শেষ-প্রণাম, শেষ-দর্শন। সেদিনের সেই আনন্দ ভোলার নয়। দুর্গামাকে তখন দেখেছি মাত্র।

"তারপর দেশে কেটে গেল বেশ কয়েকবৎসর। আবার কলকাতায় এলাম। একদিন আশ্রমেও এলাম। সেদিন বেলুড় দক্ষিণেশ্বর হয়ে যখন আমরা আশ্রমে এলাম তখন বেলা ২টা।... পূজনীয়া কমলামা এসে আমাদের চিনতে পেরে বললেন, 'তোমরা উষামার মেয়ে, না? এস এস।' তিনি আমাদের সাদরে ডেকে ভেতরে বসালেন। দুর্গামাকে দেখতে এসেছি,—বললাম। তিনি তখন নবদ্বীপে আছেন জেনে আমাদের খুব দুঃখ হল। আবার আসা হবে কি অতদূর থেকে! সারাদিন না খাওয়া, রৌদ্রে ঘুরে সবাই ক্লান্ত। ইচ্ছা ছিল...প্রসাদ পাব, কিন্তু আগে থেকে কোন ব্যবস্থা করা ছিল না বলে ঐ দুয়ের একস্থানেও প্রসাদ পাওয়া সম্ভব হয় নি।

বাড়ী ফিরে রান্না করতে হবে, এসব ভেবে কিছু না বলে আমরা তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইলাম। কমলামা বললেন, 'সে কি কথা? এত বেলায় প্রসাদ না পেয়ে যাবে কি!' মায়ের অযাচিত করুণায় চোখে জল এলো। অন্যত্র প্রসাদ পাবার ইচ্ছা থাকলেও পাই নি, আবার এখানে না চাইতেই মা নিজে ডেকে প্রসাদ দিচ্ছেন।... পরিতৃপ্ত হয়ে প্রসাদ পেলাম। দুর্গামার কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে তিনি বললেন, 'বুধবার স্নানপূর্ণিমা, ঐদিন এসো। ইতিমধ্যে মা ফিরে আসবেন। মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিও।'

"বুধবার ভোরে স্নান সেরে ফুলফল নিয়ে আশ্রমে এলাম। মাকে দেখব, তিনি কৃপা করবেন, কি একটা আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। তবু মনে আশা-নিরাশার চিন্তা, মা দেবেন তো দীক্ষা? গ্রহণ করবেন তো কন্যারূপে?...

"মা কিন্তু দেখেই হেসে বললেন, 'কি রে, কি চাই?' বললাম, 'মা, আপনি আমাকে গ্রহণ করুন' ..মায়ের কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ কাণে যেন সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দিল।

"অপরাহ্ণে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। মায়ের পায়ের উপর মাথা রাখতেই মা দু-টি হাত দিয়ে আমার মাথাটি ধরে বললেন, 'তোকে আমার...এইনামে ডাকতে ইচ্ছে করছে।' উত্তরে বললাম, 'আপনার যা ইচ্ছে, মা।' আশ্রমে থাকবার ইচ্ছা জানাতে মা বললেন, 'আচ্ছা, আমি শ্রীমার কাছে জিজ্ঞাসা করি, মা যদি বলেন, নিশ্চয় আসবি।'

"বাবার ইচ্ছা ছিল না—একেবারে আশ্রমবাসিনী হই। কিন্তু সত্যদর্শিনী গৌরীমার কথা মিথ্যা হতে পারে না। বাবাকে মিনতি জানিয়েছিলাম,—একটিবার আমার গুরুমাকে নিজের চোখে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন, কোথায় যেতে চাইছি। অবশেষে তিনি একদিন আশ্রমে এলেন। মা বাইরের ঘরে বসেছিলেন, মাকে দর্শনমাত্র বাবার মনের দৃঢ়তা সব ওলোট্‌পালোট্‌ হয়ে গেল। তিনি এসে-ছিলেন মাকে বোঝাতে যে, তিনি স্নেহময় পিতা, কন্যাকে সন্ন্যাসী

করে দিতে পারবেন না। তিনি কিছু বলার আগেই মা বললেন, 'এসেছ বাবা, তোমাকে দেখেই আমার পুত্রাভিমান জেগে উঠেছে। তুমি আমার চিরদিনের সন্তান।' বাবা এই প্রথম মাকে দর্শন করলেন। মায়ের সুমিষ্ট কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনের অবস্থাও অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি নিজে থেকে মাকে বললেন, 'মা, আপনার কন্যাকে আপনি যেদিন চাইবেন সেইদিনই আশ্রমে দিয়ে যাব।' বাড়ী ফিরে স্বজনবন্ধুদের কাছে বাবা বলেছিলেন, 'আমার যে মা নেই, একথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম আশ্রমজননী দুর্গামাকে দেখে।'

"এরপর একদিন মা তাঁর অধম কন্যাকে পায়ে স্থান দিলেন। মায়ের সান্নিধ্যে বাস করে এই বুঝেছি, মায়ের কাছে যে এসেছে, সে-ই মনে করেছে যে, মা আমার মত কাউকে ভালবাসেন না।"

মায়ের সম্বন্ধে আরও একজন সন্ন্যাসিনীর উক্তি :—

"আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী, পিতৃগৃহে বাস করি। একদিন পিতামাতার মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গে পিতাকে বলতে শুনেছিলাম—'শ্রীরাম-কৃষ্ণ-জগতের একটি তারা খসে গেল।' তখন এই কথার যথাযথ অর্থ বুঝতে পারি নি। পরে মাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরীমাতা দেহ রেখেছেন। বর্তমানে তাঁরই একজন উত্তরাধিকারী আছেন, তিনিই এখন সারদেশ্বরী আশ্রম পরিচালনা করেন, আজীবন কুমারী সন্ন্যাসিনী। সেইদিন থেকে আমাদের দেশের ভাষায় 'সাধুমা'র নামটি মনে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। পিতার মুখে আরও শুনলাম—তিনি নাকি পুরুষোত্তমে আত্মনিবেদিতা, জগন্নাথদেবকে ভজনা করে তপস্যায় জীবনযাপন করছেন। আমার নিকট এরূপ জীবনকথা অপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব এবং ধারণার বাইরে।

"আমি ছেলেমানুষ, আমার জ্ঞানবুদ্ধিই বা কতটুকু। দুর্গামা আজীবন জগন্নাথদেবকে ভজনা করে তপস্যায় জীবন কাটাচ্ছেন, এই কথা যত ভাবি, ততই কৌতূহল বাড়ে।...মীরাবাঈ বিবাহ

করেছিলেন, তাঁরও একজন লৌকিক স্বামী ছিলেন। শুধু ভগবানকে জীবনের ধ্রুবতারা করে মানুষের জীবন কত সুন্দর পবিত্র হয়, কত আনন্দের হয়, এটাই জানার মস্তবড় কৌতূহল ছিল মনে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরেও প্রতীক্ষায় দিন কাটে, কবে লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হয়ে নিজে ইচ্ছামত সাধুমার কাছে যেতে পারব। পাঠান্তে হয় কর্মজীবন সুরু। আমার কর্মক্ষেত্র আসাম থেকে চলে এলাম বিহারে, উদ্দেশ্য—এমন জায়গায় কাজ করব যেখান থেকে সাধুমার কাছে সহজে যাতায়াত করতে পারি।···

"কৌতূহলোদ্দীপ্ত চিত্তে সাধুমাকে যেদিন প্রথম দর্শন করলাম, তখন আনন্দে অন্তর পরিপূর্ণ। সেই পূর্ণানন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। আমি শুধু অনিমেষদৃষ্টিতে দেখছি—মানসকল্পনার সেই সাধুমাকে। স্তম্ভিত হলাম এমন জ্যোতির্ময়ী দেবীমাতার দর্শনে। কি দেখছি, কাকে দেখছি! তখন মনপ্রাণ আত্মহারা। পুঞ্জীভূত দেবত্ব যেন একত্র জমাটবাঁধা, দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত! এমন প্রশান্ত মাতৃমূর্তি তো পূর্বে কোথাও চোখে পড়ে নি। তাঁর ধীর প্রশান্ত করুণার দৃষ্টিতে আমার চিত্ত কেড়ে নিলেন। তাঁর চরণপ্রান্তে আত্মনিবেদন করে পূর্ণানন্দে বিভোর হলাম।···মনে প্রত্যয় হল, এতদিনে জীবনের 'গাইড' খুঁজে পেলাম।"

উপরোক্ত ব্রতধারিণী কন্যাগণের মত আরও কন্যা বিভিন্ন সময়ে আশ্রমে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন দুর্গামার আকর্ষণে। মা-ই তাঁহাদের জীবন, মায়ের আদর্শই তাঁহাদের জীবনাদর্শ। ইহাদিগকেও মা যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য এবং সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিয়া মাতৃসংঘের শক্তি প্রভূত বৃদ্ধি করেন। ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিতা এবং মাতৃজাতির সেবা ও কল্যাণে আত্মনিবেদিতা এইসকল সন্ন্যাসিনীই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রাণস্বরূপা,—শ্রীসারদামাতা, গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতার প্রদর্শিত কল্যাণপথের আলোকবর্তিকাধারিণী।

দুইটি আনন্দানুষ্ঠান

১৩৫১ সালের দুইটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান।

গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতা উভয়েরই অন্তরে দীর্ঘকাল হইতে একটি ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল যে, শ্রীশ্রীসারদামাতার দেহান্তে তাঁহার পূতাস্থি যেভাবে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যপূজিত হইতেছেন, তদ্রূপ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতাস্থিও আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাহা আশ্রমের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইবে। ধর্মাত্মাদিগের শুভ অভিলাষ অপূর্ণ থাকে না। বিলম্বে হইলেও ইহাও অপূর্ণ রহিল না; গৌরীমাতার জীবদ্দশায় না হইলেও, দুর্গামাতার সৌভাগ্যে সেই প্রার্থনা সফল হইল এইসময়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিত জনৈক সন্ন্যাসী আশ্রমের মাতৃদ্বয়ের প্রতি অতিশয় ভক্তিযুক্ত ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। গৌরীমাতার দেহত্যাগের কয়েকবৎসর পরে একদিন আশ্রমে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে তিনি দুর্গামাকে বলেন, "অনেকদিন থেকেই একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি, কিন্তু বলা আর হয় না। আজ বলব বলেই এসেছি। আমার ইচ্ছে— আমাদের ঠাকুরের ব্রহ্মসত্ত্ব সারদেশ্বরী আশ্রমেও থাকে। আমি দিতে পারি, এতে আমারও আনন্দ হবে, আশ্রমেরও কল্যাণ হবে। গ্রহণ করবেন?"

এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনিয়া মা এতই অভিভূত হইলেন যে, বিস্ময়ে ও পুলকে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল। দীন আশ্রমের প্রতি দয়াল ঠাকুরের এমন অযাচিত করুণা! মায়ের এবম্বিধ মৌন সম্মতিতে সন্ন্যাসীও আনন্দিত হইলেন। মনে হইল— তাঁহার অভীষ্ট যেন এতদিনে সিদ্ধ হইল। আশ্রমের জনৈক সন্তানের প্রতি তিনি নির্দেশ দিলেন—এই সম্পর্কে কোন্ তারিখে, কোন্ স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরমবস্তু প্রাপ্তির

সম্ভাবনায় মা একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যপাত্রসহ নির্দিষ্টদিনে সন্তানটিকে প্রেরণ করিলেন। যথাকালে রৌপ্যাধারে সযত্নে রক্ষিত সেই মহামূল্য সম্পদ স্বয়ং কৃপাপরবশ হইয়া সৌভাগ্যবতী দুর্গামাতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পরম শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত দুই হস্ত প্রসারণে মা বরণ করিলেন সেই স্বয়মাগত দেবতাকে এবং মস্তকে ও বক্ষে ধারণপূর্বক রক্ষা করিলেন যথাস্থানে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকাপূজাদিবসে বিশেষ হোম-পূজাসহকারে দুর্গামা সেই পরমসম্পদকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতাস্থিও ভোগারতিসহযোগে নিত্য পূজিত হইতেছেন আশ্রমমন্দিরে। এই সম্বন্ধে দুর্গামা পরবর্তী ট্রাষ্টী ও সেবায়েতদিগকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, "পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর পূতাস্থির ন্যায় পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতাস্থিও এই আশ্রমে যথারীতি পূজিত হইবেন এবং এই বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয় আশ্রমের সাধারণ তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।"

১৩৫১ সালেই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হয়। দুর্গামা আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী-উৎসবের যথোচিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশবাসীর পক্ষ হইতে মাননীয় বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, দেশবরেণ্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাধাবিনোদ পাল, কলিকাতার মেয়র আনন্দিলাল পোদ্দার-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জনসাধারণের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রচার করিয়া জানাইলেন, "আশ্রমের এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস এতদ্দেশের মাতৃজাতিরই গৌরবের ইতিহাস। আশ্রমের লোককল্যাণব্রতের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায়···সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসবকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।"

পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ১৭ই অগ্রহায়ণ উৎসবের

শুভ উদ্বোধন হয় যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে। প্রত্যূষে কতিপয় সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীসহ দুর্গামা তথায় গিয়া সর্বাগ্রে মাতা ভবতারিণীকে বিবিধ উপচারে পূজা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মাতা সারদেশ্বরীকে নববস্ত্রে ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। ঠাকুরের কক্ষে বসিয়া মা শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসিনীগণ শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণীর পূজারতি ও ভোগাদিকৃত্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে একটি সভার অধিবেশন হয় নহবতঘরের উত্তর-পূর্বদিকে। প্রশস্ত চন্দ্রাতপ-তলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদামাতা ও গৌরীমাতার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিতে সজ্জিত করা হয়। এইস্থানেই একদিন গৌরীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।" বলা বাহুল্য, ঠাকুরের সেই অর্থপূর্ণ নির্দেশ হইতেই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্ভব। সভাস্থলে দুর্গামা আশ্রমের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। অতঃপর প্রভাময়ী মিত্রের ভাষণ এবং কোন্নগরের কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের মাতৃবন্দনা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দদান করে।

দ্বিতীয় দিবসে আশ্রমভবনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আবির্ভাব তিথিতে পূজাপাঠ ও হোমাদিকৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। সমাগত ভক্তমণ্ডলীর জন্য আশ্রমের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেও সুসজ্জিত একটি মণ্ডপ নির্মিত হয়। দিবসব্যাপী কীর্তনগানে স্থানটি থাকে আনন্দমুখর।

তৃতীয় দিবসে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের প্রশস্ত গৃহে বিরাট সমাবেশে পৌরোহিত্য করেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিশ্ববরেণ্য মনীষী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (উত্তরকালে স্বাধীন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি)। কলিকাতা বেদবিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক উদ্‌গীত বৈদিকমন্ত্রে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। আশ্রমের পক্ষ হইতে বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মাননীয় সভাপতিকে বরণ করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের দেবভাষায় আশ্রমের বিষয় বর্ণনান্তে

প্রখ্যাতলেখিকা সরলাবালা সরকার আশ্রমের ক্রমোন্নতি এবং বৈশিষ্ট্যের সুখ্যাতি করেন। অতঃপর সংক্ষেপে আশ্রমের ইতিহাস বর্ণনা করেন দুর্গামা। শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের স্বামী বোধাত্মানন্দ বলেন,—মাতৃজাতিকে শিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া সারদেশ্বরী আশ্রম জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং সুবোধ রায় আশ্রমপ্রসঙ্গে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আমি আজ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমি বিশেষভাবে আনন্দিত, যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত ধর্মের প্রভাব এবং অনুপ্রেরণা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।···

"শিক্ষা যদি পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য হইবে—আত্মার নিত্যশুদ্ধির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া। আমাদিগকে প্রাচীন পদ্ধতির সত্য আদর্শ পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি আশা করি, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থিনীগণ বড় হইয়া কেবল সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনই করিবেন না, তাঁহারা হইবেন—অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্না, দয়া এবং তপস্যার সাধিকা।

"আমি আরও আশা করি যে, এই নগরের অধিবাসী এবং দেশের অন্যত্র সকলে এই প্রতিষ্ঠানের হিতকর কার্যাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হইবেন···সারদেশ্বরী আশ্রমের ন্যায় বহু প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করিবে।"···

সভাশেষে বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি এবং সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চতুর্থ দিবসের অনুষ্ঠান হয় কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে। তথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব, গৌরীমাতা, স্বামী অভেদানন্দজী এবং

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মাষ্টার মহাশয়ের সমাধিমন্দির-চতুষ্টয় পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। গীতিরত্ন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কীর্তন এবং প্রখ্যাত গায়ক মৃণালকান্তি ঘোষ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পঞ্চম দিবসে মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে। সভানেত্রীত্ব করেন বিচারপতি স্যার রূপেন্দ্রকুমার মিত্রের পত্নী সুধাহাসিনী দেবী। শ্রীউত্তরা দেবী ও শ্রীকান্তি মিত্রের কীর্তন, বিশিষ্ট মহিলাদিগের ভাষণ এবং ছাত্রীবৃন্দের আবৃত্তি উপস্থিত সকলকে পরিতুষ্ট করে।

এইরূপে দুর্গামাতার উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবটি সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী নরনারীগণও নানাভাবে এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন।

গিরিডিতে শাখা-আশ্রম

১৩৫৩ সালের ভাদ্রমাসে কলিকাতায় এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নরহত্যা সংঘটিত হয়, তাহাতে আশ্রম ও কন্যাগণ সম্পর্কে মা উদ্বিগ্ন হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন। পরামর্শ সভার সদস্যগণও মাকে বলেন,—এই পরিস্থিতিতে বাংলার বাইরে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। সাঁওতাল পরগণায় হলেই ভাল হয়, কাছাকাছি হবে তাহলে।

স্থির হইল, কয়েকজন আশ্রমবাসিনীসহ জনৈক সন্তান অবিলম্বে বিহার অঞ্চলে গিয়া আশ্রমের উপযোগী জমি ও বাটীর অনুসন্ধান করিবেন এবং সন্ধান পাইলেই মাকে জানাইবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর একটি বাটী আছে যশিডি ষ্টেশনের সন্নিকটে। আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা সরলাবালা সরকার এবং নির্ঝরিণী সরকার উক্ত বাটীতে আশ্রমবাসিনীদিগকে বাস করিবার অনুমতি দান করেন। পৌষমাসে মাতৃবৃন্দ তথায় গেলেন। অদূরবর্তী বৈদ্যনাথ ধামে সর্বাগ্রে ভূমি ও বাটীর বহু সন্ধান করা হইল। মধুপুরের খ্যাতনামা অধিবাসী রায়সাহেব মতিলাল মিত্র সাগ্রহে জানাইলেন,—মা যদি মধুপুরে শাখা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তিনি তদুপযোগী জমি ও বাটীর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহাদের পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়টির কার্যভার আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে আশ্রমের জন্য অর্থ-সাহায্যেরও চেষ্টা করিবেন।

ফাল্গুনমাসে মা স্বয়ং যশিডিতে গমন করেন। প্রথমে বৈদ্যনাথ-ধামের কয়েকটি নির্বাচিত জমি ও বাটী দেখিলেন, কিন্তু কোনটাই তাঁহার মনঃপূত হইল না। অতঃপর রায়সাহেবের অনুরোধে মা

মধুপুরে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিও দেখিলেন। রায়সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহের কথাও মা শুনিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। মধুপুর হইতে একদিনের জন্য নিকটবর্তী মহকুমা-সহর গিরিডিতে গিয়া মা স্থানীয় উকীল শ্রীকুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথি হইলেন এবং তথাকার কয়েকটি জমি ও বাটী দেখেন। নিউ বারগণ্ডায় অবস্থিত একটি অর্ধসমাপ্ত গৃহও দেখা হইল। তথায় খড়ের স্তূপের উপর বসিয়া গৃহবাসিনীদিগের সহিত আলাপ-আলোচনাকালে মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া সঙ্গীদিগকে বলেন, "এই বাড়ীই কেনা হোক।" তিনি তখন আরও ব্যক্ত করিলেন,—কয়েকদিবস পূর্বে তিনি স্বপ্নে একটি বাটী দেখেন, গৌরীমা তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন, সেইস্থানে বিষ্ণুধাম রচনা করিতে হইবে। স্বপ্নে তথায় বৃহদাকার এক শালগ্রাম শিলাও দর্শন করিয়াছেন। এই বাটীর সম্মুখভাগে বিরাট দুইটি বৃক্ষ এবং অভ্যন্তরে দালান, খাপরার ঘর, সকলই সেই স্বপ্নদৃষ্ট বাটীরই অনুরূপ।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মা পূর্বোক্ত বাটীর মালিককে নিজসংকল্প জানাইলেন। সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আশ্রম ব্যতীত অপর কাহারও নিকট ঐ বাটী তিনি বিক্রয় করিবেন না। কিঞ্চিদধিক দুই বিঘা জমির উপর অবস্থিত ঐ বাটী মা ১৩৫৪ সালে পনরহাজার পাঁচশত টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন এবং ইহার নামকরণ করিলেন—"শ্রীমাতৃনিকেতন।" কলিকাতার ব্যবসায়ী অজিতকুমার সেন ও তদীয়া পত্নী শ্রীউষারাণী সেন এই বাবদে মাকে সাগ্রহে দশহাজার টাকা দান করেন।

অনতিকালমধ্যেই গিরিডি-নিবাসিনী সহৃদয়া আভাময়ী দেবী তাঁহার স্বামী অভ্রব্যবসায়ী অনিলমাধব রায়ের স্মরণে বারগণ্ডায় অবস্থিত তাঁহার বসতবাটী-সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমি মাকে দান করেন। মা উক্ত জমিতেও দুইখানি পাকা ঘর নির্মাণ করাইলেন।

শ্রীমাতৃনিকেতনের অর্ধসমাপ্ত গৃহও সম্পূর্ণ করা হইল। অধিকন্তু, শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, নাটমন্দির, সন্তানগণের জন্য-পৃথক বাসগৃহ এবং আশ্রমবাটীর চতুর্দিকে উচ্চপ্রাচীরও নির্মিত হইল। মায়ের অন্যান্য সন্তানও এই বাবদে যথাসাধ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। ক্রমশঃ পুষ্পোদ্যানও গড়িয়া উঠিল। প্রধানদ্বারে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান বিরাট মহুয়া বৃক্ষদ্বয়ের—ভাগবতে উল্লিখিত যমলার্জুন বৃক্ষের অনুসরণে—মা নামকরণ করিলেন যমলার্জুন।

১৩৫৫ সালের জগদ্ধাত্রীপূজা দিবসে শ্রীমাতৃনিকেতনে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। গিরিডির মহকুমা-হাকিম রায়সাহেব পঞ্চানন শরণ সিং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হাজারীবাগ জিলার ডেপুটি কমিশনার রামসুচিত মিশ্র এবং স্থানীয় বহু নরনারী এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন,—আমাদের এই অঞ্চলে সারদেশ্বরী আশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আশ্রমকর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই প্রতিষ্ঠানটি দেবীস্থান, আমি যতদিন এস্থানে থাকিব, ইহার সাহায্যে আমার সেবা যদি লাগে, আমি তাহাতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

ক্রমশঃ স্থানীয় জনগণ আশ্রমের সহিত পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। ধর্মানুরাগী অনেক নরনারী মায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, সিন্ধ্রী, ধানবাদ, হাজারীবাগ, রাঁচি প্রভৃতি স্থান হইতেও অনেকে মায়ের আকর্ষণে আশ্রমে আগমন করেন এবং আশ্রমকার্যে সহায়ক হইলেন।

"বিষ্ণুধাম রচনা কর, মা"—স্বপ্নে প্রদত্ত গৌরীমার সেই নির্দেশ দুর্গামা বিস্মৃত হন নাই। নবদ্বীপধামে এক শালগ্রামশিলার সন্ধান তিনি পাইলেন। এই নারায়ণশিলা স্বপ্নদৃষ্ট শিলার মতই বৃহদাকার এবং সুলক্ষণযুক্ত। মা এই শিলাকে আনয়ন করিয়া যথোচিত অভিষেকাদি অনুষ্ঠানসহকারে গিরিডির আশ্রমমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নামকরণ করিলেন "শ্রীশ্রীমধুসূদন।"

শ্রীমাতৃনিকেতনে আশ্রমমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসারদা-

মাতার পট ব্যতীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিগ্রহ দৈবাদেশে নির্মিত হয়। আখ্যানটি এইরূপ—

১৩৫৭ সালের পৌষমাসে মা পুরীধামে গমন করেন। একদিন প্রভুর দর্শনান্তে মা যখন বাসস্থানে ফিরিতেছিলেন জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহার বাটীর বারান্দা হইতে চীৎকার করিতে থাকেন, "অঃ ব্রহ্মচারিণী বুড়িনী, অঃ ব্রহ্মচারিণী বুড়িনী, আরে শুন শুন।" পশ্চাৎ হইতে মায়ের জনৈক সেবক বলেন, "অর্থদণ্ডের ব্যাপার হয়তো, আপনারা পেছন ফিরে তাকাবেন না, এগিয়ে চলুন।" পরপর দুইদিন অনুরূপ ব্যাপার ঘটিল। যাতায়াতের সময় কৌতূহলবশতঃ এইস্থানে আসিয়াই মাতৃকুল উৎকর্ণ, কিন্তু সংযতদৃষ্টি ও নির্বাক থাকিতেন। তৃতীয়দিবসে দর্শনমাত্র সেই ব্যক্তি আসিয়া মায়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং মায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, যেন নিশ্চিত হইয়া, বলিলেন,— তোমাদের রোজ রোজ বলি, শুন শুন, তোমরা তো আমার কথা গ্রাহ্য করিলা না। গত নবকলেবরের সময় প্রভুর বিগ্রহের যে দারুখণ্ড বাঁচি গিলা, আমার ঘরে তা রহিয়াছে। প্রভু মোকে স্বপ্নে আদেশ করিলা, ঐ দারুখণ্ড দিয়া তিনমূর্তি গড়িয়া আপনাকে দিবার লাগি, দেশে গিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন। আপনি গ্রহণ করিলে আমি বিগ্রহ গড়ি দিব। প্রভুর আদেশ। আমি টঙ্কা চাহি না।

সেই ব্যক্তির বাক্য মা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন এবং প্রভুর এইপ্রকার অযাচিত করুণায় কৃতার্থ হইলেন। মায়েরও প্রয়োজন ছিল এই ত্রিমূর্তির। তিনি মূর্তিনির্মাণে আদেশ দিলেন। অবশ্য, উক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা না থাকিলেও এই বাবদে মা তাঁহাকে যথোপযুক্ত অর্থও প্রদান করিয়াছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট এই বিগ্রহত্রয় এবং সুদর্শন-চক্র মা যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমাতৃনিকেতনে।

ইহার কয়েকবৎসর পরে কলিকাতাবাসী শ্রীকেদারনাথ কুণ্ডু এবং তৎপত্নী শ্রীউষারাণী কুণ্ডু গিরিডি আশ্রমে প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ মাকে অর্পণ করেন। উভয়েই প্রিয়দর্শন।

শুভ রাসপূর্ণিমা তিথিতে মা যথাবিধি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া নামকরণ করেন "শ্রীশ্রীরাধামাধব।"

গিরিডি আশ্রমের প্রসঙ্গে মা বলিতেন, "ইহ গুপ্ত বৃন্দাবন।"

মায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল—এই গুপ্ত বৃন্দাবনে ময়ূর ময়ূরী পেখম তুলিয়া নৃত্য করিবে, মৃগ এবং গাভীগণ আশ্রমের সৌষ্ঠব বর্ধন করিবে। মায়ের সেই ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকে নাই। নানাস্থান হইতে তাহারা শ্রীমাতৃনিকেতনে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।

গিরিডির শ্রীমাতৃনিকেতনে গৌরীমাতার একখানি সমাধিমন্দির নির্মাণের সংকল্প প্রকাশ করিলে মায়ের স্নেহভাজন সন্তান শ্রীকুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় জননী চপলাসুন্দরী দেবীর স্মৃতিতে উক্ত মন্দির নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় ও সানন্দে বহন করেন।

কয়েকবৎসর মধ্যেই সদাশয় অভ্রব্যবসায়ী শ্রীচাঁদমল রাজগড়িয়া শ্রীমাতৃনিকেতনে বিদ্যালয়ের জন্য একটি প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করাইয়া স্থানীয় বিদ্যার্থিনীদিগের মহা-উপকার সাধন করিয়াছেন। গিরিডি-স্থিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে নানাভাবে সহযোগিতা করিতেছেন।

মায়ের অতিপ্রিয়স্থান গিরিডি-আশ্রম। চতুর্দিকে প্রশস্ত প্রান্তর, কান্তার; উপরন্তু—গিরি, নদী, উশ্রী জলপ্রপাত, খণ্ডোলি জলাধার, দূরের মাইথন প্রভৃতি বাঁধ সকলই মনোরম, সকলই মায়ের চিত্তকে আকর্ষণ করিত। সরল ও সুদীর্ঘ ইউকেলিপটাস বৃক্ষরাজির গন্ধ-আমোদিত পথ দিয়া ভ্রমণকালে এবং উশ্রীর তীরে মা প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতেন। কখনও-বা নদীর পরপারে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কোন প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়াতলে তিনি বিশ্রাম করিতেন। আবার, আশ্রমবালিকাগণসহ তথায় কখনও বনভোজন এবং আনন্দকোলাহলে দিবস অতিবাহিত করিতেন।

উশ্রী জলপ্রপাতটি মায়ের এতই প্রিয় ছিল যে, গিরিডিতে অবস্থানকালে অন্ততঃ একবার তাহা অবশ্যই দেখিয়া আসিতেন।

গিরিডির উপকণ্ঠে বনভোজনে

তাঁহার অন্য আকর্ষণ ছিল তোপচাঁচি হ্রদ। পরেশনাথ পাহাড়-সংলগ্ন এই বিশাল জলাধারের চতুর্দিকে মোটরে ভ্রমণ করিয়া মা পরিতোষ লাভ করিতেন। স্থানীয় ভক্তগণ, বিশেষত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সামন্ত (গিরিডিবাসীর 'খোকনদা', আর মায়ের আদরের 'আমার খোকনবাবা') মোটরে এবং বাসে করিয়া মাকে এবং আশ্রমবাসিনী-দিগকে বহুবার তথায় এবং বিভিন্নস্থানে লইয়া গিয়াছেন।

গিরিডিতে বাসকালে মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত, মনের প্রফুল্লতাও বৃদ্ধি পাইত। শ্রীশ্রীসারদামাতা যেমন সন্তানগণকে জয়রামবাটীতে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেন, দুর্গামাতাও তদ্রূপ গিরিডি যাইবার পূর্বে তাঁহার সন্তানবৃন্দকে তথায় যাইবার আহ্বান জানাইতেন। কলিকাতা আশ্রমে মায়ের সান্নিধ্য একান্তভাবে সহজলভ্য নহে, সুতরাং সন্তানগণ সানন্দে তাঁহার আহ্বানে পুনঃপুনঃ তথায় ছুটিয়া যাইতেন।

কলিকাতা হইতে মায়ের স্নেহভাজন শ্রীসন্তোষকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীসারদারঞ্জন দত্তশর্মা, শ্রীপুষ্পকুমার পাল, শ্রীপুরুষোত্তম গঙ্গোপাধ্যায়, হাজারীবাগের জিলা-জজ অভয়পদ মুখোপাধ্যায়, ধানবাদের শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়, আসানসোলের শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, খড়্গপুরের শ্রীহরেন্দ্রকিশোর চন্দ প্রমুখ বহু সন্তান, এবং তাঁহাদের অনেকেই সপরিবারে, মায়ের আহ্বানে গিরিডি আশ্রমে একাধিকবার গিয়াছেন।

প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত তথায় প্রায় সর্বসময়েই মায়ের দর্শন ছিল সুলভ। সন্তানবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে তিনি ভ্রমণ করিতেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে গল্প বলিতেন। এতদ্ব্যতীত, মায়ের সম্মুখে বসিয়া প্রসাদগ্রহণের সৌভাগ্যও সকলের হইত। স্থানীয় ও বহিরাগত নরনারীর সমাগমে আশ্রমবাটী তখন আনন্দমুখর হইয়া থাকিত। ভক্তিসঙ্গীত ও ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা চলিত,— যেন আনন্দের মেলা! গিরিডি হইতে ফিরিয়া বহু ভক্ত বলিয়াছেন,—এমন আনন্দ জীবনে আর কখনও পাইনি।

নবদ্বীপ আশ্রমপ্রসঙ্গে

মহাযুদ্ধের অবসানে কেহ কেহ প্রস্তাব দিয়াছিলেন, নবদ্বীপ হইতে আশ্রম পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যানয়ন করা হউক। প্রবাসে অবস্থিতির প্রয়োজন আর নাই, তদুপরি শাখা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক অপরিহার্য ব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থের আবশ্যক হইবে। কিন্তু ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব সেদিন দুর্গামার মনঃপূত হয় নাই; তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক অভিলাষ ছিল, বাংলার এই তীর্থক্ষেত্রে এবং গৌরীমাতার প্রিয়ভূমিতে আশ্রমের একটি শাখা স্থায়িভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

অল্পকালমধ্যেই আশ্রমের আদর্শ, শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজহিতকর কার্যাবলী এবং বিশেষ করিয়া দুর্গামার মহান্ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া স্থানীয় অনেকেই প্রসন্ন এবং শ্রদ্ধাযুক্তও হইয়াছিলেন। আশ্রম-পরিচালিত অস্থায়ী বিদ্যালয়টিও ইতিমধ্যে প্রসার লাভ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত, বিদ্যালয়ের জনৈকা শিক্ষার্থিনীর পিতা ধর্মপ্রাণ শৈলেশ্বর সান্যাল (ইঞ্জিনীয়ার) মহাশয় সহযোগিতায় অগ্রসর হইয়া বলেন, "মা, নবদ্বীপে এমন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন আছে। সহরের মধ্যেই আমার কয়েকটি জমি আছে, যে-টি আপনার পছন্দ, আপনি গ্রহণ করুন। জমির দাম আপনাকে দিতে হবে না।"

উক্ত সদাশয় ব্যক্তি বুড়াশিব ঠাকুরের মন্দিরের সন্নিকটে মায়ের নির্বাচিত প্রায় দুই বিঘা পরিমিত জমি এই মহৎকার্যে উৎসর্গ করিলেন। ১৩৫৪ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে আশ্রমের অনুকূলে তিনি দানপত্র যথাবিধি সম্পাদন করিয়া দিলেন। অতঃপর এই জমিতে গৃহনির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। আশ্রমবাটীর প্ল্যান করিয়া দিয়াছিলেন কলিকাতার ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসুশীলকুমার মিত্র।

অর্থাভাবে গৃহনির্মাণকার্য মন্থর গতিতে চলিতেছে দেখিয়া একদিন নবদ্বীপের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত কার্যের ভারপ্রাপ্ত সন্তানকে

বলেন, "মা রাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে কতদিনে বেল করবেন? এখন তো স্বাধীন সরকার, একটু চেষ্টা করলেই বিদ্যালয়সম্পর্কিত সমস্ত টাকা আপনারা গভর্নমেণ্টের কাছ থেকেই তো পেতে পারেন। নবদ্বীপ সহরেই কত বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর সব সরকারী টাকায় হচ্ছে।" কিন্তু, এই প্রস্তাবে মা সম্মত হইলেন না।

পরবর্তী কালেও সরকারী অর্থসাহায্যের বিষয়টি পুনরায় আলোচিত হয়। কলিকাতার প্রখ্যাত সলিসিটর নির্মলচন্দ্র চন্দ্র তৎকালীন কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা। অর্থাভাবের বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনিও পরামর্শ দিলেন,—অর্থের প্রয়োজন দেখাইয়া আশ্রমের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামে একখানি দরখাস্ত তাঁহার হস্তে প্রদান করিবার জন্য। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ষাট হাজার টাকার ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা দেন। কিন্তু, গৌরীমা এবং দুর্গামা সরকারী দান কখনও গ্রহণ করেন নাই। উভয়েরই আশঙ্কা ছিল, এইরূপ অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সরকারের বহু সর্ত মানিয়া চলিতে হয়। নির্মলচন্দ্রও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিঃসর্তদানের ভরসা দিতে পারিলেন না। সুতরাং ষাট হাজার টাকার আবেদনপত্র শেষ পর্যন্ত আশ্রম হইতে সরকারের নিকট উপস্থাপিত হয় নাই।

আর একবার এই বিষয়ে আলোচনাকালে পরামর্শসভার কোন কোন সদস্য বলেন,—ইংরেজ সরকারের সাহায্য গ্রহণে মাতাজীর আপত্তি ছিল সত্য, কিন্তু বিদেশী সরকার চলে গেছে, দেশ এখন স্বাধীন। এমতাবস্থায় সরকারের 'ক্যাপিটাল গ্রাণ্ট' নিলে কোন দোষ হবে না, আর তাতে দুর্গামার দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম বহুলাংশে লাঘব হবে। অবশ্য কোন কোন সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতাও করেন। দুর্গামা নীরব।

অবশেষে পরামর্শসভার সভাপতি—সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় বলেন,—আশ্রম যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে কারণেই হোক, সেই মহীয়সী সাধিকা

সরকারী টাকা নিতে আপত্তি জানিয়েছেন। সাধুমহাপুরুষদের সব কথা, সবরকম আচরণ আমাদের জজ-ব্যারিষ্টারদের বুদ্ধি দিয়ে অনেক সময় ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আশ্রম চালাচ্ছেন এখন দুর্গামা, বিরাট খরচের টাকা তাঁকেই বহুকষ্টে সংগ্রহ করতে হয়। তিনি স্বদেশী গভর্নমেণ্টের গ্রাণ্ট নিতেও ইচ্ছুক নন। আপনারা বলছেন বটে, সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে; but has there been any change in spirit ? (কিন্তু, যথার্থতঃ কোন পরিবর্তন হয়েছে কি ?) ধর্ম নির্বাসিত, মানুষের সততার বালাই নেই। এই দুর্দিনে দেশে যদি একটা-দুটো সারদেশ্বরী আশ্রম আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, থাকুক-না যদ্দিন পারে।

ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান ন্যায়াধীশের অভিমত সদস্যগণ সকলেই মানিয়া লইলেন। মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

এইপ্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপ শাখার টোলের ছাত্রীদিগের পরীক্ষার ফল কয়েকবৎসর প্রশংসনীয় হওয়াতে কৃষ্ণনগর হইতে শিক্ষাবিভাগের জনৈক পরিদর্শক আশ্রমে আসিয়া বলেন,—আশ্রম হইতে লিখিত আবেদন পাঠাইলে শিক্ষাবিভাগ হইতে বার্ষিক ছয়শত টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিতে পারেন। অতি আগ্রহের সহিত সংবাদটি মাকে জানাইলে তিনি এই প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। এইরূপ প্রস্তাব পরবর্তী কালেও আসিয়াছে, কিন্তু মা পূর্বাপর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, দুর্গামায়ের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল—দেশবাসী আশ্রমকে জানুন, আশ্রমের কার্যাবলীর সহিত পরিচিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হউন, তাহা হইলে তাঁহারাই সানন্দে আশ্রমের ব্যয়ভার বহন করিবেন। কার্যতঃ হইয়াছে তাহাই। সহৃদয় দেশবাসীর সহযোগিতার ফলেই কলিকাতায় চব্বিশ নম্বর বাটীর দ্বিতল পর্যন্ত এবং নবদ্বীপ-আশ্রম-বাটীর একতলার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। দুইস্থানে প্রায় বাট হাজার টাকা মাকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সমস্ত টাকা দেশের নরনারীই মহৎ প্রচেষ্টাকে সার্থক করিতে তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন।

দুর্গামার একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। অর্থসংগ্রহ সম্পর্কে মা বলিতেন,—উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, আর করণীয় কাজগুলি যদি সততার সঙ্গে পরিচালিত হয়, কষ্টে এবং বিলম্বে হলেও, সৎকাজে টাকার অভাব হয় না।

স্বল্পকালমধ্যেই জনৈকা ছাত্রীর পিতা শ্রীবিরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা আশ্রমের চব্বিশ নম্বর বাটীর ত্রিতলে দুইখানি কক্ষ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরে, মায়ের স্নেহভাজন সন্তান শ্রীঅসিতকুমার সেন ত্রিতলের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করিবার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।

১৩৫৭ সালে নবদ্বীপ আশ্রমের নবনির্মিত গৃহ বাসোপযোগী হইলে, মা স্বয়ং তথায় গিয়া মন্দিরমধ্যে আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসারদামাতার পট প্রতিষ্ঠা করেন। নারায়ণশিলাও প্রতিষ্ঠা করেন, নাম—শ্রীশ্রীধর।

একদিন পূজা করিতে বসিয়া সহসা মা কাতরভাবে বলিয়া উঠেন, 'নগেন চলে গেল।' মায়ের এইপ্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। অপরাহ্নে বিমর্ষচিত্তে তিনি নগেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বলিতেছেন, এমনসময় সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ বহন করিয়া তারবার্তা গিয়া উপস্থিত। তখন আর কাহারও মনে কোন সংশয় রহিল না যে, আশ্রমের সেই পরমহিতৈষী এবং ভক্ত সন্তান ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

নবদ্বীপ হইতে অসুস্থাবস্থায় নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় স্বগৃহে আসিয়াছিলেন, মা একাধিক দিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় এইসময় তাঁহার চিকিৎসা এবং সেবাযত্নের যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে মা অনেকাংশে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মায়ের মনে এইরূপ আশাও ছিল যে, নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু এহেন দুঃসংবাদ প্রাপ্তিতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে যে

আনন্দ-উৎসবের পরিকল্পনা হইয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইল। মা অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

নগেন্দ্রনাথের আদর্শ জীবন, সদাশয়তা, গুরুভক্তি এবং দুর্গামার প্রতি তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধার বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি মায়ের অন্তরেও ছিল এক সুগভীর স্নেহ। এই স্নেহবশতঃই নগেন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ জীবনের সায়াহ্নে মা তাঁহার সেবাযত্নের জন্য এরূপ একজন সঙ্গী ও সেবকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তিনি আমৃত্যু শান্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে অতীত ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে।—

ইংরাজী ১৯৩০ সাল। ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টার অপরাধে নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার শ্রীনারায়ণচন্দ্রের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। গোয়েন্দা পুলিসকে বিভ্রান্ত করিয়া গোবিন্দচন্দ্র পলাতক হইলেন। আর নারায়ণচন্দ্র প্রেরিত হইলেন দ্বীপান্তরে। বন্দিশালায় চলে নির্মম নির্যাতন। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান বিপ্লবিদল আমরণ অনশনে। সংবাদ পাইয়া স্নেহময় পিতা ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ রায় মহাশয় গৌরীমার নিকট আসিয়া অসহ্য বেদনায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতে থাকেন। গৌরীমা আশ্বাস দেন, "কেঁদো না, আমি বলছি, তোমাদের দুই পুত্রই ফিরে আসবে। আবার বাপ-ব্যাটায় একসঙ্গে বসে পেসাদ পাবে।"

সত্য হয় গৌরীমার আশ্বাস এবং আশীর্বাদ। দীর্ঘ নয় বৎসর দ্বীপান্তরে কারারুদ্ধ থাকিবার পর নারায়ণচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় পিতার সহিত নিজগৃহে মিলিত হইলেন।

কিন্তু, গোবিন্দচন্দ্র তখনও পলাতক। নগেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই ছিলেন গম্ভীরপ্রকৃতি। স্বীয় পুত্র কোথায়, কতদূরে,—শীতে, বর্ষায়,

অর্থাভাবে, অনাহারে কিভাবে যে দিনাতিপাত করিতেছে, এই চিন্তা নিশ্চয়ই তাঁহার মনকে পীড়িত করিত ; কিন্তু বাহিরে তাহার কোনই প্রকাশ নাই, উচ্ছ্বাস নাই,—নির্বিকার ভাব। তিনি তখনও চাকুরীস্থানে, বিহার প্রদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার একান্ত সুহৃৎকে দুর্গামা বলিয়াছিলেন, "জহর, আমার নাম করে নগেনবাবাকে গিয়ে বল, যেন একটু কাঁদে,—কেঁদে বুকটা হালকা করে। নইলে একটা কঠিন অসুখে পড়বে।"

দীর্ঘকাল এই মানসিক নিপীড়ন তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছেন। তৎপর—দেশ স্বাধীন হইলে বৃন্দাবনধামের অদূরে অবস্থিত গিরি-গোবর্ধনের পার্শ্ববর্তী এক বৈষ্ণব মঠ হইতে নগেন্দ্রনাথের পুত্র—যৌবনে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী গোবিন্দচন্দ্র, উত্তরকালে কৌপীন-বহির্বাস-শিখাধারী গোপীদাস বাবাজী—আকস্মিকভাবে একদিন নবদ্বীপধামে বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সুদীর্ঘকাল পর পিতাপুত্রের সেই মিলন যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই আনন্দবহ। পিতাপুত্রের এই মিলনে দুর্গামাও অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

কিছুদিন পিতার সহিত বাস করিবার পর পুত্রের ইচ্ছা হয় পুনরায় গোবর্ধনে গিয়া সাধনভজনে মনোনিবেশ করিবেন। দীর্ঘদিন দূরে বিজনতীর্থে বাস করিয়া তিনি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের কঠোর জীবন যাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকিতে চাহিল না। কিন্তু দুর্গামা গোপীদাস বাবাজীকে বলিলেন, "বাবা, তোমার পিতা বহুদিন বিপত্নীক, পরমবৈষ্ণব। এই বৃদ্ধ বয়সে কলকাতার স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপধামে একাকী নির্জনে সাধনভজন করছেন। তুমি যদি এখন কিছুদিন কায়মনোবাক্যে বৃদ্ধ পিতার সেবায় আত্মনিয়োগ কর, তাহলে তোমার গোবিন্দজী অনেক বেশী প্রসন্ন হবেন।" মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গোপীদাস এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন। তদবধি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথ এই সাধুপুত্রের সেবায় তৃপ্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া মা সান্ত্বনা বোধ করেন।

বৃন্দাবনে গৌরীমাতার পূতাস্থি-সংস্থাপন

গৌরীমার মনে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল,—জীবনের শেষভাগে শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিয়া তথাকার পুণ্যরজেই দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু, শ্রীগুরুনির্দেশে 'বহুজনহিতায়' আশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে এবং উত্তরকালে আশ্রমকন্যাদের প্রতিরোধে তাঁহার সেই ইচ্ছা শেষপর্যন্ত পূর্ণ হয় নাই। অবশেষে দুর্গামার নিকট অভিলাষ জানাইয়াছিলেন, "আমার দেহাবশেষ একটু ব্রজের রজে দিও, মা।"

গৌরীমার এই আকাঙ্ক্ষা দুর্গামা কোনদিনই বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু তাহা পূর্ণ করিতে নানাকারণে বিলম্ব হইল। বৃন্দাবন এবং অন্যান্য তীর্থের দেবদেবীকে উৎসর্গ এবং সাধুমোহন্তদিগকে দান করিবার উদ্দেশ্যে মা দীর্ঘদিন যাবৎ বস্ত্র, অলঙ্কার, লোটা, কম্বল, ভোজ্য, পূজাসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর ১৩৫৮ সালের ৯ই ফাল্গুন গৌরীমাতার দেহাবশেষসহ তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্থির হইল,—সর্বাগ্রে ত্রিবেণীসঙ্গমের পুণ্যপ্রবাহে পূতাস্থি অর্পণ করা হইবে। কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থানুযায়ী প্রয়াগতীর্থে তাঁহাদের অলোপীবাগের বাটীতে মা অবস্থান করিলেন। তথাকার প্রবাসী ভক্ত নরনারী মাকে পাইয়া উৎফুল্ল। ১২ই ফাল্গুন, অমাবস্যাতিথিতে মা পূতাস্থির আধার বহন করিয়া পদব্রজে চলিলেন সঙ্গমের দিকে, সঙ্গে আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দ। সূর্যগ্রহণের বিশিষ্ট ক্ষণে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে নিরঞ্জন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

দুইদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে উক্ত গৃহে বহুভক্তের সমাগম হয়। কীর্তনাদিশেষে মায়ের সম্মুখে বসিয়া ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। লোকমুখে সংবাদ শুনিয়া অপরিচিত

ধর্মার্থিগণও সাধুমাতার সন্দর্শনে সমবেত হইতে লাগিলেন। একদিন আসিলেন শ্রী আর. কে. কাউল (হাইকোর্টের বিচারপতি) এবং শ্রী এস. এন. হুক্কু (সেসন জজ)। মাতাজীর নিকট আশ্রমের আদর্শ ও কার্যধারা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা শুনিয়া তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করেন। এইভাবে প্রয়াগতীর্থে দ্বাদশদিবস অতিবাহিত করিয়া মাতৃগণ বৃন্দাবনধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রেলগাড়ীতে যাতায়াত এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে এলাহাবাদের রেলকর্মচারিগণ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

গুরু-গোবিন্দ একত্রে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কলিকাতা এবং বিভিন্ন প্রদেশের বহু ভক্ত নরনারী এই উপলক্ষে বৃন্দাবনতীর্থে যাইবার সংকল্প করেন। সুতরাং ভক্তসমাবেশ প্রচুর হইবে—এইরূপ অনুমান করিয়া দুর্গামা পূর্বেই কয়েকজন সন্ন্যাসিনী মাতা ও সন্তানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য তথায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উৎসবের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রীও তাঁহাদের সহিত কলিকাতা হইতে প্রেরিত হয়।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কন্যাগণ যমুনাতীরবর্তী বংশীবটে ভক্ত বলরাম বসুদের কালাবাবুর কুঞ্জের সন্নিকটে মোহন্ত শ্রীনরোত্তমদাস বাবাজীর ঘোটাকুঞ্জে অতিথি হইলেন। বিপুল ভক্ত সমাবেশ এবং তদুপযোগী মহোৎসব সম্পন্ন হইবার মত প্রশস্ত বাটীর সন্ধান না পাইয়া সন্তানগণ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মথুরা রোডের উপর মুঙ্গের-রাজের দেবালয়ের পশ্চাৎ ভাগে বিরাট প্রাঙ্গণসহ রাজার একখানি বৃহৎ দ্বিতলবাটী আছে, তদবির করিলে উহা পাওয়া যাইতে পারে এবং উহাতে হয়তো সকল প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে। অধিকন্তু, উক্ত বাটীর সংলগ্ন মীর্জাপুর ধর্মশালা—বৃন্দাবনের বৃহত্তম ধর্মশালা। অতএব মায়ের ভক্ত-অতিথিদিগের থাকিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। পূর্বোক্ত মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার গৌরপদ ঘোষের পরামর্শানুযায়ী মুঙ্গেরে রাজাসাহেবের নিকট মায়ের পত্র প্রেরিত হইল। রাজাসাহেবও

অবিলম্বে তারযোগে মায়ের অনুরোধ অনুমোদন করিলেন। রাজার বাটীতেই থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

মা বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর হইতেই বাংলা, বিহার, আসাম, দিল্লী, আমেদাবাদ এবং অন্যান্য স্থান হইতেও অনেক নরনারী পুণ্যোৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া মা বিভিন্ন মন্দিরে দেবদর্শনে যাইতেন। কখনও বাস ভাড়া করিয়া দূরবর্তী দর্শনীয় স্থানেও যাওয়া হইত। এইরূপে গোকুল, রাওল, দাউজী, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম প্রভৃতি দেবস্থান এবং ভোজনস্থলী, কাম্যবন প্রভৃতি ভক্তগণকে মা দর্শন করাইলেন।

ব্রজমণ্ডলে গৌরীমার পূতাস্থি মা সর্বপ্রথম উৎসর্গ করেন একাদশী তিথিতে গিরিগোবর্ধনের নিকটবর্তী রাধাকুণ্ডে। একখানি বাসে করিয়া সেইদিন তিনি সদলে তথায় গিয়াছিলেন এবং সকলেই রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে অবগাহনস্নানে ধন্য হইলেন। ইহার পরবর্তী অমাবস্যাতিথিতে পুনরায় পূতাস্থি নিবেদন করা হয় বৃন্দাবনে কেশীঘাটে যমুনার জলে।

ইতিমধ্যে মা শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে "চৌষট্টি মোহন্তের সমাজবাটী"তে গৌরীমাতার পুণ্যস্মরণে একখানি প্রস্তরময় সমাধিমন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। চৈত্রমাসের মধ্যেই ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে অস্থিস্থাপনার তারিখ ধার্য হইল শুভ নববর্ষ দিবসে। নগর সংকীর্তন, ললিতাকুণ্ড পরিক্রমা এবং অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় চৈত্রসংক্রান্তির অপরাহ্ণে। ১৩৫৯ সালে নববর্ষের প্রথম প্রভাতে উষাকীর্তন, পূজা, হোম, পূতাস্থি-প্রতিষ্ঠা এবং সন্ধ্যায় কীর্তন ও আরাত্রিকসহকারে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-কার্য সুসমাপ্ত হয়। বহিরাগত এবং স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী এইসকল অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্বক আনন্দ লাভ করেন।

এইসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণমঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। মায়ের আমন্ত্রণে কতিপয় সন্ন্যাসিসহ 'চৌষট্টি মোহন্তে' গৌরীমাতার নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত

হইয়া তাঁহারা সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেন। মা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানাইলেন। অপর একদিন শঙ্করানন্দজী মুঙ্গের-রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াও সকলকে আনন্দ দান করেন।

গৌরীমাতার প্রিয়শিষ্য নগেন্দ্রনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্বোক্ত গোপীদাস বাবাজী এইসময় বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নানাভাবে মায়ের কার্যে সহায়তা করেন এবং মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একহাজার টাকা শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ মায়ের হস্তে অর্পণ করিলেন।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সকলেই ছিলেন গৌরীমার শ্রদ্ধার পাত্র, তন্মধ্যে ত্যাগ ও তপস্যার মূর্তবিগ্রহ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম ভক্তি। দুর্গামাও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। সুতরাং মা সংকল্প করিলেন যে, শ্রীমদনমোহনের মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত সনাতন গোস্বামীর সমাধিপীঠ-সংলগ্ন স্থানে গৌরীমাতার স্মরণে একখানি তুলসীমঞ্চও নির্মাণ করিবেন। মদনমোহনের সেবায়েত মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তথায় শ্বেতপ্রস্তরের তুলসীমঞ্চটি নির্মিত হইলে শুভ অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে সেইস্থানেও আর একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উভয় উৎসব উপলক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দজী, শ্রীগোপীনাথজী ও শ্রীমদনমোহনজী-প্রমুখ বৃন্দাবনের প্রধান দেবতাবৃন্দের মন্দিরে মা স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজ্যসহ বিশেষ পূজা নিবেদন করেন।

বৃন্দাবনে অস্থিপ্রতিষ্ঠার পর রাজধানীর ভক্তগণের আমন্ত্রণে মা দিল্লীতে উপনীত হইলেন। মায়ের সন্তান নীহারকুমার রায় তখন হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর দিল্লী-শাখার কার্যাধ্যক্ষ। তদীয়া পত্নী ভক্তিমতী শ্রীসরোজরাণী গৌরীমাতার শিষ্যা। কুইন্সওয়েতে অবস্থিত উক্ত অফিসের প্রশস্ত ত্রিতলে রায় মহাশয়ের বাসস্থানের পৃথক অর্ধাংশে মাতৃবৃন্দের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। রায়দম্পতি পরম শ্রদ্ধাযত্নসহকারে এবং অকুণ্ঠভাবে মা ও সঙ্গীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। দুর্গামাতার আগমনবার্তা-শ্রবণে বহু দিল্লীবাসী নরনারী

মায়ের দর্শনে নিত্য উপস্থিত হইতে থাকেন এবং কেহ কেহ দীক্ষা গ্রহণও করেন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন কন্যাসহ রায় মহাশয়ের মোটর গাড়ীতে মা হরিদ্বারে গমন করেন। রায় মহাশয় নিজেও মায়ের সঙ্গে রহিলেন। মীরাট ও রুড়কী হইয়া যাওয়া হয়, প্রায় একশত বিশ মাইল পথ। পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনে সকলে মুগ্ধ হইলেন।

হরিদ্বারে দুইদিনের অস্থায়ী আবাস নির্দিষ্ট হইল ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্ববর্তী "বিশ্বশান্তি গৃহে"। গৃহ হইতেই মা দেখিতে পাইতেন—ধর্মার্থিদিগের কর্মচাঞ্চল্য, দেখিতেন—সুদূর পথের যাত্রী গঙ্গামায়ী ব্রহ্মকুণ্ডের বেষ্টনীতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কলকলনাদে সম্মুখ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন, দেখিতেন—পরপারে অদূরে চণ্ডীপাহাড় যেন ধ্যানমগ্ন, চতুষ্পার্শ্বে তাহার নয়নাভিরাম দৃশ্য!

একাদশী তিথির দিন পূর্বাহ্নে মা ব্রহ্মকুণ্ডের গঙ্গাপ্রবাহে গৌরীমাতার পূতাস্থি প্রক্ষেপ কারলেন। অপরাহ্নে কনখলে সতীর আত্মাহুতির পীঠস্থানে এবং প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গিয়াছিলেন। পরদিবস হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, স্বর্গাশ্রম দর্শনান্তে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর আনন্দকুটীরে উপস্থিত হইলেন।

শিবানন্দজীর সহিত মায়ের প্রথম পরিচয় কলিকাতায় কয়েক বৎসর পূর্বে। ইনি দক্ষিণভারতীয় এবং পূর্বাশ্রমে ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক। নূতন পথের আহ্বান যখন আসিল, যথেষ্ট অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহ তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। হৃষীকেশের অদূরে হিমগিরির পাদমূলে আনন্দকুটীরে তিনি এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম, দর্শন, যোগ, চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং পাশ্চাত্যদেশেও প্রচার করিয়াছেন তিনি ভারত-আত্মার শাশ্বতবাণী। শান্তিকামনায় তাঁহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিয়াছেন পাশ্চাত্যের ভোগবিতৃষ্ণ কোন কোন ধর্মার্থী।

দুর্গামাতার ভক্তসন্তান রায়সাহেব শৈলেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন

উক্ত শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য। একবার শিবানন্দজীর কলিকাতায় অবস্থানকালে শৈলেশচন্দ্র তাঁহাকে মায়ের আশ্রমে লইয়া আসেন। আশ্রমের আদর্শ ও কার্যাবলীর কথা এবং শিশু আশ্রমিকাবৃন্দের স্তবকীর্তন-শ্রবণে তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন। দুর্গামাও তাঁহার সহিত আলোচনায় বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। সর্বশেষে স্বামিজী যখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-রচিত একখানি শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিলেন তখন উপস্থিত সকলেরই হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকৃত হয় সেই উদাত্তধ্বনি।

দীর্ঘকাল পর মা আসিয়াছেন এই হৃষীকেশে তাঁহার দর্শনে। স্বর্গাশ্রমের পথে পদব্রজে চলিয়া ইতিপূর্বেই মা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইহেতু ইচ্ছাসত্ত্বেও পাহাড়ের উপরিভাগে অবস্থিত স্বামিজীর আশ্রমে যাইতে তখন অক্ষম, সুতরাং মোটরেই বসিয়া রহিলেন। জনৈক সেবক গেলেন স্বামিজীকে সংবাদ জানাইতে। তিনি তখন ধর্মসভায় ভাষণ দিতেছিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা সমাপ্ত হইল। একজন নবাগতকে দেখিয়া স্বামিজীই প্রথম কথা বলেন, সেবক উত্তরে বলেন,—কলকাতা থেকে দুর্গামা আপনার সাক্ষাতের জন্য এখানে এসেছেন।

—কোন্ দুর্গামা? সারদেশ্বরী আশ্রমের?

—হাঁ মহারাজ, তিনি নীচে আছেন গাড়ীতে, ওপরে উঠতে পারলেন না।

—চলুন, আমিই যাব সেখানে। স্বামিজী তিন-চারিজন আশ্রম-বাসীকে বলিলেন,—দুর্গামাতাজী এসেছেন, দেখবে চল।

দ্রুতগতিতে তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন। নামিতে নামিতে একবার থামিলেন এবং একজনকে বলিলেন,—মাতাজীর জন্য কিছু ফল নিয়ে এসো শিগ্‌গির। কিছুদূর গিয়া অপর একজনকে বলেন, —আমাদের কয়েকখানি বই নিয়ে এসো তো, মাতাজীকে দেবো।

মাতাজীর গাড়ীর নিকট মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, উভয়েরই প্রথম সম্ভাষণ—'নমো নারায়ণায়।' দীর্ঘকাল পরে পুনর্বার সাক্ষাতে উভয়েই প্রসন্ন। প্রাথমিক আলাপন সমাপ্ত হইলে মা

বলিলেন,—এগুলি কলকাতা থেকে আপনার জন্য এনেছি। দুইখানি উত্তম কম্বল, বহির্বাস, একটি লোটা ও কিছু ফল স্বামিজীর হস্তে মা অর্পণ করিলেন। মায়ের দান তিনি সাদরে মস্তকে ধারণ করেন।

হরিদ্বার হইয়া সেইদিবসই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, সুতরাং আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। কিন্তু এই অল্পক্ষণের সাক্ষাতেই উভয়ের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। স্বামিজী কিছু ফল এবং স্বরচিত কয়েকখানি পুস্তক মাকে উপহার দিলেন। মায়ের গাড়ী সেইস্থান ত্যাগ করিবার পূর্বক্ষণে তিনি তিনবার জয়ধ্বনি করিলেন "দুর্গামায়িকী জয়।" আনন্দকুটীরের ভক্তবৃন্দ এবং মায়ের সঙ্গী সন্তানবৃন্দও সমবেতকণ্ঠে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন—"দুর্গামায়িকী জয়।"

ভক্তসঙ্গে আরও পাঁচদিন দিল্লীতে অতিবাহিত করিয়া ২৯-এ বৈশাখ মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীসারদামাতা-জয়ন্তী

"যা বিশ্বমাতা খলু বিশ্বরূপা যা বিশ্বহেতোঃ করুণার্দ্রচিত্তা।
যা বিশ্ববন্দ্যা বহুরূপনন্দা তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে ॥"

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহায়িকা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী ভক্তগোষ্ঠীর নিকট সুপরিচিতা এবং পূজিতা হইলেও সাধারণ দেশবাসী এতাবৎকাল তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না। ১৩৬০ সালে তাঁহার শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে জনসাধারণ মাতৃপূজার জন্য যেন জাগ্রত হইলেন। বাংলাদেশে তখন হয়তো এমন সহর বা পল্লী অতি অল্পই ছিল যেখানে কোন সংঘ বা সমিতি এই মহান্ ব্রত পালন করেন নাই। যেখানে কোন সংঘ বা সমিতি ছিল না, তথাকার অধিবাসিগণ মিলিতভাবে পরমোৎসাহে এই জয়ন্তী-উৎসব প্রতিপালন করিলেন। শ্রীশ্রীমাতার পুণ্যনামে অনেক প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল। কত ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণে কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। মায়ের লোকোত্তর জীবনকথা পুস্তকাকারে রচিত হইল। সমগ্র একটি বৎসর ব্যাপিয়া প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে দেশবাসী অন্তরের ভক্তির অর্ঘ্যে মাতৃপূজায় উদ্‌যোগী হইলেন।

স্বকীয়া দীক্ষা ও সন্ন্যাসদাত্রী গুরুমাতৃকা বলিয়াই নহে, এবং আশ্রমের পরমারাধ্যা অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়াও নহে, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাকে জগজ্জননীরূপে দুর্গামা নিত্য পূজা ও ধ্যান করিতেন, সুতরাং তাঁহার শতবর্ষ-জয়ন্তী-মহোৎসব কিরূপে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, সেই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইলেন। দীর্ঘকাল সান্নিধ্যে থাকিয়া মায়ের যে অপার্থিব করুণা এবং মহিমা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যাহা তাঁহার হৃদয়ের মণিকোঠায় অত্যুজ্জ্বল রত্নরাজির মত নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে, সেইসকল অমূল্য সম্পদের বার্তা দেশবাসীকে জানাইবার জন্য মা অন্তরে অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা অনুভব করেন।

মাতাঠাকুরাণীর পুণ্যজীবনকথা লিপিবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা মায়ের মনে বহুপূর্বেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এইবার তাহা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেও উদ্যোগী হইলেন।

শ্রীশ্রীদামোদরজীর প্রাতঃকালীন সেবাপূজা সম্পন্ন করিবার পর মা গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। শ্রীমাতার জীবনের যে-সকল ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী তাহার অধিকাংশই ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর-ঠাকুরাণীর আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গগণের অনেকের নিকট মা যাহা শুনিয়াছেন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ইদানীং তাহাও লিপিবদ্ধ করাইলেন। অতঃপর পূজাদি সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্নে এই কার্যে পুনরায় ব্রতী হইতেন। বিষয়বস্তুর বর্ণনা, শ্রেণীবিন্যাস এবং সংস্থাপন যথাযথভাবে সম্পন্ন হইল কিনা তাহা পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া তৎপর উহা অনুমোদন করিতেন। এইরূপে গ্রন্থরচনার কার্য অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে শাখা-আশ্রমের কার্যপরিদর্শনের জন্য মাকে নবদ্বীপ ও গিরিডি যাইতে হইত। সেইস্থানেও এই কার্য অনুরূপভাবে চলিত।

এই গ্রন্থ রচনাকালে মায়ের প্রখর স্মৃতিশক্তির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। কোন ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন নবদ্বীপে—তিনমাস পূর্বে, তিনমাস পরে কলিকাতায় যখন সেই বিষয়টি পুনরায় পাঠ করা হয়, তখন মা যেন তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে না পারিয়া প্রথম দিনের পাণ্ডুলিপিটি বাহির করিতে নির্দেশ দেন। মিলাইয়া দেখা যায়, সত্যই শ্রীমাতার নিজ উক্তির সামান্য রূপান্তর কোথাও ঘটিয়াছে। মা বলেন, "মা তো একথা এভাবে বলেন নি, মা যে-কথা যেমনটি বলেছিলেন, তেমনই থাকবে—হেরফের করা চলবে না।" মায়ের জ্ঞাত সারদামাতার প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি ভাবের অভিব্যক্তি সবই মায়ের স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল ছিল। এমন-কি, তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারে অবিকৃতরূপে সংরক্ষিত ছিল শ্রীমাতার সম্পর্কিত প্রতিটি ঘটনায় উপস্থিত অপরাপর ব্যক্তিগণের নাম এবং তাঁহাদের উক্তি প্রত্যুক্তিও। এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির

কারণ ছিল—প্রথমতঃ মাতাঠাকুরাণীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তিবশতঃ বীজমন্ত্রের ন্যায় এইসকলের অনুক্ষণ স্মরণ, মনন ও কথন এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অসামান্য মেধা ও ব্রহ্মচর্য। তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনা ছিল, "মা, তুমি যেমনটি ছিলে, বইয়েতেও যেন তেমনটিই প্রকাশিত হও।"

এইপ্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, এই গ্রন্থরচনা কার্যটিকে মা কিরূপ পবিত্রদৃষ্টিতে দেখিতেন। মা বলিতেন, "এ সাধারণ বই লেখা নয়, এ আমার 'দেবী-ভাগবত,' এ আমার মায়ের পূজো। মায়ের পূজোটি যেন শুদ্ধ আর অনবদ্য হয়। কারুর সম্পর্কে অসত্য বা দোষত্রুটি প্রচারদ্বারা যেন দেবী-ভাগবতের বিশুদ্ধভাবের বিকৃতি না ঘটে।"

১৩৬০ সালে রথযাত্রাকালে মা একবার পুরীধামেও গমন করেন। পাণ্ডুলিপিখানি একদিন রথারূঢ় জগন্নাথদেবের হস্তে মা স্পর্শ করাইলেন এবং ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াও তাঁহাকে শুনাইলেন।

গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৩৬০ সালে পৌষমাসে শ্রীমাতার শুভ জন্মশতবার্ষিকী আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতাঠাকুরাণীর বার্ষিক জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হইলে মা সর্বাগ্রে স্বয়ং উদ্বোধনভবনে গিয়া শ্রীমাতার চরণে একখানি পত্র, ভোজ্যদ্রব্যাদি এবং কিঞ্চিৎ অর্থও শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ সমর্পণ করিতেন। এইবারও শতবার্ষিকী উপলক্ষে মা তথায় উপস্থিত হইয়া বিবিধ উপচারে মাতাঠাকুরাণীর পূজা নিবেদন করিলেন। অধিকন্তু, মূল্যবান বস্ত্র, আসন, প্রস্তর ও কাংস্যনির্মিত তৈজসপত্রাদি ও পূজাভোগের বহুবিধ দ্রব্যসহ কতিপয় আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনীকে জয়রামবাটীর মাতৃপীঠে প্রেরণ করিলেন। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-তীর্থেও ধুতি, উত্তরীয়, আসন ও ভোজ্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে মাতৃগণ তথায় গমন করেন। শ্রীমাতার আত্মীয়বর্গকেও ধুতি, সাড়ী ও দক্ষিণাদি প্রদান করা হয়।

১২ই পৌষ শ্রীসারদামাতার পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে কলিকাতা,

গিরিডি এবং নবদ্বীপ আশ্রমে পূজাপাঠ, কীর্তন, আলোকসজ্জা ও শতশঙ্খধ্বনিসহকারে শতবর্ষ-জয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হয়।

ঐ দিবস কলিকাতা আশ্রমের পার্শ্বস্থ ভূমিতে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে জয়ন্তী-সভার অধিবেশন হয়। কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব 'সারদা মাতার শত-বার্ষিকী'-শীর্ষক অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতার একটি স্তবকে শ্রীমাতার উদ্দেশে তিনি বলেন,—

"নাহি তব জন্ম-মৃত্যু, নাহি জরা,—অনন্ত যৌবন!
দেশকালাতীত তুমি, মায়ামুক্ত অনাসক্ত মন!
বিরাটের খেলা সেথা, লীলা করে মহতো মহান।
নব নব ভাবমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে লভিতেছে প্রাণ!
তোমার ইঙ্গিতে মাগো চরাচর হ'তেছে প্রকাশ,
কটাক্ষে তোমার পুনঃ দিকে দিকে সংহার-বিনাশ।
ক্ষুদ্র হ'তে অতি ক্ষুদ্র কীট মোরা অণোরণীয়ান,
তব জন্ম-শতবর্ষ—শঙ্খ, পদ্মে নাহি পাই মান!"

পরদিবসের সভায় বাগ্মী শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীসারদা মাতার প্রসঙ্গে বলেন,—

"মাতৃত্বকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা সারদামণিকে সংসারে আনিয়া বসাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে-ছেন বাক্য, আর সারদামণি ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র, আর সারদামণি সেই মন্ত্রের মর্মরূপে বিরাজ করিয়াছেন। পর্বতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া নির্ঝরিণীরূপে মাতা সারদামণি সমতল ভূমিতে আসিয়াছিলেন।... শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির তাৎপর্য হইতেছে অহেতুকী ভালবাসা। সেই-জন্য তিনি ঈশ্বরকে জননীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই অহেতুকী ভালবাসার প্রত্যক্ষ মূর্তি হইতেছেন মাতা সারদামণি।..."

দুর্গামাতা-রচিত শতবর্ষ-জয়ন্তীর অর্ঘ্য "সারদা-রামকৃষ্ণ" গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া আসিলে ১৩৬১ সালের ২২-এ বৈশাখ, শুভ অক্ষয়

তৃতীয়া দিবসে মন্দিরে শ্রীশ্রীমাতার নিকট উৎসর্গ করা হইল। গ্রন্থরচনাকালে মায়ের মনে এক আশঙ্কা ছিল,—তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য জনসমাজে সমাদৃত হইবে কি-না। তাহাতে জনৈক সন্তান মাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যে ঐকান্তিক ভক্তি আর নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার চোখে-দেখা বহুঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এ বই সকলের হৃদয় স্পর্শ করবেই।" এই আশ্বাসে মা আশান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বাবা।" বাস্তবিকই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিপুল সমাদর দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "কন্যার অর্ঘ্য মাঠাকরুণ গ্রহণ করেছেন, পূজো সার্থক হয়েছে।" একবৎসরের মধ্যেই গ্রন্থখানি তিনবার মুদ্রিত হয়।

শ্রীমাতার জয়ন্তী উপলক্ষে 'মাতৃবন্দনা' নামে বিভিন্ন লেখকের কবিতা এবং প্রবন্ধসম্বলিত একখানি পুস্তিকাও এইসময় আশ্রম হইতে প্রকাশিত হয়।

দেশদেশান্তর হইতে মায়ের নিকট অভিনন্দনসূচক এবং কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক পত্র আসিতে লাগিল। অনেকের একই মন্তব্য—আপনার গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের যেন জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। মায়ের কথা আপনি আরও লিখুন।*

---

* এই গ্রন্থের সুখ্যাতি শুনিয়া কোন কোন অবাঙ্গালীও ইহা পাঠ করিয়াছেন এবং পাঠে প্রচুর আনন্দও লাভ করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবান্দ্রাম হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত এবং বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত পি. শেষাদ্রি আয়ার পত্রযোগে মাকে লিখিয়াছেন (১৬.১২.১৯৫৪),—

"I have just read your inspired work সারদা-রামকৃষ্ণ and hasten to offer my cordial congratulations. It seems to me to be the very best book I have ever read on the mother. I wish and pray that you would bring out more similar books on শ্রীশ্রীঠাকুর and শ্রীশ্রীমা......

With respects and pranams

(স্বাক্ষর) শেষাদ্রি"

মায়ের এই 'দেবী-ভাগবতে'র অপর এক পাঠক শ্রীঅরুণবিকাশ সেন লিখিয়াছেন,—

"'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের মাধ্যমেই মাতাজী শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কি করে যে এ বই আমার হাতে এলো, আর কেমন করে কোন অলৌকিক আকর্ষণে যে এক নিঃশ্বাসে বইখানি শেষ করে ফেললাম, আমার কাছে তা দুর্জ্ঞেয়। হয়তো আমার মগ্নচৈতন্যে যে দৈবী এষণা সুপ্ত ছিল এ তারই ফলশ্রুতি।

"১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে বইখানি আমার হাতে আসে নিতান্তই দৈবক্রমে। সারদা-রামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের বর্ণনায় যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা বইখানির ছত্রে ছত্রে বিধৃত তার অমোঘ প্রভাব পড়ল আমার মনের ওপর, পবিত্র চরিত্রযুগলের সঙ্গে লেখিকা এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন যে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল কেমন করে কত সত্বর এই মহাশক্তি সন্ন্যাসিনীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হব।"

কোন বিষয়ে আগ্রহ ঐকান্তিক এবং তীব্র হইলে তাহা একদিন সফল হইবেই। অরুণবিকাশও একদিন সন্ন্যাসিনীমাতার দর্শনলাভ করিলেন, দীক্ষাও লাভ হইল। মায়ের আকর্ষণ ও সান্নিধ্যের পরিণাম লেখকের ভাষাতেই ব্যক্ত করি, "মাকে দর্শনের পর আমার জীবনে এক সন্ধিক্ষণ এসে উপস্থিত হল, আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটতে লাগল আমার সমগ্র সত্তায়। গোটা মানুষটাই যেন আদ্যন্ত বদলে যেতে লাগলাম। কোথায় গেল আমার সেই বাহ্যিক চাঞ্চল্য! মন মগ্ন হতে চাইল অন্তর্মুখিতায়, নির্জনতাকে বোধ হতে লাগল মধুরতর। অহর্নিশ শুধু তাঁরই চিন্তা—মায়ের সান্নিধ্যের মতো মধুর বুঝি জগতে আর কিছুই নেই।"

অরুণবিকাশ এবং আরও অনেকের অন্তর্লোকে সুপ্ত ধর্মভাবের এইরূপ জাগরণের মূলে—প্রথমতঃ 'সারদা-রামকৃষ্ণ', এবং তৎপর ও প্রধানতঃ ইহার রচয়িত্রী দুর্গামাতা।

এইভাবেই গ্রন্থপ্রকাশের পর কলিকাতা এবং নানাস্থান হইতে

মায়ের নিকট অবিরাম বহুভক্ত সমাগম হইতে লাগিল। কেহ আসিলেন তাঁহাকে দর্শনের উদ্দেশ্যে, কেহ দীক্ষার্থিরূপে ; শতবার্ষিকী উৎসবের বিভিন্নসভায় শ্রীমাতার প্রসঙ্গ বলিবার আমন্ত্রণ লইয়াও আসিলেন কেহ কেহ। সারদামাতার পুণ্য কথা শুনিবার জন্য জনগণের আগ্রহ দেখিয়া মায়ের চিত্তও উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি যথানিয়ম আহার ও বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া অনন্যমনে নামপ্রচারে ব্রতী হইলেন। আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভাসমিতি ব্যতীত জনসাধারণের আয়োজিত সভায়ও মা উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনবাণী আলোচনা করিয়া অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।*

* আশ্রমের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে এক বিরাট মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন নির্ঝরিণী সরকার। অনুরূপা দেবী, শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীচিত্রিতা গুপ্তা, শ্রীললিতা ভট্টাচার্য ও সরোজবাসিনী কোলে প্রমুখ মহিলাগণ শ্রীমাতার পুণ্যচরিতকথা আলোচনা করেন।

উক্ত স্থানেই অন্যদিন সাধারণ সভায় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী ভাষণ দান করেন। শ্রীশ্রীসারদামাতার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা-প্রতিযোগিতায় শ্রীনমিতা দাম ও শ্রীইরা ভট্টাচার্যকে উক্ত সভায় দুইখানি স্বুবর্ণ পদকে পুরস্কৃত করা হয়।

জনসাধারণের আয়োজিত বিভিন্ন দিবসের সভা—ইছাপুরে, দক্ষিণ-কলিকাতায় মহারাষ্ট্র-নিবাসে, উত্তর-কলিকাতায় নন্দলাল বসু-ভবনে, রাণাঘাটে, যাদবপুর কলেজে, কোন্নগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে, শান্তিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে, চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে, বরাহনগরে, চুঁচুড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘে, বসিরহাট উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে, ধানবাদে শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের এবং মধুপুরে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে।

এতদ্ব্যতীত, Women's Convention-এর কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত মহিলাদিগের মহতী সভাতেও দুর্গামা যোগদান করেন এবং শ্রীশ্রীসারদামাতার আবির্ভাব এবং বিশেষ করিয়া নারীজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার অবদানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

এই উপলক্ষে মায়ের প্রদত্ত একদিনের ভাষণের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"…দক্ষিণেশ্বর পুণ্যতীর্থ কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমিই নহে, দক্ষিণেশ্বর জননী সারদেশ্বরীরও লীলাভূমি। এই পুণ্যতীর্থে মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের কল্যাণে যে মায়ের ধ্যান করিয়াছিলেন, যে মাতৃভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন কঠোর সাধনায়, জননী সারদা সেই মাতৃভাবেরই জীবন্ত বিগ্রহ, বিশ্বমাতৃত্বের ভাস্বর প্রতীক, মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী জগদ্ধাত্রী। দক্ষিণেশ্বরেই তাঁহার বিচিত্র লীলা সীমাবদ্ধ নহে,—অনন্ত তাঁহার লীলা, অপার তাঁহার মহিমা, অসংখ্য তাঁহার রূপ। নানারূপে যুগে যুগে মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু একাধারে এমন জ্ঞানদায়িনী সারদা, স্নেহময়ী কমলা ও কল্যাণময়ী জগদ্ধাত্রীরূপে মায়ের আবির্ভাব আর কবে হইয়াছে? তাঁহার স্নেহ ও করুণাধারা কোন বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় সেই স্নিগ্ধধারা জাতিধর্ম দেশপাত্রের সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া সকলের অন্তরকে প্লাবিত করিয়াছে।…"

এইসময় চুঁচুড়া হইতে লিখিত কবি সুবোধ রায়ের একখানি পত্র—

শ্রীচরণেষু

মা, দীর্ঘ চতুর্দশবর্ষ মাতৃসন্দর্শন ও মাতৃসঙ্গলাভে বঞ্চিত থাকার পর মাতাপুত্রের মিলন। এইরূপ মিলন দেবাকাঙ্ক্ষিত। এই মিলনের ফলে দীর্ঘদিনের তৃষ্ণার্ত এই অন্তর মাতৃস্নেহসুধারসে প্লাবিত। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। আর এ তো কোনো বহির্জগতের সাময়িক আনন্দ নয়—যে আনন্দের রেশ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। মাতৃআশীর্বাদের যে আনন্দ সেটা চিত্তের স্থায়ী সম্পদ, তাই একান্তে প্রতি প্রভাতে যখন অন্তরের গভীর গহনে ডুব দিতে চেষ্টা করি, তখন আমার বুকের মধ্যে যেন মাতৃজয়ধ্বনি শুনতে পাই। আশীর্বাদ করবেন, যেন মহাজীবনের এই বীজমন্ত্রধ্বনি শুনতে শুনতে ইহসংসার থেকে হাসিমুখে বিদায় নিতে পারি…।

সেদিন ভগবতী সারদামণির জীবন ও চারিত্রকথা আপনার মুখে এক নূতন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আমি জীবনে বহু সজ্জন ও পণ্ডিতের

জয়ন্তী-উপলক্ষে একদিনেই মাকে বিভিন্ন স্থানেও ভাষণ দিতে হইয়াছে। শুভানুধ্যায়িগণ এইভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে আপত্তি করিলে মা হাসিয়া উত্তর দিতেন, "মায়ের নাম প্রচার করতে করতে যদি দেহটা চলে যায়, তাতে দুঃখ কি? আমি মার মেয়ে, মরে গেলে মার কাছেই চলে যাব।"

ইতিমধ্যে দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও শ্রীমাতার পুণ্যকথা বলিবার জন্য মায়ের নিকট আমন্ত্রণ আসে। তদনুযায়ী ১৩৬১ সালের ভাদ্রমাসে মা এলাহাবাদ গমন করেন। তথায় দুই সপ্তাহ অবস্থানকালে শ্রীসারদামাতার জীবনকথা প্রচারে বিভিন্ন পল্লীর আয়োজিত সভায় মা ভাষণ দান করেন।*

অতঃপর দিল্লীবাসী নরনারীর আগ্রহে তথায় গমন করিয়া মা নীহারকুমার রায়ের বাটীতে প্রায় এক মাস বাস করেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই মাতৃপ্রসঙ্গ আলোচনা চলিতে লাগিল।† নয়াদিল্লী কালীবাড়ীতে দুইদিন জয়ন্তী সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রথম দিন সভানেত্রীত্ব করেন লেডী আরউইন

বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু অন্তরের উপলব্ধিসঞ্জাত আপনার সুপবিত্র জীবন থেকে উদ্ভূত শ্রীশ্রীমায়ের ছবি আপনি যেভাবে এঁকে দিয়ে গেলেন, তা অতুলনীয় এবং সেটা শুধু আমার মনে নয়, সকলের মনেই দাগ রেখে গেছে।

তিন চার দিন আগে এখানকার জেলা জজ শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কে আলাপ হচ্ছিল। তিনি শীঘ্রই একদিন আশ্রমে যাবেন বললেন।...

প্রণত

সুবোধ

* এলাহাবাদে জর্জ টাউন, সাউথ মালাকা, লাউদার রোড, অলোপীবাগ রোড, লুকারগঞ্জ, সিভিল লাইন্‌স্‌, এলেনগঞ্জ, মালভিয়া রোড, প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সভায়।

† দিল্লীতে পাহাড়গঞ্জ, তিশহাজারী কালীবাড়ী, নয়াদিল্লী কালীবাড়ী, কাশ্মীরী গেট, লোদী রোড, রোশনপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি, বিনয়নগর, মণ্ডীহাউস, মিণ্টো রোড, করোলবাগ, মাথুর হাউস, দেবনগর ও কুইনসওয়ে প্রভৃতি স্থানে।

কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীকমলা দাশগুপ্তা এবং দ্বিতীয় দিবসে সভাপতিত্ব করেন সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়। সভার দ্বিতীয় দিবসে ভাষণের উপসংহারে মা যখন শ্রীমাতার সেই আশীর্বাণী—"যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে"—জ্ঞাপন করেন, তখন জনমণ্ডলী আনন্দে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়েন।

এইবারের মহানবমী তিথিতে মা দিল্লীতে উপস্থিত থাকায় ভক্তগণ পরমোৎসাহে তাঁহার জন্মোৎসব পালন করেন। উক্ত দিবসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'দিল্লী-প্রবাসী ভক্ত সেবকবৃন্দে'র পক্ষ হইতে ভক্ত নীহারকুমার একখানি অভিনন্দন পত্র—'শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবীর শ্রীশ্রীচরণে প্রণতি নিবেদন'—পাঠ করেন। মাতৃভক্তির ভাবাবেগে নীহারকুমার শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন, অভিনন্দন পাঠ আর সমাপ্ত করিতে পারিলেন না; অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিলেন অপর এক সন্তান।

'প্রণতি নিবেদনে' ভক্তবৃন্দ বলেন, "···ঘনঘোর মেঘের তমসা আজ আমাদের জীবনমন পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে এবং অন্ধ হিংসায় পৃথিবী আজ উন্মত্ত, নিখিল হৃদয় অশান্তি ও অপরিতৃপ্তির আঘাতে জর্জরিত। এই নিদারুণ সঙ্কটমুহূর্তে তুমি আসিয়াছ, মা, স্থিরোজ্জ্বল ধ্রুবতারার মত লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনকে পথনির্দেশ দিতে, তমসার বিভীষিকা অপসারিত করিয়া জ্ঞান-আলোক বিকীর্ণ করিতে, উদ্বেলিত হৃদয়ের উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চলতা শান্ত করিয়া আত্মার মায়াবন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে।···

"তাই আজ তোমার কাছে যুক্তকরে ভিক্ষা প্রার্থনা করি, হে বহিরন্তর্লোকবিচারিণী জননি, তোমার ব্রত আমাদের জীবনে কর সার্থক ও পরিপূর্ণ, তোমার দীক্ষা আমাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলুক পরমার্থলাভের একাগ্র ব্যাকুলতা, তোমার শিক্ষা মরজগতের সম্মুখে অনির্বাণ আদর্শের অমরত্ব লাভ করুক। গার্গী-মৈত্রেয়ী-সদৃশী মা, তুমি

অতুলনীয়া ধীশক্তিসম্পন্না, তোমার মহিমা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া জনগণমন রঞ্জিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে।"

দিল্লী হইতে দ্বাদশীতিথিতে মা বৃন্দাবনধামে গমন করেন। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে বিশেষভাবে পূজাভোগ নিবেদন করিলেন। শ্যামাপূজার পর আসিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এইদিবস বস্ত্র, উত্তরীয়, ভোজ্য, মাল্য, ধান্যদূর্বা ও চন্দনসহযোগে বঙ্কুবিহারীজীর মন্দিরে— তাঁহার উদ্দেশে 'ভাইফোঁটা' অনুষ্ঠান পালন করেন। বঙ্কুবিহারীজী প্রসঙ্গে মা বলিতেন,— তৃতীয় সহোদর বঙ্কিমবিহারীর সহিত তাঁহার গভীর হৃদ্যতা ছিল। বাল্যকালে তিনি অনেকসময় মাকে শ্রীমাতার নিকট লইয়া যাইতেন। এই ভ্রাতার অকালমৃত্যুর পর তিনি গৌরীমার সহিত একবার বৃন্দাবন গমন করেন। বিহারীজীর মন্দিরে তাঁহাকে গৌরীমা বলেন, "মা, ইনিই তোমার সেই বঙ্কুদাদা, এখন থেকে এঁকেই তুমি ভাইফোঁটা দিও। মানুষ-দাদা তোমায় কতটুকু ভালবাসা দিতে পারবে? এঁকে ভালবেসো, এ দাদা তোমায় সব দেবেন।" গৌরীমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই বিগ্রহের প্রতি মায়ের অন্তরের ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর এঁকেই মা 'বঙ্কুদাদা' বলিয়া ডাকিতেন। কন্যাগণকে বলিলেন, "ভাল করে এঁকে দর্শন কর, মায়েরা, ইনিই তোমাদের আসল মামাবাবু।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বিভিন্নস্থানে শ্রীসারদামাতার অপূর্ব জীবনবাণী প্রচার ব্যতীতও শতবর্ষ-জয়ন্তীর শেষার্ধে মা উত্তর-কলিকাতায় একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, শ্রীসারদামাতা, শ্রীগৌরীমাতা এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের সুসজ্জিত বৃহৎ প্রতিকৃতি এবং নগরকীর্তনসহযোগে ৫ই অগ্রহায়ণ সায়াহ্নকালে এই শোভাযাত্রা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। পুরোভাগে আলোকসজ্জা এবং বাদ্যভাণ্ড, তৎপর বিভিন্ন যানে পত্রপুষ্পমাল্যে সুশোভিত পট ও

মধ্যে মধ্যে কীর্তনসম্প্রদায়। সঙ্গে চলিয়াছেন গৈরিক পতাকাবাহী আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীগণ এবং শতশঙ্খবাদনরত বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। তাঁহাদের অনুগমন করিতেছেন বহু ভক্ত নরনারী। সর্বশেষে একখানি সুসজ্জিত রথে শ্রীমাতার এক বৃহৎ প্রতিকৃতি শোভাযাত্রার শ্রী ও আকর্ষণ যেন শতগুণ বর্ধিত করিয়াছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিতেছেন মায়ের সন্তানগণ। পথচারী এবং উভয় পার্শ্বের গৃহ হইতেও নরনারী এই ভাবগম্ভীর দৃশ্য দর্শনে যুক্তকরে প্রণাম করিতেছেন।

মা একখানি রিকসায় করিয়া কখনও পার্শ্বে, কখনও-বা পশ্চাতে থাকিয়া শোভাযাত্রাটি পরিদর্শন করিতেছেন। পূর্বনির্দিষ্ট সমগ্র পথ পরিক্রমণ যখন সমাপ্তপ্রায়, এমনসময় রথোপরি প্রসন্নবদনা শ্রীমাতাকে দর্শন করিয়া মা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। সহসা রিকসা হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তে রথ টানিতে লাগিলেন। মাকে এতদবস্থায় দেখিয়া শোভাযাত্রী নরনারীও যোগদান করিলেন মায়ের সহিত। শ্রীমাতার রথ তখন এইভাবে চালিত হইতে লাগিল এবং "জয় সারদেশ্বরী মায়ের জয়" ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল রাজপথ। মনে হইল যেন শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা!

শোভাযাত্রা আশ্রমভবনে প্রত্যাগত হইলে পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বিপুল জনতার এক অবর্ণনীয় দৃশ্য! প্রসাদ বিতরণ করিয়া সেইদিনের অনুষ্ঠান মা সম্পন্ন করিলেন।

জয়ন্তী-উপলক্ষে কিছুদিন পূর্ব হইতেই আশ্রমের পশ্চিমপার্শ্বস্থ পুরাতন বিদ্যালয় গৃহে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন চলিতেছিল। শ্রীমাতা আশ্রমে আগমন করিয়া যে-সকল দ্রব্য স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন, বিভিন্ন সময়ে দুর্গামাকে যাহা যাহা উপহার দিয়াছিলেন সেই সকল বস্তুই পরমসম্পদের ন্যায় এযাবৎকাল মা সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাহার সব কিছুই জনসমক্ষে প্রদর্শিত হইল। এতদ্ব্যতীত, চিত্রে এবং মৃন্ময়ী মূর্তিতেও প্রদর্শিত হয় শ্রীমাতার জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

জপমালা, যাহা তিনি ষোড়শীপূজার সময় শ্রীসারদামাতার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তিকালে শ্রীমাতা যাহা দুর্গামাকে দান করিয়াছিলেন, তাহাও প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু, এই অমূল্য পবিত্র ধন মা অন্যান্য প্রদর্শিত বস্তুর সহিত একত্রে রাখিতেন না; সুরক্ষিত একটি কাঁচের আধারে ইহা সযত্নে স্থাপনপূর্বক সতর্ক প্রহরীর ন্যায় স্বয়ং সর্বক্ষণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে প্রত্যহ সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কলিকাতা মহানগরী এবং দূরদূরান্তর হইতে প্রত্যহ বহু দর্শনার্থীর সমাগম হইত এই প্রদর্শনীতে। কলিকাতার পরে গিরিডি আশ্রমেও জনসাধারণের মধ্যে ইহা প্রদর্শিত হয়।

১৩৬১ সালের ৩০-এ অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীমাতার আবির্ভাব-তিথিতে আশ্রমভবনে সাড়ম্বরে শতবর্ষপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

এইরূপে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতে পারিয়া এবং এতদুপলক্ষে শ্রীমাতার জীবনবেদ 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশনে সমর্থ হইয়া দুর্গামা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

যাঁহার করুণায় এই মহৎ এবং বিরাট অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, সেই সর্বসিদ্ধিদাত্রী মাতাকে আমরা বারংবার ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম জানাইতেছি,—

"আনন্দসারো যদনুগ্রহাপ্যো দুর্গাপুরীং যা বিদধাতি সিদ্ধিম্।
সন্ন্যাসদানেন কৃপাপ্রকাশাৎ তাং সারদাখ্যাং শরণং প্রপদ্যে॥"

দীক্ষাদান

শ্রীশ্রীসারদামাতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্নস্থানের সভা-সমিতিতে দুর্গামাতাকে দর্শন, তাঁহার নিকট হইতে শ্রীমাতার অপূর্ব চরিতকথা শ্রবণ এবং বিশেষতঃ 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসংখ্য নরনারী কেহ-বা সাধনপথের উপদেশ প্রার্থিরূপে, কেহ-বা দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু হইয়া আশ্রমে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ সময় পর্যন্তই এইভাবে ভক্তসমাগম অবিরলধারায় চলিয়াছে। কোন দীক্ষার্থীকে তিনি কখনও বিমুখ করেন নাই, হয়তো কাহাকেও অনুকূল লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। কাঙ্গাল দিনমজুর, রিকসাবাহক, ট্যাকসিচালককেও মা পথের সন্ধান দিয়াছেন। অবস্থাবিশেষে কোন কোন ধর্মার্থীকে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া দীক্ষাদান করিয়াছেন। এবম্বিধ কার্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত পদটি মা বলিতেন,—

"উন পাপী তাপী প্রভু না কৈলা বিচার।
উদ্ধারিলা জগজ্জনে দিয়া নাম ভার॥"

উক্তিটি নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে। কঠোর আদর্শনিষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অধিকারী অনধিকারীর বিচার করিতেন, কিন্তু প্রেমসিন্ধু নিত্যানন্দপ্রভু কৃপা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন নির্বিচারে। দীক্ষাদান ব্যাপারে গৌরীমাতার সহিত দুর্গামাতারও এইরূপ পার্থক্য লক্ষণীয়। গৌরীমা সকলকে দীক্ষাদান করিতেন না। অনেককে শ্রীমাতা অথবা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি কোন দীক্ষার্থীকে বিমুখ করিতেন না। এমন-কি, তাঁহার মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বেও, যখন স্বামী সারদানন্দজী সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন যাহাতে কোন দীক্ষার্থী মায়ের নিকট যাইতে না পারেন এবং শ্রীমাতাকেও সকাতর মিনতি জানাইয়াছেন—তিনি যেন অসুস্থ দেহে আর দীক্ষাদান না

করেন, এমতাবস্থায়ও কেহ প্রার্থনা জানাইলে প্রহরীদিগের অগোচরে করুণাময়ী মাতা তাহা পূর্ণ না করিয়া পারেন নাই। এই বিষয়ে দুর্গামাও গুরুমাতার পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন।

দীক্ষার্থিগণের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মাকাঙ্ক্ষী। আবার কেহ শোকার্ত বা সংসারতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া মায়ের শরণাগত হইয়াছেন। কোন দীক্ষার্থী হয়তো মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াও মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, মা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিতেন, "বাবা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিজমুখে বল, ইষ্টবস্তু প্রার্থনা করে নিতে হয়।" কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সন্তান স্বয়ং কিছু বলিবার পূর্বেই মা বলিয়াছেন, "বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছে।"

এমন ধর্মার্থীও দেখা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনে বহু সাধুসঙ্গলাভ করিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। কেহ-বা দিনের পর দিন স্বীয় বিচারবুদ্ধিদ্বারা গুরুর আসনে বসাইবার মত উচ্চ আধারের সাধক নির্বাচন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছেন—যিনি গুরু, তিনি স্বয়ং ডাকিয়া মন্ত্র দিবেন। এমন ব্যক্তিও দুর্গামার নিকট দীক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দীক্ষার্থীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মায়ের সান্নিধ্যে আসিবার পূর্বেই, স্বপ্নে গুরুর দর্শনলাভ করিয়াছেন, পরে মাকে দর্শনমাত্রই চিনিতে পারিয়াছেন। কেহ আবার ইষ্টনাম গ্রহণ করিতে আসিয়াও সংশয়াকুল হইয়াছেন—মা কি আমার প্রাণের ঠাকুরের নামটি আমায় দিবেন? যদি তাহা না হয়, তবে কি উপায় হইবে? কিন্তু কার্যকালে মা যখন তাঁহার ঈপ্সিত ইষ্টদেবতার রূপ বর্ণনা করিয়া এবং পটেতে দেখাইয়া মন্ত্রদান করিয়াছেন, শিষ্য তখন বিস্ময়ে এবং ভক্তিতে অভিভূত হইয়াছেন।

কখনও আবার কোন দীক্ষার্থীকে মা বলিয়াছেন, "বাবা, কয়েক-দিন পরে এসো; আমি শ্রীমাতার কাছ থেকে জেনে নিই, তারপর

তোমায় জানাব।” কয়েকদিবস পরে তাঁহাকে ডাকিয়া দীক্ষাদান করিয়াছেন। মা বলিতেন, “বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষকে দেখেই শ্রীমাতার নির্দেশানুযায়ী লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারি—তার কোন্ ঠাকুর আর কি মন্ত্র। আবার কারুর ক্ষেত্রে হয়তো তৎক্ষণাৎ হল না, দু-একদিন মাকে ধ্যান করলেই মা সব জানিয়ে দেন।”

প্রত্যেক দীক্ষার্থীকে মা জপধ্যানের বিধি বুঝাইয়া দিতেন,—প্রাতঃকালে শুদ্ধবস্ত্রে অভুক্তাবস্থায় কিভাবে মন্ত্র জপ করিতে হয়, কিরূপে ইষ্টচিন্তা করিতে হয়, এবং আর একবার সন্ধ্যাতেও বসিতে হয়। জপ সম্পর্কে কেহ কোনপ্রকার অসুবিধা বোধ করিলে এবং কাহারও কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে বলিতেন। জিজ্ঞাসুর সকল সংশয়ের যথাযথ সমাধান মা সস্নেহে করিয়া দিতেন।

মায়ের জনৈক বৃদ্ধ এবং পঙ্গু সন্তান জোড়াসনে বসিতে পারিতেন না, এইকারণে তিনি চেয়ারে বসিয়াই জপ করিতেন। মা ইহা জানিতে পারিয়া বলেন, “বাবা, দিনে অন্ততঃ একবার ভুঁয়ে বসে জপ করতে হবে।” সন্তানটি এই আদেশ শুনিয়া সেইদিবস কিছু বিব্রত বোধ করিলেও পরে সানন্দে মাকে জানাইয়াছিলেন যে, পুনঃপুনঃ চেষ্টার পর তিনি মাতৃ-আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জপের আসন সম্বন্ধে মা বলিতেন, “গুরুগৃহে, গঙ্গাতীরে আর দেবমন্দিরে আসন দরকার হয় না। অন্যত্র জপের জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকা প্রয়োজন, আর তা অন্য কেউ ব্যবহার করবে না।”

দুর্গামাতার দীক্ষিত নরনারীদিগের মধ্যে যাঁহারা দীক্ষার পূর্বে স্বপ্নে কিছু কিছু অলৌকিক দর্শন ও নির্দেশলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ এইস্থানে উল্লেখ করা হইল।

শ্রীসবিতা ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন,—

“দীক্ষা হওয়ার আগে একদিন স্বপ্ন দেখছি—আমরা বাড়ীর কয়েকজন একটী গাড়ীতে করে কোথায় যেন যাচ্ছি, দূরে, অনেক দূরে। কত মাঠঘাট, গাছপালা পেরিয়ে, কত গ্রামের ভিতর দিয়ে,

গঙ্গার ধার দিয়ে যেন স্থানটীতে এসে পৌঁছালাম। সেখানে একটী মন্দির, গঙ্গার ধারেই অবস্থিত, চারিদিকে গাছপালা, স্থানটী খুব নির্জন। আমরা সেই মন্দিরে দর্শনের জন্য গেলাম। ভিতরে বেদীর উপর শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-এর অপরূপ মূর্তি বিরাজমান। দেখে খুব ভালো লাগলো। নীচেই একজন স্ত্রীলোক বসে আছেন—যেন জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি। দর্শন করে আমরা সকলে চলে এলাম। একটু এসেই মনে হল, প্রণাম তো করা হয়নি। আমি আবার গেলাম সেই মন্দিরে প্রণাম করতে। আমাকে দেখে সেই দেবীমূর্তি বললেন, 'তোকে দুর্গা কিছু বলেছে?' আমি বললাম 'না তো।' আবার তিনি বললেন, 'তুই যাস্, দুর্গাকে আমি বলে দিয়েছি, দুর্গা তোকে বলবে।'

"পরে শ্রীযুক্তা দুর্গামাকে এইসকল কথা জানিয়েছিলাম। মা কিছু বলেননি, শুধু একটু হেসেছিলেন। তারপরই মা আমাকে দীক্ষা দেন।

"এরও অনেকদিন পরে, মা তখন নবদ্বীপের আশ্রমে ছিলেন। আমরাও বেড়াতে গেলাম দু দিনের জন্য। বেশ ভাল লাগলো আশ্রমটী। পুরাণ আশ্রম (রাণীর চড়ায়) দেখতে গিয়েছি। সেইখানে মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-এর মূর্তি দেখে অবাক হয়ে ভাবছি, এই মূর্তি তো আগে দর্শন করেছি, মনে হচ্ছে, কিন্তু নবদ্বীপে তো আগে আসা হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই স্বপ্নের কথা। আমি যেন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তাইতো, আমি তাহলে শ্রীশ্রীগৌরীমাতাজীরই দর্শন পেয়েছি। সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করে একটা কথা শুধু প্রতিধ্বনিত হল—একি স্বপ্ন! না, দুর্লভ দর্শন।"

শ্রীমণিমালা নাগের বিবৃতি—

"আজ থেকে অনেক বৎসর পূর্বে, আমার মনে ইচ্ছা হয় যে, আমি মন্ত্র লইব। কিন্তু যদি সৎগুরু পাই এবং আমার মনে ভক্তি হয় এমনি গুরুর নিকটই আমি মন্ত্রদীক্ষা লইব, নচেৎ আমার দীক্ষা না হয়, সেও ভাল। এবং এই অনুসন্ধানেই আমি বহুস্থানে ঘুরিয়াছি, কিন্তু মনের

মত গুরুর সন্ধান মিলে নাই। আমি ক্লান্ত হইয়া আর খোঁজও করি নাই।

"১৯৫৫ সালে—তারিখটা সঠিক মনে নাই, রাত্রে আমি আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম যে,—কত লোক দলে দলে কোথায় যাইতেছে, আমিও কৌতূহলবশতঃ তাহাদের পিছনে চলিলাম। তাহারা একটা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম যে, সামনেই সিঁড়ি এবং বড় বড় খড়খড়িওয়ালা দরজাজানালা দেওয়া ঘর এবং তাহার পাশেই বারাণ্ডা। (পূর্বে জানিতাম না, পরে জানিয়াছি, ইহাই 'উদ্বোধন-ভবন'—শ্রীমায়ের বাড়ী)। তাহারা সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া পাশের সরু বারাণ্ডা দিয়া যাইতে লাগিল। আমিও তাহাদের পিছনে চলিলাম, কিন্তু যাওয়া আর হইল না; দেখিলাম যে, আমাদের মা সারদামণি। সেই সামনের দরজা খুলিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং ওদের সাথে যাইতে মানা করিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, তাঁহার সেই মহিমময় রূপ—শ্যামাঙ্গী, পরণে লালপাড় শাড়ী, আলুলায়িত কুন্তল। তিনি আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ভুবনমোহিনীরূপে এবং বলিলেন, 'মা, তুমি কোথা যাচ্ছ? তুমি এইখানে আমার সামনে দাঁড়াও।' আমি মাকে দেখিয়া মনে করিয়াছি, মার ত দেখা পাইয়াছি, বলি—আমার মন্ত্রের কথা—মা আমাকে দয়া করিবেন। আমি বলিলাম, 'মাগো, আমাকে তুমি মন্ত্র দাও, মা, আমি নেব।' মা বলিলেন, 'আমি মন্ত্র দেব না, মা, ও তোকে মন্ত্র দেবে।' বলিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে আমাকে দেখাইয়া দিলেন একজনকে, তিনি পিছন ফিরিয়া শুইয়া আছেন, অঙ্গে তাঁহার গেরুয়া বসন। আমি ফিরিয়া দেখিলাম, তারপর বলিলাম, 'মা, আপনি ত বলছেন, কিন্তু উনি ত কোন উত্তর দিচ্ছেন না।' মা বলিলেন, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, দেবে, বুধবার সকাল আটটায় সিংহদ্বারে তোর মন্ত্র হবে।' এই কথা বলাতে তিনি ফিরিলেন। দেখিলাম, তিনি আমার এই দুর্গামা। আমি অবাক হইয়া গেলাম। মা আমার সহিত যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহাতে

আমার অন্তর শীতল হইয়া গেল, প্রাণ জুড়াইয়া গেল। এইরূপ মধুমাখা কথা আমি কভু শুনি নাই।...

"সেই বৎসর বুধবার দিন ছিল কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী। সেই শুভদিনে মা আমাকে দয়া করিলেন, আমি ধন্য হইলাম।"

এই মহিলার দীক্ষাকার্য আশ্রমের প্রধান প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে বসিয়াই হইয়াছিল।

বালিগঞ্জের এক বিত্তশালী এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মায়ের সহিত তাঁহার যোগাযোগের সূত্র এবং দীক্ষার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"আমাদের অতিসাধারণ জীবনেও দু'একটি এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে আমাদের সংশয় বিনষ্ট হইয়া মায়েতে মনুষ্যবুদ্ধি একান্তভাবেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। ইংরাজী ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গাপূজার পরে আমি বিন্ধ্যাচলে যাইয়া তিন সপ্তাহকাল ওখানে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে ছিলাম; সেই সময়ে গায়ত্রী স্মরণ করিবার সময় ভ্রূমধ্যে একটি আলো অনুভব করিতাম এবং সেই আলোর সাহায্যে সাংসারিক যাবতীয় জিনিষই চোখের সামনে আসিত। বিন্ধ্যাচল ত্যাগ করিবার পর সেই জ্যোতিদর্শন আর হয় নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আমার এক বন্ধু (শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজের আশ্রিত) আমার নিকট বিন্ধ্যাচলের কথা শুনিয়া গিরি মহারাজের আশ্রমের তদানীন্তন মোহন্ত, যিনি সেই সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নিকট লইয়া যান। মোহন্ত মহারাজ বলিলেন, 'ভ্রূমধ্যস্থিত জ্যোতি কখনও মিথ্যা হয় না। আপনি তান্ত্রিক মন্ত্র নেবেন না, ঘরে বসেই যথাকালে মন্ত্র পাবেন।'

"ইহার পরে বহু বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু দীক্ষা লইবার আগ্রহ আসে না। পরে একসময় প্রবল আগ্রহ জন্মে, এবং কাহার নিকট হইতে দীক্ষা লওয়া যায় সেই বিষয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে আমার স্ত্রীর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সারদেশ্বরী আশ্রমের মাতাজীর নিকট হইতে দীক্ষা নিলে কিরূপ হয়? আমি বলিয়াছিলাম যে, মাতাজী স্বয়ং কাহাকেও বীজমন্ত্র দেন

কিনা আমার জানা নাই, তবে অনুসন্ধান করিব। যেদিন আমাদের কথাবার্তা হয় তার পরের দিন সকাল ১০২টায় দুর্গামা কালীঘাটের মা-কালীকে দর্শন করিয়া আমাদের বাড়ী পর্যন্ত আসিয়া গাড়ীতেই অবস্থান করেন। খবর পাইয়া আমার স্ত্রী সেখানে যান এবং একটু পরেই আমিও যাই। আমাকে দেখিয়া মা দুর্গা ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন এবং আমি গিয়া প্রণাম করিতেই আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'কাল সন্ধ্যা হতেই ভেতরে একটা কথা কেবলই শুনছি, এবং আরও শুনছি যে ওকে গিয়ে শুনিয়ে দে।' মা আর অপেক্ষা না করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। আমি আমার দিনকার কাজ সমাপ্ত করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেলাম এবং মায়ের সঙ্গে নিভৃতে কিছুসময় ধরিয়া কথোপকথন হইল। আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, এই ঘটনা কি করিয়া সংঘটিত হইল। উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'সারদা মায়ের ইচ্ছা'। সেইসময় ঠিক হইল যে তিনদিন পরে (মহালয়ার দিনে) মা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে মন্ত্রদান করিবেন। তাহাই হইল।

"দীক্ষা পাইবার ৮।১০ দিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কেন গুরুবরণ উপলক্ষে দুর্গামায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। যে বৎসর জাপানীরা কলিকাতার উপরে বোমাবর্ষণ করে সেই সময় আমি আমার পরিবারস্থ সকলকে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ সাব-ডিভিসন সহরে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং দুই মাস পরে সেখানে নিজেও গিয়াছিলাম। মুন্সিগঞ্জে গিয়া আমি অত্যধিক রক্তের চাপে প্রায় তিনমাস শয্যাগত ছিলাম। ইহার মধ্যে আমার জীবনও সংশয়াপন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী বলিলেন, একদিন রাত্রে প্রভাতের কিছু আগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক তাহার কপালে সিঁন্দুর মাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কয়েকবৎসর পরে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে প্রথমবার সারদেশ্বরী আশ্রমে যান এবং সেখানে দুর্গামাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, ইনিই তাহার

কপালে সিন্দূর মাখাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা বহুবৎসর পর্যন্ত আমার নিকট হইতে গোপন রাখা হইয়াছিল।”…*

উক্তরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত আরও কয়েকটি আমাদের জানা থাকিলেও বাহুল্যভয়ে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না।

অনেক শোকার্ত নরনারী মায়ের নিকট আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও দুর্গামাকে বলিয়াছিলেন, “তোমার কাছে যে আসবে, সে শান্তি পাবে।” মায়ের সান্নিধ্যে আসিয়া যে-সকল শোকাহতা নারী জীবনে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীপ্রতিভা দত্ত চৌধুরী লিখিয়াছেন,—

“মনে পড়ে সেই দিনটির কথা, যেদিন আমি দুঃখভরা শোকাকুল প্রাণে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়েছিলাম।…কাতরে বলেছিলাম,—মাগো, শান্তি দাও, কৃপা কর আমায়। দু হাত বাড়ায়ে মা আমায় কাছে ডেকেছিলেন, মমতামাখা হাত দু'খানি দিয়ে পরমস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘মাগো, তুমি শান্তি পাও।’ করুণাময়ী মায়ের স্পর্শে দেহমন আমার জুড়িয়ে গেল। আমার ব্যথায় মা ব্যথা পাচ্ছেন, আমার দুঃখজ্বালা নিজে গ্রহণ করে শান্তি দিতে চাইছেন, তা অনুভব করেছিলাম সারা অন্তর দিয়ে। এমন দয়াময়ী মার দেখা, আরো আগে পেলাম না কেন?

“১৩৬২ সন, ১৩ই ফাল্গুন, রাত ৯৷৷০ টা,—যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। হঠাৎ করোনারী থ্রম্বসিসে আমার স্বামী চিরদিনের তরে চলে গেলেন। দু ঘণ্টা সময়ও হাতে পেলাম না, মুহূর্ত আগেও ভাবিনি এতবড় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে আমার জীবনে।…শোকে,

* মায়ের এই বিদ্যোৎসাহী এবং যশোমানে নিস্পৃহ সন্তান প্রচুর অর্থব্যয়ে একটি কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আরও অনেক সমাজকল্যাণ এবং সেবা প্রতিষ্ঠানে বহুসহস্র টাকা তিনি প্রদান করিয়াছেন।

দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেলাম। আমার এই মানসিক বিপর্যয়-কালে আমার বৌদি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমায়া দেবী প্রায়ই আসতেন আমার কাছে, বলতেন, আশ্রমের কথা, আর আমার করুণাময়ী মায়ের কথা। এসব প্রসঙ্গ আমার বড় ভালো লাগতো। আমি শান্তি পেতাম। পরম আগ্রহে শুনতাম শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের কথা।

"এই মায়া দেবীই আমায় মায়ের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এই দরদী মাকে পেয়ে আমি শোক দুঃখ ভুলেছিলাম, প্রাণে অপার শান্তি পেয়েছিলাম।...

"তারপর মা আমায় কৃপা করলেন। ১৩৬৩ সন, আষাঢ় মাস, উল্টোরথের দিনে মা আমায় দীক্ষা দিলেন। পরম গুরুরূপে মা আমার হৃদয়ে হলেন প্রতিষ্ঠিতা। নূতন জীবনে ধন্য হলাম আমি। মায়ের দেওয়া ইষ্টমন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপ করতে সচেষ্ট হলাম।"

অন্য এক শোকাতুরা কন্যার কথা।—

স্বদেশীযুগে প্রতিষ্ঠিত 'কিং হাফটোন কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী গোপালচন্দ্র বসুর বিদুষী কন্যার বিবাহ হয় রেঙ্গুন সহরের এক সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী-পরিবারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদিগের বোমাবর্ষণের সময়ে পথে বাহির হইয়া নিরাশ্রয় আতঙ্কিত পথচারী-দিগকে স্বগৃহে আশ্রয় দানকালে কন্যার স্বামীর দেহ সহসা বোমা-বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য দর্শন না করিয়াই, তাহা শুনিবামাত্র কন্যাটি মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। নিদারুণ শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁহাকে বর্মা হইতে দেশে ফিরাইয়া আনা হইল। এই সময়ে তাঁহার জনৈক আত্মীয়—গৌরীমাতার শিষ্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুহ দুর্গামাতার সহিত তাঁহার যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন।

মা তখন নবদ্বীপে। পিতার সহিত কন্যা মাতৃচরণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। মা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন, স্নেহশীতল পদ্মহস্তখানি কন্যার অশান্ত বক্ষে রাখিয়া বলিলেন, "মা, তুমি বীতশোকা হও"। মুহূর্তের মধ্যেই যেন কন্যার শোক অপসৃত হইল, অন্তরে অনুভব করিলেন অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দ।

পরদিবস ছিল শুভ জন্মাষ্টমী তিথি। উক্তদিবসে মা তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন। দীক্ষান্তে বলিলেন, "তুমি আমার বৈরাগী কন্যা, মা। তোমার মা সন্ন্যিসী, তুমিও সন্ন্যিসী। আমাদের দু জনেরই আশ্রয় পুরীধামের প্রভু জগন্নাথ, অভিভাবক তিনিই।" দীক্ষার পর কন্যার শান্তভাব দেখিয়া শোকাহত পিতাও নিশ্চিন্ত হইলেন। কয়েকবৎসরের মধ্যেই এই মহিলা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া মায়ের আশ্রম-বিদ্যালয়ের সেবায় সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিলেন। পরবর্তিকালে তাঁহাকে মা সন্ন্যাসব্রতেও দীক্ষিত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখসুখের আলোকে মাতৃমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন শিলঙ 'রীড চেষ্ট হসপিটালে'র রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার শ্রীলীলা ঘোষ,—

"মার কাছে আমি কি যে পেয়েছি তা কি করে বোঝাবো! তা বোঝানো আমার পক্ষে বড় কঠিন। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর কাছে কি পাই নি! সবই তো পেয়েছি। যেদিন আমি মাকে পেয়েছিলাম, তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কি যে এক বিষাদময় জীবন বয়ে বেড়াচ্ছিলাম! আর সে যে কত অসহ্য ছিল তা জানেন একমাত্র মা-ই। দুর্যোগরাতে দুঃখের নৌকা আমায় যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা আমি জানি না। কে এসে যেন পারে টেনে নিয়ে আলো দেখালেন! আমার মা-ই তিনি, যিনি আমায় তাঁর শ্রীচরণে তুলে নিয়েছেন।

"আমার স্বামী মারা যান ১৯৬১ সালের ১৬ই আগষ্ট। অভাবিত এ দুর্ঘটনা। চার বছরের শিশুকন্যাকে কোলে রেখে বুকফাটা চাপা কান্নাতে যখন আমি দিশাহারা হয়ে পড়তাম, তখন মনে হত— কে যেন তাঁর একখানি স্নেহকোমল হাত আমার মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছেন! হঠাৎ কোন কোন রাত্রে বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে দেখতাম, কে আমার ঘরে! কাউকেই দেখতে পেতাম না। আবার সেই অসহ্য কষ্টে জীবন বড় দুর্বিষহ হয়ে উঠত। এমনি করেই কেটেছে প্রায় একটি বছর।

"যেদিন আমি প্রথম সাক্ষাতে মাকে পেয়েছিলাম, মার পায়ে প্রণাম করতেই সেই চেনা-ছোঁওয়া যেন অনুভব করলাম, আর সেইদিনই আমার ব্যথার অবসান হল। আমার ভাঙ্গাবুকে হাত রেখে মা কাছে টেনে নিলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, দীক্ষাদানে কৃতার্থ করলেন।

"আজ এ নিশ্চিত বিশ্বাস মনের মধ্যে পোষণ করি যে, তিনি আমায় আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবেনই, আমার জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। মনটা খুলে দেখানো যায় না, লেখাও যায় না জীবনের সব কথা। তবে তাঁর করুণার উপলব্ধিতে বুঝি, তিনি আমায় ঘিরে আছেন।...তাঁর কৃপাদৃষ্টিই যে এ নিরাশ্রয় জীবনের একমাত্র সম্পদ।"

অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মা যে দীক্ষার্থীর ইষ্টস্বরূপ এবং মন্ত্র নির্ণয় করিতেন নিম্নোক্ত বিবৃতিসমূহের মাধ্যমে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।—

শ্রীআভা ঘোষ দীক্ষালাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া একদিন স্বামীকে তাঁহার প্রাণের কথা জানাইলেন। উত্তরে স্বামী বলেন, "এত ব্যস্ত হয়ে পাওয়ার জিনিষ তো নয় এসব, যতক্ষণ না ভগবানের দয়া হবে, ততক্ষণ কোন উপায় নেই।" আশ্চর্যের বিষয়, এইসময় সহসা দুর্গামা একদিন তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

শ্রীআভা ঘোষ লিখিয়াছেন,—

"মার আদেশমত তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। মা সেইদিনই বললেন, রাসপূর্ণিমার দিন সকাল বেলা শুদ্ধাচারে দামোদরলালজীর কাছে আসতে এবং সেইদিনই তিনি দীক্ষা দেবেন। তখন প্রায় দিন পনর বাকী। মনে কিন্তু আমার তখন আর এক চিন্তার উদয় হল। কারণ আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয় স্বর্গীয় জহরলাল ঘোষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্ত, শ্রীশ্রীগৌরীমা ও দুর্গামারও তিনি প্রিয় সন্তান ছিলেন, তাঁদের আশ্রিত ছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ

করতেন এবং আমার বিবাহের পর শ্রীগৌরাঙ্গের নামগান সকাল সন্ধ্যায় নিয়ে বসে শেখাতেন। তিনি সদাসর্বদা বলতেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম জয় রাধে গোবিন্দ।

এই নাম স্মরণ করবার চেষ্টা করতে। মানুষ অভ্যাসের দাস, আমার মনে বড়ই সাধ ছিল, যদি দীক্ষা পাই, যেন গৌরাঙ্গের নাম এবং গৌরাঙ্গের মূর্তিই পাই। সত্যই মা আমার ছিলেন অন্তর্যামিনী। রাসপূর্ণিমার দিন, (১৩৫২ সাল), সকালে আমার আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের ইচ্ছার মহামন্ত্রই তিনি দান করলেন এবং সেই সুন্দর ষড়ভুজ গৌরাঙ্গমূর্তি দেখালেন।·· মূর্তির এত সুন্দর বর্ণনা করলেন যে এখনও যেন আমার মনে সদাসর্বদা ঝংকৃত হচ্ছে।"

এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কথাও আমাদের স্মরণে আসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—যেদিন দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তিনি দুর্গামায়ের নিকট আগমন করেন, সেদিন তাঁহারও মনে ঐরূপ সংশয়ের উদয় হইয়াছিল,—মা কি আমার প্রিয় দেবতার নামটিই দিবেন? যথাসময়ে মা যখন রাখাল-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া বীজমন্ত্রটি তাঁহার কর্ণে প্রদান করেন, তখন বিস্ময়ে, ভক্তিতে এবং আনন্দে তিনি এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, দীক্ষান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও সমগ্র দিবস তিনি এক অভূতপূর্ব ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। 'আমি কবে মার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাব। আমার প্রাণের দেবতাকে কবে গান শোনাব!'—এই ছিল সেদিন তাঁহার অন্তরের একমাত্র ব্যাকুল প্রার্থনা।

মায়ের আহ্বানে আশ্রমের উৎসবাদিতে যোগদানপূর্বক তিনি বহুবার ভক্তিসঙ্গীত ও কীর্তন পরিবেশন করিয়াছেন। সহশিল্পিরূপে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে। একবার কৃষ্ণ-চন্দ্র আশ্রমে "শ্রীকৃষ্ণের রূপ" পালাকীর্তন গাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের

রূপচিন্তায় মুগ্ধ গায়কের মধুর ও উদাত্ত কণ্ঠের কীর্তন শ্রবণে মা এবং শত শত নরনারী সেইদিন পরম আনন্দ লাভ করেন।

মা বলিতেন,—গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কেবল একজন্মের নয়, গুরু পূর্বনির্দিষ্ট। দীক্ষার শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে গুরুর সাক্ষাৎ অবশ্যই পাওয়া যাইবে। গুরুনির্বাচনে নানাস্থানে যাতায়াত করিয়া, ইষ্টমন্ত্র লাভের জন্য যথার্থ ব্যাকুল হইলে শিষ্য অবশেষে পূর্বনির্দিষ্ট গুরুরই সমীপবর্তী হইবেন।

গুরুলাভ প্রসঙ্গে শ্রীমায়া দেবী ঃ

"যেদিন প্রথম আশ্রমে যাই, আমার হাতটি ধরে আপাদমস্তক এক নিমেষে দেখে মা জিজ্ঞাসা করেন,— আমি এখানে এর আগে কোনদিন এসেছি কিনা। ইতিপূর্বে আশ্রমে আমি কোনদিনও আসি নি, সে কথা বললাম। তিনি কিন্তু কেবলই বললেন, 'তুমি তো আমার খুব চেনা, খুব পরিচিত, অথচ বলছ, মা, কোনদিন এখানে আস নি। এই একজন্মের চেনাই কি চেনা ?' এইভাবে প্রথমদিনেই মা আমাকে একান্তভাবে আপনার করে নিলেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিনই আশ্রমে যাই, না গিয়ে থাকতে পারি না।

"একদিন বললাম, 'মা, আমার দীক্ষা হয় নি, আপনি আমায় দীক্ষা দিন, মা।' মা বললেন, 'তোমার দীক্ষা এখানেই হবে।' জিজ্ঞাসা করলাম, কবে ? মা বললেন, সামনের শনিবার সন্ধ্যাবেলা খবর নিও, কবে দিন ঠিক হল। একটা টেলিফোন করে খবর নিও, মা।' আমি বললাম, 'না, মা, আমি নিজেই আসব।' মা বললেন, 'ফোনই করো।' আমি কিন্তু ভাবছি, নিজে এসেই জেনে যাব। যখন চলে আসছি, তখনও মা বার বার বলছেন, 'ফোন করেই খবর নিও, মা।' অভাবিত আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

"যথাসময়ে বাঞ্ছিত সেই শনিবার এল। খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে বার হলাম আশ্রমের পথে। কিন্তু রাস্তায় এসে দেখি—অবস্থা

বড়ই ভয়াবহ। ট্রাম পুড়ছে, বাস জ্বলছে, চারিদিকে আগুন আর উন্মত্ত জনতা! এ অবস্থায় কি করে যাব আশ্রমে! প্রথমেই বাধা! মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে মাকে টেলিফোনই করলাম। মা ফোনে বললেন, 'আমি তো বলেছিলাম মা, ফোন করতে। যাক্, আগামী ৬ই মাঘ, বুধবার, দীক্ষার দিন ঠিক হল।'

"বহুপ্রতীক্ষিত সেই ৬ই মাঘ, বুধবার এল। সেই শনিবার থেকে এই বুধবারের সকাল পর্যন্ত দুটি জিনিষ আমার মনে ভীষণ-ভাবে আলোড়ন তুলেছে। প্রথমটি, ফোনের বিষয়। নবজন্মের প্রারম্ভেই মা এমন করে সাবধান করলেন আমায়! ভেবে বিস্মিত হয়েছি। তাঁর এই দিব্যদৃষ্টিকে আজকের বিজ্ঞান কি বলবে জানি না, তবে আমার মনে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া অন্যরূপ। দ্বিতীয়টি, ছোটবেলা থেকেই যে মূর্তিটি আমার একান্ত প্রিয়, এই কদিন দিবানিশি মনে হতে লাগল।

"যথাসময়ে মার কাছে গেলাম। মা শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইতিমধ্যে আমার মনে কোন অনুভূতি বা কোন রূপ দর্শন হয়েছে কিনা। আমি শুধু 'হাঁ' বললাম। মা আর কিছু বললেন না। স্থির, অবিচলভাবে বসে রইলেন। মায়ের এ রূপ অবর্ণনীয়! তারপর আরম্ভ হল দীক্ষা অনুষ্ঠান।

"দীক্ষামন্ত্রের ব্যাখ্যা মা যখন আরম্ভ করলেন—শুনতে পেলাম মায়ের কণ্ঠনিঃসৃত সেই অনাহত 'নাদধ্বনি।' এতদিনের সাধনায় 'নাদ' অনুভবের এবং প্রকাশের অনুশীলন করেও যাকে আয়ত্তে পাই নি, এই মুহূর্তে আমার অন্তরে যেন সেই সত্তার জাগরণ অনুভব করলাম। মায়ের উচ্চারিত মহাবাণী বাতাসে স্তরে স্তরে ভেসে চলেছে। সমগ্র বিশ্ব যেন পূর্ণ হয়ে উঠল সেই ধ্বনিতে। এরপরে আমার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত।

"দীক্ষাকার্য সমাপ্ত হল। আমার সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে এল। ভাবছি, কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম! আমার নবজন্ম লাভ

হল। করুণাময়ী মা তাঁর অভয় শ্রীচরণচ্ছায়ায় আশ্রয়দানে জীবন আমার কৃতার্থ করলেন।”

শ্রীশোভাময়ী বসুর দীক্ষা:

“আমার স্বামী (৺সতীন্দ্রমোহন বসু) শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ দীক্ষিত সন্তান। তাঁকে আশ্রয় করে, তাঁরই দয়ায় দুর্গামার শ্রীচরণের সন্ধান আমি পাই।…

“দাম্পত্যকলহ বলতে যা আমাদের অনেকদিন ছিল, সে আমার দীক্ষা নিয়ে। তাঁর (স্বামীর) ইচ্ছা আমি তাঁদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হই, না হলে গুরুত্যাগ হয়; সে মহাপাপ। আর, আমার মনে প্রাণে কামনা মা দুর্গা। এই নিয়ে ঝগড়া তর্ক জেদ, কথাবার্তা বন্ধ সময় অসময় চলতে থাকে। সময় যায়। বড় মেয়ে দীক্ষা নিয়েছে, আমি তখনও দীক্ষিত নই। তা নিয়ে বিদ্রূপ করেন, হাতের জল আমার অশুদ্ধ, স্পর্শ করবেন না, ত্যাগ করেন। তবু আমি সংকল্পে অটুট। শেষে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে একদিন যাই মায়ের কাছে—আশ্রমে। সব শুনে চিন্তান্বিতা মা বললেন, ‘তাই তো বৌমা, বুঝলাম সব। কিন্তু ছেলের অনুমতি ছাড়া যে কিছু হবার নয়, মা। কোথায় সে?’ সঙ্গে এসেছেন শুনে সামনে এসে একটিমাত্র প্রশ্ন মায়ের—‘সে কেমন করে হবে, বাবা সতু? বৌমা যে গৌরীমার চিহ্নিত।’ মন্ত্রের মত ফল। মাথা নীচু করে তিনি বললেন, ‘আমার আর কিছু বলার নেই, ছোটমা। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।’

“এতদিনের তর্কবিবাদ, বাদবিসম্বাদ মুহূর্তে মীমাংসা হয়ে গেল ঐ একটি কথায়। অনন্ত করুণাময়ী মা আমার, কৃপা দানেও বিলম্ব হল না, কদিন মাত্র আর বাকী অক্ষয় তৃতীয়ার। সেই শুভদিন নির্দিষ্ট হল। যথাদিনে দামোদরের ঘরের সামনে বসেই মা বীজমন্ত্র দিলেন কানে। সহসা মুদ্রিত চোখের উপর আমার যেন বিদ্যুৎ বিকাশ, এক আলোর ঝলকানি। ভয়ে চমকে উঠি, দৃষ্টি আটকা পড়ে মায়ের মুখে। সে কি অপরূপ রূপমাধুরী মার! সারা

মুখ ঘোর রক্তবর্ণ, চক্ষু নিমীলিত, ওষ্ঠে স্নিগ্ধ মধুর হাসির আভাস। তেমনটি আর কখনও দেখলাম না। মায়ের লীলার কত না স্মৃতি, দিনের পর দিন সঞ্চিত হয়ে আছে ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের মণিকোঠায়, শতমুখে বলেও তার শেষ হবে না।”

চারুচন্দ্র বিশ্বাসের দীক্ষাপ্রসঙ্গ।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া যখন বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, একদিন পুরাতন সুহৃৎ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন,—চারু, পরকালের জন্য একটু ব্যবস্থা করে রাখ এখন।

—ওসব আমার দ্বারা হবে না। তা ছাড়া বিশ্বাসও হয় না।

—চেষ্টা করলে সবই হয়। সৎসঙ্গ চাই, অনুশীলন চাই। দীক্ষা নাও, মনে শান্তি পাবে।

—খাঁটি সাধু কোথায়?

—সৎগুরুর সন্ধান আমি দেব। আগে তুমি মনস্থির কর। সাতদিন সময় দিলুম।

সাতদিন অতীত হইতে চলিল। কিন্তু তবুও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না চারুচন্দ্র। চিত্ত তখনও দোদুল্যমান।

অচিরেই উপস্থিত হয় অনুকুল পরিস্থিতি। বন্ধুবর বিজনকুমার একদিন চারুচন্দ্রকে জানাইলেন,—শীগ্গিরই কালীবাড়ীতে এক সভা হবে, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। একজন নতুন মানুষ দেখাব।

নিউদিল্লী কালীবাড়ীতে সেদিন শ্রীশ্রীসারদামাতার শতবর্ষ-জয়ন্তীর সভানুষ্ঠান। সভাপতি—বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রচুর জনসমাবেশ। প্রথমে আশ্রমকন্যাগণ দেবতার সমক্ষে আরতি করিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসিনী দুর্গামা তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

—ভগবান যুগে যুগে মানবকল্যাণে এই পৃথিবীর মাটিতে আমাদের মতই রক্তমাংসের দেহে অবতীর্ণ হন। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীসারদা মাতাঠাকুরাণী তাঁহাদের জীবন এবং সাধনা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্মই জীবন এবং সংসারে বাস করিয়াও মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ভোগে সাময়িক সুখ হয়তো আছে, কিন্তু শাশ্বত আনন্দ নাই। ধর্ম এবং ভগবানকে আশ্রয় করিয়া চলিলেই পরা শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। এবং ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।···

সভাশেষে বিজনকুমার প্রশ্ন করেন বন্ধুকে,—তোমার কেমন লাগল, চারু ?

—তা, বক্তৃতাটা ভালই দিয়েছেন।

—না হে, এটা মস্তিষ্কের মাপ-করা মামুলী বক্তৃতা নয়, হৃদয়ের অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

—হাঁ, ঠিকই বলেছ। কে এই মহিলা ? কোথায় থাকেন ?

—তুমি যদি সাক্ষাৎ করতে চাও, ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—মন্দ হবে না। একটু আলোচনা করতে চাই।

মা তখন দিল্লীতে হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজারের বাটীতে অতিথি। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া বন্ধুর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মাকে সবিশেষ জানাইলেন। মায়ের সহিত বিশ্বাস মহাশয়ের যোগাযোগেরও ব্যবস্থা হয়।

ইহার কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বাস মহাশয় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তিনি দুর্গামার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

চারুচন্দ্র মায়ের নিকট জপ ও সাধন বিষয়ের অনেক প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করিয়া লইতেন। কলিকাতায় আসিলে তিনি আশ্রমে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ; দূরে থাকিলে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। বিশ্বাস মহাশয়ের বাক্যে ও তাঁহার পত্রের ভাষায় আমাদেরও মনে হইত, একটি অভাবের পরিপূরণে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। দুর্গামাকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রের

কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থার কিছু পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।*

ইংরাজের রাজত্বকালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অপরাধে শ্রীঅমর নন্দীকে কৈশোরে ও যৌবনে অনেক বৎসর কারারুদ্ধ এবং অন্তরীণাবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার সাংবাদিক জীবন, অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী। আমেরিকায় অতিপ্রগতিশীল সভ্যতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু বহুবিধ কর্মব্যস্ততা এবং বিপরীত ধারার মধ্যেও ভারতের শাশ্বত আত্মার আহ্বান তিনি অন্তরে শুনিতে পাইতেন। তিনি এবং তাঁহার রাজনীতিক সহযাত্রিগণ বিশ্বাস

* Law Minister, India
5, Queen Victoria Road, New Delhi.
13th October, 1954

স্নেহময়ী মা আমার,

...সন্তান যখন মার শ্রীচরণে নিজের সুখ দুঃখ সব সমর্পণ করে, তখন তাহার চিন্তা করিবার কোন কারণ থাকে না। আপনার আশীর্বাদে আপনার সন্তান ভালই আছে। আপনার আদেশমত আমি প্রত্যহ সকালে প্রথম নামটী ১০৮ বার জপ করি। অবশিষ্ট তিনটী পদ আপনি যাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটী আমার স্মরণ আছে. কেবল শেষ নামটী মনে নাই। তাই প্রথম দুটী প্রত্যহই স্মরণ করি। আমি জানি সন্তানের কিছু ত্রুটী হইলে, মা নিজেই তাহা মার্জনা করিবেন, ও তাহার প্রতীকারও করিবেন।...

আপনি আমাদের সকলের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আমার ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী মায়েদেরও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইবেন।

ইতি আপনার
নিত্য স্নেহাকাঙ্ক্ষী সন্তান
প্রণত শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস

করিতেন, "ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্যই যে প্রয়োজনীয় তাই নয়, ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা প্রয়োজন।"···

তিনি লিখিয়াছেন, "দেশের স্বাধীনতা লাভের পর আমার মন ধীরে ধীরে মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণের পর থেকে আমি অন্তরে দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করতে থাকি। কিন্তু এই ব্যাকুলতার সঙ্গে একটা প্রশ্নও মনে জাগত। সে প্রশ্ন এই— দীক্ষালাভের জন্য যে আন্তর প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা কি আমার হয়েছে? মাটি যদি তৈরী না হয়ে থাকে তবে বীজ বপন করলে কী লাভ হবে?···

"শৈশব থেকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তাঁর চরণে আমার সামান্য একটু ভক্তিলাভ হয়েছিল। জীবনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমি মনে মনে ঠাকুরের শরণাপন্ন হলাম। ঠাকুরকে ডেকে আমি মনে মনে বলতাম, 'ঠাকুর, আমি ত জানি না আমার সত্যিই দীক্ষালাভের সময় হয়েছে কিনা। তাই আমি কোন সাধক বা সাধিকার কাছে দীক্ষা চাইতে যাব না। যদি তুমি মনে কর যে আমার দীক্ষালাভের সময় হয়েছে, তবে আমার ভাবী গুরু যেন আমাকে নিজে থেকে ডেকে দীক্ষা দান করেন।' আমি বারে বারে মনে মনে ঠাকুরকে ডেকে এই কথাগুলি বলতাম। ঠাকুর কৃপা করে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।"

১৯৬২ সাল। দুর্গামা তখন দিল্লীতে—কাশ্মীরী গেটে।

"৩০-এ অক্টোবর তারিখে নয়াদিল্লীর লক্ষ্মীবাই নগরে পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং যথাসময়ে ভক্ত ও সঙ্গিনীগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে মা সভায় এসে উপস্থিত হলেন।···

"সভাভঙ্গের পর সভায় উপস্থিত ভক্তরা মায়ের পদধূলি নেবার

জন্য মায়ের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালেন। মিনিট কয়েক পরে ভিড় কমে গেলে আমি এগিয়ে এসে মাকে প্রণাম করবার জন্য যেই তাঁর পায়ের কাছে মাথা রেখেছি অমনি মা সস্নেহে আমার মাথায় তাঁর ডান হাতটি রাখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তোমার দীক্ষা হয়েছে?' আমি বললাম, 'না মা, আমার দীক্ষা হয় নি।' মা—'কেন হয় নি, বাবা'? আমি—'কেউ আমাকে একদিন নিজে থেকেই ডেকে দীক্ষা দেবেন এই আশায় আমি এতদিন ধরে বসে আছি।' মা—'কাল সকাল দশটায় তুমি আমাদের ওখানে এস। আমি তোমাকে নাম দেব। সকালে কিছু খেও না, খালিপেটে আসবে।"

পরদিবস তিনি, তাঁহার পত্নী শ্রীমণিকা নন্দী এবং জনৈক আত্মীয় কাশ্মীরী গেটের বাসস্থানে দীক্ষার্থিরূপে উপস্থিত হইলেন।

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গৌরীমায়ের পূজিত দামোদর শিলার সম্মুখে, মায়ের মন্ত্রোচ্চারণে পবিত্রীকৃত এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবতারদের স্মৃতির অনুধ্যানে পরিপূর্ণ আবহাওয়ায় আমাদের তিনজনের দীক্ষা হয়ে গেল। এইভাবে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর একমাত্র সন্ন্যাসিনী শিষ্যা আজন্ম ব্রহ্মচারিণী শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী আমাদের তিনজনকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করলেন। এর পূর্বে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, দুর্গামা হবেন আমার গুরু এবং শ্রীশ্রীমা হবেন আমার পরমগুরু। শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদাত্মা।...এখন দীক্ষার মধ্য দিয়ে সস্ত্রীক আমাকে তাঁর চরণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করে ভারতের বহুযুগযুগান্তরের আধ্যাত্মিক স্রোতধারার মধ্যে আমাকে টেনে নিলেন।

"যতই দুর্গামায়ের কথা চিন্তা করি ততই একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সদগুরুর চরণাশ্রয়লাভ কৃপা ছাড়া হয় না। গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, তাই সে-সম্পর্ক এই দৃশ্যমান জগতের আড়ালে যে সূক্ষ্মভাবময় আধ্যাত্মিক জগৎ বিরাজমান তারই নিয়মাধীন।...আমাদের উপরে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী যে সত্যিই

অহেতুক কৃপা প্রদর্শন করেছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত এই যে, আমাদের গুরু একজন মা এবং আমাদের পরমগুরুও মা। আমাদের পরমগুরু স্বয়ং মহামায়া, জগতের সর্বত্র পূজিতা এবং আমার গুরু তাঁরই অংশীভূতা শক্তি। আমাদের ভয় কি? ··যিনি পরমকল্যাণের পথে টেনে এনেছেন, তিনিই একদিন পরমলক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবেন।”

দীক্ষার্থীর প্রার্থনার পূর্বেই অন্য এক ক্ষেত্রে গুরুর আহ্বান গিয়াছিল,—তিনি প্রখ্যাত বেতারশিল্পী এবং রবীন্দ্র-ভারতীর সঙ্গীতের অধ্যাপক চিত্ত রায়। কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একদিন মায়ের জরুরী পত্র চলিয়া গেল। এক দৈব অনুপ্রেরণাবশে মা ভাগ্যবান চিত্ত রায়কে লিখিলেন,—

“ছেলেকে এক পরম শুভসংবাদ দিচ্ছি, তোমার আহ্বান এসেছে ‘মায়ের নিকট থেকে’, মা ডেকেছেন পুত্রকে সর্বতোভাবে পূর্ণতর করতে। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩৬৩) সোমবার সকাল ৯টায় একটু জবাফুল ও বিল্বপত্রসহ অভুক্ত অবস্থায় আসবে, বাবা। ঐদিন তোমায় মায়ের নাম দেব—যে নামে হৃদয় দিব্যানন্দে ভরে ওঠে। তখন মনে হবে ‘কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং।’ অন্তরে মায়ের দিব্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তুমি আনন্দে মায়ের নাম করবে, বাবা।···‘ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে ভজে’, সেই পরমানন্দময়ীকে ভজনা করে তুমি শান্তি পাও।”

পত্রখানি পাঠ করিয়া চিত্ত রায় বিহ্বলচিত্তে সেখানি কন্যাকে দিয়া বলিলেন, “এ কি দারুণ চিঠি! ক’ জনের ভাগ্যে এমন আহ্বান আসে!” নির্দিষ্ট দিনে ইষ্টকার্য সম্পন্ন হইল। তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার কন্যা বেতারশিল্পী শ্রীমাধুরী রায়ও দুর্গামাতার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত সম্পর্কেই চিত্ত রায়ের পরিচয় মায়ের সঙ্গে কয়েকবৎসর পূর্বে। মায়ের নির্দেশে তিনি আশ্রমে উৎসবাদিতে এবং নানাস্থানে মায়ের সহিত গিয়া সভাসমিতিতে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছেন।

অতঃপর পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির দীক্ষার কথা।—

এলাহাবাদ-প্রবাসী শ্রীতেজেশচন্দ্র ঘোষ ধনীর পুত্র, চা-বাগানের মালিক। যৌবনে বহু বৎসর ইউরোপে পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবনযাপন করিয়াছেন এবং ভারতে প্রত্যাগত হইয়াও অনেককাল অনুমান করিতে পারেন নাই যে, ভবিষ্যতে কোনদিন ভাগ্যনিয়ন্তা ভগবান তাঁহার জীবনের স্রোত এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন,—তিনি ধর্মপ্রেরণায় সদ্‌গুরুর শরণ লইবেন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবেন, সেবা করিবেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের।

"সারদা-রামকৃষ্ণ" পাঠ করিয়া অকস্মাৎ তাঁহার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—এমন অপূর্ব গ্রন্থের মহীয়সী রচয়িত্রীকে একবার দর্শন করিতে হইবে। ১৩৬৪ সালের শারদীয়া পূজায়—মা তখন এলাহাবাদে, স্থানীয় পত্রিকায় তাঁহার আগমনবার্তা পাঠ করিয়া অলোপীবাগের বাটীতে মহাষ্টমীর শুভ দিবসে তেজেশচন্দ্র আসিয়া মহিমময়ী সন্ন্যাসিনী মাতার প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর যাতায়াত চলিতে থাকে। মা একদিন তাঁহাকে বলেন, "বাবা, তোমার ইষ্ট-কার্যের সময় হয়েছে।"

সদ্‌গুরুর কৃপালাভের সংকল্প এবং ব্যাকুলতা সেইসময় তাঁহার অন্তরেও সক্রিয় হইয়াছে। কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', প্রথম লগ্ন বহিয়া গেল। তীর্থযাত্রার নির্ঘণ্ট অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিবসে মা এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে চলিয়া গেলেন।

পুনরায় বৃদ্ধি পায় তেজেশচন্দ্রের দীক্ষা গ্রহণের আকুলতা, মায়ের আকর্ষণ দূর হইতে যেন তীব্রভাবে অনুভব করেন। অবিলম্বে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাস্থানে উপনীত হইয়া আত্মনিবেদন করেন মাতৃচরণে। পরদিবস জগদ্ধাত্রী পূজার শুভক্ষণে তাঁহার ইষ্ট-কার্য সম্পন্ন হইল।

আর একপ্রকার দীক্ষা।

মা তখন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে বাস করেন। সায়াহ্নে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করেন, সঙ্গে কয়েকটি কন্যাও থাকেন।

একদিন পথিমধ্যে দেখেন—বিপরীত দিক হইতে উচ্চপদস্থ জনৈক পুলিস কর্মচারী আসিতেছেন, সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারী ও সিপাহী। প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে মায়ের পুলিসভীতি ছিল অত্যধিক। মুহূর্তের মধ্যে মা কন্যাদিগের চলন দেখিয়া লইলেন এবং এক পার্শ্ব দিয়া সসঙ্কোচে প্রস্থান করিলেন। পুলিস কর্মচারীটিও মাকে লক্ষ্য করিলেন। দৃষ্টি কৌতূহলপূর্ণ।

তাঁহার নাম অরুণোদয় চক্রবর্তী, নদীয়ার জিলা-পুলিসের ডেপুটি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট। কৃষ্ণনগর হইতে সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে তখন নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসিনীর শান্তসৌম্য মুখমণ্ডল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল, অভূতপূর্ব এক অনুভূতির সৃষ্টি হইল তাঁহার অন্তরে। কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়াও বারংবার তাঁহার স্মরণে আসে সেই ভাবগম্ভীর মাতৃমূর্তি ; প্রশ্ন জাগে মনে—ইনি কে ? অনির্দিষ্ট কার্যের অজুহাতে—মূলতঃ অন্তরের নির্দেশে—অরুণোদয় পুনরায় আসেন নবদ্বীপে। থানার কর্মচারীদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলেন,—'ঐদিনের সন্ন্যাসিনী মা কে ? কোথায় থাকেন তিনি ?'

তৃতীয়দিবসে সন্ধান পাইলেন। থানায় সরকারীবেশ পরিবর্তন করিয়া তিনি মাতৃসন্দর্শনে গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মা চিন্তিত হইলেন,—এ তো সেদিনের সেই পুলিস সাহেব ! তথাপি যথোচিত আপ্যায়ন করিলেন, মন্দিরের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্তি দর্শন করাইলেন, ধর্মালোচনাও কিছু হইল। কিন্তু, মা অতিশয় সাবধান, মনে দুশ্চিন্তা,—পুলিসের লোক তো, কি মতলব কে জানে !

প্রথমদিনের কৌতূহল ক্রমশঃ শ্রদ্ধায় পরিণত হয়, শ্রদ্ধার সহিত অগোচরে আসিয়া মিলিত হইল ভক্তিও। ডি. এস. পি, সাহেবের নবদ্বীপে মাতৃসমীপে যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তিনি একদিন মাকে একান্তে পাইয়া অন্তরের গোপন বেদনাটি অকপটে নিবেদন করেন, "মা, ধর্মের প্রেরণায় যৌবনে একদিন···মহারাজের কাছে দীক্ষালাভ করেছিলুম। কিন্তু, পুলিসের চাকরী তো, অনেক ক্ষমতা,

তার মত্ততায় ভেসে গেলুম। এমন-কি, গুরুদত্ত মন্ত্রও ভুলে গেছি। ওদিকে, গুরুও দেহত্যাগ করেছেন। মাঝে মাঝে অনুতাপের জ্বালা আমায় দগ্ধ করে। এখন উপায় কি? আপনি উপায় বলে দিন, মা। আপনি আমায় আবার দীক্ষা দিন। আমার বড়ই অশান্তি।"

দুর্গামা সন্তানের হৃদয়বেদনা অনুভব করিলেন, বুঝিলেন,—তাঁহার মোহঘোর কাটিয়া গিয়াছে, সুসময় আসিয়াছে। কিন্তু দীক্ষাদানে তিনি সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "···মহারাজের কাছ থেকে তুমি মন্ত্র পেয়েছিলে, তাকে বাতিল করে আমি নতুন করে মন্ত্র দিতে পারি না। কয়েকটা দিন সময় দাও, আমার মায়ের কাছে প্রার্থনা করে দেখি, এর কোন উপায় হয় কি-না।"

অনুতপ্ত সন্তানের জন্য শ্রীমাতার নিকট মা প্রার্থনা জানাইলেন। অতঃপর যেদিন সন্তানটি পুনরায় আশ্রমে আগমন করেন, সেই প্রবেশক্ষণেই তাঁহার ললাটে জ্যোতির্ময় অক্ষরে লিখিত বীজমন্ত্রটি মায়ের দৃষ্টিগোচর হইল। মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, শ্রীমাতার কৃপায় তোমার মন্ত্র উদ্ধার হয়েছে।" দিন ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া মা বলিলেন, "ঐদিন প্রাতঃকালে স্নান সেরে শুদ্ধবস্ত্রে অভুক্ত অবস্থায় আসবে, চা খাওয়াও চলবে না।"

মাতৃচরণে মস্তক নত করিয়া অরুণোদয় তখন ভাবাবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মা, আপনিও আমার গুরু।" মা তাঁহার শিরে আশীর্বাদ করিয়া বলেন, "আমার কোন বাহাদুরী নেই বাবা, আমার মায়ের করুণাতেই এ সম্ভব হল।"

মায়ের নির্দেশমত শুভদিনে সন্তানটি আসিলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "অন্য গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে বলতে নেই, মন্ত্র বাতিল হয়ে যায়। আমি তিনটি নাম বলবো, এর মধ্যে তোমার ইষ্টদেবতাও আছেন। কিন্তু ইষ্টদেবতার নাম তুমি আমায় বলো না।" অতঃপর মা তিনটি নাম বলিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ মা, এর মধ্যে আমার ইষ্ট আছেন।" মা বলিলেন, "সাধারণতঃ সংস্কৃতে চতুর্থী বিভক্তির একবচনযোগে দেবদেবীর মন্ত্র রচনা হয়;

যেমন—ইষ্টদেবতা গণেশ হলে মন্ত্র "ওঁ গণেশায় নমঃ', আবার আকারান্ত মাতৃদেবতা হলে—যেমন অন্নপূর্ণার মন্ত্রে 'ঐং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।' এই পর্যন্ত বলিবামাত্র সন্তানটি সোল্লাসে বলিয়া উঠেন, "মা, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে!" অনুশীলনের অভাবে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার হইয়াছে, তাঁহার বদনমণ্ডলে পরিস্ফুট হয় অন্তরের উচ্ছলিত আনন্দের অভিব্যক্তি।

মা তখন তাঁহাকে জপসংখ্যা রাখিবার নিয়ম বুঝাইয়া বলেন, "এখানে বসে এখন একশত আটবার জপ কর। প্রত্যহ প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় আসনে বসে এক হাজার আটবার জপ করবে; সময়ের নিতান্ত অভাব হলে অন্ততঃ একশত আটবার। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে, তখন জপের মালা পাবে।"

মায়ের মন্ত্রোদ্ধারের দৈবীশক্তি দেখিয়া অরুণোদয় সেদিন অতীব বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় মাকে ভক্তি করিতেন। মায়ের অনুপ্রেরণায় তাঁহার লক্ষণীয় পরিবর্তন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহুভাবে—আর্থিক ও কায়িক সেবা, আশ্রমের প্রচার,—সর্বশেষে মাতৃচরণে তাঁহার দুই কুমারী কন্যাকে উৎসর্গ করিয়া তিনি আশ্রমসেবা করিয়াছেন।

অরুণোদয়ের অন্তিম দিনের কথাও অপূর্ব—যোগিজনবাঞ্ছিত। জীবনের শেষসন্ধ্যায় কলিকাতা আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন, মায়ের আদর ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। সুস্থ মানুষটি, আশ্রম-সেবকদিগের সহিত হাস্যপরিহাসও হইল। কিন্তু, সেই রাত্রেই অকস্মাৎ আসিল পরপারের আহ্বান। গৃহে ফিরিবার পর তাঁহার দেহ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িল। অবিচলিত চিত্তে মাতৃদত্ত মালা জপ করিতে করিতে তিনি সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

পূর্বেই মা এই ঘটনার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। সেদিন যখন সন্তানটি সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন, জনৈকা সন্ন্যাসিনীকে মা একান্তে

বলিয়াছিলেন, "দেখ তো, বৌমার সিঁথির সিঁদুর বড় বেশী জ্বলজ্বল করছে না! এ লক্ষণ ভাল নয়।"

পরদিবস প্রাতঃকালে অরুণোদয়ের প্রিয় কনেষ্টবলটি অশ্রুসিক্ত নয়নে আশ্রমে আসিয়া সেই নিদারুণ বার্তা প্রকাশ করিলেন। আশ্রমবাসিনী সকলেই এই দুঃসংবাদে স্তম্ভিত, মর্মাহত।

ত্রিতলে নিজকক্ষে বসিয়া মা উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন মুক্ত আকাশের দিকে। বার্তা লইয়া জনৈকা আশ্রমবাসিনী মায়ের নিকট নতমস্তকে দাঁড়াইতেই মা বলিলেন, "কি বলতে এসেছিস্? অরুণ চলে গেছে, এই খবর তো! ওরে, ও আমি জানি।"

ধর্মপ্রসঙ্গে

মহাসাধিকা দুর্গামা অগণিত নরনারীকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দান করিয়াছেন, দেখাইয়াছেন শান্তি এবং আনন্দের পথ। এই উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রানুযায়ী তিনি নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্মভাব জাগ্রত করিতে সাধারণভাবে ধর্মোপদেশ দান ব্যতীত জপ, ধ্যান এবং অন্যান্য ক্রিয়ারও নির্দেশ দিতেন। তবে সর্বপ্রকার ধর্মসাধনার মধ্যে তিনি 'জপ'কেই দিতেন শ্রেষ্ঠ স্থান।

'জপাৎ সিদ্ধিঃ', 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'—ইহাই ছিল সকলের প্রতি মায়ের মুখ্য বাণী। যিনি ধর্মার্থী তাঁহাকেও এই বিধান এবং যিনি আর্ত বা বিপন্ন তাঁহাকেও এই একই উপদেশ। বলিতেন, "মাগো এই যে মনের উৎফুল্লতা আমার সারাজীবন অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার কারণ জপ, শুধু জপ। ভগবানের নামজপেই মনের সরসতা আসে, নামেই আনন্দ, নামেই শান্তি। অল্পবয়সেই অনেকের জীর্ণতা এসে যায়, দেখতে পাই—কত কমবয়সেই যেন মনের সব আনন্দ ফুরিয়ে গেছে। ঈশ্বরের নামেই চিত্তের সরসতা বজায় থাকে। এই যে নামধ্বনি ভেতরে উঠছে জপের সঙ্গে—এই জপই তো সব। এই জপে মনে ভক্তির উদয় হয়, এই জপেই মুক্তি, জীবের একমাত্র পরাগতি।" মা আরও বলিতেন, "প্রত্যহ জপ না করলে ইষ্টকে উপবাসী রাখা হয়, একান্ত মনে জপেই ইষ্টের তুষ্টি।"

একদিন এক সধবা মহিলা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মা, স্বামিপুত্রের মঙ্গলের জন্য জপ করলে আমার নিজের পরকালের জন্য কি উদ্বৃত্ত থাকবে?" উত্তরে মা বলেন, "সকাম জপ করতে করতেও মনের অবস্থা একদিন এমন হবে যে, তখন আপনাথেকেই আর কোন বাসনা থাকবে না। স্বামীর কল্যাণে স্ত্রীর যে জপ তা নিষ্কাম জপ, কারণ স্বামী নারায়ণ, স্বামী গুরু। গুরুর কল্যাণে যে জপ—গুরুর ভাল হোক, গুরু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুন, তাও নিষ্কাম

জপ। মেয়ে যদি মাতাপিতার জন্য জপ করে, তাও এই পর্যায়ের। কিন্তু পুত্রকন্যার জন্য মা যেটা করবে, তা সকাম জপ।"

জপে উৎসাহ দিয়া আশু ফললাভের জন্য মা ব্যবস্থা দিতেন,—'মহানিশায় জপ।' এইকারণে অমাবস্যায় এবং বিশেষতঃ কালীপূজা-দিবসে কোন কোন সন্তানকে তিনি শ্মশানে জপধ্যান করিয়া রাত্রি-যাপনে আদেশ করিতেন। বলিতেন, "অমাবস্যার মহানিশায় শ্মশানে একাসনে বসে জপধ্যান করলে হাজারগুণ ফললাভ হয়। ঘুমুলে চলবে না, আসন ছেড়ে ওঠা চলবে না। তাই উপবাসে থাকবে।"

একবার জনৈক সন্তান কাশীপুর মহাশ্মশানে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতে মাকে জানাইলেন, "মা, রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত অতিচমৎকার জপধ্যান হয়েছে। কিন্তু তারপর এমন ঘুম এলো যে বাকী রাত আর তেমন জম্‌লো না।" মা বলিলেন, "ঐ তো মহানিশা—বারোটা থেকে রাত দুটো। এটুকু হলেই হলো।" সন্তানগণ অনেকে তাঁহার আদেশমত কালীপূজাদিবসে উপবাসী থাকিয়া কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে জপধ্যান করিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। কেহ কেহ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতি-অমাবস্যায় অদ্যাপি সেই নির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে পালন করিতেছেন। স্নেহময়ী মাতা তাঁহাদিগকে বার বার বলিয়া দিতেন, "রাত কেটে গেলে গঙ্গা-স্নান করে সোজা আমার কাছে চলে আসবি, আমি তোদের জন্য প্রসাদ নিয়ে বসে থাকবো।" মা স্বয়ং আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনীদিগের সহিত উপবাসী থাকিয়া মা-কালীর পূজা ও হোম সমাপনান্তে রাত্রি-শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সন্তানগণ আসিবামাত্র একতলে নামিয়া অতিযত্নসহকারে তাঁহাদিগকে প্রসাদ খাওয়াইতেন। মাতৃ-স্নেহের স্পর্শে তাঁহাদিগের সকল ক্লান্তি যেন তখনই দূরীভূত হইত।

কোন কোন ধর্মার্থীকে মা মালাজপের ব্যবস্থাও দিয়াছেন, বলিতেন—"শুচি অশুচি, শায়িত অথবা পথচলা,—যে-কোন রকম অবস্থাতেই মানসে জপ করা চলে, কিন্তু মালায় বা হাতের করে সংখ্যা রেখে জপ করতে হলে ভূমিতে শুদ্ধ আসনে বসতে হবে, শয্যায়

বসে চলবে না।” মা আরও বলিতেন, “জপ কেবল আধ্যাত্মিক পথের অবলম্বন নয়, রোগ, শোক অথবা বিপদকালেও বেশী করে জপ করলে বিপদমোচন হয়। ভক্তবৎসল ভগবান সর্বসন্তাপহারী, তাঁকে জপ আরাধনায় তুষ্ট করতে পারলে অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হবে।” কোন কোন সন্তানকে মা পুরশ্চরণেও উৎসাহ দিয়াছেন।*

সাধনভজন সম্পর্কে সন্তানের মধ্যে ত্রুটি বা অনুশীলনের অভাব দেখিলে মা তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। এই সম্বন্ধে মায়ের জনৈকা কন্যার বিবৃতি ঃ—

“মা···আমাকে নিরিবিলি পেলেই বলতেন, ‘মা, তোমার পথ অনুশীলনের পথ। এ ছাড়া গতি নেই। কেউ কেউ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তৈরী মন নিয়ে জন্মায়। ঈশ্বরপ্রেমে তার অধিকার হয় সহজ, অনায়াস। অন্যদের যেতে হয় কঠিন অনুশীলনের পথ দিয়ে। আমার কত সন্তান রয়েছেন – জ্ঞানী, গুণী, সমাজে কত গণ্য মান্য, তাঁরা আমাকে বলেন,—মা, ঈশ্বরকৃপা দাও। আমারও কত ইচ্ছা যে তাঁদের হয়, কিন্তু হচ্ছে কৈ? অথচ দেখ, নতুন বিয়ে হয়েছে, ষোড়শী মেয়ে, পূর্ণ ভোগের সময়, তার মনে ঈশ্বরানুরাগ এসে গেছে। এ কি একজন্মের ব্যাপার, মা? তোমাকে তাই বলি, অনুশীলনে ফাঁক রেখো না। সেটা তোমার কম হচ্ছে বলে মনে হয়।’ তাঁর এই কথাগুলি আমার মনে গাঁথা হয়ে রয়েছে। তিনি আমার মনের ফাঁক দেখতে পেয়েছিলেন। তবে সেটাকে ফাঁকি মনে করেন নি, তাই তাঁর আশ্রমের কাজে আমার সাধ্যমত সেবা

*পুরশ্চরণ একটি ব্রত। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ ব্যতীত পাঁচ হাজার কিংবা দশ হাজার অতিরিক্ত জপ করিবার সংকল্প লইয়া ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। ইষ্টমন্ত্রের অক্ষর সংখ্যা যত, তত লক্ষ জপ হিসাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পূর্ণ করিতে হইবে। মধ্যে কোন দিবস ছেদ পড়িবে না, যদি দৈবাৎ ছেদ পড়ে, তবে সেইদিবসের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পরদিবস দ্বিগুণ জপ করিতে হয়। এইরূপে যথাসময়ে জপসংখ্যা পূর্ণ হইলে গুরুইষ্টের পূজা এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্বারা ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়।

করবার অধিকার আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। কাছে এসে যখনই তাঁকে প্রণাম করেছি, দুই চোখে অমৃত বর্ষণ করে মাথায় হাত রেখে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে বলেছেন, 'মা, ধর্মে মতি হোক, ঠাকুর ও মায়ের কৃপালাভ কর।"

কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, নামজপের প্রভাবে দেহের রোগও যে নিরাময় হইতে পারে, তাহারই প্রমাণ পাইয়াছেন শ্রীশোভারাণী চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, -

"অনেক বছর আগেকার কথা। আমি তখন দীর্ঘদিন যাবৎ রোগে ভুগছি—পেটে অসহ্য ব্যথা, মাঝে মাঝে জ্বরও হয়। এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী ডাক্তাররা অনেক চিকিৎসা করলেন। কেউ বললেন—ম্যালেরিয়া, কেউ বা কালাজ্বর, আবার কেউ বা অনুমান করেছেন—গল ব্লাডারের ব্যথা। ব্যথার চিকিৎসার জন্য তিন চারবার হাসপাতালে গেছি। শেষে গল ব্লাডার বলে পেটে অপারেশন করা হলো, কিন্তু সেই অপারেশন সম্পূর্ণ হলো না, দেখা গেল—অন্য ব্যাপার। পিত্তের থলি শুকিয়ে গেছে, আরও কি দোষ রয়েছে। কাটাস্থান তাড়াতাড়ি সেলাই করা হলো। চিকিৎসা-বিভ্রাটের চরম! রক্ত, সেলাইন আর অক্সিজেন চললো। বিশেষজ্ঞগণ জানালেন, আর কিছুই করার নেই। কেউ কোন ভরসা দিতে পাচ্ছেন না। আমার পরিণামের জন্য আত্মীয়পরিজনের মধ্যে তখন দারুণ উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা।

"আমার পিতা সারদেশ্বরী আশ্রমে যাতায়াত করতেন। আমার সহোদরা বেলা পূজনীয়া দুর্গামার শিষ্যা, তাকে নিয়ে গর্ভধারিণী ছুটলেন আশ্রমে—সাধুর আশীর্বাদে, দৈবকৃপায় যদি কন্যার জীবনরক্ষা হয়। আশ্রমে গিয়ে তিনি দুর্গামার পায়ে কেঁদে পড়লেন,—আমার মেয়েকে বাঁচান। দুর্গামা আমার অবস্থা সব শুনলেন, খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর অবিচলিত দৃঢ়স্বরে বললেন,—কেঁদো না, মা, মেয়ে মরবে না। কিন্তু তোমাকে মেয়ের কল্যাণে খাটতে হবে। প্রতিদিন পাঁচ হাজার জপ করবে, আর এই এই নির্দিষ্ট

কয়েকটা দিনে গঙ্গাস্নান করে তারপর জপ করবে। মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলে, সে নিজেই জপ করবে। জপেই রোগমুক্তি হবে।

"সাধুমায়ীর কথায় গর্ভধারিণীর মনটা হালকা হলো, তিনি পরম বিশ্বাসে আমার কল্যাণে তপস্যা আরম্ভ করলেন। চিকিৎসকদের অনুমান আর সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম করে আমার রোগযন্ত্রণা কমতে লাগলো। অনতিবিলম্বে একেবারেই সেরে গেল।

"পূজনীয়া গৌরীমাতার শতবর্ষ-জয়ন্তীর বৎসর গুরুপূর্ণিমা তিথিতে পূজনীয়া দুর্গামা দয়া করে আমায় দীক্ষা দান করলেন। সেই থেকে নাম জপ করে চলেছি। গত কয়েকবছর পেটে ব্যথা, জ্বর, জণ্ডিস ইত্যাদি আর হয় নি। সম্পূর্ণ সুস্থদেহে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছি। গুরুকৃপাতেই ঘোর বিপদ থেকে আমি উদ্ধার পেয়েছি।"

অনেকেরই ইচ্ছা হয়—প্রাণ ভরিয়া গুরু ইষ্টের পূজা করি। কিন্তু সংসারের নানা অসুবিধায় তাহা বাস্তবে সম্ভব হয় না। মা ইহা বুঝিতেন। সেইহেতু বলিতেন, "সবাই তো নানা উপচারে পূজো করতে পারে না, যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন করবে। কেউ হয়তো ফুলবেলপাতায় আর সামান্য ফলবাতাসা দিয়ে ভোগ দিল। আন্তরিক নিষ্ঠা থাকলে তাতেই তার পূজো সার্থক হবে। বাহ্যিক উপচারের মূল্য কি বেশী? অন্তরে ভক্তি থাকলে ভোগরান্না না করেও তাঁর সেবাপূজো হয়। মানসে চিন্তায় আর জপের মাধ্যমেও তাঁকে ভোগ দিতে পার। এর ফলও কম নয়।"

একদিন শ্রীশান্তি সিংহকে বলেন, "তুমি মানসে পূজো করবে, মা। যা দিয়ে পূজো করলে সাধ মেটে মনে মনে ইষ্টদেবকে সেই সব নিবেদন করবে।" এই বলিয়া মা তাঁহাকে মানসপূজার পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন। অতঃপর একটি সুন্দর কাহিনীও শুনাইলেন।—

প্রভুপাদ রূপ গোস্বামী রয়েছেন বৃন্দাবনে, অসুস্থ। কবিরাজ চিকিৎসা করছেন, আর সেবক প্রাণপণে সেবাযত্ন করছেন। কিন্তু রোগের উপশম হচ্ছে না। কবিরাজ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন,—কোনরকম কুপথ্য হচ্ছে। তাঁর এমন কথা শুনে সেবক বিস্মিত হলেন, এবং

অসন্তুষ্টও হলেন। ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় কবিরাজ এসে দেখলেন—গোস্বামিজীর একটু জ্বর হয়েছে। নাড়ী পরীক্ষা করে বলেন,—দুধ খাওয়া হয়েছে, নাড়ী চঞ্চল। সেবক মানতে রাজী নন, বলেন,—এ কখনও হতে পারে না, আমি সর্বক্ষণ উপস্থিত রয়েছি, সেবা করছি। কবিরাজও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখে মৃদুহাস্যে রূপ গোস্বামী ধীরে ধীরে বলেন,—হ্যাঁ, আমি একটু দুধ খেয়েছি। সেবক অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ভাবছেন—সে কি করে হতে পারে! দুধ কখন খেলেন! তখন গোস্বামিজী বললেন,—দুপুরে আমি শ্রীরাধাগোবিন্দজীকে মানসে একটু দুধ ভোগ দিয়েছিলাম; পরে সেটুকু প্রসাদ পেয়েছি।

মা আবার ইহাও বলিতেন, "মনের দ্বারা সেবাপুজো সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ সকলের শক্তি তো সমান নয়। সাধনভজন মনের কাজ। যে তা না পারবে সে ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে কায়িক সেবা করবে, তাতেও সাধনভজনের কাজ হয়।"

প্রত্যহ অন্ততঃ এক রূপ শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ এবং নিত্য হোমানুষ্ঠান মা আশ্রমে প্রবর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত, বিশেষ তিথিতেও বিরাটাকারে হোমানুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহাতে বহিরাগত মাতৃবৃন্দও আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। মা বলিতেন, "হোমাগ্নির ধূম ও তাপ অঙ্গে লাগলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, দেহ সুস্থ থাকে।"

বিভিন্ন সময়ে গৃহী এবং ভক্ত নরনারীদিগের দ্বারাও মা হোম-কার্য করাইতেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁহারা কিরূপ অনুভূতি লাভ করিতেন সেই বিষয়ে দুইজনের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীঅসিতকুমার সেনের পত্নী লিখিয়াছেন,—

"আমরা একবার খুব অল্পদিনের জন্য গিরিডি আশ্রমে গিয়েছিলাম। একদিন সকালে মা আমাদের দু জনকে দিয়ে হোম করালেন। সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে হোমাগ্নির সামনে আমার সন্ন্যাসিনী মায়ের অপরূপ মূর্তি আজও আমার মনের পটে আঁকা

হয়ে আছে। বইতে পড়া পুরাকালের মুনিঋষিদের আশ্রমের ছবি জীবন্ত রূপ নিয়ে সেদিন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে আমার মহাভাগ্যবতী বলে সেদিন মনে হয়েছিল।"

শ্রীদেবানন্দ প্রামাণিক,—

"শ্রীমাতৃনিকেতনে একদিন মা আমার হাতে একখানি গীতা দিয়ে সমগ্র গীতা তিনবার পাঠ করতে বলেন। পরদিন সকালে আমাকে দিয়ে হোম করালেন। তন্ত্রধারিকা মায়ের নির্দেশমত আমি হোমাগ্নিতে...আহুতি দিলাম। সেদিন আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি পেলাম।...এরপর থেকে আমার সকল কর্মই যেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন উদ্যম আর আনন্দের সঙ্গে করেছি। মা আমাকে দিয়ে প্রায়ই হোম করাতেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, হোম করার পর প্রতিবারই আমার একই রকম অনুভূতি হয়েছে।"

মা অনেককে প্রতিদিন গীতাপাঠ করিতে বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ সম্ভব না হইলে অন্ততঃ আংশিক। কাহাকেও-বা চণ্ডীপাঠের নির্দেশ দিতেন। অবশ্য, চণ্ডীপাঠে কিছু কিছু বিধিনিষেধ থাকিত। শেষ কয়েকবৎসর প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাহিরে সন্তানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া মা তাঁহাদিগের দ্বারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করাইতেন, স্বয়ং শুনিতেন এবং সকলকে শুনিতে বলিতেন। আশ্রমাভ্যন্তরে মায়ের উপদেশ ব্যতীত, কন্যাদিগের ধর্মমূলক সঙ্গীত এবং স্তবাদি শ্রবণেও সমাগত মহিলাবৃন্দের চিত্ত ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইত।

বিভিন্ন স্থানে দেবদর্শন, দেবতার সম্মুখে স্তব, কীর্তনাদি, বস্ত্র পুষ্প মাল্যাদি উপচারে তাঁহাদিগের অর্চনা এবং সম্ভব হইলে ভোগ প্রদানে মা তৃপ্তিলাভ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমবাসিনীগণ এবং ভক্ত নরনারীসহ বহুবার তিনি অনেক দেবস্থানে গিয়াছেন। সন্তানগণের মনে ভক্তিভাব উদ্বুদ্ধ করিতে মা কোনপ্রকার শারীরিক ক্লেশকেই গ্রাহ্য করিতেন না। কলিকাতার অদূরে অবস্থিত দেবালয়-সমূহ এবং বিগ্রহের নাম ও ইতিবৃত্ত ছিল মায়ের সুবিদিত। দক্ষিণ-কলিকাতায় কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী, খড়দহে শ্যামসুন্দর,

হালিসহরে রামপ্রসাদের সিদ্ধভিটা, শ্যামনগরে ব্রহ্মময়ী, সাঞ্চীবনায় নন্দদুলাল, গঙ্গার পশ্চিমপারে শঙ্করমঠ, রামরাজাতলা, হাজারহাত কালী, হাওড়া সমাজে নদের নিমাই, মাহেশে জগন্নাথ, শ্রীরামপুরে রাধাবল্লভ এবং বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী প্রভৃতি দেবস্থানে মা সন্তানগণকে লইয়া যাইতেন।

কালীঘাটের শ্রীশ্রীকালীমাতা-প্রসঙ্গে শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষকে মা একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমরা সব কলকাতায় থাক। কলকাতার রাজা হচ্ছেন কালীঘাটের মা কালী। মাঝে মাঝে তোমরা তাঁকে দণ্ডবৎ করে আসবে। আর, কলকাতা থেকে যখন বাইরে যাবে তখন মা কালীকে জানিয়ে যাবে, আবার যখন ফিরবে, তাও গিয়ে জানিয়ে আসবে।" অদ্যাপি তিনি গুরুমাতার সেই নির্দেশ পালন করিয়া চলিতেছেন।

মায়ের নির্দেশমতই একদিন অধিকরাত্রে এই সন্তান মা কালীর দর্শনে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখেন, মন্দির প্রায় জনশূন্য। সেবকবৃন্দ সিন্দূর, পুষ্পমাল্য, আতর ও অন্যান্য দ্রব্যাদিদ্বারা মায়ের সজ্জা রচনা করিতেছেন। মন্দিরদ্বার তখনই রুদ্ধ হইবে। মায়ের রাত্রি-কালীন শয়নের ব্যবস্থা হইতেছে, সেই কারণে চতুর্দিক পরিচ্ছন্ন। শুচিসুন্দর এবং দেবভাবের উদ্দীপক এক পরিবেশ। দেবীর প্রসন্ন-দৃষ্টিতে সন্তানটি সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

পরদিবস আশ্রমে আসিয়া মায়ের নিকট সকল কথা জ্ঞাপন করিলে মা তাঁহাকে বলেন, "মা কালী কলকাতার রাজা। সারাদিন ধরে দরবারে সন্তানদের নানারকম প্রার্থনা, অভাব-অভিযোগ, এমন-কি বিকারগ্রস্ত ছেলে-মেয়েদের হরেক কথাও শোনেন। তারপর শয়নের আগে ঐরকম সাজেনগোজেন। এদিকে, মা গঙ্গাও সারাদিন ধরে সন্তানদের নানারকম পাপের বোঝা বন। রাত্রে মা গঙ্গাও মা কালীর কাছে যান। মা যমুনাও যান। তাঁরা মা কালীর সেবা করেন, তাঁদের মধ্যে তখন নানারকম আলাপসালাপও হয়। সন্তানদের জন্য তাঁদের কি কম চিন্তা।"

সন্তানগণের অনেকের আকাঙ্ক্ষা হইত—মাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার পুণ্যপদরজে তাহা পবিত্র এবং আপনাদিগকে ধন্য করিবেন। মা সন্তানের শুভেচ্ছা অপূর্ণ রাখিতেন না। আন্তরিক আমন্ত্রণ পাইলে ধনিনির্ধননির্বিশেষে মা সকলের গৃহেই গমন করিয়াছেন। মা যখন তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেন তখন গৃহদ্বারে আম্রপল্লব, আলিম্পন ও মঙ্গল কলস দ্বারা সজ্জিত, আত্মীয়পরিজন-সমাকীর্ণ ভবন দেখিয়া মনে হইত যেন দুর্গোৎসব। গৃহাগত গুরুমাতার চরণযুগল গৃহকর্ত্রী স্বহস্তে জলধারায় ধৌত করিতেন, স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া নিবেদন করিতেন সভক্তি প্রণতি। মা তাঁহাদিগকে অন্তরের শুভাশীর্বাদ জানাইয়া বলিতেন, "মায়েরা, সংসারে শান্তি, শৃঙ্খলা আর পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব তোমাদেরই। এর জন্য প্রয়োজন ভগবানের নাম স্মরণমনন, তাঁর কৃপা প্রার্থনা। সেই কৃপা তোমাদের সংসারে বর্ষিত হউক, পতিপুত্রপরিজন সকলকে নিয়ে আনন্দে সংসারধর্ম প্রতিপালন কর।"

সন্তানের গৃহে পৃথক ঠাকুরঘর থাকিলে তথায় বসিয়া মা জপ এবং গৃহদেবতার আরাত্রিক করিতেন। আশ্রমকন্যাগণ স্তব ও সঙ্গীতাদি গাহিতেন। এইরূপে সমগ্র পরিবেশটিকে দিব্যভাবে পরিপূরিত করিয়া মা বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিতেন সন্তানবৃন্দের হৃদয়ের ধর্মভাবকে। সেই পরিবারের নরনারী বালকবৃদ্ধই কেবল নহেন, এই উৎসবে প্রতিবেশিগণও আসিয়া অংশ গ্রহণ করিতেন।

স্বীয় গৃহদেবতার সম্মুখে এক আনন্দ-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে ডাক্তার শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত লিখিয়াছেন,—

"আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা—যেদিন কতিপয় আশ্রমিকাসহ মা এ অধীনের গৃহে পদার্পণ করে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে ধর্মসভায় তাঁর অপূর্ব ভাষণ দান করেছিলেন। সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে তাঁর আশীর্বাদ ও প্রসাদ বিতরণ করলেন এবং অনাবিল আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিলেন। এরূপ আনন্দপ্রাপ্তি জীবন সার্থক করে।"

(মায়ের হস্তাক্ষর)

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥

আজি আর এই শুভ গুরুপূর্ণিমা-দিবসে আমাদের পরম শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিশেষ আহ্বান। ইহা ক্ষুদ্র মানবের কথা নহে; বিরাটের কথা — বিশ্বগুরুর কথা। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট — আদি ও অনন্ত এবং "সত্যং শিবং সুন্দরং"। সন্তান সকলে শুদ্ধ দেহে এবং সমাহিত চিত্তে স্ব স্ব হৃদয়মন্দিরে শ্রীগুরুর আসন এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন পূর্বক প্রাণের প্রার্থনা জানাইবেন — "আবিরাবীর্ম এধি" — হে স্বপ্রকাশ তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও; প্রার্থনা জানাইবেন, "মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়" — তুমি দয়া করিয়া আমাকে অজ্ঞান ও মৃত্যুর পথ হইতে অমৃতে লইয়া চল। সকলের ঐকান্তিকতায় ও সাধনায় প্রসন্ন হইলে শ্রীগুরু তাঁহাদের দেন সিদ্ধি - পরাশান্তি ও অনাবিল আনন্দ। তখন শোক ও অভাব থাকে না, দুঃখ থাকে না, মৃত্যুভয়ও থাকে না — থাকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আনন্দই মনুষ্যের চির কাম্য, আমার ভগবানই আনন্দঘন। ইহাই ভারতের সাধনার মর্মকথা - শাশ্বত বাণী।

আজি আর এই শুভ তিথিতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকল সন্তান এই শুভ সংকল্প গ্রহণ করুন যে — প্রত্যেক ভারতবাসীকে দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে উন্নত হইতে, চরিত্রে ধর্মে ও জ্ঞানে মহান হইতে হইবে, ত্যাগ ও তপস্যায় গরিষ্ঠ হইতে হইবে। ভারতের সাধনায়, ভারতের শক্তিতে বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রার্থনা করি — শ্রীগুরু করুন যাহাতে আত্মবিশ্বাসে দিব্য স্বপ্ন হবে — ধন্য পূর্ণ হবে।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
শ্রীগুরুপূর্ণিমা —
১৩ই আষাঢ় — ১৩৫৭

ও ভাগবতী
দুর্গামা

দিব্যদৃষ্টি

সাধক যখন সাধনার উচ্চাবস্থায় অধিরূঢ় হন তখন তাঁহাতে ঐশী শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ দেখা যায়। দিব্যদৃষ্টিও একটি ঐশী শক্তি। কোন কোন শক্তিমান সাধকের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং চেষ্টা ব্যতিরেকেও কদাচিৎ তাঁহাদের মানসে অথবা দৃষ্টিসমক্ষে ফটো-ফিল্মের ন্যায় ভবিতব্যের বহু দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। কল্যাণ-পরবশ হইয়া তাঁহারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সেই সম্পর্কে পূর্বেই সতর্ক করিয়া থাকেন।

আমরা মনে করি, জগৎপালিনী মাতার ইঙ্গিতেই দুর্গামার মধ্যেও ঐরূপ ঐশী শক্তির প্রকাশ পাইত। সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের কল্যাণার্থে পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, আবার কখনও-বা প্রতিকারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এই অধ্যায়ে করা যাইতেছে।

গিরিডি আশ্রমের সেবক শ্রীঅচ্যুতানন্দের অভিজ্ঞতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

গিরিডি আশ্রমপ্রাঙ্গণে দুটি প্রাচীন মহুয়া গাছ মাথায় মাথায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মা আদর করে এদের বলতেন, 'যমলার্জুন।' ভক্তদের বসার জন্য গোড়াদুটি সুন্দর করে বাঁধানো।

দামোদরজীর মঙ্গলারতি সেরে মা বেড়াতে যেতেন প্রতিদিন, সেদিনও মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। সামনে সিঁড়ির প্রথম ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে উপর দিকে চেয়ে মা দেখলেন যেখানে গাছদুটি ডালপালা মেলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছে। গিরিডি আশ্রমের ভারপ্রাপ্তা সন্ন্যাসিনী মাতা শ্রীসুচিত্রাপুরী দেবী কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে বললেন, 'মা সুচিত্রা, ওই ডালপালাগুলো কাটিয়ে দিও। অমলবাবা নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন।' নিকটে প্রতীক্ষমাণ অবনীদাকেও বলেন, 'বাবা অবনী, মহুয়াগাছের ওই

ডালপালাগুলো কাটিয়ে দিও।' শ্রীযুক্ত অমলদা তখন গিরিডিতেই রয়েছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একজনকে দিয়ে নীচের কতকগুলি ডালপালা কাটিয়ে দিলেন।

আরও কয়েকদিন পরে। মা নাটমন্দিরে এসে বসেছেন, বেড়াতে যাবেন কন্যাদের নিয়ে প্রতিদিনের মত। সেদিনও আবার মা সুচিত্রাদিকে বলেন, 'সুচি, ওপরের ওই মোটা ডালটা কেটে নামিয়ে দিতে বলো। অমলবাবা যেন দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি নিশ্চিন্ত থাকবো।' অবনীদা কাছেই ছিলেন, বললেন, 'মা, আমি একটা কথা বলব? ওই ডালটি আর একটি শক্ত ডালের সঙ্গে এঁটে আছে। পড়ার কোন ভয় নেই।' মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'তা হোক, ওই ডালটাও কাটিয়ে দাও।'

আশ্রমকন্যাদের নিয়ে মা বেড়াতে গেলেন, সেদিন সঙ্গে আমি যাই নি। আশ্রমে তখন প্রভু জগন্নাথদেবের নূতন রথ তৈরী হচ্ছে ঐ গাছেরই নীচে। সুচিত্রাদি গাছতলায় দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমিও কাছেই রয়েছি। মা ফিরে এলেন সকলকে নিয়ে।

আবার সেই কথা। মা বললেন, 'ঐ ডালটা তো এখনও কাটানো হলো না!' হঠাৎ মা চীৎকার করে উঠলেন, 'ওরে, তোরা সব ওখান থেকে সরে যা, সরে যা।' সরতে বলেই মা সজোরে ডান হাতখানিও নাড়তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চড়্‌চড়্‌ শব্দ! আমরা আতঙ্কে মুহূর্তে সরে গেলাম ওখান থেকে। ভাই ধ্রুব ঘোষ এবং আরও দুই একজনও ছিলেন গাছতলায়, তাঁরাও তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। অথচ পরিষ্কার আকাশ, কোথাও ঝড় তো নেইই, হাওয়া পর্যন্তও নেই। অদ্ভুত কাণ্ড! মায়ের সেই নির্দিষ্ট মোটা ডালটি তখন ঝুলছে শূন্যে। বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যই যেন ঠিক শেষ মুহূর্তে বিপত্তারিণী মাতা সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

তখনই ডালটা কাটার ব্যবস্থা হলো। অতবড় মোটা ডালটা কুড়ুলের দু-চার ঘায়েই সপ্রতিবাদে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়লো।

আশ্রম-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মা বললেন, 'এতদিন ধরে বলছি, আমার কথা তোমরা তো বিশ্বাস করলে না। আজ একটা মহা-বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল।'

আর একবারের ঘটনা।

অভ্রব্যবসায়ী ৺অনিলমাধব রায়ের পত্নী সহৃদয়া আভাময়ী দেবী গিরিডির বারগণ্ডা অঞ্চলে ছু বিঘা জমি আশ্রমকে দান করেন। তার ওপর মাটীর একটি ছোট্ট ঘর ছিল। আমি প্রতিরাত্রে গিয়ে সেই ঘরে শুতাম এবং পরদিন সকালে আবার দৈনন্দিন কাজের জন্য ফিরে আসতাম আশ্রমবাড়ীতে।

কলকাতা থেকে একদিন স্নেহময়ী মাতার চিঠি পেলাম, "আমার এই চিঠিকে টেলিগ্রাম মনে করে তোমার বিছানা আশ্রমবাড়ীতে অবিলম্বে এনে ফেলবে, ও আজ হতে রাত্রে সতুবাবার সঙ্গে আশ্রমে থাকবে।" ওই লেখার নীচে কালি দিয়ে চিহ্নিত করা, অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত জরুরী। চিঠির নির্দেশে বিস্মিত হলাম। কী ব্যাপার! পূজনীয়া কমলামা ঐ সময়ে গিরিডি আশ্রমে ছিলেন ভারপ্রাপ্তা, তাঁকে চিঠি দেখালাম। তিনিও একখানি চিঠি দেখালেন, মা তাঁকেও লিখেছেন, "আমার এই চিঠি পাওয়ামাত্র অচ্যুনকে দিয়ে দানের জমি থেকে তার বিছানা আনিয়ে নেবে এবং আজ রাত্রি থেকে সে আশ্রমবাড়ীতে থাকবে। এর যেন অন্যথা না হয়।" কমলামা বললেন,—তুমি এক্ষুণি বিছানা নিয়ে এসো, মায়ের নির্দেশ।

ভেবেছিলাম, অবসর সময়ে বিকেলে আনবো, কিন্তু তাঁর কড়া তাগিদে তখনই বিছানাটা কাঁধে নিয়ে আশ্রমে এনে ফেললাম।

পরদিন মুষ্টিভিক্ষায় বার হয়েছি। আভাময়ী দেবীর বাড়ীতেও ভিক্ষাসংগ্রহে গেছি। আমায় দেখেই সহানুভূতি জানিয়ে তিনি বললেন, "বাবা, আপনার বড় ব্যথা লেগেছে কাল. আহা, লাগবেই তো।" মহিলার স্নেহার্দ্র কণ্ঠের সমবেদনায় আমি বিস্মিত, নির্বাক। আমার ব্যথা! কিসে লাগলো! কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তিনি আবার বললেন, "না, না, বলুন, আমার কাছে কোন সংকোচ

নেই। অত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রাত্রে ঘুমের মধ্যে এমন ব্যাপার আচমকা ঘটলে জীবনপর্যন্ত চলে যায়।"

বিস্ময় বাড়তে থাকে। ভিক্ষার ঝুলিটি রেখে পাশের চেয়ারে বসলাম। তিনিও বসলেন অন্য চেয়ারে। আমি গম্ভীর মুখে বললাম, "আপনি একটু পরিষ্কার করে সব কথা বলুন। রাত্রের দুর্ঘটনা, জীবন সংশয়, শরীরে ব্যথা,—আমি তো আসল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এবার মহিলার আশ্চর্য হবার পালা। বলেন, "আপনি গতকাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিলেন ?"

—আশ্রমবাড়ীতে।

মহিলার মুখ প্রসন্ন হলো। দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন জোড়হাতে, তারপর বললেন, "ঈশ্বর আপনাকে রক্ষে করেছেন। প্রতিরাত্রে আলো হাতে করে আপনি চালাঘরে শুতে আসেন, আপনার আসাটা আমার কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দে জানিয়ে দেয়। আমার ধারণা ছিল, প্রতিদিনের মত আপনি কালরাত্রেও শুতে এসেছেন। তখন মাঝরাত, হুড়মুড় করে একটা ভীষণ আওয়াজ ঐ ঘরটির দিক থেকে এল। পাশের ঘরে বোনপো থাকে, তাকে ডাকলাম, 'দেখ তো গোরা, আশ্রমের ঐ ঘরের দিক থেকে একটা আওয়াজ এলো। আশ্রমের ছেলেটি রাত্রে শোয়, তার কোন বিপদ হলো না কি ?' গোরা ঘুমের ঘোরে বলল, 'মাসী, তুমি স্বপ্ন দেখছ,' বলে পাশ ফিরে আবার ঘুমে অচেতন। আমার তো বাবা, রাত্রে আর ঘুম হলো না। ভোর হতেই চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি গেলাম। যা দেখলাম, তাতে তো চক্ষুস্থির! ঘরখানার চারটে দেওয়াল আর বারান্দার খুঁটী দুটো ছাড়া আর কিছু নেই। সম্পূর্ণ চালাটা মাটীতে পড়ে আছে। খুবই কষ্ট হলো, সন্তানটি এখানে রাত্রে থাকেন, তাঁরই ওপর চালাটা ভেঙ্গে পড়লো। আর ব্যথার শরীর নিয়ে নীরবে আশ্রমে চলে গেছেন। তাই বলছি, ঈশ্বর রক্ষে করেছেন আপনাকে।"

শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হয় আমার; মনে পড়লো—মা-জননীর 'টেলিগ্রাম-চিঠির' কথা, কমলামার কড়া তাগাদা। মনে পড়ে, সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দূরদেশ থেকে করুণাময়ী মাতার উৎকণ্ঠা ও আশীর্বাদ, তাঁর অলৌকিক দিব্যদৃষ্টি! মানসে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানাই আমার মাকে।

এলাহাবাদের শ্রীসুধাময়ী সেন শ্রীআনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে দীক্ষাপ্রাপ্ত। দুর্গামাতাকেও তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং মায়ের এলাহাবাদে অবস্থানকালে প্রত্যহ দুইবেলা পূজার নানাবিধ উপচারসহ তাঁহার দর্শনে আসিতেন। মা-ও তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

একবার সুধাদেবীর কন্যা কমলা এবং জামাতা ইনকাম-ট্যাক্স ট্রাইবুনালের সদস্য শ্রীশশাঙ্কভূষণ রায়ের কল্যাণে দুর্গামা কিছু দৈবকার্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করেন। সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে পত্রমাধ্যমে কিছু শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাইতে সুধামাকে লিখেন।

ইহার কিছুকাল পর উক্ত কন্যাজামাতা মোটরযোগে কোনও স্থানে যাইতেছিলেন, সহসা একটি ট্যাক্সির সহিত সংঘর্ষে মোটরখানি সম্পূর্ণরূপে উলটাইয়া যায় এবং গাড়ীর কাঁচগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়। উল্টান গাড়ীর মধ্যেই তাঁহারা প্রায় একঘণ্টা আবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। রাত্রি এগার ঘটিকার সময় এক ভদ্রলোক এইপথে গমনকালে তাঁহাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, কন্যাজামাতা অক্ষত দেহেই রক্ষা পাইয়াছিলেন।

এই বিষয়ে সুধাদেবী লিখিয়াছেন, "মাকে আমি বলেছিলাম, 'মা, তোমার কৃপায় তো ওরা রক্ষা পেল। তুমি কি করে জানলে?' মা কেবল হাসলেন। মায়ের কথা মনে হলে চোখে জল রাখতে পারি না। মা যে কতদিন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর স্নেহধারা ঢেলেছেন!"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনির্মলেন্দু নাথ রায় লিখিয়াছেন,—

"মার ছিল অলৌকিক শক্তি—যার প্রকাশ মার সন্তানগণ অনুভব করেছেন। কিন্তু যে ভয় ও বিস্ময় অলৌকিক শক্তির আধার থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে নিয়ে যায়, মার শক্তি সেরূপ ছিল না। মা এই শক্তিদ্বারা সন্তানকে স্নেহধারায় আপ্লুত করে তাকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। এই সম্বন্ধে নিজের দু'একটী অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে।

"একবার কর্মস্থান পরিবর্তন এবং নতুন কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মার অনুমতি চাইলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে কাজে যোগদান করতে হবে?' আমি বললাম, ১লা সেপ্টেম্বর (যতদূর মনে আছে ইং ১৯৫৯ সালে)। একটু চিন্তা করে মা বললেন, 'না, ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় ভাল না, তারপর কাজে যোগ দেবে।' আমার মনে হলো, মা সম্ভবতঃ পঞ্জিকার মতে শুভ অশুভ সময়ের কথা বললেন। কিন্তু, কয়েকদিন পরেই মার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছিলাম। দাঙ্গা, কাঁদুনে গ্যাস, গুলিবর্ষণ ইত্যাদির ফলে ঐ ক'দিন কলকাতার পথে বের হওয়া অতিশয় বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ৬ই কাজে যোগদান করেছিলাম।

"আর একবারের কথা। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এরোপ্লেনে গৌহাটী যেতে হবে। মাকে বললাম, মা বললেন, 'যাবার আগের দিন আমার সাথে দেখা করবে।' মার আদেশমত রওনা হবার আগের দিন সন্ধ্যায় মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে গেলাম। মা আশ্রমের এক কন্যাকে আদেশ করলেন, '···স্থানে যে জিনিষটী আছে, নিয়ে এসো।' তারপর মা যেন কি চিন্তা করে সেটী আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটী সব সময় তোমার কাছে রাখবে, আমার বুকপকেটে রাখতে পার।' সেইভাবে সেটীকে নিয়ে পরদিন সকালে প্লেনে উঠলাম। পরিষ্কার আকাশ, ঝড়বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। দু'ঘণ্টা পর গৌহাটীর এয়ার পোর্টে প্লেন নামল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলো। অসম্ভব কিছু নয়, এ রকম হতেই পারে। তারপর যেদিন ফিরবো সেদিন

সকালে গৌহাটীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল। অস্বস্তিতে মন ভারাক্রান্ত। কিছুক্ষণ পর প্লেনে উঠলাম। কি আশ্চর্য! ঝড়বৃষ্টি কিছুই নেই। প্লেনটীর আগরতলা হয়ে কলকাতায় আসবার কথা। আগরতলায় প্লেনটী মাটি স্পর্শ করবার সাথে সাথেই প্রবল বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। প্রায় দেড়ঘণ্টা বৃষ্টি হলো। তারপর আবার আকাশ পরিষ্কার। নির্বিঘ্নে কলকাতায় পৌঁছে গেলাম।

"মাকে যেদিন প্রণাম করতে গেলাম, সব কথা বললাম। যতক্ষণ প্লেনে উপরে উঠেছিলাম ঝড়বৃষ্টি কিছুই ছিল না, কিন্তু নীচে নামতেই বৃষ্টি। শুনে মা একটু হাসলেন। সেই জিনিষটী পকেটে ছিল—একটী ফুল। সেটীর কথা মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটীকে কি করতে হবে? মা বললেন, 'ওর কাজ হয়ে গেছে, ওপরেই ওর কাজ ছিল। এখন ওকে গঙ্গায় দিও।'

আকাশপথে যেন কোনপ্রকার বিঘ্ন না ঘটে সেই অভিপ্রায়েই মা সন্তানের কল্যাণে দেবতার নির্মাল্য দিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট-অফিসার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসুও একবার দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।—

"একবার গিরিডি হইতে ফিরিবার দিন আসিল। মা তাড়াতাড়ি প্রসাদ পাওয়াইয়া দিলেন। তখন বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে, তাহার মধ্যেও···এই সন্তানের জন্য মায়ের কত ব্যাকুলতা।

"মাকে যখন প্রণাম করিয়া উঠিলাম মা একটি শতদল পদ্ম দিয়া আমাকে বলিলেন, 'বাবা, এটি রক্ষাপুষ্প, বুকপকেটে রেখে দাও।' মায়ের আজ্ঞা পালন করিলাম। আশ্রম হইতে যখন বাহির হই, মা সাথে সাথে গেট পর্যন্ত আসিলেন, রিক্সা হইতে দেখিতে লাগিলাম—মা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। যতক্ষণ দেখা গেল মাকে একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম।

"মধুপুর হইতে যে ট্রেণে আসিব স্থির ছিল তাহার পূর্বেই আর একটি ট্রেণ পাইয়া গেলাম এবং তাহাতেই কলিকাতা পৌঁছিলাম। পরের দিন পত্রিকায় দেখি,—যে ট্রেণে আসিব স্থির করিয়াছিলাম

তাহা দুর্ঘটনায় পড়িয়াছে। অদ্যাবধি মায়ের সেই রক্ষাপুষ্প বুক-পকেটে রাখিবার আজ্ঞা পালন করিয়া চলিয়াছি।"

শ্রীনীলিমা সেনের অভিজ্ঞতা :

"একবার মা এসেছেন এলাহাবাদে, আমি বেনারসে। এবার মার ছেলে নিয়ে চলেছেন, সন্ধ্যায় মার কাছে গিয়েছি। মা আদর করে কাছে বসালেন। কত লোক আসছেন, মার কাছে বসে বসে মার সভা দেখছি। ভীড়ের চাপে একটু পেছনে সরে যেতে হলো। এত লোকের মাঝেও হঠাৎ শুনি মা আমাকে খুঁজছেন, 'সরে গেলে মা', উত্তর দিলাম, 'মাগো, এই যে আমি।' কাছে গিয়ে তাঁর হাতটি জড়িয়ে ধরলাম, মা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। সেদিন মনে হলো, আমি মা, আর তিনি শিশুকন্যা।

"পরদিন বিকেলে বেনারসে ফিরছি। এলাহাবাদ ছাড়বার পরেই ভীষণ বৃষ্টি সুরু হলো। ভাবলাম, কিছুক্ষণ পর থেমে যাবে। কিন্তু, সারা রাস্তায় এক মিনিটের জন্যও বিরাম হলো না,—কখনও জোরে, কখনও ধীরে বৃষ্টি পড়তেই লাগল। কোথাও একটা লোকও নেই। জনশূন্য প্রান্তর—শুধু আমরা চলেছি। সন্ধ্যা হয়ে এলো, ডাকাতের জায়গাও ছাড়িয়ে এলাম। কেবলই মাকে ডাকছি আর মন বলছে, 'ভয় নেই।' যেন দেখতে পেলাম মা তাকিয়ে আছেন। নিরাপদে বাড়ী ফিরে এলাম। সারা রাস্তায় কিছু হলো না, কিন্তু দরজার সামনে এসে গাড়ীর চাকাটা গেল। মা বরাভয়ারূপে সন্তানকে রক্ষা করেছেন!

"...আর একবার মার ছেলের অফিসের দরকারী কাগজপত্র ট্রেণ থেকে চুরি হয়ে গেল। কি হবে! কি হবে! কত অপমান সহ্য করতে হবে! মাকে ডাকছি কাতর হয়ে। আশ্চর্য, কি রকম ভাবে কি ঘটে গেল, তাঁর ছেলের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। যখনই তাঁকে ডাকি, তাঁর সাড়া পাই।"

ষ্টেটসম্যান পত্রিকা অফিসের শিল্পী শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় :

"হঠাৎ একদিন অফিসে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তার সাথে

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগলো। সহকারী ম্যানেজারের ব্যবস্থায় আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন,—এপেণ্ডিসাইটিস, অপারেশন করতে হবে, বণ্ডে সই করুন। আমি জানালাম,—আমার গুরুমাকে না জানিয়ে আমি সই করবো না। দিন দুই পরে মায়ের সাথে দেখা করে সব বললাম। মা শুনে বললেন, 'যদি এপেণ্ডিসাইটিস হয়ে থাকে, তবেই তো অপারেশন করবে, নইলে করবে না তো?' মা আমায় একটি ফুল দিয়ে বললেন, 'যদি অপারেশন করতে চায় তবে আর বাধা দিও না।'

"কয়েকদিন হাসপাতালে যাতায়াত করবার পর একদিন বড় ডাক্তার একস্-রে দেখে বললেন,—'এপেণ্ডিসাইটিস্ দেখছি না তো, বোধ হয় এটা ভুল হয়েছে। অপারেশনের প্রয়োজন নেই।' পরে মাকে সব জানাতে মা একটু হাসলেন।

"আর একদিনের কথা। আশ্রমে ঢুকতেই মা বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা, তোমার কাজ আমাকে করতে হচ্ছে কেন?' বললাম, 'কি কাজ, মা?' মা বললেন, 'জপ'। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, 'সময় নেই একদম, মা। কি করি, বলুন।' 'ওরি মধ্যে সময় করে নিতে হবে, বাবা',—মা বললেন, 'নইলে দামোদরজী রাগ করবেন যে!' আমি আবদারের সুরে বললাম, 'তা মা, আপনি আপনার দামোদরকে বলে আমার ডিউটিটা সকালের দিকে করে দিন না।'

"আমার খবরের কাগজের অফিসের চাকুরী, অথচ এরপর নাইট ডিউটি একেবারে উঠে গেল। এ নিয়ে অফিসে অনেকেই গোলমাল করেছেন। আজ শুধু নাইট ডিউটিই নয়, ইভিনিং পর্যন্ত আমার উঠে গেছে।"

কলিকাতার প্রবীণ অ্যাডভোকেট শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের কন্যা শ্রীনিবেদিতা রায়ের বিবৃতি।—

"আমার জীবনের সাথে জড়িত যত ঘটনা তা সব লেখা তো সম্ভব নয়, কারণ জীবনটাই তো তাঁর হাতে এবং এমন অনেক ঘটনা আছে যা মাতাকন্যার একান্ত গোপনীয়। সন্তানকে ধর্মপথেও তিনি

যেমন রক্ষা করতেন, তাঁদের দেহের অসুস্থতা হতেও তেমনই তাকে রক্ষা করেছেন।…

"একদিন আশ্রমে গেছি, দেখি—মার স্নেহভরা চোখ দুটি করুণায় ভরা, মা বেশ ব্যাকুল। চিন্তিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাগো, আমার বাবার হজমের গোলমাল নেই তো? কেমন আছেন?' হাসি এল—মা সর্বদাই শঙ্কিত। বললাম, 'খুব ভাল হজম করছেন, মা।' তবুও মা চিন্তিত, আবার সতর্ক করে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাংঘাতিক এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে পড়লেন স্বামী। প্রথমে ডাক্তার না বুঝে এমন চিকিৎসাবিভ্রাট করেছিলেন যে, তাঁর প্রাণ ফিরে পাবার কথা নয়। পরে যখন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জি দেখলেন, দেখে বললেন যে, এমন অবস্থায় ঐ চিকিৎসায় ওটা ফেটে তখনি মৃত্যু হতে পারত। দুই ডাক্তারের পরীক্ষায় রোগ নিঃসন্দেহে স্থির হল, এবং একটু সুস্থ হলেই অস্ত্রোপচার করা হবে—এখন শুধু স্থিরভাবে বিশ্রাম ও জলীয় পদার্থ পান। খবর নিয়ে মায়ের শরণ নিতে গেলাম। মা গম্ভীরভাবে বললেন, 'মা, কাটাছেঁড়াটা আমার ভাল লাগে না।'

"কয়েকবার ছবি নেওয়া হল। ওষুধ খাইয়ে, আরও কতভাবে, যাতে কোনও খুঁত না থাকে। প্রতিবারই নির্দোষ। এমন কি, একটা যে ফোড়া হয়েছিল, তারও চিহ্ন পাওয়া গেল না। চিকিৎসক অবাক। শেষ পর্যন্ত মার কথাই রক্ষা হল, কাটাছেঁড়ার প্রয়োজনই আর হল না।

"কিন্তু আমার পুত্রের যখন এই রোগ হল তখন মাকে জানালাম যে, 'ওর অস্ত্রোপচার করতে হবে।' মা সেই চিন্তিত স্বরে বললেন, 'মা দেখ, ডাক্তার যা বলেন করে নাও।' ছেলে সুস্থ হলে মাকে বললাম, 'মা, নিজের ছেলের সময় বললে, 'কাটাছেঁড়া ভাল লাগে না', আমার ছেলের বেলায় আর তা বললে না।' করুণামাখা হাসি হেসে চিন্ময়ী মা বললেন, 'মা, আমার ছেলে যে বড় কম-জোর, তাই পিতার ব্যাধি পুত্রে গিয়ে বিপদ কাটল।'

"দেহে মানবী, কার্যে চিন্ময়ী। তবু নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য মা বলতেন, 'মা, আমি তোমাদের সন্ন্যাসিনী মা। এ দিকের তো কিছু দিতে জানি না মা, শুধু তাঁর চরণ চেনাতে পারি।"

শ্রীসুবোধবালা রায়ের কাহিনী :

"শ্রীশ্রীমাতা দুর্গাপুরী দেবীর সন্তান আমার স্বামী (ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়) কর্মোপলক্ষে রেঙ্গুনে ছিলেন। এজন্য আমায় তাঁর কাছে যেতে হোত মাঝে মাঝে। কলকাতায় ছেলেরা তখন পড়াশুনা করছে, তাদের যাওয়া সম্ভব হোত না। একবার আমাকে রেঙ্গুনে যেতে হবে, শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী মাতাকে গিয়ে বললাম রেঙ্গুনে যাওয়ার কথা। সব শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'মা, তুমি প্লেনে যাচ্ছ তো, তাই তোমার জন্য আমি ঠাকুরকে জানাব আগামী কাল। পরশু সকালে ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দিও, নির্মাল্য আর প্রসাদ দেব আমার ছেলের জন্য। আর বৌমা, তুমি পৌঁছেই আমায় চিঠি দিও মা, দুজনে একসঙ্গে সই করো।'

"যথাসময়ে মায়ের কাছ থেকে নির্মাল্য প্রসাদ ইত্যাদি নিয়ে রওনা হলাম। ছেলেরা তাদের পিতাকে টেলিগ্রামে আমার যাওয়ার সংবাদ পূর্বেই জানিয়েছে। আমি তো রেঙ্গুন এরোড্রামে নেমে স্বামীকে দেখতে পেলাম না। এই এরোড্রামটি সম্পূর্ণ নতুন তৈরী। ভাবলাম, বোধহয় এই নতুন নিয়ম, পাশপোর্ট ছাড়া ঢুকতে দেবে না কাউকে। কাষ্টমস্ চেকিং হওয়ার সময় একটি বাঙ্গালী ছেলে আমার পিছু পিছু ঘুরছিল দেখলাম। আমি ইংরাজী জানি না, বর্মিজ ভাষাও জানি না, কাজেই চেকিং এর সময় আমার অসুবিধা হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই ছেলেটি পাশে দাঁড়াতে কোন অসুবিধা হল না। এরপর এরোড্রাম থেকে সিটী অফিস পর্যন্ত ১৪ মাইল পথ বাসে সেই ছেলেটি ও অন্যান্য যাত্রীসহ এলাম। ভাবলাম, সিটী অফিসে হয়তো স্বামী এসেছেন। সেখানে এসেও দেখি, তিনি আসেন নি। রাত তখন ৯টা বেজে গেছে। আমার খুব ভয় হচ্ছে। ঐ ছেলেটি বলল, 'মাসীমা, আপনি বাড়ী চেনেন তো? আমি ঐ দিকেই যাব।'

অগত্যা তার সঙ্গেই গেলাম। স্বামীর কোয়ার্টার চার মাইল দূর সিটী অফিস থেকে। এদিকে তিনি ছেলেদের কাছ থেকে আমার আসার সংবাদ পাননি—চিঠি বা টেলিগ্রাম। ঐ ছেলেটিই আমাকে যথা-স্থানে পৌঁছে দিল, রাত্রি তখন দশটা।

"সেই রাত্রে তখনই বসে শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী মাতাকে পত্র লিখলাম, 'মাগো, আপনার করুণায় আমি নিরাপদে স্বামীর কাছে এসে পৌঁচেছি। এমতাবস্থায় আমার মত মেয়েদের চোর গুণ্ডার হাতে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আপনি ঐ ছেলেটিকে পাঠিয়ে আমাকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দিলেন। আমার স্বামীও সই করলেন পত্রে।' এ শুধু মায়ের ঐশ্বরিক শক্তিবল ও তপস্যার দিব্যদৃষ্টি! সেদিন মর্মে মর্মে একথা অনুভব করেছিলাম।

"একবার মায়ের সন্তানকে অফিসের কাজ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন গভর্ণমেন্ট। অভিযোগ এই যে, তাঁর সই করা ২৪৫০ টাকার চেক খোয়া গেছে। আমরা তো এই আকস্মিক বিপদে বিপন্ন হয়ে মায়ের শরণ নিলাম। জননী অনেকক্ষণ মনোযোগ সহ-কারে সমস্ত কথা শুনে তাঁর ছেলেকে বললেন, 'বাবা, তোমার মুখে দোষের ছাপ পড়ে নি, ও সই তোমার নয়।' মার সন্তান বললেন, 'মা, আমি তো বলেছি যে, সই আমার বলেই বোধ হচ্ছে।'

"ট্রাইবুনালে বিচার আরম্ভ হোল। মা তাঁর সন্তানকে অভয় দিয়ে বললেন, 'বাবা, বলবে যে, ও সই তোমার নয়।' শুনানীর সময়ে মার কথা স্মরণ করে তিনি নির্ভয়ে ও সই তাঁর নয়, এই কথাই বললেন। শেষে রায় বার হলে জজের উক্তি এই যে, 'এ সই যদি তাঁরই সই হোত এবং তিনি ঐ টাকা নিতেন, তবে প্রথমেই অস্বীকার করতেন যে এ সই তাঁর নয়।' এইভাবে তিনি সসম্মানে বেরিয়ে আসেন এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে থেকে। বাকী টাকাও ফেরৎ পেলেন। সবই মায়ের প্রাণভরা আশীর্বাদে।"

শ্রীনৃত্যগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নদর্শন—

"১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে চাকুরী-স্থান

দিল্লীতে থাকাকালে মায়ের এ সন্তান কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সর্বশরীর ফুলে ওঠে, রক্তবর্ণ হয়। প্রথমে হাম সন্দেহে পাঁচছয় দিন চিকিৎসা চলে, কোন সুফল না পাওয়ায় আর একজন চিকিৎসককে ডাকা হয়। তিনি লিভারের দোষ সাব্যস্ত করেন—ওষুধ দেন। এ ভাবে চৌদ্দপনর দিন কেটে যায়, কিন্তু একইভাবে রোগ চলে, কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না।

"একদিন দুপুরে গৌরীমাতার শিষ্য শ্রীতারাপদ চৌধুরী যে ডাক্তার নিয়ে এলেন তিনি প্রকৃত রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেওয়ায় তিনদিনে রোগের উপশম হয়। ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় দিনের পর দিন স্বপ্নে এক অতি অপরূপ দৃশ্য দর্শন হয়।—মা বসিয়া আছেন, মায়ের কোলে সন্তানের মাথাটি। মা অতি সন্তর্পণে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, সম্মুখে দণ্ডায়মানা সন্তানের ইষ্টমূর্তি। কয়েকদিন একইভাবে ঐরূপ দর্শন হয়। একদিন দেখা গেল এবং স্পষ্ট শোনা গেল, ইষ্টমূর্তি মাকে বলছেন,—'এবার ছেড়ে দাও না, ও তো ভাল হয়ে গিয়েছে।' মা তখনও সন্তানের পিঠে সেই একইভাবে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন,—'না, এখনও কেমন হয়ে রয়েচে।' পরের দিন আবার দেখা যায়—মা পিঠে হাত দিয়ে রয়েছেন, কিন্তু ইষ্টমূর্তি অন্তর্হিত হয়েছেন। রোগমুক্তির পর অন্নপথ্য গ্রহণ করে সেরূপ স্বপ্নদর্শন আর কোন দিন হয় নি।

"সন্তানের অসুস্থতা এবং আরোগ্যলাভের সংবাদ মাকে জানানো হয় নি, কিন্তু কলকাতার আশ্রম থেকে মার পত্র এলো, 'নিত্য-নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—বাবা নৃত্যগোপাল, তুমি তো ভাল হয়ে গেছ বাবা, ওঠো, তোমাকে যে আশ্রমের অনেক সেবা করতে হবে।"

মায়ের জনৈক সন্তানকে একবার এক জ্যোতিষী বলেন যে, স্বল্পকালমধ্যেই মোটরগাড়ীর এক দুর্ঘটনায় তাঁহার প্রাণহানি-যোগ রহিয়াছে। জ্যোতিষীর বাক্যে সন্তানটির বিশেষভাবে বিশ্বাস ছিল, সুতরাং তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ মানসিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার একজন হিতৈষী একদিন মাকে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণীর

কথা বলেন। মা সব শুনিয়া বলিলেন, 'কেন যায় ওসব জ্যোতিষীর কাছে! বলে দিও, কিছু হবে না'। মায়ের এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং জ্যোতিষীর গণনায় নির্ধারিত সময় নির্বিঘ্নেই অতিক্রান্ত হইয়া গেল। ইহার পর হইতে মায়ের আশীর্বাদের বর্মেই তিনি আপনাকে সর্বদা সুরক্ষিত মনে করেন।

প্রবাসী এক বাঙ্গালী ডাক্তার, অমায়িক এবং সাহিত্যসেবী। চিকিৎসায় যশস্বী হইয়াছেন, সদাশয়তায় ধনী নির্ধন সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে তাঁহার অনিচ্ছা, আপন খুশীতে একাকী থাকেন। অবসরসময়ে রবীন্দ্রসাহিত্য, অরবিন্দদর্শন প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন থাকেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ কবিতাদি রচনা করিয়াও চিত্ত-বিনোদন করেন। দুর্গামার নিকট ধর্মালোচনা শুনিতে যাইতেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তিও করিতেন। অবশেষে মায়ের নিকট তিনি দীক্ষালাভও করিলেন।

ডাক্তার যখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, অনিদ্রা এবং মানসিক অস্বস্তির ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি ঘটে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যথাবিধি তাঁহার চিকিৎসা করিলেন, বন্ধুগণ সমুদ্রস্নানের জন্য পুরী-ধামেও লইয়া গেলেন। কিন্তু কোনপ্রকারেই সুফল লাভ হইল না। শেষপর্যন্ত মনোব্যাধির চিকিৎসকগণ বিধান দেন বিবাহের। এই উদ্দেশ্যসাধনে বন্ধুগণও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ডাক্তার উত্তরে বলেন,—এখন আর সময় নেই। তবু, দুর্গামা যদি আদেশ দেন, তবেই বিয়ে করবো, নচেৎ নয়।

মা একবার সেইস্থানে গিয়াছেন, কতিপয় হিতৈষী আসিয়া ডাক্তার-বন্ধুর স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা জানাইয়া বলিলেন,—মা, আপনার অনুমতি হলে ও বিয়ে করতে রাজী আছে। সমগ্র বিবরণ শুনিয়া মা গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন, স্বীয় মতামত কিছুই ব্যক্ত করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বন্ধুবর্গ অধৈর্য হইয়া বলেন,—ও তো সাধুসন্ন্যাসী

হচ্ছে না, ওর বিয়েতে আপনার আপত্তি কেন? অথচ এজন্য একটা মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাঁহারা মায়ের অসম্মতির স্পষ্ট কারণ জানিতে চাহেন, এবং পুনঃপুনঃ মায়ের সম্মতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে থাকেন। মা নিরুপায় হইয়া বলেন,—তোমরা ওর হিতার্থী, আমিও ওর মা, ওর শুভার্থী। কিন্তু অপ্রিয় কথা বলতে আমার কষ্ট হয়। আমার ছেলের উপকারের জন্য আর একটি অল্পবয়স্কা মায়ীর জীবনটা নষ্ট হবে, মা হয়ে তা আমি চাইছি না।

মায়ের এইরূপ বাক্যে বিস্মিত হইলেন বন্ধুবর্গ। তথাপি তন্মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—এমন কথা আপনি বলছেন কেন?

—ওর কত টাকা জমা আছে?

—হাজার চার-পাঁচ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, তা ছাড়া ওর মাসিক উপার্জনও প্রচুর। সংসারজীবনে ওদের কষ্ট হবে না।

—তা বটে। কিন্তু, এখন যা আছে এই পরিমাণ টাকা কি সেই মায়ীর সারাজীবনের পক্ষে যথেষ্ট?

—এ সব কি বলছেন, মা? তবে কি ওর আয়ু কম?

—আয়ু মোটেই নেই। ভোগ করবে কে?

মায়ের এইপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণীতে বন্ধুগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি না; আপাততঃ সকলে হতাশ হইয়াই বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু, ডাক্তার স্বয়ং বিবাহে আর সম্মত হইলেন না এবং ইহার জন্য মায়ের প্রতি অসন্তুষ্টও হন নাই। অধিকন্তু, একজন সুহৃৎকে পরে নিশ্চিন্তমনে বলিয়াছিলেন,—মা বলেছেন, আমার আর দু-তিন মাস কষ্ট আছে, তারপরই আমি চলে যাব।

বেদনাবহ হইলেও, মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনমাসের মধ্যেই সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

শ্রীলাবণ্যপ্রভা রায়ের অন্যপ্রকার অভিজ্ঞতা:

"একবার অর্ধকুম্ভ মেলা উপলক্ষে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রয়াগে

যাবেন। বহুলোক স্নান করবে, নেহেরুজীকেও দেখবে। আমি খবরের কাগজে খবরটা দেখে মার কাছে ছুটে গেলাম কুম্ভে যাবার অনুমতি নিতে। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা যেন আঁৎকে উঠে বললেন,—'না মা, তুমি যেও না।' সেই রাত্রে মার কাছ থেকে বাসায় এসে ভাবলাম, মা তো কোনখানে যেতে এমন বাধা দেন না। কয়দিন আগে মেজছেলেকে বলে রেখেছি,—'আমাকে একটা পাস এনে দিস্, স্নানে যাব।' তখনও অবশ্য পাস পাই নি।

"তার পরের দিন আমি মার কাছে সন্ধ্যের পর গিয়েছি। মা আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,—'মাগো, আমার জন্য তোমার যাওয়া হলো না।' আমি বললাম,—'মা, আপনি যা করবেন সবই আমাদের কল্যাণের জন্য।' মা কিন্তু আমাকে কিছুক্ষণ পরেই বললেন,—'আচ্ছা, মা, তুমি কালকেই রওনা হয়ে যাও।' ভাবলাম, গতকাল মা মানা করলেন, আজকেই আবার বলছেন, 'প্রয়াগে রওনা হয়ে যাও।' অথচ এদিকে ছেলে পাসও দেয় নি, হাতেও তো টাকা নেই, যাব কি করে ?

"আমি মার কাছ থেকে রাত ১০টায় অনেক ভাবনা নিয়ে বাসায় ফিরে যাই। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে সন্ধ্যা বলে উঠলো, 'মা, মেজদা তোমার পাস পেয়েছে, মাসীমারটাও পেয়েছে।'

"সন্ধ্যা ৮॥০টায় গাড়ী। সকালে তোড়জোড় করছি। সন্ধ্যা বললো, 'মা, তুমি তো সব ব্যবস্থা করছ, তোমার কলেরাবসন্তের সার্টিফিকেট না হলে কিন্তু গাড়ীতে উঠতে দেবে না।' শুনেই চলে গেলাম হাসপাতালে। আমার টিকে হয়ে গেল, সার্টিফিকেটও পেলাম। তারপর স্নান করে মার কাছে ছুটে গেলাম। আমার যাওয়া হবে শুনে সেদিন মার কি আনন্দ! কি হাস্যময়ী মা তখন!

"রওনা হবার পরের দিন গাড়ী মাঝপথে আটকে রইলো, ভীষণ ভীড়, পরে গাড়ী ছাড়বে। শুনলাম, প্রয়াগে তো সব সারা হয়ে গেছে। দুর্ঘটনায় কত শত লোক যে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই।···

"মার কৃপায় শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদে আমার বোনের বাসায় উঠলাম। আমার দাদা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত আমাকে বললেন, 'আমি

আর তোর বৌদি মাত্র স্নান করে উঠেছি, তার পরই দেখছি, সবগুলো লোক যেন মাটিতে, জলে শুয়ে পড়ছে। ভীড়ের চাপে কতলোক যে মরেছে তার হিসেব নেই। কি ভীষণ কাণ্ড! দেখে যেন প্রাণ শিউরে ওঠে।'

"আমি মার কৃপায় ১২।১টার সময় নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে গিয়ে স্নান করে এলাম। তখন বুঝলাম, প্রথম দিন বাধা দিয়ে মা আমায় বিপদের হাত থেকেই বাঁচালেন, আর দ্বিতীয় দিন অনুমতি দিয়ে ত্রিবেণীস্নানে কৃতার্থ করালেন।"

মা একবার গিরিডি শাখা-আশ্রমে যাইতেছেন। মাকে প্রাতের গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহার কয়েকজন সন্তান হাওড়া ষ্টেশনে যথারীতি সমবেত হইয়াছেন। সন্তানগণের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া মা বলিলেন, "বাবা, শরীর তোর বড় খারাপ দেখছি। বিশ্রাম দরকার। সোজা বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়্, ক'দিন আশ্রমে আর যাস্ নি।" সন্তানটি আশ্রমসেবক, অনুপস্থিত থাকিলে সেবাকার্যে কিছু অসুবিধা উপস্থিত হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মা তাহাকে আশ্রমে আসিতে নিষেধ করিলেন। এই ব্যবস্থার মর্মার্থ সেই সময় উপস্থিত কেহই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, এমন-কি সন্তানটিও নহে। কারণ, তিনি তখন আপনাকে সুস্থ বলিয়াই জানেন। সকলের প্রণাম গ্রহণ, আশীর্বাদ ও প্রসাদ বিতরণ অন্তে মায়ের গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মাতৃ-আদেশে সন্তানটি মধ্যপথে আর আশ্রমে না আসিয়া স্বগৃহেই গমন করেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ; কিন্তু সেই দিবসই দ্বিপ্রহরে স্নানের সময় তাঁহার শরীরে উত্তাপ অনুভূত হয়, অপরাহ্ণে ১০৪ ডিগ্রী জ্বর। দুই-এক দিবসের মধ্যেই সেই প্রবল জ্বরের সহিত আরম্ভ হইল রক্তবমন।

চিকিৎসক আসিয়া যথারীতি পরীক্ষা করিলেন, ব্যবস্থাও দিলেন, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। সন্তানটির গর্ভধারিণী পুত্রের শারীরিক অবস্থা এবং তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়া গিরিডিতে মায়ের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইলেন।

টেলিগ্রাম পৌঁছিবার পূর্বেই সেই দিবস উক্ত সন্তানটির জীবন-রক্ষার্থে মা আশ্রমকন্যাদের দ্বারা পূর্বাহ্ণে চণ্ডীপাঠ করাইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, 'খুব কঠিন অসুখে পড়েছে, তোমরা মা সারদাকে জানাও, সন্তানের জীবন রক্ষে হোক।' মাতৃ-আশীর্বাদে সন্তানটির জীবন রক্ষা পায়।

শ্রীঅখিলেন্দ্রনারায়ণ সিংহের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা :

"আমার তখনও দীক্ষা হয় নি। মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সবে ফিরেছি। বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে আছি। কী যেন হোল! মনে প্রচণ্ড ভয়! একটা ছায়া ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে দিবারাত্র। জীবন দুর্বিষহ।...আমার স্ত্রীর মুখে এইকথা জেনে মা আমাকে দেখতে চাইলেন। দেখে আমার স্ত্রীকে বললেন, 'এক পরলোকগত আত্মার ওর প্রতি তীব্র আকর্ষণ। সে তো ভাল নয়, মা।' আমার জন্ম রক্ষাফুল দিলেন এবং বললেন, আমাকে দীক্ষা নিতে হবে। তবে, কিছু দেরী হবে। কেন না, বিঘ্ন রয়েছে, কাটাতে হবে। কর্মবহুল কলকাতার আশ্রমে সে সুযোগ সম্ভব নয়। তিনি যখন বাইরে যাবেন তখন সেখানে হবে। রক্ষাফুল পাবার পর থেকেই সেই ভয় ও প্রত্যক্ষ অশুভ অনুভূতি কেটে গেল।

"কয়েকদিন পর মা নবদ্বীপ গেলেন এবং সেখান থেকে ডেকে পাঠালেন। এক কালীপূজার পরের দিন শুভ মুহূর্তে মার কৃপা লাভ করলাম।..

"যায় কিছুদিন। মাথায় এক তীব্র যন্ত্রণা হোত। কোনও কারণ নেই, যখনতখন মাথার শিরা দড়ির মত ফুলে উঠত, চোখ লাল হয়ে যেত। অসহ্য যন্ত্রণা। কোনও রকমে উপশম হয় না। সহ্য করতে পারি না। তখন গিয়ে মাকে বললাম। মা একটা দিন নির্দিষ্ট করে বললেন, সেইদিন একটি নতুন সরা করে কিছুটা মিছরি, ফুল, বিল্বপত্র ইত্যাদি নিয়ে মাথায় করে গঙ্গার জলে নেমে ভাসিয়ে দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে আসতে। তাই করলাম। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ বৎসরাধিক কাল একদিনের তরেও সেই যন্ত্রণা হয় নি।

"নবদ্বীপে এক কালীপূজার রাত্রে মা আমাকে পাঠালেন রাণীর চড়ায় গৌরীমাতার সমাধিপীঠে জপ করতে। বললেন, 'একাসনে মহানিশায় জপ করবে, বাবা।'

"সমাধিপীঠ নদীর ধারে, মন্দির-সংলগ্ন খোলা মাঠের মধ্যে। তার পাশে গঙ্গার দিকে মুখ করে জপে বসলাম, রাত তখন প্রায় ১১॥টা। ডানদিকে একটু পিছনে একটি বড় কদম গাছ। তার ডালপালা প্রায় মাথার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। জনশূন্য মাঠ। অমানিশার গভীর রাত প্রায় ২॥/৩টায় প্রত্যক্ষ করলাম, গাছের ডাল থেকে ভল্লুকের মত দেখতে একটা কদাকার লোমশ জীব আমার ওপর দিয়ে মাঠের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আমার দিকে তীব্রভাবে তাকাল। চমকে উঠলাম, ভয় হলো; কিন্তু সেই মুহূর্তেই মার কথা—'একাসনে জপ করবে, বাবা'—মনে এল। সাহসও এল। আসন ছেড়ে ভয়ে পিছিয়ে যাবার ইচ্ছা মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেল। জন্তুটাও কোথায় মিলিয়ে গেল। পাঁচটা পর্যন্ত জপ করে আশ্রমে ফিরলাম।

"মার দেখা পেলাম। তাঁর চোখে উদ্বেগের ছায়া। জিজ্ঞাসা করলেন,—'জপ কেমন হলো বাবা? কোনও বিঘ্ন?' বুঝলাম মা অলক্ষ্যে সবই জানেন। বললাম সব কথা। মা চুপ করে শুনলেন। পরে আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'প্রাণের আশঙ্কা ছিল আসন ছেড়ে উঠলে।' বুঝতে পারলাম, কার শক্তিতে এই ভয়ঙ্কর বিপদ পার হয়ে এলাম।"

এইরূপে শুভার্থিনী মাতা তাঁহার স্বীয় দৈবানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় শরণাগত সন্তানদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। করুণাময়ী মূর্তিখানিই ছিল সকলের আশ্রয়স্থল। বিপন্ন পুত্রকন্যাগণ তাঁহার চরণসমীপে আসিয়া আপনাদিগের অসহায় অবস্থা কেবল নিবেদন করিয়াই শান্ত হইতেন, কারণ প্রত্যেকেরই এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে,—মা স্বয়ং বিপত্তারিণী, কোনমতে একবার তাঁহার কর্ণগোচর করাইতে পারিলেই জীবনের ঘনায়মান দুর্যোগের অবসান হইবে। দেখা গিয়াছে, কার্যতঃ তাহাই বার বার সত্যে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রে শেষদর্শন

আশ্রমের কর্মসম্প্রসারণহেতু মায়ের পক্ষে ইদানীং প্রতিবৎসর শ্রীক্ষেত্রে গমন সম্ভবপর হইত না। কিন্তু ক্ষেত্রধামে শ্রীজগন্নাথদেবের যে-সকল প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত প্রভুদেবকে লইয়া তিনি তাহা পালন করিতেন। ইহাদের মধ্যে স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রাই প্রধান। এই দুইটি শুভ অনুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সাহত আশ্রমে পালিত হইত এবং অদ্যাপি হয়। স্নান-পূর্ণিমাদিবসে মা সন্তানদিগকে দিয়া মন্ত্রপাঠসহ গঙ্গোদকে ত্রিমূর্তিকে স্নান করাইতেন। রথযাত্রাদিবসে পত্রপুষ্পমাল্যাদি সজ্জিত রথে জগন্নাথদেব, বলভদ্রদেব ও মাতা সুভদ্রাদেবীকে স্থাপিত করিয়া মা রথ টানিতেন। সন্তানগণও ইহাতে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। 'জগন্নাথজী কী জয়' ধ্বনিতে আশ্রমবাটী মুখরিত হইয়া উঠিত।

১৩৬০ সালে স্নানপূর্ণিমা এবং রথযাত্রাতে মা জগন্নাথদর্শনের সংকল্প করেন। তদনুযায়ী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষার্ধে তিনি পুরীধামে গিয়া পুঁটিয়ার মহারাণীর 'বৈকুণ্ঠধামে' অবস্থান করেন।

ইদানীং মা যখনই শ্রীক্ষেত্রে যাইতেন হাওড়া ষ্টেশন হইতে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলেই নীলাদ্রিনাথের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম জানাইয়া কন্যাদিগকে জগন্নাথ-স্তোত্র আবৃত্তি করিতে বলিতেন। কন্যাগণ স্তোত্র ও ভজন সুরু করিলে মা-ও তাহাতে যোগদান করিতেন। গাড়ীর কামরাটিকে তখন মনে হইত যেন ভগবদ্‌ভাবে পূর্ণ একটি ভজনালয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে গাড়ীতেই মা দামোদরলালের মঙ্গলারতি সম্পন্ন করিতেন। ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে আসিতেই তিনি কন্যাদিগকে বলিতেন, "আমায় ভাল করে সাজিয়ে দে।" উত্তম বস্ত্র, চন্দনকুম্‌কুমের টিপ ও কেশবিন্যাসে তখন তাঁহাকে সজ্জিত করা হইত। ইহার পর এক-একটি ষ্টেশন পার হয় আর মায়ের মুখমণ্ডল যেন আনন্দোজ্জ্বল হইতে থাকে। ক্ষেত্রধামে পৌঁছিবামাত্র

মাকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার বয়স যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে অবতরণের পর কন্যাকুল ও সঙ্গীয় মালপত্রের দায়িত্ব কোন বয়োজ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনীর উপর অর্পণ করিয়া ব্যাকুল অন্তরে মা 'ধুলো-পায়ে' যাইতেন প্রভুজীর সন্দর্শনে।

এই যাত্রাতেও মা 'ধুলো-পায়ে' প্রভুজীর দর্শনে গেলেন। মণি-কোঠায় উপনীত হইয়া আত্মনিবেদনের প্রণাম রাখেন দেবতার শ্রীপাদপদ্মে। দীর্ঘকাল পরে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ, দর্শনানন্দে অতিবাহিত হয় অনেক সময়। মায়ের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় অমৃতময়ের অমৃত আভা। ত্রিমূর্তির বন্দনাশেষে মাতা বিমলা ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রণাম জানাইয়া মা বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

প্রত্যহ রাত্রির শেষপ্রহরে মা স্নানাদি কৃত্য সম্পন্ন করিতেন এবং তৎপর দামোদরলালজীর মঙ্গলারতি ও ভোগ নিবেদন করিয়া মন্দিরে যাইতেন। পুনরায় যথাকালে বাসস্থানে ফিরিয়া মধ্যাহ্ন পূজা ও ভোগ সমাপন করিতেন।

একদিন মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইলে দেখা যায়—মায়ের দক্ষিণহস্তে শাঁখা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, ভিড়ের চাপে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আবার যদি ভাঙ্গিয়া যায় এইকারণে মা আর নূতন শাঁখা ধারণ করেন নাই। জনৈকা সন্ন্যাসিনী কন্যা তখন রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করেন, "খালি হাতে জগন্নাথদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আপনার লজ্জা করবে না, মা? তিনি ভাববেন কি আপনাকে?" এইকথা শুনিয়া মা যেন কিশোরী বধূর ন্যায় লজ্জিত হইলেন। সেবিকা কন্যাদিগকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে শাঁখা পরিয়ে দে।" শাঁখা-হস্তে পুনরায় মন্দিরে গিয়া জগন্নাথ প্রভুকে প্রণাম করিয়া আসিলেন।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যার পরেই মা বাটীতে ফিরিয়াছেন। কিন্তু মন বড়ই অপ্রসন্ন। কোথায় যেন কিছু গরমিল হইয়াছে; নিত্যদিবসের আনন্দসুরের তন্ত্রী আজ বুঝি ছিন্ন! "রাত্রে কিছু খাব না" বলিয়া মা নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

মায়ের এইরূপ ভাবান্তরের কারণনির্ণয়ে কন্যারা পরস্পর আলোচনা করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে মাকে কিছু বলিবার সাহস কাহারও নাই। অবশেষে জনৈকা বর্ষীয়সী কন্যা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেন, "মাগো, আজ কি পিতাজীর সঙ্গে ভাল করে আপনার কথাবার্তা হয় নি?" বোধ হয় সেই চিন্তাতেই মা তখন মগ্ন ছিলেন, কন্যার প্রশ্নের উত্তরে অন্তরের গোপন কথাই স্বীকার করিলেন, "ঠিক বলেছিস, আজ প্রভুর সঙ্গে তেমন করে আমার কথা হয় নি। দেরী হয়ে যাচ্ছে মনে করে ফিরে এসেছি।" কন্যাটি সান্ত্বনা দিলেন, "না মা, তেমন বেশী রাত হয় নি। চলুন, বাকী কথা বলে আসবেন তাঁর কাছে।" বাধ্য কন্যাটির মত উক্ত সেবিকাসহ রিক্সাযোগে মা তৎক্ষণাৎ মন্দিরে গেলেন। যখন গৃহে ফিরিলেন তখন আবার প্রতিদিনের মতই মায়ের সেই সদাপ্রসন্নভাব। তাঁহার সহাস্যবদনমণ্ডল হইতে যেন প্রভুদর্শনজনিত আনন্দজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

এইরূপে শ্রীক্ষেত্রে কয়েকদিবস অতিবাহিত হয়। অতঃপর আসে বহুপ্রতীক্ষিত স্নানপূর্ণিমাতিথি। মা সেদিন অতিপ্রত্যূষেই মন্দিরে গিয়া দর্শন ও স্পর্শনের অপেক্ষায় রহিলেন। দৈতাপতিগণ যখন ত্রিমূর্তিকে মন্দির হইতে বাহিরে আনিতেছিলেন, স্নানবেদীতে যাইবার পথে মা পুনঃপুনঃ জগন্নাথজীকে আলিঙ্গন করেন। মায়ের স্থূল দেহ, তথাপি ভিড় ও ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া প্রভু-অঙ্গ স্পর্শ করিবার তাঁহার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দৈতাপতিগণের প্রধান শ্রীগঙ্গাধর পাণ্ডাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এই ভক্তিমতী মাতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রভুর সান্নিধ্যে বারংবার লইয়া গেলেন। সেইক্ষণ হইতেই উভয়ের মধ্যে মাতাপুত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। মা বলেন, "প্রভুর কাছে আমায় নিয়ে গেছ, প্রভুর অঙ্গস্পর্শ করিয়েছ, বাবা, তুমি বেঁচে থাক।" গঙ্গাধর বলিলেন, "আমার জন্মজন্মান্তরের মা আছ তুমি। আর আমি তোমার গোপাল আছি।"

দ্বিপ্রহরে মহাস্নানের পর জগন্নাথদেবের গণেশ-বেশ হইবে। মা ইত্যবসরে একবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দামোদরলালের মধ্যাহ্ন

স্নান ও ভোগ সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর জনতার ব্যূহ ভেদ করিয়া মা যখন পুনরায় প্রভুসকাশে উপস্থিত হইলেন, তখন স্নান আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গাধর দৈতাপতি কন্যাকুলসহ মাকে স্নানবেদীর একপার্শ্বে নিরাপদস্থানে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত একভাবে বসিয়া থাকিয়া সজ্জা ও আরাত্রিকাদি সকল কৃত্য দর্শনান্তে মাতৃবৃন্দ বাসস্থানে ফিরিলেন।

পূর্ণিমায় অত্যধিক স্নানহেতু প্রভুজী অসুস্থ হইয়া পড়েন, রুদ্ধদ্বার-মন্দিরে এখন পঞ্চদশদিবস তাঁহার পূর্ণবিশ্রাম। এই কয়দিন তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, তৎসত্ত্বেও মা প্রতিদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যায় গিয়া দ্বারের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন তদ্গতচিত্তে। তাঁহাদের উভয়কে উভয়ের দর্শন কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দর্শনই নহে, ইহা আন্তরদর্শনও বটে। মাতা বিমলা ও লক্ষ্মীদেবীকে পূজা করিয়া মা প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম রাখিয়া আসিতেন। কন্যাগণকে বলিতেন, "ওরে, তোরা সব জপ করবি, আমি যাতে রথযাত্রায় গুণ্ডিচাবাড়ী পর্যন্ত প্রভুর রথ টেনে নিয়ে যেতে পারি।"

নেত্রোৎসবদিবসে প্রভুর মন্দিরদ্বার প্রাতঃকাল হইতেই উন্মুক্ত। রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত অগণিত ভক্ত নরনারী আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন, পাণ্ডাগণের ব্যস্ততার সীমা থাকিবে না। এইহেতু মা দর্শনপ্রার্থী হইয়া প্রতীক্ষমাণা আছেন মন্দির খুলিবার বহুপূর্ব হইতেই। পাণ্ডাগণের সাহায্যে যথাসময়ে দেবতার দর্শনস্পর্শন সুসম্পন্ন হইল, পক্ষকাল অদর্শনের কাতরতার কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। সেইদিবস দ্বিপ্রহরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, তথাপি মা অপরাহ্ণে পুনরায় দর্শনে গিয়া রাত্রে ফিরিয়া আসেন।

পরদিবস শুভ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। প্রভুদেব রথে আরোহণ করিবেন। মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইবার পূর্ব হইতেই একটি কন্যাসহ মা প্রভুর চত্বরে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছিলেন। অচিরে বৈতালিক-গণের নামকীর্তনে মন্দিরাভ্যন্তর পূর্ণ হইল, প্রধান পাণ্ডা শ্রীমধুসূদন

নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। মা তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়াই রথে প্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। রথ হইতে নামিয়া কন্যাগণ সবিস্ময়ে দেখেন—পূর্বের সেই কাতরতার পরিবর্তে মায়ের বদনে আনন্দের দীপ্তি। দুই কর যুক্ত করিয়া তিনি নিমীলিতনয়নে গাহিতেছেন, "জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।" মায়ের এই অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেই বুঝিলেন, একান্তে পাইয়া দেবতা তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে মা রিক্সাযোগে চলিয়াছেন গুণ্ডিচাবাড়ীর পথে, অন্যান্য সকলে পদব্রজে। মা দেখেন, এক ব্যক্তি ঐ পথেই আসিতেছে, তাহার দুইহস্তে দুইটি কেয়াফুল। রিক্সা থামাইয়া মা তাহাকে ডাকিলেন, সে নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেয়াফুল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ, বাবা?" সে উত্তর দিল, "মন্দিরকু জিমি।" অতি-ব্যাকুলভাবে মা বলেন, "ফুল দুটো আমায় দেবে, বাবা? তুমি যা দাম চাও, আমি তাই দেব।" সন্ন্যাসিনী মায়ীর ব্যাকুলতা বুঝিয়া সে যাহা বলিল তাহার মর্মার্থ ইহাই যে,—তুমি যার জন্য চাইছ, আমিও চলেছি তার জন্যই এ ফুল নিয়ে। দাম কি হবে? তবে, তুমি মায়ীলোক আছ, আমায় 'বাবা' বলে ডেকেছ, আমি তোমার ছেলে হলাম। এ ফুল তুমিই নিয়ে গিয়ে জগবন্ধুকে দাও। তিনি বেশী খুশী হবেন।

সরল গ্রাম্য মানুষ, তাহার এইরূপ সহৃদয় আচরণে মা অভিভূত হইলেন। ফুল দুইটি প্রসারিত দুই হস্তে মা গ্রহণ করিলেন। তবে তাহাকে রিক্তহস্তে ফিরাইলেন না, দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাবা, তুই আমার ছেলে, জগবন্ধুর প্রসাদ কিনে খাস।" সেও মায়ের এই সস্নেহ ব্যবহারে অতিশয় তুষ্ট হইল এবং মায়ের সহিত একত্রে দেবদর্শনে চলিল। মা পাণ্ডাজী-মারফৎ ফুল দুইটি জগন্নাথ-দেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন।

সেইরাত্রেই রথে সোপান সন্নিবেশিত হয়। দেবতাত্রয়কে রথ হইতে গুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া যাইতে রাত্রি অধিক হইল। যতক্ষণ

সম্ভব তথায় থাকিয়া মা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিবস হইতে তিনি প্রত্যহ দুইবেলা মূলমন্দিরে মাতা বিমলা ও লক্ষ্মীদেবীকে দণ্ডবৎ করিয়া পরে গুণ্ডিচামন্দিরে প্রভুর দর্শনে যাইতেন।

সপ্তাহান্তে পুনর্যাত্রা। মা পূর্বের মতই সেইদিবস গুণ্ডিচাবাড়ীর সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বার তখনও রুদ্ধ, শত শত ভক্ত দর্শনার্থীর সমাবেশ; প্রচণ্ড রৌদ্র, ছায়াচ্ছন্ন স্থান নিকটে নাই। মায়ের সঙ্গিগণের ক্লেশবোধ হইতে লাগিল, কিন্তু মায়ের মুখচ্ছবিতে ক্লান্তির চিহ্নমাত্রও নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে তখন কেবল আকুল প্রতীক্ষা—কতক্ষণে প্রভুর দর্শন মিলিবে।

পূজার্চনা গ্রহণ করিয়া পুনর্যাত্রায় রথারোহণ করিতে প্রভুদেবের সেইদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইল। দেবতাগণের মস্তকের পশ্চাতে বহুপুষ্পপত্র বিন্যাসে একখানি করিয়া বিশালকায় চন্দ্রাকৃতি চালচিত্র স্থাপন করা হইয়াছে। সুবৃহৎ মুকুট ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা, তাহাতে বিভিন্ন রঙের পুষ্পসজ্জা। জগন্নাথদেবের মুকুটের চূড়ায় শোভা পাইতেছে ঘনসবুজ দূর্বাগুচ্ছ। প্রভু যত অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার সেই মোহনচূড়াও সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে। সত্যই তাঁহার রূপমাধুরী বর্ণনাতীত।

পুনর্যাত্রা আরম্ভ হইল প্রায় অপরাহ্ণকালে। সকলের সহিত মা-ও প্রভুর রথরজ্জু ধরিয়া চলিলেন। অগ্রসর হইতেছেন সকলে মূলমন্দিরের পথে। সিংহদ্বারে আসিয়া রথ পৌঁছিল সায়াহ্নে। মা কোথা হইতে সংবাদ পাইলেন যে, ঐ রাত্রেই সোপান স্থাপিত হইবে। সমগ্র দিবসের উপবাস, পরিশ্রমের ক্লান্তি, কিন্তু কোনপ্রকার ক্লেশই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। পথপ্রান্তে তিনি কন্যাগণসহ অধীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, যদি কোনপ্রকারে প্রভুর সম্মুখে একবার যাইবার উপায় হয়। তিন-চারি ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর জানা গেল—সংবাদ অমূলক। ব্যর্থপ্রতীক্ষা-অন্তে মা গৃহে ফিরিলেন। তথাপি রথোপরি প্রভুর সেই ভুবনমোহন রূপ তাঁহার চিত্তকে প্রসন্নতায় পূর্ণ করিয়া রাখিল।

পরদিবস অপরাহ্নে নারিকেলবৃক্ষের খণ্ডিতকাষ্ঠে রথের সোপান সন্নিবেশিত হইল। জনতা বিপুল আনন্দে জয়ধ্বনিসহকারে প্রভু-দেবের স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় রথে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাধর দৈতাপতি স্বয়ং আসিলেন মাকে রথোপরি প্রভুসকাশে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে। পাণ্ডাজী এবং সন্তানবৃন্দের সাহায্যে মা সাবধানে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার আরাধ্য দেবতার সম্মুখে। দেবতা তখন অসংখ্য সন্তানসন্ততির প্রণামগ্রহণ, আর্তিশ্রবণ এবং আলিঙ্গন আদানপ্রদানে ব্যাপৃত। মা তাঁহাদিগকেই অগ্রাধিকার দান করেন প্রভুসান্নিধ্যলাভে। পাণ্ডাজী সাগ্রহে বলেন, "চল মা চল, বাবার আরও কাছে।" তাঁহার বলিষ্ঠ হস্তদ্বয়ের সহায়তায় জনসমাবেশ ভেদ করিয়া মাকে লইয়া চলেন প্রভুর অতিনিকটে।

সান্নিধ্যে আসিয়া মা আলিঙ্গন করেন পরমপতিকে। রথারূঢ় প্রভু জগন্নাথ রাজোচিত মহিমায় অধিষ্ঠিত স্বীয় আসনে, অবারিত তাঁহার করুণার উৎস। এমন শুভক্ষণে বক্ষঃস্থলে মিলিতা হইয়াছেন তাঁহার আত্মনিবেদিতা দয়িতা। সুমহান সেই দৃশ্য। কিছুসময় অতিবাহিত হইবার পর পাণ্ডাজী মাকে প্রভুজীর সাদরপ্রসারিত বামবাহুর আশ্রয়ে স্থান করিয়া দিলেন। প্রভুর কণ্ঠদেশের প্রসাদী মাল্য কন্যাদিগকে দিয়া বলেন, "পরাও, পরাও মায়েরা, বাবার প্রসাদী মালা দিয়ে মাকে সাজিয়ে দাও।" কিছু প্রসাদী চন্দনও তিনি জগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিলেন। অতিশয় আগ্রহের সহিত কন্যাগণ তদ্দ্বারা মাকে সজ্জিত করিলেন। মায়ের আননে তখন এক অপার্থিব পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি। পিতা ও মাতার এই মহিমময় রূপদর্শনে কন্যাগণও আনন্দে অভিভূত।

দর্শনস্পর্শন-প্রত্যাশী জনসমাবেশ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। পাণ্ডাজীর ব্যবস্থানুসারে রথের উপর অধিকতর নিরাপদস্থানে কন্যাগণসহ মা উপবেশন করেন। মা তাঁহাকে বলেন, "এত লোকের আর্জি শুনতে শুনতে আমার প্রভুর মুখখানি শুকিয়ে গেছে। তুমি একটু

সরবতের ব্যবস্থা কর, বাবা।” মা টাকা দিলেন। পাণ্ডাজী যথাসম্ভব মৃন্ময় ‘বড় হাণ্ডী’তে নানাদ্রব্যের মিশ্রণে সুপেয় সরবৎ প্রস্তুত করিয়া মায়ের হস্তে আনিয়া দেন। মা স্বহস্তে প্রভুকে ভোগনিবেদন ও কর্পূর আরতি করিলেন। রথোৎসবের পরদিবস জগন্নাথদেবকে রসগোল্লা ভোগ দিবার প্রথা পুরীধামে প্রচলিত আছে। মায়ের জনৈকা কন্যা উহা গৃহে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সরবতের পর প্রভুজীকে রসগোল্লা ভোগ দিয়া মা পাণ্ডাগণ ও সন্তানবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করেন।

দেবত্রয় সেইবার সিংহদ্বারের সম্মুখে চারিদিবস রথারূঢ় রহিলেন। এইসময় এক গভীর রাত্রে অল্পক্ষণের জন্য তাঁহাদের ‘রাজবেশ’ হইয়াছিল। পাণ্ডাগণ মায়ের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলে মা তৎক্ষণাৎ গিয়া সেই মনোহর রূপ দর্শন করেন।

দুইটি রথোৎসবের অত্যধিক পরিশ্রমে, বিশেষ করিয়া একদিনের জনতার চাপে জানু ও পাদদেশে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় মায়ের প্রবল জ্বর হয়। ১০৪ ডিগ্রী জ্বর, মা প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সমগ্র দিবস শয্যাশায়ী রহিলেন। কোনপ্রকারে একবার গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে দামোদরজীর পূজাভোগ সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু স্বয়ং জল-গ্রহণ করিতেও পারিলেন না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মা উঠিয়া বসিলেন। ইহার পর একখানি গরম চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া একটি কন্যাসহ তিনি সন্তানগণের অগোচরে রিক্সাযোগে প্রভুদেবের দর্শনে বাহির হইয়া পড়েন। মাকে দেখিবামাত্র পাণ্ডাজী রথ হইতে নামিয়া আসিলেন। কিন্তু মায়ের এইপ্রকার অসুস্থতা দেখিয়া বলেন, “মা, আমি তখন থেকে তোমায় খুঁজছি। তুমি এমন অসুস্থ! তা এখন চল, এই সামনের লাইব্রেরী বাড়ীর ওপরে জানালার ধারে তোমার বসার ব্যবস্থা করে দিই। তুমি বসে বসে প্রভুকে দেখ। একটু পরেই ভিড় কমবে, তখন এসে তোমায় প্রভুর কাছে নিয়ে যাব।” মা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, বলিলেন, “হ্যাঁ, সেই ভাল। অপেক্ষা না

যেন অতি আদরে কাহারও সেবা করিতেছেন। মৃদুস্বরে মা গানও গাহিতেছেন,—

"দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর।

... ...

এই কর হরি দীন-দয়াময়,

তুমি আমি যেন দুটি নাহি রয়।

জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, আমি নদী তুমি সাগর।"

নিমীলিতনেত্রে তন্ময়চিত্তে মা পুনঃপুনঃ শেষ কয়টি ছত্র গাহিতেছেন এবং অশ্রুধারায় চলিতেছে আত্মনিবেদন।

রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকায় মা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। কন্যাগণকে ডাকিয়া বলেন, "ওরে, তোরা আয়।" তাঁহারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, মা প্রেমানন্দে বিহ্বলা। পরদিবস হইতে এক পক্ষকাল প্রভুর অদর্শন, তিনিও বোধ হয় প্রিয়জনের অদর্শনে কাতর, সেইহেতু গভীর রজনীতে তাঁহার এই দিব্য উপস্থিতি!

শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে লিখিত মায়ের একখানি পত্র।—

"...প্রভুর করুণার সীমা নাই, তাঁহার সামনে দাঁড়ালে আনন্দে বিভোর হই।...বড় আনন্দ।...আদি পুরুষ বিরাট—তাঁহার সমীপে তোমাদের কল্যাণে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি এবং আশীর্বাদ—তাঁহার প্রসন্নতা পাইতেছি। কোথাও যাইবার বাসনা নাই, কেদারনাথ বদরিনাথ মেরে জগন্নাথ। শান্ত অবস্থায় কিছুদিন থাকিতে চাই। আশ্রমরূপ বিষয় লইয়া দীর্ঘদিন যুদ্ধ করিয়াছি, একান্তভাবে তাঁহার দর্শন চাই।"

শ্রীগৌরীমাতা-জয়ন্তী

একা শক্তিরনন্তরূপরুচিরা সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকৃৎ
তস্যাস্ত্বং বহুকারিণী প্রতিগতা প্রত্যক্ষদৃষ্টান্ততাম্।
গৌরী গৌরবসন্তৃতাস্থ ভবতী গৌরীব চণ্ডীব বা
জীয়াদ্ ভারতভূমিভাগ্যমহিমা পুণ্যা পরশ্রেয়সে॥

শ্রীশ্রীগৌরীমাতার জীবদ্দশায় তাঁহার আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসবের আকাঙ্ক্ষা আশ্রমবাসিনী কন্যাগণ বহুবার করিয়াছেন, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা-বিরাগিণী সন্ন্যাসিনী সর্বদাই এইপ্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতেন। তথাপি দুর্গামা এবং ভক্তবৃন্দ ক্ষুদ্রাকারে এই তিথিটি পালন করিতেন। গৌরীমাতার দেহত্যাগের পর হইতে তাঁহার অবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়দিবসই মা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেন।

গৌরীমাতার আবির্ভাবের শততমবর্ষ সমাগত হইলে মা এই জয়ন্তী-উৎসব পালনে উদ্‌যোগী হইলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, গৌরীমাতার নারীশিক্ষার আদর্শ আজও দেশে প্রচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। এইহেতু তাঁহার একান্ত ইচ্ছা—বৎসরকালব্যাপী এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গৌরীমাতার অপূর্বজীবনকথা, তাঁহার ভাবধারা ও মহান্ আদর্শ দেশবাসীর নিকট প্রচারিত হউক। এতদুদ্দেশ্যে সভাসমিতি, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, নগরকীর্তন এবং বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অলোকসামান্য জীবনচরিত প্রকাশ প্রভৃতি কার্যসূচীসমন্বিত এক বিরাট পরিকল্পনা মা স্থির করিলেন।

শতবর্ষ-জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা ও সমাপ্তি সম্বন্ধে মায়ের নিকট দুইটি অভিমত উপস্থাপিত হইল। একমতে ১৩৬৩ সালের মাঘ মাসে শততম জন্মতিথিতে ইহার শুভারম্ভ এবং বৎসরান্তে সমাপ্তি বিধেয়; অপরমতে শতবর্ষ পূর্ণ হইলে ১৩৬৪ সালে আরম্ভ এবং

পরিসমাপ্তি ১৩৬৫ সালে। মা দুইটি অভিমতই গ্রহণ করিলেন—'অধিকন্তু ন দোষায়'।

বিভিন্ন স্থান হইতে দেশের বহু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানও দুর্গামাকে জানাইলেন, এই উপলক্ষে তাঁহারাও মহিমময়ী গৌরীমাতার প্রতি তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা যথাযোগ্যভাবে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছুক। ভারতের তদানীন্তন মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ পূজনীয়া গৌরীমাতার লোকোত্তর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক তাঁহার শতবর্ষজয়ন্তী ও আশ্রমের সাফল্য কামনা করিয়া একটি বাণী ও অর্থসাহায্য প্রেরণ করেন। বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ* গৌরীমাতার শতবর্ষজয়ন্তী-অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ জানাইলেন, "…আমাদের দেশের মাতৃকুল যখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলেন, বিস্মৃত হইয়াছিলেন আত্মগৌরব, এমনই সময়ে মাতৃমহিমদীপ্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন গৌরীমা।…আমরা দেশবাসীর নিকট, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন নারীপ্রতিষ্ঠানের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন…ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার জীবন্ত বিগ্রহরূপী এই মহিমময়ী সন্ন্যাসিনীর উদ্দীপনাপূর্ণ জীবনকথা, তাঁহার বাণী ও কর্মাবলীর কথা সভা ও পত্রিকাদির মাধ্যমে প্রচার করেন।"

১৩৬৩ সালের ২৯-এ মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭) মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতিথিতে গরীয়সী গৌরীমাতার শততম আবির্ভাব দিবসে আশ্রমে শতশঙ্খধ্বনি-সহকারে শতবর্ষ-জয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হয়। দিবসত্রয় বিশেষ পূজাপাঠ হোম, কীর্তন, বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান এবং আশ্রমভবন আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়।

কলিকাতা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্নস্থানেও ভক্ত নরনারীর সশ্রদ্ধ উৎসাহে এই জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদিগের

---

* বহুগ্রন্থরচয়িত্রী অনুরূপা দেবী, শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ (ভারতের প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র)-প্রমুখ সুধীবৃন্দ।
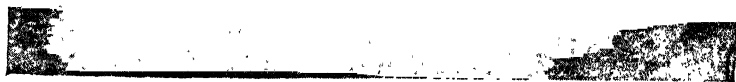
আগ্রহাতিশয়ে অধিকাংশ অধিবেশনেই দুর্গামা উপস্থিত হইয়াছেন। শতবর্ষজয়ন্তীর প্রথমার্ধে যে-সকল সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইস্থানে উল্লেখ করা হইতেছে।—

সিঁথি বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পক্ষ হইতে সম্পাদক ভাগবতভূষণ শ্রীরাধারমণ দাসের উদ্যোগে "প্রাচ্য বাণী মন্দিরে" "আবাল্যতপস্বিনী প্রেম ও ভক্তিময়ী শ্রীগৌরীমাতার শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসব" অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীদুর্গাপুরীমাতা, ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এবং অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।

চন্দননগরের অধিবাসিবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত "নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে" অনুষ্ঠিত শতবর্ষজয়ন্তী সভাতে বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল। সভানেত্রী শ্রীদুর্গাপুরী মাতাকে বরণ করেন প্রবর্তক সংঘের সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত। দুর্গামাতা ব্যতীত কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং প্রবর্তক নারীমন্দিরের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্যও সভায় গৌরীমাতার পূতচরিত আলোচনা করেন।

জয়ন্তী-উৎসব সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীগৌরীমাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন,"মাগো, তোমার মাঝে আমরা দেখেছি যেমন ত্যাগ-তপস্যার দীপ্ত অগ্নিশিখা, জ্বলন্ত বৈরাগ্য, কঠোর তপস্বিনী মূর্তি, আবার তেমনি পেয়েছি নারীর দুঃখে দুঃখিনী, বিগলিত স্নেহময়ী, করুণার মাতৃবিগ্রহ।···নারীকল্যাণব্রতে বিরামহীন কর্মে আপনাকে উৎসর্গ করে যে মহান আদর্শ তুমি দেখিয়ে গেছ, তা বাংলার নারীসমাজকে চিরদিন জাগরণের অমর প্রেরণা দিবে···দেবি, এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধার নৈবেদ্য নিয়ে তোমার ভাবমুগ্ধ চন্দন-নগরবাসী আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি—স্মরণ করছি তোমার পূত চরিত্র ও বাণী, যাচ্‌না করছি কায়মনোপ্রাণে তোমার আশীর্বাদ। ঊর্ধ্বলোক থেকে—তোমারই চরণোদ্দেশে আমাদের সমবেত সভক্তি অর্চনা ও প্রণতি গ্রহণ কর।"

আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিবিধ বাদ্য সহযোগে চণ্ডী-কীর্তনাদি মনোরম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও সভায় হইয়াছিল। "নারী

কল্যাণে গৌরীমাতা" বিষয়ক প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠা লেখিকাকে পুরস্কৃত করা হয়। শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীসুধাংশুশেখর দত্ত, মহকুমা-শাসক সপত্নীক এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দের সহযোগিতায় জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

চন্দননগর প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধাস্পদ মতিলাল রায় মহাশয় গৌরীমাতা-জয়ন্তী উৎসবের সাফল্যকামনা করিয়া দুর্গামাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।*

এতদ্ব্যতীত, কাশীপুর ঝিল এষ্টেটে, বনফুল সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে, লেডী ব্রেবোর্ন কলেজে এবং দার্জিলিঙ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনির্মলেন্দুনাথ রায়ের উদ্যোগে দার্জিলিঙে গৌরীমাতার শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর ১৩৬৪ সালে এলাহাবাদ-নিবাসী ভক্তগণের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ পাইয়া মা শারদীয়া পূজার পূর্বেই তথায় গমন করেন এবং ১২ই আশ্বিন হইতে এলাহাবাদে পূর্বোক্ত অলোপীবাগের বাটীতে দুই

* পরমকল্যাণীয়া মাতা দুর্গাপুরী দেবী।

অশেষ স্নেহাস্পদাসু—মহিমময়ী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতার একাধিক শততম আবির্ভাব উৎসব মাতা সারদেশ্বরীর আশ্রম ভবনে এবং অন্যান্য স্থানে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। যোগ্যা জননীর যোগ্যা সন্ততি আপনি তথা আপনারা—আমি কায়মনোপ্রাণে প্রার্থনা করি—আপনাদের তপস্যা সিদ্ধ হউক, সার্থক হউক।

আমি আজ বৃদ্ধ অসুস্থ তাই দূর হইতেই আপনাদের উৎসবের সাফল্য কামনা করি। আপনি তথা আশ্রমের অন্তেবাসিনী সকলকেই আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলি জয়তু। জয়তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—ঠাকুর আপনাদের মধ্যেই চিরজাগ্রত থাকুন। ইতি

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমতিলাল রায়

সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন পল্লীর অধিবাসিবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত গৌরীমাতার শতবর্ষজয়ন্তী সভায় তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যাপূত এবং নারীজাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনচরিত মা আলোচনা করেন।*

কোজাগরীপূর্ণিমা পর্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থানের পর মা দিল্লী অভিমুখে রওনা হইলেন। এই যাত্রায় তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেন তাঁহার স্নেহভাজন সন্তান শ্রীশক্তীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে—পুসা রোডে। দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলের সন্তানবৃন্দও নানাদিবসে গৌরীমাতা-জয়ন্তী সভার আয়োজন করেন।†

শ্রীরায়ের ব্যবস্থানুযায়ী একদিন তাঁহার স্বকীয় ভবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এবং অন্য একদিন নিউদিল্লী কালীবাড়ীতে গৌরীমাতার শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (পরবর্তিকালে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী) ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গৌরীমাতার বহুমুখী গুণাবলী এবং সমাজসেবায় তাঁহার আত্মোৎসর্গের কথা উল্লেখ করেন। গৌরীমাতার প্রসঙ্গে ডক্টর রাও বলেন, "ভগবানকে ভালবাসাই ভারতের ঐতিহ্য। গৌরীমাতা এই ঐতিহ্যে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কেবল আত্মোপলব্ধির জন্যই নহে, মানবসেবায়—বিশেষ করিয়া এ দেশের নারীজাতির দুরবস্থার

* এলাহাবাদে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা—

জগত্তারণ গার্লস কলেজ, অলোপীবাগ রোড, থর্নহিল রোড, জর্জ টাউন, ইণ্ডিয়ান প্রেস ভবন, লুকারগঞ্জ, পূর্ণিমা সম্মিলনী, লাউদার রোড, সরোজিনী নাইডু মার্গ, শ্রীরাজীব রায়ের ভবন ইত্যাদি।

† দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা—

পুসা রোড, হ্যামিলটন রোড, তিশহাজারী কালীবাড়ী, ইষ্ট বিনয়নগর, কাশ্মীরী গেট, ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ, লোদী রোড, মতি বাগ,যোশী রোড, বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, কোটলা, রোশনপুর, কবিরাজ বৈদ্যনাথ সরকারের ভবন ইত্যাদি।

উন্নতিসাধনে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে, সেখানে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ছিলেন ভগবানের পরিজন, এবং গৌরীমাতা তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি নিজের জীবনদ্বারা এই কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধর্মই ভারতের প্রাণ এবং শক্তি।"

দিল্লীবাসী সন্তানগণ গৌরীমাতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে একদিন নগরসংকীর্তনেরও ব্যবস্থা করেন। এক রবিবারের প্রাতে পত্রপুষ্প-মাল্যে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও গৌরীমাতার প্রতিকৃতি বহন করিয়া সন্তানগণ চলিলেন। অগণিত ভক্তের সম্মিলিত নামকীর্তনে রাজধানীর রাজপথ উৎসবমুখর হইয়া উঠে। পথচারী এবং পথিপার্শ্বস্থ গৃহের অধিবাসিবৃন্দ স্মৃতিপূজার এই অভিনব দৃশ্যে ঔৎসুক্য এবং আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।*

অতঃপর শ্রীশক্তীশ রায়ের অনুরোধে তাঁহার সহিত মোটরযোগে মাতৃবৃন্দ হরিদ্বার গমন করেন। তখন কার্তিক মাসের শেষার্ধ, প্রচণ্ড শীত। তৎসত্ত্বেও প্রতিদিন পূর্বাহ্নে মা ব্রহ্মকুণ্ডের জলে অবগাহনস্নান করিতেন এবং সন্ধ্যায় গঙ্গাদেবীর আরাত্রিক দর্শনান্তে পুণ্যসলিলে প্রদীপ ভাসাইতেন।

হরিদ্বার হইতে সস্ত্রীক শ্রীরায় মাকে হৃষীকেশ, লছমনঝোলা এবং মুসৌরীতেও লইয়া গেলেন। চারিদিবস হিমালয়ের ক্রোড়ে আনন্দে অতিবাহিত করিয়া মা সদলে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এইসময় তাঁহাদের বাটীতে অনুষ্ঠিত এক কল্যাণযজ্ঞে বহু নরনারী সমবেত হইয়া আহুতি প্রদান করেন।

* এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দুর্গামাতার নির্দেশানুযায়ী শ্রীতারাপদ চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীমাখনলাল ভট্টাচার্য-প্রমুখ দিল্লীবাসী ভক্ত সন্তানগণের, বিশেষ করিয়া শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায় এবং তাঁহারই গৃহে বহুবৎসর যাবৎ পূজা, পাঠ, হোম, কীর্তন ও ভক্তসেবাসহ গৌরীমাতার জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

দিল্লী হইতে শ্রীরায় পুনরায় মোটরযোগে সপারিষদ মাকে বৃন্দাবনধামের মুঙ্গের-রাজবাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। তিনি এবং তৎপত্নী শ্রীবাণী রায় এই একমাস কাল মা, কন্যাকুল ও সমাগত ভক্তবৃন্দের যে অকুণ্ঠ সেবা করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়।

দিল্লী এবং এলাহাবাদ হইতে অনেক ভক্ত বৃন্দাবনধামেও সমাগত হইলেন। মায়ের সহিত শ্রীগোবিন্দ ও অন্যান্য দেবদর্শনে ভক্তবৃন্দের আনন্দের অবধি রহিল না। দিল্লীর নগরসংকীর্তনের অনুরূপ ব্যবস্থা এইস্থানেও হয়। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্থানীয় অন্যান্য উৎসাহী অধিবাসিবৃন্দ লক্ষ্মণশহীদ-হলে এক মহতী সভার আয়োজন করেন। তথায় 'শ্রীবৃন্দাবনে গৌরীমাতার তপস্যা' বিষয়ক এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন দুর্গামা। স্থানীয় এবং মথুরা হইতে আগত নরনারী এবং সাধুগণও সশ্রদ্ধ অন্তরে সেই অপূর্ব জীবনবেদ শ্রবণে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। সভাশেষে আশ্রমের শিশুকুমারীগণ কর্তৃক 'রাসলীলা' অভিনীত হয়। শ্যামচন্দ্র এবং গোপীবৃন্দের লীলাভিনয় দর্শনে সমবেত ভক্তমণ্ডলী পরমানন্দ অনুভব করেন।

বৃন্দাবনে জয়ন্তী-উৎসব এবং দেবদর্শনাদি কার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই কানপুর ও লক্ষ্ণৌ হইতে মায়ের আমন্ত্রণ আসিল। কলিকাতা হইতেও পত্রবাহক আসিয়া জানাইলেন যে, বাংলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে গৌরীমাতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মহাজাতি সদনে' যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে তাহাতে যোগদানের নিমিত্ত মায়ের অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন অত্যাবশ্যক।

ইতিমধ্যে কানপুরে ডাক্তার শ্রী এস. এন. মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তদীয়া পত্নী সরযূবালা দেবীর আতিথ্য মা গ্রহণ করেন। তথায় ত্রিরাত্র অবস্থানকালে প্রত্যহ বিভিন্নস্থানে গৌরীমাতার জীবনবাণী এবং নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

চতুর্থদিবসে মোটরযোগে মাতৃবৃন্দ লক্ষ্ণৌ গমন করেন। দিল্লীর পূর্বোক্ত নীহারকুমার রায় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইদানীং

এইস্থানে বাস করিতেছিলেন। মা তাঁহার অতিথি হইলেন। নীহারকুমারের আমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতলের ঘরে ধর্মসভার আয়োজন হয়। মা এই সভায় দক্ষিণেশ্বরের লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। অতঃপর সেই রাত্রেই মা কানপুরে প্রত্যাগত হইয়া পরদিবস সন্ধ্যায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক নরনারী এই যাত্রায় মায়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার সিংহ, শ্রীগৌরী সিংহ-প্রমুখ উৎসাহিগণের উদ্যোগে ১৮ই অগ্রহায়ণ, (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৭) হইতে মহাজাতি সদনে গৌরীমাতার শতবর্ষজয়ন্তী-উপলক্ষে সঙ্গীত, ভাষণ, ধর্মালোচনাদিসহ সপ্তাহব্যাপী এক বিরাট কর্মসূচী প্রস্তুত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদামাতা ও শ্রীশ্রীগৌরীমাতার তিনখানি সুবৃহৎ আলেখ্য মহাজাতিসদনের পুরোভাগে স্থাপিত করা হয়। অগণিত নরনারী প্রতিটি দিবসেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিভিন্নবিষয়ে ভাষণ দিয়াছিলেন—মাতা শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী, অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-প্রমুখ বিদগ্ধমণ্ডলী। সঙ্গীত, ভজন ও কীর্তন পরিবেশন করেন স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার রায়, চিত্ত রায়, শ্রীপূর্ণদাস বাউল, শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজনবালা ঘোষ দস্তিদার-প্রমুখ প্রায় চল্লিশজন সঙ্গীতজ্ঞ। মা প্রত্যহ সভায় উপস্থিত থাকিতেন।

৮ই ডিসেম্বর তারিখে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সভায় গৌরীমার পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,—

"...নারীজাতির উন্নতিবিধানে তাঁহার অবদান শ্রদ্ধান্তঃকরণে স্মরণ করিয়া বাংলার জনসাধারণ কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এই আবেদন জানাইতেছেন যে,—(১) গৌরীমাতার প্রধান কর্মকেন্দ্র উত্তর-কলিকাতায় একটি প্রশস্ত রাজপথ এবং একটি পার্ক তাঁহার নামে উৎসর্গ করা হউক এবং (২) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গৌরীমাতা সর্বপ্রথম যে-স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাপূর্বক সেবাব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, যে স্থানটি কলিকাতা কর্পোরেশন জলকলের জন্য দখল করিয়া লইয়াছেন, পলতায় গঙ্গাতীরে সেইস্থানে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা হউক।"*

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত।

এতদ্ব্যতীত, বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দের আয়োজিত বহু জনসভাতেও মা ভাষণ দান করেন। এসোসিয়েশন হলের উদ্যোক্তা-গণের আয়োজনে যাদবপুরে এবং ঠাকুরপুকুর শ্রীসারদাবিহারে গৌরীমাতা-শতবর্ষ-উৎসব প্রতিপালিত হয়। শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বরাহনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনেও গৌরীমাতা সম্বন্ধে মা ভাষণ দিয়াছেন।

গৌরীমাতার জীবনী অবলম্বনে রচিত 'গৌরীগাথা' কথকতা এবং

* উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রথম বিষয় নিয়মতান্ত্রিক কারণে বিলম্বিত হইলেও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণের সহৃদয়তায় ইতিমধ্যে কার্যকর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদামাতা এবং তাঁহাদের লীলাসহচরবৃন্দ-অধ্যুষিত উত্তর-কলিকাতায় পুণ্যতীর্থ বলরাম বসু ভবনের পার্শ্ববর্তী (গিরিশ এভিনিউ-স্থিত) নূতন পার্কটি কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় 'গৌরীমাতা উদ্যান' নামে অভিহিত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সম্মুখস্থ পথটির (মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটের পশ্চিমাংশ) 'গৌরীমাতা সরণী' নামকরণ হইয়াছে।

সুরসহযোগে আশ্রমবাসিনীবৃন্দ কর্তৃক নানাস্থানে গীত হয়। যশস্বী চিকিৎসক শচীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারীর কোন্নগরের বাটীতেও একদিন 'গৌরীগাথা' গীত হইয়াছিল।*

গৌরীমাতা এবং দুর্গামাতার বাল্যকালের বাসস্থানের সন্নিকটে দক্ষিণ-কলিকাতায় "হরিশ পার্কে" এবং চেতলা, শিবপুর, চাকদহ, রাণাঘাট (নারীকর্মী সমিতি) ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে জয়ন্তীসভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ঘটক, শ্রীচিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ মাতৃদ্বয়ের পূর্বাশ্রমের আত্মীয়বর্গ। তাঁহাদের সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে দুর্গামা এইসকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দুর্গামাতার বাল্যস্মৃতিবিজড়িত বসিরহাটেও জয়ন্তী উৎসব পালন করা হইয়াছিল। বসিরহাটে হরিমোহন দালাল বালিকা বিদ্যালয়ে গৌরীমাতার জয়ন্তী-সভার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সভায় পৌরোহিত্য করেন বঙ্গীয় বিধানসভার অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র কর এবং প্রধান বক্তা ছিলেন দুর্গামাতা। সভায় ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ গৌরীগীতি ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অধ্যক্ষ কর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "উপস্থিত ছাত্রীবৃন্দকে আমি বলছি—জাতির প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তোমরাই। তোমরাই জাতির জননী। জাতির মধ্যে সর্বস্তরে যে বিশৃঙ্খলা, যে উচ্ছৃঙ্খলতা অনুপ্রবেশ করেছে, তা থেকে তোমরাই রক্ষা করতে পার

*আশ্রমের সহিত শচীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। যখন তিনি মেডিকেল কলেজে পাঠাভ্যাস করিতেন—গৌরীমা ও দুর্গামার নিকট তাঁহার যাতায়াত ছিল। তিনি তাঁহাদের একান্ত স্নেহাস্পদ ছিলেন। কোন্নগরে গঙ্গাতীরে 'মাতৃনিবাস' নামে তাঁহার একখানি বাসগৃহ আছে, তথায় সপ্তাহান্তে গিয়া এই ধর্মপ্রাণ সন্তান নির্জনে বাস করিতেন, সাধনভজন করিতেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে নিজ বাটীতে উৎপন্ন নানাবিধ ফল ও ফুল আশ্রমে দিয়া যাইতেন দেবসেবার জন্য। তাঁহার অনুরোধেই মায়ের সহিত মাতৃনিবাসে গমন করিয়া আশ্রমকন্যাগণ একদিন সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে 'গৌরীগাথা' গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন।

জাতিকে। এবং যদি তোমরা গৌরীমার নির্দেশিত পথে চলতে পার তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হবে, ভারত জগতের আসনে আবার শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করবে।"*

হরিদাস মিত্র মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে পুরুলিয়ায়, হাজারীবাগের জিলা-জজ অভয়পদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে হাজারীবাগে, শ্রীননীতোষ দাশগুপ্ত-প্রমুখ ভক্তসন্তানগণের আয়োজনে সিন্ধ্রীতে, শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আসানসোল বারাবনী কোলিয়ারীতে এবং শ্রীদেবানন্দ প্রামাণিকের ব্যবস্থায় বোকারোতেও জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এতদ্ব্যতীত, কেন্দ্র-আশ্রম ও শাখা-আশ্রমদ্বয়ের উদ্যোগে সাধারণ সভা, মহিলা-সম্মেলন, ছাত্রী-সম্মেলন, নগরকীর্তন ও শোভাযাত্রাদির আয়োজন করা হয়। আশ্রমের উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে যে মহিলা-সম্মেলন এবং প্রাক্তন ছাত্রী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীতারা দেবী এবং অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী।

সমাপ্তি-উৎসবে আশ্রম-মণ্ডপে বিভিন্ন দিবসে শ্রীউত্তরা দেবী, শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দের সঙ্গীত এবং গ্রে-ষ্ট্রীট কালীকীর্তন

* এই উপলক্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একটি গৃহ আচার্যা গৌরীমাতার নামে উৎসর্গ করা হয়। গৃহগাত্রে শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ থাকে—"এই বিদ্যালয় বসিরহাটে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়রূপে ক্ষুদ্রাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতার পূত আশীর্বাদে।"

উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, "বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বিশেষ করিয়া বসিরহাটে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পুণ্যশ্লোকা শ্রীশ্রীগৌরীমাতার অবদান স্মরণ করিয়া প্রতি-বৎসর তাঁহার জন্মদিবস অতঃপর পর্বদিবসরূপে পালিত হইবে।"

সংঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল সংঘ (হাওড়া), শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকীর্তন সংঘ (ভবানীপুর), পটলডাঙ্গা রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রভৃতি দলের পালাকীর্তন, হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই' অভিনয় ইত্যাদি নানাবিধ চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানসহযোগে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

বহু মনীষী, সাহিত্যিক ও কবি শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রবন্ধ, কবিতা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধিকা গৌরীমাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। 'অর্ঘ্য' নামক পুস্তিকায় তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌরীমাতা-বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বেতারে একদিবস দুর্গামাতা এবং অপর একদিবস জনৈকা সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এলাহাবাদের অধ্যাপিকা শ্রীলাবণ্যপ্রভা রায় কর্তৃক হিন্দী ভাষায় এবং আসামের দেশসেবক মহাদেব শর্মা কর্তৃক অসমীয়া ভাষায় গৌরীমাতার দুইখানি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচিত ও প্রকাশিত হয়। 'Gaurimata and Her Mission' নামক একখানি ইংরাজি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।*

আশ্রমের উদ্যোগে গৌরীমাতা-জয়ন্তী উপলক্ষে সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে—১৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৫, পৌরোহিত্য করেন ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও। আশ্রমকুমারীবৃন্দ কর্তৃক আরাত্রিকের পর সভার উদ্বোধন করেন গৌরীমাতার স্নেহভাজন সন্তান স্বনামধন্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়। গৌরীমাতা-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং

* শেষোক্ত পুস্তিকার কাগজ ও মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এলাহাবাদস্থিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের শ্রীহরিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। গৌরীমার ত্রিবর্ণরঞ্জিত বৃহদাকার বহুসংখ্যক চিত্রও তিনি মুদ্রণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী নারীজাতি তথা সমাজের কল্যাণে গৌরীমাতার অপূর্ব ত্যাগ ও অবদানের বিষয় আলোচনা করেন। সভাশেষে গৌরীমাতা-বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীআশাপূর্ণা দেবী স্বরচিত কবিতায় গৌরীমাতার উদ্দেশে বলেন,—

> ···অমরাত্মা যুগে যুগে আবির্ভূত হ'ল পৃথিবীতে,
> পথভ্রষ্ট পৃথিবীকে কল্যাণের মন্ত্রদীক্ষা দিতে।
> সে আত্মা এ মরলোকে অমৃতের বার্তা আনে বহি'
> পীড়িত মানবপ্রাণ সে অমৃতে হয় দুঃখজয়ী।
> পরমা গৌরীর অংশ কৌমার্যের মূর্তি গৌরীমাতা,
> তুমি সে বাণীর ধাত্রী, সে আনন্দবেদের উদ্‌গাতা।···

এইভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ সহযোগিতা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুণ্যশ্লোকা গৌরীমাতার শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

এলাহাবাদ এবং দিল্লীতে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। গৌরীমাতার জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষেই দুর্গামা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু এলাহাবাদবাসী ভক্তবৃন্দ এই সুযোগে দ্বিবিধ উৎসবের আয়োজন করেন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে পূজনীয়া গৌরীমাতার জয়ন্তী-উৎসব সুষ্ঠুভাবেই পালন করিয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহাদের আরও কিছু পরিকল্পনা ছিল।

এই কথা অনস্বীকার্য যে, বাস্তববিচারে তাঁহাদের সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠতা দুর্গামাতার সহিতই অধিক। শারদীয়া দুর্গাপূজায় এইবার তিনি প্রথম এলাহাবাদে উপস্থিত, সুতরাং তথাকার ভক্তবৃন্দের আনন্দের পরিসীমা নাই। রেল ষ্টেশনেই তাঁহারা 'জীবন্ত দুর্গা'কে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

মায়ের জন্মদিবস— মহানবমীর পুণ্যপ্রভাতে তাঁহাদের পূর্বের

পরিকল্পনানুযায়ী শঙ্খধ্বনি ও সানাইয়ের সুরসহযোগে শুভ উৎসবের সূচনা হয়। মায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া দ্বিপ্রহরে সমবেত প্রার্থনায় বহু নরনারী যোগদান করেন। অতঃপর সন্ধ্যাকালে প্রদীপমালা ও আলিম্পনে সুসজ্জিত সভাপ্রাঙ্গণে মাকে স্থানীয় প্রথায় বরণ করেন শ্রীমাধবী সেন। কেহ হিন্দীতে, কেহ বঙ্গভাষায় শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। শ্রীরাজীব রায় এবং অন্যান্য শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। একাধিক সভায় মাতাকে অভিনন্দনপত্রও প্রদান করা হয়।

এতদ্ভিন্ন, প্রকাশ্য সভার অবসরে প্রায়শঃ মায়ের বাসভবনেও ভক্ত নরনারীর সমাগম হইত। তখন তথায় ভাগবত প্রসঙ্গ এবং কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হইত।

অতঃপর মা দিল্লী উপস্থিত হইলে ঐস্থানের সন্তানগণও জয়ন্তী-উৎসবের অবকাশে মাকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শ্যামাপূজা এবং জগদ্ধাত্রীপূজা দিবসের অনুষ্ঠানে সমাগত নরনারীর নিকট মা মাতৃলীলামাহাত্ম্য আলোচনা করেন। কামাখ্যাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ভক্তসন্তানগণের কালীকীর্তন এবং একদিবস প্রখ্যাত শিল্পী পান্নালাল ঘোষের বংশীবাদন-শ্রবণে মা অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

রাজধানীতে অবস্থানকালে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সহিত একদিন মায়ের সাক্ষাৎ হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জে. এন. মজুমদার মহাশয় ছিলেন মায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ। মা দিল্লী যাইবার পূর্বেই তিনি একদিন আশ্রমে আসিয়া মাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন,—তাঁহার সুহৃৎ এবং সহপাঠী রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের সহিত মা যেন অবশ্য একবার সাক্ষাৎ করেন। ডক্টর প্রসাদকেও তিনি এই মর্মে পত্র দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী নির্দিষ্ট দিবসে মা রাষ্ট্রপতি-ভবনে গমন করেন। ডক্টর প্রসাদ সন্ন্যাসিনী মাতাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইলেন। ধর্মবিষয়ে এবং আশ্রমের শিক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইল।

অতঃপর কলিকাতায় আসিলে বিচারপতি মজুমদার মহাশয়ের বাটীতেও মায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। মায়ের সহিত তাঁহার পত্রালাপও চলিত।*

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীশ্রীসারদামাতার শুভ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করিয়া অগণিত নরনারী আশ্রমে আসিতে আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শতবার্ষিকী জয়ন্তীকে হেতু করিয়াও লোক সমাগম আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং এইভাবে দুর্গামাতার কর্মপরিধি বহুদূর সম্প্রসারিত হয়।

* ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের একখানি পত্র—

Rashtrapati Bhavan
New Delhi
১৫ই মে, ১৯৫৭

প্রণামান্তে নিবেদনমিদং

মা, আপনার আশীর্বাদপত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনি আমাকে যে আশীর্বাদ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার দেশবাসী আমার উপর যে গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন, আশা করি, আপনার আশীর্বাদে আমি নির্বিঘ্নে বহন করিতে সক্ষম হইব। আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ও স্বয়ং আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আপনার আশীর্বাদে আমরা সকলে কুশলে আছি। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

আপনার আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী
(স্বাক্ষর) রাজেন্দ্র প্রসাদ

সন্ন্যাসিনী দুর্গামা

বিবিধ প্রসঙ্গে

মানবের প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় তাহার সুশৃঙ্খল আচরণে অথবা সুসংযত সুন্দর বাক্যে নহে। যাহা কিছু স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত তাহাই তাহার জীবনসমীক্ষার বাতায়নস্বরূপ। দুর্গামাতার ক্ষেত্রেও তাঁহার স্নানাহারাদি নিত্যকর্ম এবং স্বচ্ছন্দ আচরণের মাধ্যমেই আমরা অতিসহজে উপলব্ধি করিতে পারি যে, কত সরল ও অনাড়ম্বর ছিল তাঁহার জীবনযাত্রা-প্রণালী। তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বকে মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছে যে বৈষ্ণবোচিত দীনভাব, শিশু-সুলভ সরলতা এবং হাস্যোচ্ছল কৌতুকপ্রিয়তা – প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ ক্রিয়াদির মাধ্যমে—তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে এই অধ্যায়ে।

মায়ের প্রাত্যহিক জীবনধারা :

মা আজীবন রাত্রিশেষে প্রায় চারি ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিতেন এবং আশ্রমবাসিনীদিগকেও এইসময়ে জাগরণের নির্দেশ দিতেন। কন্যাগণ উষাকালীন প্রার্থনা আরম্ভ করিলে মা স্নানান্তে মন্দিরে মঙ্গলারতি ও বালভোগ সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাদর্শনে বাহির হইতেন। আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া সমাগত নরনারীর সহিত সাক্ষাৎকার, পূর্বদিবসের পত্রাদিপাঠ ও উত্তরপ্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করিয়া পুনরায় স্নান করিতেন। অতঃপর মন্দিরে গিয়া পূজাহ্নিক, জপ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ পাঠ এবং শ্রীশ্রীগুরুমাতৃকার পূজার সহিত শ্রীশ্রীদামোদরজী ও শ্রীশ্রীগদাধরজীর মধ্যাহ্ন স্নান ভোগ সমাপন করিতেন। গৌরী-মাতার তুলসীমালাও মা জপ করিতেন এইসময়ে। আশ্রমের মুখ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, প্রভু জগন্নাথদেব এবং অন্যান্য দেবতার পূজা ও ভোগ রন্ধনাদি কার্য

আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মাতৃবৃন্দ করিয়া থাকেন। বিশেষ উপলক্ষে মা শ্রীশ্রীসারদামাতার সমাধিমন্দিরে পূজা করিতেন। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম, তৎপর আশ্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া মা একতলায় নামিতেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত কখনও বহিঃকক্ষে পুরুষ সন্তানদিগের নিকট, কখনও-বা অভ্যন্তরে মহিলাবৃন্দের সহিত নানাবিষয়ে আলোচনা করিতেন। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সংবাদ শ্রবণ করিতেন এবং অবস্থাবিশেষে আর্তের সান্ত্বনা এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের প্রশ্নের মীমাংসাও তিনি করিয়া দিতেন। তাঁহার ধর্মোপদেশ ও সহৃদয় আচরণ সকলের প্রাণেই তৃপ্তি দান করিত। রাত্রি সাড়েদশ ঘটিকায় ত্রিতলে উঠিয়া পুনর্বার সংক্ষেপ-স্নানান্তে দেবতার রাত্রিকালীন সেবার পর স্বয়ং সামান্য আহার্য গ্রহণ করিতেন প্রায় বার ঘটিকায়। অতঃপর শয্যাগ্রহণ। পুনরায় জাগরণ রাত্রি চারি ঘটিকায়। সমগ্রজীবন এইরূপেই তিনি কর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অবসাদ অথবা ক্লান্তি তাঁহাকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।

ভক্তগণের সংখ্যাধিক্যহেতু দৈনিক পত্রাদির আদানপ্রদান যখন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল, তখন স্বহস্তে পত্রোত্তর লিখন মায়ের পক্ষে আর সম্ভব হইত না। কেবল তাহাই নহে, কোন একজন কন্যার পক্ষেও তখন বিভিন্নপ্রকার উত্তর শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং মা এই ব্যাপারে এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। একসঙ্গে তিন-চারিজন কন্যাকে পত্র লিখিবার উদ্দেশ্যে মা তাঁহার নিকটে বসাইতেন। পর পর প্রত্যেককে কিয়দংশ বলিলে তাঁহারা তাহা লিপিবদ্ধ করেন। পুনরায় প্রথমার পালা আসিলে, তাঁহাকে পূর্বে কি বলা হইয়াছে তাহা মায়ের স্মরণে থাকিত, সুতরাং তৎপরবর্তী অংশ তাঁহাকে বলিতেন। যথাক্রমে এরূপে এককালে তিন-চারিখানি পত্রোত্তর লিখন সম্পন্ন হইত। ইহার পর আরম্ভ হইত অন্য এক প্রস্থ। সর্বশেষে, লিখিত পত্রগুলি মা স্বয়ং একবার পাঠ করিতেন। পত্রোত্তর প্রদানকালে কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিতও

মাকে বাক্যালাপ করিতে হইত। নবাগতগণ এই দৃশ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন, ইহা সম্ভবপর হইতেছে কিরূপে! ধর্মোপদেশ, শোকে সান্ত্বনা, কাহাকেও বা সংসারের কর্তব্যপালনের নির্দেশ,— এইরূপ বিভিন্নপ্রকারের পত্রের উত্তর মাকে একই সময়ে প্রদান করিতে হইত। কিন্তু একখানির সহিত অপরখানির বক্তব্যে কখনও কোন গোলযোগ ঘটিত না।

সহজাত সংযম ঃ

গৌরীমাতার শিষ্যা দুর্গেশনন্দিনী বসু মায়ের বাল্যকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, কলিকাতায় "স্থায়িভাবে আশ্রম হইবার পূর্বে মাতাজী অনেকসময় সঙ্গে দুর্গাপুরীকে লইয়া গৃহস্থবাড়ীতেও থাকিতেন। তিনি যখন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন তখন আশ্রমের কার্যব্যপদেশে অধিকাংশ দিনই বাহিরে যাইতেন। দেখিতাম, মাতাজী সকালে দুর্গাপুরীকে কোন কোন দিন এক আনা দামের একটি 'বরফি' খাওয়াইয়া চলিয়া যাইতেন, আর হয়তো রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া রান্না করিয়া দামোদরজীউর ভোগ দিয়া তবে দুর্গাপুরীকে খাইতে দিতেন। মাতাজীর বিনা অনুমতিতে দুর্গাপুরীকে কিছু খাইতে দেওয়ার সাহস কাহারও ছিল না। কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তিনি হাসিমুখে তাহার সহিত আলাপ করিতেন। কোনদিন কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখি নাই। ছোটবেলা থেকেই তিনি ত্যাগ সংযমের জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়াছেন।"

বাল্যকাল হইতেই এই কঠোর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ও নিদ্রাকে মা এমনভাবে জয় করিয়াছিলেন যে, উপবাস, অনিদ্রা অথবা শারীরিক অসুস্থতাসত্ত্বেও ঘন্টার পর ঘন্টা কর্তব্য পালনে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন না। এমন-কি, অনেক সময় কেহ বুঝিতেই পারিত না ১০৩।৪ ডিগ্রী জ্বর সত্ত্বেও তিনি যথারীতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিতেছেন। অসুস্থ হইলে শরীরের কোন্ স্থানে যে কষ্ট তাহাও মা সঠিকভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেন

না। সেবিকাকে দেখাইয়া চিকিৎসককে বলিতেন, 'ওকে জিগ্যেস কর, বাবা।' সেবিকার বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ সময় চিকিৎসককে মায়ের ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইত।

অনাড়ম্বর বেশভূষা ঃ

সন্ন্যাসগ্রহণের পর হইতে মা সরুপাড় ধুতি ব্যবহার করিতেন এবং ভূষণ ছিল শঙ্খবলয় ও লোহা। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীসারদামাতা সরুপাড় ধুতি পরিধান করিতেন, এইহেতু তাঁহার কন্যাও সেই বেশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে সন্তানসন্ততিবর্গের অনুরোধে মা প্রশস্ত লালপাড় সাড়ী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এইসময় হইতে কপালে শ্বেতচন্দনের মধ্যস্থলে রক্তচন্দনের 'টিপ'ও ধারণ করিতেন। রাত্রে বিশ্রামকালে তিনি পরিধান করিতেন সরুপাড় ধুতি। বস্ত্রাদি ও শয্যার পরিচ্ছন্নতার প্রতি মায়ের চিরদিনই দৃষ্টি ছিল প্রখর।

স্নানভোজন ঃ

গঙ্গাস্নানে মা সমগ্রজীবনই ছিলেন প্রীতিযুক্ত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুযোগ পাইলে মা প্রায়ই গঙ্গাস্নানে যাইতেন। অসুস্থতানিবন্ধন অবগাহনস্নান সম্ভব না হইলে একবার অন্ততঃ গঙ্গাদর্শন করিতে পারিলেও তিনি তৃপ্তি বোধ করিতেন।

এলাহাবাদের 'নর্দান ইণ্ডিয়া পত্রিকা'র বার্তা-সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ চন্দ মায়ের গঙ্গাপ্রীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"মায়ের প্রয়াগবাসকালে একদিন সকাল প্রায় ৯॥০ টার সময় রাজপথে মায়ের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ। তিনি একটি ক্ষুদ্রদল নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলেছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। পশ্চিমাঞ্চলের রোদ সকালেই বেশ প্রখর। দলের পশ্চাতে একটি রিক্সা অনুসরণ করছে। মা সকলের সঙ্গে বালিকার মত হাস্যপরিহাস করতে করতে চলেছেন। একজন ব্রহ্মচারিণী মায়ের মস্তকোপরি একটি

ছাতা ধরে চলেছেন। দেখা হতেই পথিমধ্যে মাকে প্রণাম করলুম। মা সস্নেহে চিবুক ধরে আমায় আশীর্বাদ করলেন। আর বলতে লাগলেন, 'দেখো বাবা, আমাদের এই কাণ্ড। দল নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে নাইতে যাচ্ছি। প্রয়াগরাজের এই তো প্রধান তীর্থকর্ম। তুমি যাবে বাবা ?'

"আমি বললুম, 'গোলামীর তাগিদ আছে। আজ আর হবে না।' একটু থেমে আবার বললুম, 'সঙ্গমে স্নান সহসা ঘটে না। তবে সকালে একটু বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গাদর্শন করি। সঙ্গম আর সরস্বতী ঘাট এখান থেকে বেশী দূর নয়।'

"মা বললেন, 'তা বেশ, বেশ।' বলেই তাঁর অনবদ্যকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'তব প্রেক্ষণং পাবনম্।'

'তব প্রেক্ষণং পাবনম্' মার মুখের এই বাক্যের ঝংকারটি বড়ই মধুর লেগেছিল। মনে মনে বার বার আউড়েছিলুম।

"সৌভাগ্যক্রমে এই গঙ্গাস্তুতির দুটো পংক্তি পরে এক পুস্তকে দেখতে পাই। যথা—

'তত্তীরে বসতিস্তবামলজলে স্নানং তব প্রেক্ষণম্।
তন্নামস্মরণং তবোদয়কথাসংলাপনং পাবনম্॥'

"মা সামান্য কথার ছলেই অসামান্য ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। কথায় কথায় তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের গভীর উপলব্ধি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বেরিয়ে পড়তো।"

গঙ্গাস্নান ব্যতীত পরবর্তিকালে সমুদ্রস্নানও ছিল মায়ের প্রিয়। বাটীতে স্নান করিলে তাহা ছিল এক দর্শনীয় ব্যাপার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জল রক্ষিত থাকিত। তৈলমর্দনকালে পত্রাদি শ্রবণ ও উত্তরদান চলিত। অতঃপর কন্যাগণ একের পর এক বহুপাত্র জল মায়ের মস্তকে ঢালিয়া তাঁহার স্নানকার্য সমাপ্ত করিতেন, দৃশ্যটি হইত যেন—জগন্নাথ মহাপ্রভুর স্নানপর্ব।

মায়ের প্রসাদগ্রহণও ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জগন্নাথদেবের যেমন বহুবিধ দ্রব্য ভোগ হয়, মা-ও ভোজনে বসিয়া সেইরূপ প্রসাদের

নানাপ্রকার সমাবেশ দেখিলে প্রসন্ন হইতেন। কিন্তু একাকী ভোজনে তিনি কখনও তৃপ্তিলাভ করিতেন না। আশ্রমকন্যাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া আহারেই ছিল তাঁহার আনন্দ। মায়ের আহার্যগ্রহণও ছিল অসাধারণ,—যেন দৃষ্টিভোগ। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা তিনি বিভিন্ন বস্তু জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া কোনটির কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিতেন। অন্ন মাখিয়া গ্রহণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। ভাজা, বড়া এবং ময়দা-প্রস্তুত দ্রব্যাদি ছিল তাঁহার অধিকতর প্রিয়। ফলের মধ্যে কচি শশা, নরম নারিকেল, পেস্তা, আখরোট, কচি ভুট্টা, মটর ও ওলন্দাশুঁটির দানা ছিল তাঁহার নিকট রুচিকর। মিষ্টান্নের মধ্যে নরম সন্দেশ ও ক্ষীরের বরফি মা পছন্দ করিতেন। শৈশবে 'আউয়া-ভাতে' (অর্থাৎ আলুসিদ্ধ) ছিল তাঁহার প্রধান খাদ্য।

আশ্রমবাসিনী কন্যাগণ ছিলেন তাঁহার প্রসাদের নিত্য অংশীদার। সমাগত ভক্ত নরনারীও ইহা হইতে বঞ্চিত হইতেন না। প্রসাদের অংশ ভক্তবৃন্দের কাহার কাহারও নামোল্লেখ করিয়া মা স্বহস্তে তুলিয়া রাখিতেন, তাঁহারা সন্ধ্যায় আসিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। আহারে বসিয়া যে-সকল হাস্যোদ্দীপক গল্প বলিয়া কন্যাগণকে তিনি আনন্দ পরিবেশন করিতেন, তাহার কয়েকটি এই অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হইল।

মায়ের দীনভাব :

একদিন জনৈকা মহিলা মাকে প্রণাম করিতেছেন এবং স্বগতঃ বলিতেছেন, 'জ্যান্ত জগদম্বা, সাক্ষাৎ ভগবতী দর্শন। মা তো আমার সাক্ষাৎ ভগবতী।'

করজোড়ে মা বলেন, 'অমন কথা বলো না, মা, আমি তাঁর দাসী-মাত্র, তাঁর সেবিকা, কন্যা তাঁর।'

অন্য একদিন এক মহিলা মাকে জিজ্ঞাসা করেন, মা, গুরু আর ইষ্ট কি এক? আমি যে আপনাকেই স্বপ্ন দেখেছি। গুরুকে অবলম্বন করেই কি তাঁর কাছে পৌঁছান যাবে না? মা উত্তরে বলেন, 'শ্রীমা-ই

বলিলেন,—কুমারটুলীতে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরের নিকটে এক রিক্সাওয়ালাকে পথ হইতে সচকিতে একটি রুমাল তুলিয়া লইতে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়, তিনি তাহাকে উহা দেখাইতে বলেন। জিনিষগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—এইগুলি সাধুমার, কারণ সাধুমা এই পথে প্রায়ই প্রাতর্ভ্রমণে আসেন। সুতরাং তিনি উহা তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়াছেন। জিনিষগুলি সত্যই সাধুমার, ইহা জানিয়া এবং তাঁহার হস্তে উহা অর্পণ করিতে পারিয়া তিনি স্বস্তিবোধ করিলেন। সেই ব্যক্তির সততায় প্রসন্ন হইয়া মা তাঁহাকে প্রসাদ এবং একখানি নূতন বস্ত্র দান করেন।

কলিকাতায় বর্তমান বিদ্যালয়ভবনের জমির মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে একখানি জরুরী পত্র পাইয়া মা অর্থসাহায্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জনৈক সন্তানকে প্রেরণ করিলেন শোভাবাজারের সহৃদয় বিত্তবান ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীজগন্নাথ রায় এবং শ্রীবলরাম রায়ের নিকট। সন্তানটি মনে করিলেন, মূল পত্রখানি দেখাইলে অর্থের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দাতাদের মনে সহজে বিশ্বাস ও সহানুভূতি জন্মাইবে। সুতরাং তিনি মূল কাগজখানি চাহিলেন। যে কারণেই হউক, মা প্রথমে আপত্তি করিলেন, তথাপি সন্তানটির বিশেষ অনুরোধে উহা তাঁহার হস্তে দিলেন। তিনি উহা সঙ্গে লইয়া গিয়া দাতাদিগকে দেখাইলেন। কিন্তু, ফিরিবার পথে তাঁহার অনবধানতাবশতঃ নির্দেশপত্রটি হারাইয়া যায়। লজ্জায় ও অনুশোচনায় সেদিন সন্তানটি আশ্রমে আসিলেন না এবং সাক্ষাতের ফলাফলও মাকে কিছু জানাইলেন না।

ঐ রাত্রেই অপরিচিত এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক টেলিফোন-যোগে আশ্রমে জানাইলেন,—আশ্রমের নামে কর্পোরেশনের একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্র তিনি পথে পাইয়াছেন এবং 'সারদেশ্বরী আশ্রম' নাম টেলিফোন ডিরেকটরীতে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন,—আগামী কাল আশ্রমের কেহ যেন তাঁহার ঠিকানায় গিয়া পত্রখানি লইয়া আসেন।

স্বপ্নও সত্য হয় ঃ

মায়ের জীবনের দুইটি স্বপ্নবৃত্তান্ত এইস্থানে উল্লেখ করা হইল। দুইটিই ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস।

১৩৪৭ সালের পৌষমাসে শ্রীশ্রীসারদামাতার শুভ জন্মোৎসবের কয়েকদিবস পুর্বে একরাত্রে মা স্বপ্ন দেখেন,—শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিতেছেন, 'আমার এখানে রাঁধবার লোক নেই, যে রাঁধতো সে চলে গেছে, তুমি আমাকে একটি মেয়ে দাও।' মা জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি যাব মা?' শ্রীশ্রীমা বলেন, 'তোমায় দিয়ে তো হবে না, মা, আমি এমন মেয়ে চাই যে সবরকম 'নিদিনিস্কুতি' রাঁধতে জানে।'

মা প্রথমে স্বপ্নের কোন তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় মন তাঁহার ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। পরদিবস প্রাতে নবীন ময়রার দোকান হইতে সন্দেশ আনাইয়া তিনি মাতাঠাকুরাণীকে ভোগ নিবেদন করিলেন। অতঃপর স্বপ্নবৃত্তান্ত সকলকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে যাবে মার কাছে?' একটি কন্যা বলিল, 'বাপ্‌রে, আমি যাব না, মা।' কিন্তু উপস্থিত অন্য একটি দুরন্ত কন্যা বলিল, 'আমি যাব, মা।'

আশ্চর্যের বিষয়, সেইদিবস সন্ধ্যা হইতেই মন্দিরের ভোগরন্ধনকারিণী পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমারী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। দ্বিতীয় দিবসে দেখা গেল, তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত লাল দাগে ভরিয়া গিয়াছে এবং সে প্রায় অচৈতন্য। অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে মা চিকিৎসক আনাইলেন। রোগীকে দেখিয়াই চিকিৎসক বলিলেন, "এ অতি মারাত্মক ধরণের বসন্ত, হাজারে একজনও বাঁচে কিনা সন্দেহ। একে এক্ষুণি হাসপাতালে পাঠাতে হবে।" মা মহাসমস্যায় পড়িলেন। কন্যাটি দুঃস্থা, মাতাপিতৃহীনা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই সে মায়ের স্নেহে লালিতপালিত। তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে মা কোনমতেই সম্মত হইলেন না। চিকিৎসক বলেন,—এমন রোগের

চিকিৎসা আশ্রমে হতেই পারে না। বিশেষতঃ সামনে উৎসব, যদি উৎসবের দিন কিছু ঘটে যায়, তাহলে তখন কি করবেন? নিরুপায় হইয়া মা ঐ ব্যবস্থায় সম্মতি দান করিলেন। কন্যাটি ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রেরিত হইল। প্রত্যহ তাহার সংবাদ আনয়নের জন্য মা একটি সন্তানকে নিযুক্ত করিলেন। সুচিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় হইল। কিন্তু, উৎসবের পূর্বদিবস সন্ধ্যায় সংবাদ পাওয়া গেল, সর্বপ্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে, কন্যাটির দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। মা বলিয়াছিলেন,—সেবাময়ী কন্যাটি শ্রীমার সেবার জন্যে তাঁর জন্ম-তিথিতেই তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল। ওকে মা-ই টেনেছেন।

১৩৫৮ সাল। বুদ্ধপূর্ণিমার পূর্বরাত্রে মা স্বপ্ন দেখেন—নয়নাভিরাম এক কৃষ্ণকায় বালক মায়ের বাহুতে তাহার কোমল হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তোমার হাতে বড় ব্যথা, না? আমি সারিয়ে দেব?" তদুত্তরে মা বলেন, "আমার হাত দামুর সেবার জন্য, তাঁর সেবাটুকু যেন করতে পারি, তারপর ব্যথা থাকা না-থাকা সে তাঁর ইচ্ছে।"

এই স্বপ্নদর্শনের পরই মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। মা স্নানাগারে যাইবেন, কন্যাগণ সকলেই তখন নিদ্রিত। যদি তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এইরূপ ভাবিয়া মা আলো না জ্বালিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইতে গিয়া সহসা ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। পতনের শব্দে কন্যাগণের অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর উপর শরীরের ভার, মা পতিত অবস্থায় রহিয়াছেন। বাহুমূলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। মায়ের সেবিকাবৃন্দ প্রাথমিক শুশ্রূষাদ্বারা তাহা লাঘবের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম হইল না। প্রাতঃকালে চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষান্তে বলেন,—"যতদূর মনে হচ্ছে, হাড়ের কোথাও চিড় খেয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক্স-রে প্রয়োজন।" তিনি যন্ত্রণাহ্রাসের ঔষধ দিলেন। ঔষধে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইল বটে, কিন্তু হস্ত অচল হইয়া পড়িল। অতঃপর রেডিওলজিষ্ট ডাক্তার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মায়ের আহতস্থান

এক্স-রে করিয়া বলেন, 'হাড়ে চিড় খেয়েছে।' মায়ের সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে দীর্ঘসময় লাগিয়াছিল।

গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু ঃ

মা বলিতেন, 'তুলসীপাতার যেমন ছোটবড় নেই,—সব সমান, গুরুর আত্মীয়পরিজনেরাও তেমন। তাঁদের দোষত্রুটি আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত কাজ।' ইহা তাঁহার কেবল মৌখিক উপদেশ নহে, আজীবন আচরণদ্বারাও মা সেই শিক্ষাই দিয়াছেন। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও গুরুবংশের কাহারও প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, 'ওঁরা কত জন্মজন্মান্তর বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের আরাধনা করে তবে তো জগন্মাতাকে ঘরে আনতে পেরেছেন। তাই আজ কেউ দিদি, কেউ পিসী, কেউ-বা ঠাকুমা বলার অধিকার পেয়েছেন। ওঁরা মায়ের কাছে যা চাইবেন তাই পাবেন। ওঁদের কাছে আমাদের কোন অপরাধ হলে কি আর রক্ষে আছে!'

শ্রীসারদামাতার সহোদর, ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রী কখনও কেহ আশ্রমে আসিলে মা অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন এবং বস্ত্র ও অর্থাদি দিতেন। এমন-কি, বিবাহিত হইলে পত্নীর জন্যও একখানি সাড়ী দিতেন। তাঁহাদিগের পুত্রকন্যাগণও কখনও বস্ত্র বা অলঙ্কারাদি যাচ্ঞা করিলে মা সাধ্যমত তাঁহাদের অভিলাষ সানন্দে পূর্ণ করিতেন। শ্রীমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণীর প্রতি ছিল মায়ের গভীর স্নেহ। মা বলিতেন, 'রাধু একটু খেয়ালী বটে, কিন্তু বড় সরল। ওর ভালবাসা বড় সাচ্চা।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা ও শিবরামদাদা এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগের প্রতিও মায়ের মনোভাব ছিল অনুরূপ। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীর আত্মীয়গণ আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলে মা পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন।

দেশপ্রেমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা :

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি মায়ের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি ছিল আন্তরিক। স্বদেশীযুগের বাংলার বিপ্লবীদিগের প্রতি মায়ের ছিল গভীর প্রীতি। তাঁহাদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, পবিত্রতা এবং বিশেষভাবে মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা—মাকে মুগ্ধ করিত। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে যুবকগণের মহৎ অবদানের কথা স্মরণ করিয়া তিনি গর্ববোধ করিতেন। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল-প্রমুখ শহীদগণের দেশপ্রেমের প্রসঙ্গে মায়ের মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বাল্যকালে শ্রীসারদামাতার সহিত বাসকালে মা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, বিপ্লবিগণ কেহ কেহ শ্রীমাতার দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। কেহ-বা তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণও করিয়াছেন, আবার কেহ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীমাতার প্রতি তাঁহাদের এই প্রগাঢ় ভক্তি মায়ের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

পরবর্তিকালে দেশপ্রেমিকদিগের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত মায়ের সাক্ষাৎ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁহার স্নেহের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বঙ্গজননীর বরপুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুকালে মা ছিলেন পুরীধামে। মন্দির হইতে ফিরিবার পথে এই শোকসংবাদ তিনি শ্রবণ করেন। মা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, তাঁহার অশ্রুমোচন হইতে লাগিল। গৃহে ফিরিয়া সেদিন তিনি কোন আহার্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

মনুষ্যেতর জীবপ্রীতি :

মায়ের স্নেহভালবাসা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মূক পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার মমতা ছিল অকৃত্রিম।

গিরিডির আশ্রমবাটীতে একটি গাভী ছিল, মা তাহার নাম

রাখিয়াছিলেন 'শ্রীমতী'। কলিকাতা হইতে যাইবার কালে তাহার জন্য মা সন্দেশ লইয়া যাইতেন এবং স্বহস্তে তাহাকে আহার করাইতেন। প্রত্যহ তাহাকে অন্নপ্রসাদও দিতেন। বাহিরের নাটমন্দিরে বসিয়া মা কর্মীদিগকে বলিতেন, "শ্রীমতীকে নিয়ে এস, একটু দেখি।" গাভীটি ছিল অতিশয় দুরন্ত, কিন্তু মায়ের নিকট গিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইত। রাত্রে মশার উৎপাত নিবারণের উদ্দেশ্যে মা উহার জন্য একটি মশারী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। একবার শ্রীমতী অসুস্থ হইলে পশুচিকিৎসক দ্বারা তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং গিরিডি আশ্রমের একজন সন্ন্যাসিনীকে বলেন, "শ্রীমতীর সেবায় তুমি থেকো, মা। অবোলা জীব, শরীরের কষ্ট ওরা বলতে পারে না, বুঝে নিয়ে ওর সেবা করবে।"

অত্যধিক আদরযত্নে গাভীমাতাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া জনৈক সন্তান একদিন মন্তব্য করেন, 'গরু বেশী মোটা হয়ে গেলে দুধ দেবে কম।' মা এইরূপ কথা শুনিয়া বলেন, "এ কিরকম ব্যবসাদারী কথা তোমার! গোমাতা দুধ না দিন, আমার দুধ চাই না, উনি খেয়ে-দেয়ে সুস্থ থাকুন।"

শ্রীমতীর প্রসব হইলে মা গোবৎসকে অনেক আদর করেন, সস্নেহে চুম্বন করেন। নির্দেশ দেন, "দুধ যতখানি হয় তার আদ্দেক দোয়া হবে, আর বাকী সবটা থাকবে বাছুরের জন্যে।"

গিরিডি আশ্রমের সম্মুখস্থ বিরাট মহুয়া বৃক্ষ দুইটি শুক, সারী, শালিক, কাঠঠোকরা প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষীর আশ্রয়স্থল। কাঠ-বিড়ালীও উহাতে বাস করে। বিভিন্ন ঋতুতে বর্ণবৈচিত্র্যময় নবাগত বহু পক্ষীরও আগমন হয়। উহাতে কয়েকটি লক্ষ্মী পেচকও থাকে। ইহাদের প্রতি মায়ের ছিল বিশেষ প্রীতি। প্রবল ঝটিকা অথবা অসতর্কতাহেতু বৃক্ষ হইতে পতিত শিশু শাবকদের জন্য মায়ের চিন্তার অন্ত ছিল না। ইহাদের আহারের ব্যবস্থা কি হইবে, কিরূপেই-বা বৃক্ষকোটরে নিরাপদে পক্ষীমাতার নিকট উহাদের রাখিয়া আসা যাইবে, তাহার জন্য মায়ের কত ব্যাকুলতা!

পুরুষের নিন্দায় মনঃক্ষুণ্ণতা :

একবার মা এক ধর্মসভায় আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। তথায় সভানেত্রীর ভাষণে নারীজাতির প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা বর্ষিত হয়। বক্তৃতাশ্রবণে মা অতিশয় অস্বস্তি বোধ করেন।

আশ্রমে ফিরিয়া বলেন, "বক্তৃতা শুনে আমার মনে হল, হে ধরিত্রি, তুমি দ্বিধা হও। আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।" আরও বলিলেন, 'বাপভাই কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি পুরুষজাতির বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করি নি। আমার জীবনে ছেলেদের আচরণ মোটের ওপর ভালই দেখেছি। আমি জানি—আমি মা, ছেলেরা আমারই সন্তান। তারা মা বলে ডাকে, আমিও স্নেহ করি পুত্রজ্ঞানে। আর, সত্যি বলতে কি, পুরুষের সাহায্য ছাড়া কি সংসারের কাজ চলে? তা ছাড়া, ঠাকুর রামকৃষ্ণও পুরুষ, স্বয়ং পুরুষোত্তম।"

নারীর বৈশিষ্ট্য :

একদিন জনৈকা মহিলা-সাহিত্যসেবী আশ্রমে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথোপকথন-ব্যপদেশে মা বলেন, "মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হতে যাবে কেন? মেয়েরা মা, তারা পুরুষকে শিক্ষা দেবে, সুসন্তান গঠন করে সমাজের কল্যাণে সহায়ক হবে। আমি বলি, মায়েরা আদ্যাশক্তি, প্রধানা শক্তি। মায়েরা পালন করছেন ধরিত্রীর মত। এই দেহে সন্তান ধারণ করছেন, পালন করছেন, আবার সন্তানের পীড়নও সহ্য করছেন। একেবারে মাটি হয়ে মায়েরা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই তৃপ্ত। স্বামী পুত্রকন্যা আত্মীয় সকলকে ভালবেসেই তাঁদের সুখশান্তি। মাঠাকরুণ বলতেন, "মেয়েদের ত্যাগবুদ্ধি আসতে সময় লাগে। সংসারে এদের আকর্ষণ বেশী,

শৈশবে মা বাপ ভাই, যৌবনে স্বামী আর পুত্রকন্যা ; কিন্তু একবার যদি মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তাহলে শন্ শন্ করে এগিয়ে যায়।”

নারীর সমস্যায় ঃ

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন সম্পর্কে যখন পার্লামেণ্টে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময় প্রখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী, সরলাবালা সরকার, প্রভাময়ী মিত্র এবং আরও কয়েকজন প্রাচীনপন্থী মহিলা এই বিষয়ে মায়ের মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। প্রথম আইনটি সম্বন্ধে মা বলেন,—ইহাতে ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্নেহমধুর সম্পর্কটি ক্ষুণ্ণ হইবে ; পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তিও বহুবিভাজনের ফলে ক্রমে হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে মা তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পতির অনাচার অত্যাচার হইতে পত্নী দূরে থাকিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু-নারীর পক্ষে আইনের সাহায্যে স্বামীকে ত্যাগ করা সমীচীন নহে। আমাদের ভারতবর্ষ সতীসাবিত্রীর দেশ, আবার সেই পুরাতন আদর্শ-প্রীতি মায়েদের মধ্যে ফিরাইয়া আনা প্রয়োজন। নারীর বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ হিন্দু আদর্শের বিরোধী। ইহাতে সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে, সমাজে দুর্নীতিবৃদ্ধিরও আশঙ্কা জাগিবে।

অন্য প্রসঙ্গে। পশ্চিম-ভারতের জনৈকা ডিগ্রিধারী মহিলা ছিলেন কোন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যা এবং তাঁহার স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদ কর্মচারী। ফলে, বিবাহের পর উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, গৃহমধ্যস্থ বায়ুও হইয়া উঠে উত্তপ্ত। সেই মহিলা কখনও দুর্গামাকে দর্শন করেন নাই, জনৈকা হিতকামীর মাধ্যমে মায়ের নাম, নিবাস ও ইতিহাস জানিয়াছেন। অতঃপর তিনি মাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেন। তাহার সারমর্ম এইরূপ,—আপনাকে কখনো দর্শন করি নি, অন্যের কাছে আপনার কথা শুনেছি, সেই ভরসায় এই পত্র লিখছি। কিছুকাল আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে অনুমান করতে পারি নি,

কিন্তু এখন বুঝছি স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি, আশঙ্কা হয়—যে-কোন দিন রাগের মাথায় তিনি আমাদের দলের পক্ষে ক্ষতিজনক কোন কাজ করে বসতে পারেন। কিন্তু মা, আমার আদর্শ তো দেশসেবারই আদর্শ। আমি তা ত্যাগ করব কেন? ব্যক্তির চাইতে তো আদর্শ বড়। আমাদের সাংসারিক অভাব কিছু নেই, কিন্তু দিনের পর দিন এই নিয়ে ঝগড়া করা, অশান্তি বৃদ্ধি করাও তো ভাল নয়। আদর্শকে আমি ধর্ম বলেই মনে করি, ধর্মকে ত্যাগ করতে আমি রাজী নই। স্বামীর জীবন দুর্বহ করাও আমার সুখকর নয়। এমতাবস্থায় আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া কি আপনি উভয়ের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না?

মায়ের উত্তর,—মাগো, তোমাকে কন্যাজ্ঞানেই আমার মতামত জানাচ্ছি। আমিও এক সংঘভুক্ত। এটি ধর্মসংঘ, ভারতের প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত, এই আদর্শ আমি কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করি এবং প্রচার করি। সুতরাং আমার পক্ষে বলা উচিত হবে না যে, তোমাদের মনের দ্বন্দ্ব ও অশান্তির অবসানের জন্য বিবাহবিচ্ছেদই শ্রেয়ঃ বা একমাত্র পথ। হিন্দুর বিবাহ অবিচ্ছেদ্য, স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়তা জন্মজন্মান্তরের। আমার সংঘের কথা বাদ দিলেও মানুষ হিসেবে আমার একটি নিজস্ব সত্তা ও মতবাদ আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে চাই,—তুমি হিন্দুকুলে জন্মেছ, রাজনৈতিক আদর্শটা অনেক পরে শিক্ষা ও সঙ্গগুণে তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে। দেখা গেছে, অনেক সময় এবং অনেক কারণে অনেকেরই রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন ঘটে থাকে। রাজনীতির দলাদলিতে না গিয়েও অধিকাংশ মানুষ শান্তিতে জীবনযাপন করছে, দেশের সেবাও করছে। বিশেষতঃ ভারতীয় নারীর পক্ষে রাজনৈতিক বাদবিতণ্ডা ও দলাদলিতে অংশগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক নয়; পক্ষান্তরে, সন্তানপালন, সুসন্তান গঠন এবং সংসার রক্ষা করাই নারীর প্রধান কর্তব্য। নারীর এই দায়িত্বকে আমি গুরু এবং গৌরবের বলেই মনে করি। আরও একটা কথা, তুমি বিদুষী, যুক্তিতর্কে বুঝিয়ে স্বামীকে তোমার পথে

টেনে আন; তা যদি না পার, তাহলে স্বামীর মতেই আত্মসমর্পণ কর। আত্মসমর্পণও ত্যাগ, পরাজয় স্বীকার নয়। এই আত্মসমর্পণ করতে পারলে তবেই তোমাদের সংঘর্ষ ও অশান্তির সমাপ্তি হবে। বিবাহবন্ধন যখন স্বীকার করেছ, বিচ্ছেদের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। সংঘের অধীনে দেশসেবাই কর অথবা দশজনকে নিয়ে সংসারেই বাস কর, একজন প্রধানের মতানুযায়ী চলতেই হবে। সংসারে জননীকে সন্তানদের কত দৌরাত্ম্য আর আবদারই তো হাসিমুখে সহ্য করতে হয়, সেক্ষেত্রে তোমার ঐ ছোট্ট একটি সংসারে দু'জনে মিলেমিশে কেন থাকতে পারবে না, মা? তোমরা সুখে শান্তিতে সংসারধর্ম পালন কর,—সন্ন্যাসিনী মার এইই কাম্য।

সংসারের এইপ্রকার বহুবিধ সমস্যার মীমাংসার জন্য অনেকে মায়ের নিকট আসিয়াছেন। পতি আসিয়া পত্নীর আচরণের নিন্দা করিয়াছেন, আবার পত্নী বলিয়াছেন পতির বিরুদ্ধে; মাতা-পুত্রের বিবাদের কাহিনীও আসিয়াছে। উভয় পক্ষেরই প্রার্থনা—'মা, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে দিন।' মায়ের মধ্যস্থতায় এবং উপদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল দেখা গিয়াছে।

মায়ের গল্প ও কাহিনী ঃ

মা সাধারণতঃ যে-সকল গল্প বালিকাদিগের এবং সন্তানগণের নিকট বলিতেন তাহার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।—

ষড়্‌গাত্মক ঃ

একদিন স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী শচীদেবী গ্রীষ্মের দুপুরে ভোজনের পর বিশ্রামসুখ উপভোগ করছেন। এমনসময়ে তাঁদের নন্দনকাননে কোন জন্তুর বিকট শব্দে তাঁদের বিশ্রামের বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হল। উত্যক্ত হয়ে ইন্দ্র বাইরে এসে দেখেন, পারিজাত বৃক্ষের শাখায় বসে কোকিলের চেয়েও বড় একটা কালো রং-এর পাখী ঐরকম কর্কশ শব্দ করে চলেছে।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে দেবভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে একে অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন। পশুপাখীরাও না-কি ঐ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করত।

কর্কশকণ্ঠ ঐ পাখীকে দেখে খুব রাগতঃস্বরে ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন,—কস্ত্বং (কে তুমি) ?

পাখীটি বলল,—বায়সোঽহং (আমি কাক)।

—এখানে কেন এসেছ তুমি ? আর এমন অসময়ে ?

—স্বর্গে দেবতাদের সভায় গান শোনাব বলে মর্ত থেকে আমি এখানে এসেছি।

—বাঃ, তোমার মত গায়ক মর্তে ক'জন আছে ?

কাক হিসেব করে বলল, মর্তে শ্রেষ্ঠ গায়ক আমরা সংখ্যায় মাত্র ছ' জন—অহঞ্চ বর্ষমিত্রশ্চ পেচকো জম্বুকস্তথা।

দীর্ঘগ্রীবো রাসভশ্চ ষড়েতে গায়কোত্তমাঃ ॥

(আমি, ব্যাঙ, পেঁচা, শেয়াল, উট আর গাধা)।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই ষড়গায়কের পরিচয় শুনে স্তম্ভিত দেবরাজ বলেন,—একেনাকুলিতঃ স্বর্গঃ কিমু ষড়্ভিরেভিঃ পুনঃ।

ধন্যা বজ্রময়ী পৃথ্বী যন্ন যাতি রসাতলম্ ॥

(তোমার একার গানেই স্বর্গ তোলপাড়, এর ওপর ছয় জন ! ধন্য বজ্রকঠোর পৃথিবী, তিনি এখনও যে রসাতলে যান নি !)

দাঁড়াও, তোমার কৃতিত্বের যোগ্য পুরস্কার দিচ্ছি। এই বলে দেবরাজ তার দিকে ছুঁড়লেন একটি ঢিল। প্রশংসালাভের আশায় স্বর্গে গান শোনাতে গিয়েছিল, এমন পুরস্কারলাভে বায়স তৎক্ষণাৎ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল।

হা-মা-কা ঃ

মাতুল কংসরাজার মনে মহাদুশ্চিন্তা—ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণের হাতে মরতে হবে। কৃষ্ণ আর বলরামকে বধ করার জন্য কংস নানারকম কৌশল চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের মথুরায় আসার নিমন্ত্রণও

পাঠালেন। তাঁরা দুইভাই নিমন্ত্রণ পেয়ে মথুরায় এলেন। পথে এক রজককে দেখতে পেয়ে গোপবালকের বেশ ত্যাগ করে সুন্দর বেশে তাঁদের সাজতে ইচ্ছে হলো। তাই রজকের কাছে কিছু ভাল ভাল পোষাক তাঁরা চাইলেন। সে লোকটি রাজার রজক, দামী দামী কাপড়চোপড় ধুয়ে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাচ্ছিল। রাজার লোক সে, রাস্তার বালকদের অন্যায় দাবী গ্রাহ্য করবে কেন? দুইপক্ষেই বচসা আরম্ভ হয়। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমে গেল। রজক তো জানে না যে, সে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের সঙ্গে ঝগড়া করছে, তাই সে খুব উদ্ধতভাবে অনেক দুর্বাক্য বললে। শ্রীকৃষ্ণ আর সহ্য করতে না পেরে একখানি হাত দিয়েই রজকের গলা কেটে ফেললেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে রজকের সঙ্গীরা আর সেই ভীড়ের সব লোক যে যেদিকে পারল প্রাণভয়ে দৌড়ুতে লাগল।

তাদের অবস্থা দেখে অন্য পথচারীরাও খুব ভয় পেয়ে গেল। সবাই তাদের জিজ্ঞেস করছে, 'কি হয়েছে? তোমরা সবাই এমন করে দৌড়ুচ্ছ কেন?' তাদের মধ্যে একজন শুধু 'হা-মা-কা' বলেই আবার দৌড়ুতে লাগল। নতুন দল এসে এমন করে যারা পালাচ্ছে তাদের সবাইকে আবার জিজ্ঞেস করছে। তারাও সংক্ষেপে শুধু বলছে, 'আরে, হা-মা-কা আসছে, পালাও, পালাও।' সবাই ভাবছে হা-মা-কা!—সে আবার কি? আগের লোকদের দৌড়ুতে দেখে পরের লোকরাও সেইভাবে দৌড়ুতে আরম্ভ করল। প্রকৃত কারণ কেউই বুঝতে পারছে না, তবুও দৌড়ুচ্ছে। কিন্তু শেষে তাদের মনে হলো, ব্যাপারটা কি, সেটা আগে জানা দরকার। মথুরা নগরে এমন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটলো? শেষকালে নবাগত একটি দল এসে পালাচ্ছে এমন একজনকে ঘিরে ধরে তারা বললে, 'কি হয়েছে? সব খুলে বল।' নিরুপায় সেই লোকটি তখন ভয়ে আর ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। একটু সুস্থ হয়ে পরে বলল, "আরে ভাই, কি আর বলব! রাজার কাপড়চোপড় নিয়ে রজক রাজবাড়ীতে যাচ্ছিল। কোথাকার সুদর্শন বালক এসে তার পথ আগলে বলে, 'এই সব কাপড়

আমাদের মাতুলের। মাথার বোঝা নাবাও, আমরা কতকগুলো পোষাক বেছে নেব।' বালক দুটি তার মাথা থেকে কাপড়ের বোঝা টেনে নাবিয়েছে, আর সুন্দর সুন্দর কয়েকখানা পোষাক নিয়েও নিয়েছে। এই নিয়ে রজকের সঙ্গে তাদের ঝগড়া বেধে গেল। রজক তাদের দুইভাইকে অনেক দুর্বাক্যও বলেছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছে। তখন তাদের মধ্যে যে ছেলেটা শ্যামবর্ণ, সে করল কি, সুদর্শন চক্র চালার ভঙ্গীতে খালি হাতেই প্রধান রজকের মাথাটা কেটে ফেলল। মুণ্ডুহীন দেহটা মাটিতে পড়ে গেল। এই সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে আমাদের সবার খুবই ভয় হলো, ছেলেটা যদি আমাদের সবার মাথাও হাতে কেটে ফেলে! সেজন্যেই আমরা সবাই চারদিকে এমনি করে দৌড়ে পালাচ্ছি। 'হাতে-মাথা-কাটা ছেলেটা আসছে', এত বেশী কথা বলার সময় তো নেই, তাই সবাই সংক্ষেপে বলছে, 'হা-মা-কা', 'হা-মা-কা', পালাও, পালাও।"

কুঁড়ে শিষ্য ঃ

এক গুরুর ছিল এক কুঁড়ে শিষ্য। গুরু একদিন তাকে বললেন, 'বাবা, এবার ভিক্ষেয় বের হও। কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে এসো, ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে।'

শিষ্য বলেন, 'আমি এখন জপে আছি।'

কিন্তু, ঠাকুরের নিত্যভোগের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। অগত্যা গুরু নিজেই ভিক্ষেয় বের হলেন। ভিক্ষে করে ফিরে এসে শিষ্যকে বলেন, আমি তো খেটেখুটে নিয়ে এলুম, তুমি এবার রান্না কর।'

শিষ্য জবাব দেন, 'আজ্ঞে, আমার জপ তো এখনও শেষ হয় নি। দেরী হবে।'

গুরু আর কি করেন! নিজেই রান্না করে, ভোগ নিবেদন করে শিষ্যকে ডাকলেন, 'এবার পেসাদ পেতে এসো।'

শিষ্য তৎক্ষণাৎ ভক্তিভরে বলেন, 'গুরুদেব, দু-দু'বার গুরুবাক্য লঙ্ঘন করেছি, এবার আর নয়।' বলেই পেসাদ পেতে বসে গেলেন।

জয় গুরু—জয় আমি ঃ

ভক্তিমান এক শিষ্য নানা উপচারে গুরুর সেবা করেন। গুরু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু অর্থলোভী, ভোগবিলাসী ; তাঁর প্রেম আর ভক্তির খুবই অভাব। গুরুর সেবায় শিষ্য সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন, একেবারে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থায়ও গুরু কিছু পরিমাণ সোনা চাইলেন নিঃস্ব শিষ্যের কাছে। শিষ্য নিরুপায়, গুরুর মনস্কামনা কিভাবে পূর্ণ করা যায় ? তিনি শুনেছেন, পঞ্চগব্যে দেবতার পুজো হয়, গোময় স্বর্ণতুল্য। তাই, একটু গোময় এনে ভক্তিভরে গুরুর চরণপ্রান্তে রাখলেন।

শিষ্যের প্রণামীর ঘটা দেখে গুরু মহারুষ্ট হয়ে বললেন, 'যা ব্যাটা যা, নদীতে ডুবে মরগে যা।' 'যে আজ্ঞে' বলে গুরুদেবকে প্রণাম করে ভক্ত শিষ্য প্রশান্তমনে চললেন মৃত্যুবরণ করতে। যেতে যেতে অনেক দূরে গিয়ে দেখেন, সামনে নদী। গুরুর আজ্ঞাপালনে নদীর জলে নাবলেন ডুবে মরতে। কিন্তু নদীর জল কমে যায়, হাঁটুর ওপর জল ওঠে না, ডোবা যায় না। বিফলমনে শিষ্য আবার চলেন, নদীর পর নদী খোঁজেন, সর্বত্রই সেই হাঁটুজল। কেউ আর তাঁকে ডুবে মরতে দেয় না।

অবশেষে এক নদীর পরপারে গিয়ে দেখেন, ফলফুলে সুশোভিত এক চমৎকার অরণ্য, তার মধ্যে খুব সুন্দর একটি মন্দিরে বিরাজ করছেন—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ। চিত্তহারী মূর্তি। তাঁর ইষ্টমূর্তি। পরমভক্তিভরে দণ্ডবৎ করে উঠে দেখেন—পেছনে রয়েছে দু'টি সোনার পাহাড়। সূর্যকিরণে ঝলমল করছে।

প্রসন্নহাসিতে জিজ্ঞাসা করেন দেবতা,—কি চাই তোর ?

গুরুর প্রসন্নতা ছাড়া ভক্তিমান শিষ্যের আর কোন চিন্তা নেই, কামনা নেই ; করজোড়ে নিবেদন করেন,—আমার গুরুদেবের প্রণামীর জন্যে কিছু সোনা পেলে কৃতার্থ হব। আর কিছু কামনা নেই আমার।

দেবতা বলেন,—তথাস্তু। এ সোনার পাহাড় ছুঁটো তোর। তোর জন্যেই রেখে আমি চৌকী দিচ্ছি।

শিষ্য বিস্মিত, কৃতার্থ মনে করেন নিজেকে।

গুরুদত্ত মন্ত্রকে বিশ্বাস করেছেন শিষ্য, জপ করে করে তাকে করেছেন প্রাণবন্ত। 'জপাৎ সিদ্ধিঃ', ইষ্টলাভ হয়েছে। 'আদিত্যবর্ণং পুরুষং মহান্তম্'কে দর্শন করলে কিছুরই আর অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতা থাকে না। শিষ্য এখন আপ্তকাম, পূর্ণ।

ওদিকে গুরু বসে আছেন তাঁর অহঙ্কারের আসনে, হঠাৎ দেখেন,—শিষ্য আসছে ছুটতে ছুটতে। সেই ব্যাটা, যে গোবর দান করেছিল, যাকে তিনি ডুবে মরতে বলেছিলেন। কিন্তু, কিন্তু,—মনে হচ্ছে, এ যেন নতুন মানুষ, অশ্রুপুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিকের লক্ষণ যেন প্রকাশ পাচ্ছে ওর সারা দেহে! গুরু অবাক।

ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে শিষ্য বলেন,—গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমার ইষ্টদর্শন হয়েছে, সোনার পাহাড়ও পেয়েছি।

গুরুর ভাবের পরিবর্তন হয় শিষ্যকে দেখে, বলেন,—বাবা, আমাকে দেখাতে পারবি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে?

—হ্যাঁ পারব, আপনি আসুন।

ঈশ্বরদর্শী শিষ্য পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন গুরুকে। ভবনদী পার হতে হবে। শিষ্যের যেখানে হাঁটুজল, অনায়াসে এগিয়ে চলেন, গুরুর সেখানে অথৈ জল, ডুবে যাচ্ছেন। বিপন্ন গুরু বলেন,—তুই কি করে এগোচ্ছিস্ বাবা? আমি তো ডুবে যাচ্ছি।

শিষ্য বলেন,—কেন? আমি তো আপনার নামের বলেই—'জয় গুরু,' 'জয় গুরু' স্মরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি।

গুরু ভাবেন,—এই ব্যাপার! গুরু তো আমি, আমার নামের গুণেই ও এগিয়ে যাচ্ছে! তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'জয় আমি, জয় আমি, জয় আমি!' 'জয় আমি' বলে তিনি যত এগুতে যাচ্ছেন, তত জলে ডুবে যাচ্ছেন।

গুরুর দুরবস্থা দেখে শিষ্যের কান্নাকাটি। তাঁকে পিঠে তুলে 'জয়

গুরু', 'জয় গুরু', 'জয় গুরু' বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। শিষ্যের তখনও হাঁটুজল। শেষপর্যন্ত সেই দেবস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন গুরুশিষ্য। কিন্তু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণকে কেউ আর দেখতে পাচ্ছেন না; না গুরু, না শিষ্য।

গুরুভক্ত শিষ্য কাঁদেন দেবতার কাছে গুরুর জন্যে—প্রভু, দয়া করে আমায় যদি দর্শন দিয়েছেন, আমার গুরুকেও দর্শন দিতে হবে। আমার যদি কিছু পুণ্য থেকে থাকে, তার বিনিময়ে আমার গুরুকে দর্শন দিন দয়াময়।

সাধনসিদ্ধ শিষ্যের পুণ্যে দেবতার দয়া হলো। ততক্ষণে গুরুরও চৈতন্যোদয় হয়েছে। গুরু আর শিষ্য দুজনেই দর্শন পেলেন সেই চিন্ময় মাধবের।

জামাইঠাকুরের কাহিনী ঃ

একদিন শ্রীশ্রীদামোদরজীর সেবাপূজার পর অপরাহ্নে গৌরীমা বিশ্রাম করিতেছিলেন, তন্দ্রাবস্থায় শ্রবণ করেন, কে যেন বলিতেছেন, 'আমি বিনোদ, বৃন্দাবন থেকে এসেছি, বেলুড়ে আছি। শীগ্যির এসে আমায় দেখে যা।' গৌরীমা তখন কলিকাতায়, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্বক দুর্গামাকে বলেন, 'শীগ্যির চল বেলুড়ে। বৃন্দাবন থেকে বিনোদঠাকুর এসেছেন, দর্শন করে আসি।'

যথাসম্ভব দুইজনে বেলুড়ে উপস্থিত হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর তাড়াশের জমিদার বনমালী রায়ের সাক্ষাৎ পাইলেন।* গৌরীমা তাঁহার নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। জমিদার জানাইলেন,—স্বপ্ন সত্য, তিনিই রাধাবিনোদের বিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে লইয়া আসিয়াছেন অঙ্গরাগের জন্য। মাতৃদ্বয় বিগ্রহ দর্শন এবং প্রণাম করিলেন। দুর্গামা অতিনিবিষ্টচিত্তে শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করিতে করিতে সহসা প্রশ্ন করেন, 'ইনি কে? ইনি তো রাধা নন!'

* প্রজাগণ এই ভক্ত জমিদার বনমালী রায়কে 'রাজর্ষি' বলিতেন।

বনমালী রায় তাঁহার এহেন প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলেন, 'ইনি রাধা নন, কি করে জানলে তুমি এ কথা ?'

—দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইনি বৃন্দাবনের রাধারাণী নন, ইনি মানুষ।

দুর্গামা তখন বালিকা, বয়স প্রায় দশ। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও আগ্রহ দেখিয়া জমিদার বিনোদঠাকুরের অপূর্ব কাহিনী মাতৃদ্বয়ের নিকট ব্যক্ত করিলেন।—

প্রায় তিনশ বছর আগেকার কথা। পাবনা জেলায় তাড়াশের জমিদারীতে এক নিষ্ঠাবান ভক্তব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর নাম বাঞ্ছারাম অধিকারী। প্রতিদিন করতোয়া নদীতে তিনি স্নান করেন, ধর্মানুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মণ একদিন স্নানকালে শুনলেন, কে যেন বলছেন,—আমায় তোল্, ঘরে নিয়ে চল্। কথাগুলি শুনলেন বটে কিন্তু কাউকে কোথাও দেখতে পেলেন না। ব্যাপারটা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিনও একই ব্যাপার। ঘরে ফিরে ব্রাহ্মণ সেই অশরীরিবাণীর কথা স্ত্রীকে বললেন। ব্রাহ্মণী সব শুনে বলেন,—ওমা, সে কি কথা! তুলতে যখন বলেছেন কেউ, ডুব দিয়ে হাত্‌রে দেখবে তো! হয়তো কোন বিগ্রহ রয়েছেন সেখানে। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা—তোর ঘরে আমায় নিয়ে চল্। ব্রাহ্মণ জলে ডুব দিলেন, কিন্তু হাত্‌রে কাউকে পেলেন না। বিভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে আকুতি জানান,—আপনি কে ? রোজ রোজ আমায় একই কথা শোনাচ্ছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। কাঙাল ব্রাহ্মণকে কৃপাই যদি করছেন, তবে নিজগুণে দেখা দিন। এই বলে আর একবার ডুব দিয়ে নীচের মাটি হাত্‌রাতে লাগলেন। কিসের যেন স্পর্শ লাগে হাতে! নরম মাটির সঙ্গে কি যেন গেঁথে আছে! বস্তুটিকে তখন তিনি টেনে তুললেন, দেখেন—অপূর্বসুন্দর এক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ! দারুমূর্তি। হয়তো কোন হতভাগ্য সেবা-অপরাধ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে নদীতে সদ্য বিসর্জন দিয়ে গেছে! ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ পরম আনন্দমনে বুকে জড়িয়ে সেই

বিগ্রহকে নিজের কুটীরে নিয়ে এলেন, নাম রাখলেন 'বিনোদ।' ভক্তিভরে পূজো করেন, দীনভাবে ভোগের ব্যবস্থা করেন। বিনোদ সেবার উপকরণ ভক্তদের কাছ থেকে নিজেই জোগাড় করতে লাগলেন। চঞ্চল বালগোপালের মত তিনি অন্যলোকের বাড়ীতে গিয়ে দৌরাত্ম্যও করেন। তা সত্ত্বেও, সকলেই আনন্দ পান, তাঁর প্রিয়দর্শন মূর্তি দেখে। সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয় বিনোদ-ঠাকুরের অযাচিত কৃপা আর অলৌকিক লীলার কথা।

ক্রমে ভক্ত জমিদার রামহরি রায়েরও কর্ণগোচর হয় যে, তাঁরই জমিদারীতে বিনোদঠাকুরের অলৌকিক আবির্ভাব হয়েছে। সেবা-পূজোর প্রচুর জিনিষপত্র নিয়ে তিনি যান দেবদর্শনে। তাঁর যেন মনে হয়—দেবতা প্রসন্ন। বাঞ্ছারামের কাছে তিনি মনোবাসনা জানান যে, তাঁর নিজের বাড়ীতে বিনোদঠাকুরকে নিয়ে যাবেন। জমিদারের অনুরোধ ব্রাহ্মণ অস্বীকার করতে পারেন না। ধর্ম-প্রাণ জমিদারের গৃহে রাজোচিত ব্যবস্থায় সেবাপূজো পান গরীব ব্রাহ্মণের ঠাকুর। জমিদারের একমাত্র সন্তান বালিকা রাজলক্ষ্মীও তার ছোট্ট দু'খানি হাতে দেবতার সেবাকার্যে সাহায্য করে। প্রতিদিন তাঁর মন্দির পরিষ্কার করে, চন্দন ঘষে দেয়, ফুল তুলে মালা গাঁথে। বিনোদের সেবায় বালিকার একান্ত আগ্রহ, অন্তরে পরম আনন্দ। তার মনে হয়, বিনোদ যেন তার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসেন, কি যেন বলেন। উভয় দিকেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। অপরূপ সুন্দরী রাজলক্ষ্মী, সুদর্শন বিনোদ; লোকে বলাবলি করে—তাঁরা যেন বৃন্দাবনের রাধা আর শ্যাম।

এইভাবেই পরম আনন্দে দিন যায়, মাস যায়, চলে যায় বছরের পর বছর। বালিকা এখন কিশোরী। এক পূর্ণিমার রাত্রে রাজলক্ষ্মী সুগন্ধি এক ছড়া মালা গেঁথে বিনোদকে বলে,—দ্যাখো, কী সুন্দর মালা গেঁথেছি তোমার জন্যে! বিনোদ বলে,—কই, দেখি। কাছে গিয়ে ভাবের আবেগে সুন্দর মালাগাছি তাঁর গলায় পরিয়ে দেবামাত্র বিনোদ রাজলক্ষ্মীর কোমল একখানি হাত নিজের

হাত দিয়ে সজোরে আকর্ষণ করে সহাস্যে বললেন,—আমি তোমায় বিয়ে করবো।

কিশোরী লজ্জায় নত হয়ে বলেন,—দেবতার সঙ্গে মানুষের বিয়ে কখনও হয় না-কি?

—কেন হবে না? তুমি আমার লক্ষ্মী।

—হাত ছাড়, আমি এসব কথা জানি না।

অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিবাহ কি করে সম্ভব? পিতাকে এমন কথা কন্যা তো কোনমতেই বলতে পারে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষা বিনোদের আর সহ্য হয় না, স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জমিদারকে বলেন,— তোমার মেয়ের বিয়ে দাও আমার সঙ্গে।

অদ্ভুত প্রস্তাব! এমন বিবাহ কিভাবে হতে পারে? স্বপ্ন, কিন্তু, নিতান্ত মনের ভ্রান্তি ভেবে রামহরি রায় অগ্রাহ্যও করতে পারেন না। সমস্যারও কোন সমাধান হয় না। শেষে পণ্ডিতগণ বিধান দেন, শ্রীমতী রাধারাণী ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের পূজো অশাস্ত্রীয়। যত শীগ্যির সম্ভব, শ্রীমতীর ধাতুমূর্তি প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্তব্য।

শাস্ত্রের বিধান রাজলক্ষ্মীও শোনেন, মর্মাহত হয়ে বলেন,—সে কিছুতেই হবে না, আমি তবে প্রাণে বাঁচবো না।

ওদিকে, পণ্ডিতগণের মতেরও পরিবর্তন হয় না। রাধারাণীর ধাতুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই।

সমস্যা জটিলতর হতে থাকে।

পরবর্তী পূর্ণিমার গভীর রজনী। অপরূপ শোভায় পৃথিবী সেজে উঠেছে। পিয়াসী কিশোর-কিশোরীর অভিলষিত মিলন-বাসর প্রস্তুত। শ্যামল কিশোরের বংশীধ্বনি শুনতে পান কিশোরী, সেই সুর আকর্ষণ করে তাঁর আনন্দচঞ্চল দেহ-মন-প্রাণ। স্বপ্নের আবেশে কিশোরী বলে চলেছেন,—ঐ-যে বিনোদ আমায় ডাকছে। তোমরা কি কেউ শুনতে পাচ্ছ না? তোমরা কি বুঝতে পাচ্ছ না, আমার শুভলগ্ন যে এসেছে? ঐ তো বিনোদ আমায় নিতে এসেছে। আমি যাই, আমি যাই।

সেইরাত্রেই স্বপ্নে জমিদার রামহরিকে বলেন বিনোদ,—তোমার মেয়ে সামান্য মানুষ নয়, অনেক পুণ্যবলে তাকে পেয়েছিলে। তার আত্মা আমাতে লয় হয়েছে, স্থূল দেহের বিনাশ ঘটেছে। ঐ-যে সামনে নিমগাছ রয়েছে, ঐ দিয়ে তার অনুরূপ মূর্তি গড়িয়ে তারপর ওর দেহের সৎকার করবে।

আচম্বিতে টুটে যায় শঙ্কিত পিতার তন্দ্রা, ছুটে গেলেন প্রাণাধিক কন্যার শয্যার পাশে। বহুবার আকুলভাবে ডেকেও আজ আর তার নিদ্রাভঙ্গ করতে পারলেন না। দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রাণ, মুখে লেগে আছে দিব্যহাসি,— নিত্যমিলনের পরম আনন্দ!

বিনোদের নির্ধারিত সেই নিমগাছের কাঠে রাজলক্ষ্মীর আকৃতির অনুরূপ মূর্তি তৈরী হলো। জমিদারের বংশের মর্যাদা অনুযায়ী মহাসমারোহে কন্যা এবং জামাতার বাঞ্ছিত বিবাহের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। সেই থেকে বিনোদ 'জামাইঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

বিনোদের লক্ষ্মী—রাজার পুণ্যকীর্তি কন্যা রাজলক্ষ্মী মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমর হইয়া রহিলেন বিনোদঠাকুরের সঙ্গে একই পূজাবেদীতে—শ্রীরাধার মতই দীপ্তমহিমায়।

সঙ্গীতে অনুরাগ

দুর্গামা সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন। যথারীতি সঙ্গীত সাধনা তিনি করেন নাই, তথাপি সঙ্গীতে তাঁহার জ্ঞান এবং সহজাত রসবোধ ছিল। অবসর সময়ে অথবা যখন একাকী থাকিতেন আপনমনে গান গাহিতেন। দৈনন্দিন পূজাপাঠাদির পরেও দেবতাকে তিনি সঙ্গীত শুনাইতেন, অন্তরের প্রার্থনা জানাইতেন গীতির মাধ্যমে। কণ্ঠস্বরও ছিল মধুর। তাঁহার প্রিয় কয়েকটি সঙ্গীতের পদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে,—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ, দয়া জানি না ছাড়বি মোয়।

* * *

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, কৃপাবিন্দু বিতর।
(মোর) হৃদি-বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণমন সনে বিহর।

* * *

পরমানন্দ মাধবের নিকট সঙ্গীতের দ্বারা মায়ের আত্মনিবেদন ও কৃপাবিন্দু প্রার্থনা চলিত এইভাবে।

আবার, কখনও মায়ের এই আত্মনিবেদনের রূপটি প্রকট হইত অন্যভাবেও। প্রতিদিনের সুখদুঃখের পসরাকে ব্রহ্মময়ীরই কৃপার দানরূপে যেন নতমস্তকে মা গ্রহণ করিতেন,—

বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবলি দয়া তব জেনেছি মা দুখহরা।

* * *

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয় নি মা তোর মনের মত।

* * *

শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, নাচবি সেথা নিরবধি।

মায়ের সঙ্গীতের প্রসঙ্গে জনৈক সন্তান লিখিয়াছেন, "একদিন মায়ের একটি গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। স্থানটি পুরীর 'সিন্ধু-নিবাসে'র সম্মুখস্থ উন্মুক্ত সৈকতভূমি। সম্মুখে উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অসীম পারাবার, ঊর্ধ্বে নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ। সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

"মা আমাকে একটি গান গাহিতে আদেশ করিলেন। মায়ের আদেশে দুইটি ভজন গাহিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে,' এই গানটি জানি কি-না। গানটি আমার জানা না থাকায় মাকেই উহা গাহিবার জন্য একান্ত প্রার্থনা জানাইলাম। প্রার্থনায় মা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন,—

মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, আয় চলে
আয় আমার পাশে।...

গানটি গাহিতে গাহিতে মা যেন মহাসিন্ধুর ওপারের মধুর ডাক শুনিতে পাইলেন। দেহে স্পন্দন নাই, দৃষ্টি স্থির, কণ্ঠও নীরব। ক্ষণিক পরেই স্বাভাবিক অবস্থায় মা ফিরিয়া আসিলেন।"

শ্রীমাণিক বসুর স্মৃতিকথা ঃ

"একবার এই সন্তানকে উপলক্ষ্য করে গিরিডির কাছে একটা ওয়াটার ওয়ার্কস্ দেখানোর জন্য মা বাস-এর ব্যবস্থা করলেন।... ফেরার রাস্তায় আমি বাস-ড্রাইভারের কাছে বসেছি। মা আশ্রম-বাসিনী ও মহিলাদের নিয়ে বাসের মধ্যে বসেছেন। বাস যখন ফিরছে তখন একটা প্রাণমাতানো সুর ভেতর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ শুধু সুরটাই কানে আসছিল, একটু ভাল করে শুনে মনে হলো কোন শিশুকণ্ঠ। গানের ভাষা তখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম, গানটি—'এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয় নি মা তোর মনের মত' ইত্যাদি। একটু কৌতূহল হলো যে, আশ্রমের কোন শিশুর এমন সুমিষ্ট গলা! পিছনে তাকাতেই দেখি, মা নিজে গান গাইছেন। সঙ্গীত হৃদয়ের মধ্যে স্পর্শ করে যাচ্ছে।"

সুগায়িকা শ্রীমীরা সেন :

"মায়ের সাথে বৃন্দাবনে একটি মন্দিরে গেছি। সকলে কীর্তনগানে আত্মহারা। আমার মনেও সুরের পরশ লেগেছে। ভাবছি, একখানা গান যদি ঠাকুরের কাছে গাইতে পারতাম।···ঠিক এমনি সময়ে মা আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, 'এবার আমার এই মা ঠাকুরকে একখানি গান শোনাবেন।' আমি তো বিস্ময়ে বাক্যহারা। কিন্তু বিস্ময়ের আরও বাকী ছিল। তখনও আশ্রমকন্যারা কীর্তনগানে মগ্না, একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন তাঁরা। আমি ভাবছি অন্য কথা, ভাবছি,—আমার যে দু-চারখানি কীর্তন জানা আছে তার প্রায় সবগুলো আশ্রমকন্যারা আগে গেয়েছেন, আমার শেষসম্বল একখানি গান মাত্র আছে যা এখনও গাওয়া হয় নি। তাই মনে মনে শঙ্কিত হয়ে আছি, পাছে এই গানখানি কেউ গেয়ে দেয়। আস্তে আস্তে আশ্রমকন্যাদের গান শেষ হলো। শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে তাঁদের সুমধুর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি যেন বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। মনে হলো সবাই যেন 'সমাধি মগ্না।'

"এবার ধীরে ধীরে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন মা জননী, শান্তকণ্ঠে বললেন, 'মা, তুমি বিদ্যাপতির সেই পদটি গাও।' আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। কারণ যে পদটির কথা মা বললেন, সেইটিই আমার শেষসম্বল কীর্তনগানে—'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।' আর এই গানখানিই গাওয়ার জন্য আমিও তখন ব্যাকুল। সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে গেল। দু চোখের ধারার মধ্য দিয়ে গান কখন শেষ করেছি জানি না। মা আমার মাথায় হাত রেখে বহুক্ষণ ধরে আশীর্বাদ করলেন। তারপর কতবার আশ্রমে গেছি, মায়ের কাছে বসে বার বার এই গানখানিই গেয়েছি।"

কোন ভক্ত যদি শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণী অথবা অন্য দেবদেবীর উদ্দেশে সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রাণের আবেগে স্বকণ্ঠে তাহা গান করিতেন, সঙ্গীতের প্রতি মায়ের প্রবল অনুরাগহেতু শ্রুতিমধুর না হইলেও মা

অতিশয় মনোযোগসহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন এবং সেই সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব অনুভব করিয়া গায়ককে যথেষ্ট উৎসাহও দিতেন।

অন্তরে ভাব আছে, ভক্তিও আছে, কিন্তু রচনায় ছন্দবিন্যাস বা লালিত্য নাই, কণ্ঠস্বরেও মাধুর্য নাই, এমন এক সঙ্গীতসাধকের প্রসঙ্গে শ্রীবিনয়ভূষণ শূর লিখিয়াছেন,—

"এক গায়কের কথা। তাহার কণ্ঠ কর্কশ, সুর-তাল-লয়-এর বালাই নাই। তাহাকে কিন্তু দুর্গামা গানে খুবই উৎসাহ দিতেন। কত-না আদর করিতেন, কত প্রসাদ দিতেন, তাহার তুলনা নাই। ইহা মোটেই বাড়াইয়া লিখিতেছি না, বরং বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে তাহা যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

"গায়ক যখন গান করিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গ সকলেই হাসিতেন, এমন-কি মাকেও কখন কখন সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইত। বিশেষ করিয়া মায়ের কোন কোন সন্তান এবম্বিধ প্রয়াস মোটেই সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিতেন না, বরং বিদ্রূপের হাসিতে তাচ্ছিল্যই দেখাইতেন। তাহা ছাড়া, ইহাও কাহারও কাহারও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, যখনই ঐ গায়ক গান করিতেন তখন তাঁহারা গল্পগুজব করিয়াই ঐসময় কাটাইয়া দিতেন।

"মায়ের কিন্তু ঐ কর্কশকণ্ঠ গায়কের প্রতি স্নেহ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। মা তাহাকে খুব উৎসাহ দেন। কলিকাতা গেলে পত্র লিখেন, 'বাবা, তোমার গানের তুলনা নাই, আজও আমার কানে বাজিতেছে। বাবা, তুমি যখন নাটমন্দিরে (গিরিডিতে) গান গাও, আমি এখান হতে শুনতে পাই। আমি চলিয়া আসিলে তুমি ওখানে বসে বসে গান করো, আমি এখান থেকে শুনতে পাব। বাবা, তোমার লিখা গানগুলি বড়ই ভাল লেগেছে, ইহা শুধু কালির আঁচড় নহে, ইহা ভক্তের আত্মনিবেদন।"

সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মা বলিতেন, "জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি, আবার গানাৎ পরতরং ন হি," ঈশ্বরলাভের পথে সঙ্গীতও অন্যতম সোপান। তপস্যায় যেমন ভগবান ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, সঙ্গীতের তন্ময়তার

মধ্যেও তেমন তিনি আবির্ভূত হন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রমুখ মাতৃসাধকগণ ভক্তিসঙ্গীত দ্বারা জগন্মাতাকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনলাভেও সফল হইয়াছেন।

প্রখ্যাত গায়িকা সুরশ্রী শ্রীমায়া সেনের স্মৃতি ঃ

"একদিন আমার সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে মা ডান হাতখানি উপরদিকে তুলে বলতে লাগলেন গাইবার ভঙ্গীতে—'সা রে গা মা পা ধা নি—সারদামণি।' আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বলছেন,—'জান মা, মা সারদামণির আদিতে 'সা', অন্তে 'নি'। ঐ সা রে গা মা পা ধা নি—তোমারও জীবনসাধনা। সারদামণি আর সা রে গা মা পা ধা নি-কে একাকার করে এখন জীবনে গ্রহণ কর, সাধনা কর, এগিয়ে যাও তোমার অভীষ্টলাভের পথে। 'সা'-এর আকার, 'নি'-এর ই, আর দীক্ষার বীজমন্ত্র—এই তিনে মিলেই সারদা-সরস্বতীর রূপ আর রস তুমি অনুভব কর, মা। জান মা ? তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার শতসহস্র পথ আছে ঠিকই, কিন্তু দুটি পথই হলো শ্রেষ্ঠ—এক জপ, অপরটি সঙ্গীত। তবে মধুরতর পথ সঙ্গীতই।' এই বলে তানসেন, বৈঁজু বাওরা, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ সাধকসাধিকার প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেন। তারপর বললেন, 'সেই সঙ্গীতকে যখন জীবনে গ্রহণ করেছ, তখন সেই পরম পথ ধরেই চল মা, তোমার ধ্যানের ধনই সুরব্রহ্মস্বরূপা মা সারদা।'

"ব্রহ্মময়ী মায়ের এই পরম নির্দেশ—জীবনের পরম প্রাপ্তি। তারপরেও কতবার মা সঙ্গীত সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন। আমার মনে যখনই সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জেগেছে, অকপটে মাকে তা বলেছি, মনের মত উত্তরও পেয়েছি। সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি কথা মা প্রায়ই বলতেন, 'প্রাণের আবেগ, প্রেম আর নিষ্ঠা—এই তিনটিকে আত্মার স্পর্শ দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করবে, তবেই হবে আত্মসঙ্গীত।"

প্রকৃত সঙ্গীতের রূপ কি তাহা বুঝাইবার জন্য বৃন্দাবনে হরিদাস গোস্বামীর সাধনার পীঠস্থান নিধুবনে বসিয়া মা একদিন তাঁহার এই সঙ্গীতসাধিকা কন্যাকে নিম্নোক্ত কাহিনীটি বলিয়াছিলেন,—

"নিধুবনে বসে হরিদাস গোস্বামী সঙ্গীত সাধনা করেন। চারিদিকের বৃক্ষলতায় পরিবৃত শান্ত প্রকৃতিও যেন তন্ময় হয়ে শোনে সে সঙ্গীত। বন্য পশুপাখী, এমন-কি হিংস্র জন্তুরাও বাদ যায় না সে অমৃত-আস্বাদন থেকে। সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধক চান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

"ভারত-বিখ্যাত গায়ক তানসেন এই সঙ্গীতসাধকের শিষ্যত্ব লাভ করেন। সম্রাট আকবর শাহ একদিন দীনবেশে এসে উপস্থিত হন এইস্থানে। হরিদাস গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করে আর সঙ্গীত শুনে ভারতসম্রাট আত্মবিস্মৃত হলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, তাঁর ধন, দৌলত ঐশ্বর্যের বিরাটত্ব কত তুচ্ছ এ মহান সম্পদের কাছে।

"একদিন এক পথচারী এই বনাকীর্ণ পথে যেতে যেতে সহসা এমন মধুর সঙ্গীত শুনতে পেয়ে আকৃষ্ট হলেন। তিনি খুঁজতে খুঁজতে সাধকের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছে এসে বসলেন। ঐ পথিক কতক্ষণ ধরে যে ঐ একইভাবে বসেছিলেন তা তাঁর বোধ ছিল না। হরিদাস গোস্বামী যখন তানপুরা ছেড়ে চোখ মেলে চাইলেন তখন দেখেন—প্রতিদিনের মত জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে একটি মানুষও তদ্‌গত হয়ে বসে আছেন। পথিকের সংবিৎ তখন ফিরে এসেছে। তিনি যেন তখন অমৃত পারাবার থেকে স্নান করে উঠেছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পথিক সাধককে বললেন, 'আপনি স্বয়ং ভগবান, তা নয় তো এমন সঙ্গীত মানুষের কণ্ঠে সম্ভব নয়। এই বন্য জন্তুরাও হিংসাদ্বেষ ভুলে এমন মুগ্ধ হয়ে সঙ্গীত শ্রবণ করে!' একটু হেসে হরিদাস গোস্বামী উত্তর দিলেন, 'না, আমি মানুষ, আমি সঙ্গীত-পিয়াসী। আমি সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের সাধনা করছি মাত্র। যে সঙ্গীতে রয়েছেন পূর্ণব্রহ্ম, যে সঙ্গীত সব কিছুকে একাকার করে দেয়, সেই সঙ্গীতসাধনা আমার আজও পূর্ণ হয় নি। নইলে হিংস্র জন্তুরা আমার কাছ থেকে এখনও দূরে রয়েছে কেন? যেদিন এরাও এসে আমার দেহে মিশবে সেইদিনই বুঝবো যে, তিনি এসেছেন—সেই পূর্ণব্রহ্ম, আর সেইদিনই হবে আমার সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধি।"

আশ্রমের আরও প্রসার

১৩৬৩ সালে ভাদ্রমাসের বন্যায় বঙ্গদেশের যে-সকল স্থান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নবদ্বীপ সহর তাহাদের অন্যতম। সহসা নবদ্বীপ হইতে সংবাদ আসিল—চতুর্দিকস্থ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গঙ্গার জল সহরে প্রবেশ করিয়াছে। সমগ্র সহর জলমগ্ন। পত্রিকাতেও সংবাদ প্রকাশিত হইল,—রেল লাইন জলে নিমজ্জিত হওয়ায় কলিকাতা হইতে কোন রেলগাড়ী নবদ্বীপ ষ্টেশন পর্যন্ত যাইতে পারিতেছে না। নবদ্বীপস্থ আশ্রমবাটী—'গৌরী-নিকেতন' তখন একতলা, অধিকন্তু, সহরের অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। এই পরিস্থিতিতে কন্যাগণ কোথায়, কি অবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহাদের আহারাদিরই-বা কি ব্যবস্থা, কিরূপে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিবেন অথবা সাহায্য প্রেরণ করিবেন—এইপ্রকার নানাচিন্তায় মা উদ্বিগ্ন হইলেন।

সন্তানগণের নিকট এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ জানাইবামাত্র কয়েকজন তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন,—যে-কোন প্রকারে হউক, তাঁহারা নবদ্বীপে যাইবেন এবং যথাসত্বর কন্যাকুলকে কলিকাতায় লইয়া আসিবেন। পরামর্শের পর স্থির হইল,—দুইজন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগরের পথে এবং অন্য দুইজন হাওড়া হইয়া রওনা হইবেন। রেলগাড়ীতে যতদূর সম্ভব যাইবার পর অবস্থা বুঝিয়া পদব্রজে অথবা অন্য যে-কোন প্রকারে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। হাওড়া-নবদ্বীপগামী যে গাড়ীতে সন্তানদ্বয় রওনা হইলেন সৌভাগ্য-ক্রমে সেইদিবস সেইখানিই প্রথম নবদ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিল, কারণ ইতিমধ্যে বন্যার জল হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু নবদ্বীপে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন,—প্রায় সমগ্র সহরই জলমগ্ন। প্রধান প্রধান পথ দিয়া যাত্রীবাহী নৌকা যাতায়াত করিতেছে। অধিকাংশ সহরবাসী নিজের অথবা পরের বাটীর ছাদে কিংবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ কোন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মায়ের সন্তানদ্বয় নৌকাযোগে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—বাটীর আঙ্গিনার মধ্যে প্রায় সাত-আট ফুট গভীর জল এবং গৃহের অভ্যন্তরেও জল তিন-চারি ফুট। আশ্রমবাটীর সম্মুখস্থ একটি দ্বিতল বাটীর ছাদে আশ্রমবাসিনীগণ সকলেই আশ্রয় লইয়াছেন। মুক্ত আকাশের তলে, অভুক্ত অবস্থায় তাঁহাদের প্রথম রজনী অতিবাহিত হয়। বাটীর জিনিষপত্রাদি কতকাংশ আশ্রমের ছাদে অনাবৃত অবস্থায় এবং বাকী কক্ষাভ্যন্তরে জলের নিম্নেই রহিয়াছে। আশ্রম-কর্মিদ্বয়ের একজন সেইসকল দ্রব্যের চৌকীদারীতে আশ্রমবাটীর ছাদে এবং অপরজন মাতৃবৃন্দের বাটীতে রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় কলিকাতা হইতে আগত সন্তানগণকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পরম আশ্বস্ত হইলেন। অপরদিকে, কৃষ্ণনগরের পথে যাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহারাও অনতিবিলম্বে আসিয়া পৌঁছিলেন। মা কলিকাতা হইতে যে ভোজ্যদ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই সকলের সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। কিন্তু আশ্রমস্থ কূপে এবং চতুর্দিকে তখন অপরিষ্কৃত জল, পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য।

রেলষ্টেশনে যাইবার জন্য সেই রাত্রেই নৌকার ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে কন্যাগণ পরদিবস প্রাতের গাড়ীতেই কলিকাতায় আসিতে পারেন। মায়ের নির্দেশ ছিল—আশ্রমের দেবসেবার জন্য যাঁহাদের থাকা একান্তই প্রয়োজন, এইরূপ চারি বা পাঁচজন সন্ন্যাসিনী ব্যতীত অন্য সকল কন্যাকেই লইয়া আসিতে হইবে। তদনুযায়ী অধিকাংশ আশ্রমবাসিনীই কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহাদিগকে নিকটে পাইয়া মা-ও নিশ্চিন্ত হইলেন। নবদ্বীপের পূর্বাপর অবস্থা শুনিয়া মা পুনরায় উক্ত দিবসেই ত্রিপল, খাদ্যসম্ভার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ দুইজন সন্তানকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা নবদ্বীপে পৌঁছিয়াই প্রথমে ছাদের উপর ত্রিপলের আচ্ছাদনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর দুইদিনের মধ্যেই গৃহস্বামী শ্রীহরেরাম দে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া সহৃদয়তাবশতঃ উক্ত বাটীর দ্বিতলে মাতৃবৃন্দের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কয়েকদিবস পর জল হ্রাস পাইলে মাতৃগণ আশ্রমবাটী পরিষ্কৃত করিয়া স্বগৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু বন্যার জলে আসবাবপত্রাদি বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং বৃক্ষলতাদি নিশ্চিহ্নপ্রায়। এই বৎসরের বন্যার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে মা ইহার স্থায়ী প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শোভাবাজারের বিখ্যাত ধনী প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয়—সদাশয় শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীবলরাম রায়ের কন্যাগণ কলিকাতার আশ্রম-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেন। নবদ্বীপের তৎকালীন পরিস্থিতি জানাইয়া অর্থসাহায্যের জন্য মা তাঁহাদের নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাঁহারাও অবিলম্বে পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া মায়ের এই অভিলাষ পূর্ণ করেন। অতঃপর নবদ্বীপের আশ্রমবাটীর দ্বিতল নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়ণে মা সচেষ্ট হইলেন।

কলিকাতাতেও আশ্রম ও বিদ্যালয়—উভয়ত্র অন্তেবাসিনী এবং শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধিহেতু আশ্রমবাটীর সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। আশ্রমবাটীর পূর্বদিকে যে উন্মুক্ত ভূমিতে এতাবৎকাল আশ্রমের উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইত, মা এইবার তাহা ক্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। কেবল প্রসারের প্রয়োজনেই নহে, বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আশ্রমের পরিচালনায় এইস্থানে বহুবার পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ; গৌরীমা এবং বহু প্রাচীন ভক্ত তাহাতে অংশগ্রহণও করিয়াছেন। এইসকল কারণে উক্ত স্থানকে দুর্গামা পুণ্যভূমি জ্ঞান করিতেন এবং ইহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণও ছিল। কিন্তু, এই জমিতে নাবালকের স্বত্ব থাকায় আইনজ্ঞগণ পরামর্শ দিলেন—বঙ্গীয় সরকারের মাধ্যমেই ইহা ক্রয় করা সমীচীন। তদনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশন এবং ল্যাণ্ড একুইজিসন কালেক্টরের সহযোগিতায় উক্ত জমি ক্রয় করিবার জন্য মা উদ্যোগী হইলেন। ইহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন, ভূমির সমগ্র মূল্য সরকারের নিকট অগ্রিম জমা দিতে হইবে। মায়ের শিষ্যশিষ্যা এবং

পরিচিত বহু সহৃদয় নরনারী মুক্তহস্তে অর্থসাহায্যদ্বারা এই বিরাট কার্যকে সহজসাধ্য করিয়া দিলেন। শোভাবাজারের পূর্বোক্ত রায় ভ্রাতৃদ্বয় এই উপলক্ষেও পনর হাজার টাকা আশ্রমকে দান করেন। অবশেষে ১৩৬৪ সালের ১৪ই আশ্বিন, দেবীপক্ষে, বৃহস্পতিবারের পূর্বাহ্নে কর্পোরেশন এবং কালেক্টরের প্রতিনিধিগণ উক্ত জমির স্বত্বাধিকার আশ্রমের ট্রাষ্টী-সম্পাদিকা দুর্গামাতার হস্তে অর্পণ করেন। জমির পরিমাণ প্রায় সাত কাঠা এবং তাহার জন্য মূল্য দিতে হইয়াছিল প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার টাকা।

এইসময়ে গৌরীমাতার শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় মায়ের পক্ষে গৃহনির্মাণকার্য দ্রুত আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার পর ১৩৬৬ সালের আশ্বিন মাসে মা সর্বাগ্রে নবদ্বীপ-আশ্রমের গৃহনির্মাণকার্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কার্যারম্ভের অনতিকাল মধ্যেই নবদ্বীপ পুনর্বার বন্যার প্রকোপে পড়ে। এইবারও কন্যাকুলকে একমাসের জন্য অপর এক নিরাপদ বাটীতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। বন্যার অবসানে পুনরায় গৃহ-নির্মাণকার্য আরম্ভ এবং যথাকালে সমাপ্ত হইলে নবদ্বীপে গিয়া মা আশ্রমদেবতাদিগকে বিশেষ পূজাভোগ নিবেদন করেন। কয়েকদিবস নবনির্মিত দ্বিতলে বাসও করেন। ভবিষ্যতে বন্যা আসিলে কন্যাগণকে বিপন্ন অবস্থায় আর অন্যত্র যাইতে হইবে না,—ইহা চিন্তা করিয়া মা স্বস্তিবোধ করিলেন।

এতাবৎকাল গিরিডির আশ্রমবাটীও ছিল একতলা। মায়ের স্নেহাস্পদ সন্তান আগরতলানিবাসী শ্রীপ্যারীমোহন ভৌমিক এই গৃহের কিয়দংশ দ্বিতল করিবার ব্যয়ভার গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী ১৩৬৭ সালে মায়ের জন্য দ্বিতলে প্রচুর আলো-বাতাসযুক্ত একটি শয়নকক্ষ, দামোদরজীর পূজাকক্ষ এবং কন্যাগণের জন্যও একখানি কক্ষ ও স্নানাগার প্রভৃতি নির্মিত হইল।

গিরিডির এই আশ্রমবাটী-প্রসারকল্পে শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীনির্মলনলিনী দত্তও যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার নূতন জমিতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ভবনের নকশা কর্পোরেশন হইতে যথারীতি অনুমোদিত হইয়া আসিলে ১৩৬৮ সালের কার্তিক মাসে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা দিবসে মা তথায় বাস্তুপূজা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করেন এবং উক্ত দিবস হইতেই গৃহনির্মাণের কার্য আরম্ভ হয়। ১৩৬৯ সালের শারদীয়া পূজার পূর্বেই একতলার ছাদ ঢালাই হইলেও নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিতে তখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মা পুনর্বার এলাহাবাদ এবং দিল্লী যাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন। সুতরাং পূজার প্রাক্কালে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে এলাহাবাদ এবং পরে তিনি দিল্লী গমন করেন। অবশেষে বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন, তখন সংবাদ পাইলেন, পূর্বোক্ত সহৃদয় শ্রীবলরাম রায় কলিকাতার বিদ্যালয়ভবন নির্মাণের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গৌরীমাতার শিষ্য এটর্নী শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসুর মাধ্যমে এই দানকার্য সম্পন্ন হয়। বৃন্দাবন হইতে উভয়কে আশীর্বাদ জানাইয়া মা পত্র লিখেন। ইহার পর বিদ্যালয়ভবনের নির্মাণকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঠাকুরদাস রায় বিনা-পারিশ্রমিকে পূর্বাপর সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন।

আশ্রমবাটীর একতলা-চারিতলায় ওঠা-নামা করিতে মায়ের অতিশয় ক্লেশ বোধ হয় বুঝিয়া এলাহাবাদের শ্রীতেজেশচন্দ্র ঘোষ একটি 'লিফ্‌ট্' করিবার উদ্দেশ্যে পনর হাজার টাকা মাকে প্রণামী দিয়াছিলেন। মা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাহা ব্যয় না করিয়া দাতার সম্মতিক্রমে বিদ্যালয়ভবনের নির্মাণকার্যে উৎসর্গ করেন।

এইরূপে দেশবাসী নরনারীর বদান্যতায় নবদ্বীপ, গিরিডি এবং কলিকাতা আশ্রমের গৃহসমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়া মা নিশ্চিন্ত হইলেন। কলিকাতা বিদ্যালয়ভবনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ সমাপ্ত না হইলেও ১৩৬৯ সালের যাবতীয় উৎসবাদির অনুষ্ঠান মা এই নূতন ভবনেই সম্পন্ন করেন।
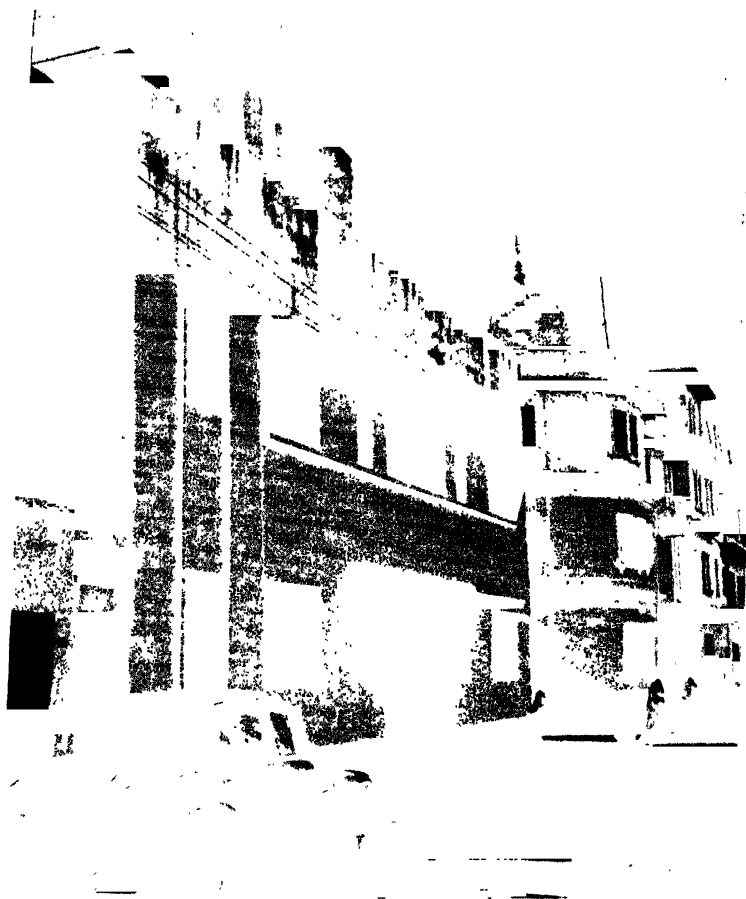
কলিকাতায় বিদ্যালয়ভবন, আশ্রমভবন ও ছাত্রীনিবাস
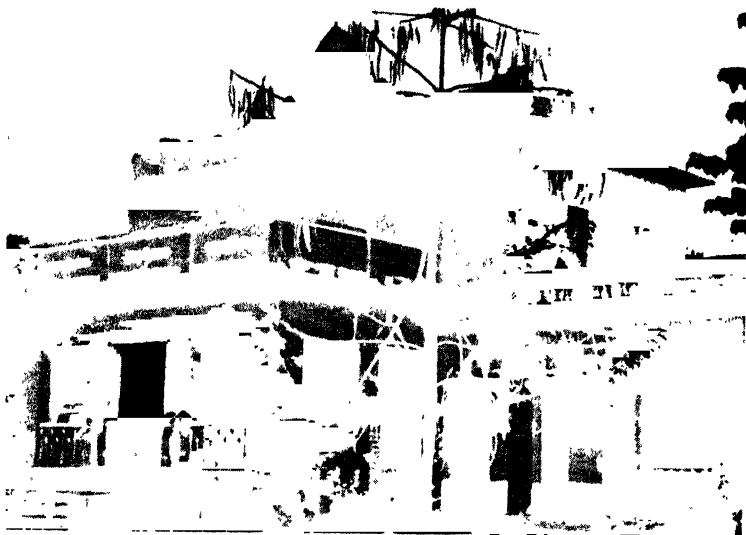
নবদ্বীপ-আশ্রম—শ্রীগৌরীনিকেতন

গিরিডি-আশ্রম—শ্রীমাতৃনিকেতন

ইতিপূর্বে উত্তর-কলিকাতানিবাসী এক মহানুভব ব্যক্তি—শ্রীচন্দ্রশেখর বিশ্বাস ১৩৬৩ সালে বালিগঞ্জ ষ্টেশন-রোডে অবস্থিত তাঁহার দ্বিতল গৃহখানি অযাচিতভাবে আশ্রমকে দান করেন। তদবধি ইহার ভাড়া আশ্রমসেবায় ব্যয় হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত, এলাহাবাদনিবাসী মায়ের শিষ্য মহাপ্রাণ ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাশ এলাহাবাদ সহরে সুভাষনগরে তাঁহার নূতন গৃহখানি 'উইল' সম্পাদনপূর্বক আশ্রমকে দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে উক্ত গৃহের ভাড়াও আশ্রম পাইতেছে।

পুনর্বার উত্তর-পশ্চিম ভারতে

শ্রীসারদামাতা এবং গৌরীমাতার শতবার্ষিক জয়ন্তী-উৎসব নানা-স্থানে সম্পাদনে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, তদুপরি সর্বত্র অগণিত নরনারীর সমাগমে বিশ্রামের একান্ত অভাবহেতু ১৩৬৫ সালের শেষার্ধ হইতেই মায়ের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছিল; কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মা ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদান কার্য পূর্ববৎ অব্যাহত রাখেন। চিকিৎসকগণের নির্দেশানুযায়ী ঔষধ সেবন করিলেও পরিশ্রম হইতে মা বিরত হইলেন না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের জলবায়ু মায়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল এবং তত্রত্য ভক্তগণও তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেন, সুতরাং ঐ অঞ্চলের প্রতি তাঁহারও আকর্ষণ ছিল।

১৩৬৭ সালে মায়ের সন্তান শ্রীতেজেশচন্দ্র ঘোষ মাকে কিছু-কালের জন্য এলাহাবাদ গিয়া বাস করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। মা সম্মতি জানাইলেন। এলাহাবাদে অলোপীবাগের বাটীতে থাকা স্থির হইল। চৈত্র মাসে মা তথায় গমন করেন। কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ এবং স্থানের জলবায়ুর গুণে মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল।

এইবার প্রয়াগতীর্থে আসিয়া মা দুইজন নূতন ভক্ত লাভ করেন, প্রথম জন—পূর্ণেন্দুমোহন কর এবং দ্বিতীয় জন—তৎপত্নী শ্রীলীলা দেবী। পূর্ণেন্দুমোহন ছিলেন চার্টার্ড-একাউন্ট্যান্ট। কয়েকদিবস পূর্ব হইতেই পত্নী লীলা দেবী পূর্ণেন্দুমোহনকে অনুরোধ জানাইতেছিলেন একবার-গিয়া দুর্গামাকে দর্শন করিবার জন্য। কিন্তু কর্মব্যস্ততা এবং উদাসীনতায় তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে মা যেদিন এলাহাবাদ ত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্বের সন্ধ্যায় ভক্তিমতী সহধর্মিণী পুনরায় পতির নিকট অনুনয় জানাইলেন, 'চল, একবার গিয়ে মাকে শুধু প্রণাম করে আসবে, দেরী হবে না।' তাঁহার

কাতরতা দর্শনে পূর্ণেন্দুমোহন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, 'আমি এখন ভারী ব্যস্ত, পাঁচ মিনিটের বেশী সেখানে থাকতে পারব না।' পত্নী তাহাতেই সম্মত হইয়া পতিসহ মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসিনী মাতার পুণ্যদর্শন এবং তাঁহার ভাগবতী কথা শ্রবণে পূর্ণেন্দুমোহন এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, কিভাবে দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই। তখন উপলব্ধি করিলেন—এতদিন মায়ের নিকট না আসিয়া তিনি খুবই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি ছিলেন হিসাবের লোক, অতিদ্রুত ভুল সংশোধনে তৎপর হইলেন। সময় তখন অতিসংক্ষেপ। মা পরদিবসই এলাহাবাদ ত্যাগ করিতেছেন। পূর্ণেন্দুমোহন তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন যে, তিনিও অবিলম্বে কলিকাতায় গমন করিবেন। আসিবার দিন দুর্গামাতা-রচিত একখানি 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রেলগাড়ীতে বসিয়া উহা পাঠ করিতে করিতে তিনি এমনই আনন্দানুভব করেন যে, এই গ্রন্থপাঠেই রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকাপূজার পরবর্তী প্রভাতে তাঁহারা পতিপত্নী উভয়েই মায়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। অতঃপর দুইজনে প্রায় প্রতিমাসে একবার, কখনও-বা দুইবার আসিয়া মাকে দর্শন করিয়া যাইতেন। মা-ও এলাহাবাদের নানাপ্রকার কার্যের ভার পূর্ণেন্দুমোহনের উপর অর্পণ করিতেন। মায়ের প্রেরিত পত্রাদি ও প্রসাদ তিনি তথাকার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করিতেন। অতঃপর স্থানীয় উৎসবাদিতে সকলকে একত্র করা, সন্তানগণের সহিত মায়ের যোগাযোগ রক্ষাকার্যেও তিনিই ছিলেন প্রধান মাধ্যম। মা বলিতেন, 'পূর্ণেন্দু আমার পি. এম., অর্থাৎ পোষ্টম্যান।' আশ্রমে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতেন এবং তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়বর্গের নিকট আশ্রম হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী বিক্রয় করিয়া দিতেন। মায়ের আশ্রমের জন্য তিনি

এদের মাঝখানে বসলে ভুলে যাই যে কোথায় আছি।” সন্তানবৃন্দের কয়েকজনের প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতিপয় ভক্তের বিশেষ আগ্রহে মা একদিন স্থানীয় হরিসভায় গমন করেন। কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা এবং এলাহাবাদের নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ভক্তিমতী শ্রীবিভারাণী দেবী মায়ের অপেক্ষায় হরিসভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পতিপত্নী উভয়েই মায়ের পূর্বপরিচিত। তথাপি বিদেশে সাক্ষাতের আনন্দ অধিক। শ্রীহরিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সাদর আমন্ত্রণে মা একদিন তাঁহাদের বিরাট ইণ্ডিয়ান প্রেসটিও দেখিলেন। অন্য একদিন ক্রশবেট কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষা শ্রীলাবণ্যপ্রভা রায়ের অনুরোধে তাঁহার কলেজে মা গমন করেন। এতদ্ব্যতীত, নাগরের রাজার সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীদামোদরজীর ব্যবহারের জন্য একখানি সুদৃশ্য রৌপ্য সিংহাসন রাজাবাহাদুর মাকে উপহার দান করেন।

এইসময়ে এলাহাবাদে মুষলধারে বারিপাত হইতেছিল। প্রায় সপ্তাহব্যাপী অবিরাম বর্ষণের ফলে বাটীর প্রাঙ্গণ ও পার্শ্ববর্তী স্থান যেন বিশাল জলাশয়ের রূপ ধারণ করিল। সকলেরই চিন্তা—এই অবস্থায় মা দিল্লী যাইবেন কিরূপে? সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, বন্যায় দিল্লীতে যমুনার জলোচ্ছ্বাসও আশঙ্কাজনক, যমুনাতীরের অধিবাসিবৃন্দকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই মা একদিন কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে পুরোগামিরূপে দিল্লী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের ব্যয়নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থাদি বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘মা, এত বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া কি সমীচীন হবে?’ মা উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, ‘আর না!’ আশ্চর্যের বিষয়, নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণমুখরতা সহসা বিরতি মানিল সেই দিবসের সন্ধ্যায়; সুতরাং পূর্বগামী দলটি যথাকালেই দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর মা নিজের যাত্রার দিন স্থির করিলেন মহালয়াদিবসে।

কন্যাগণের ইহাতে নিদারুণ আপত্তি, কারণ, প্রথমতঃ—পূর্ণ অমাবস্যা তিথি, দ্বিতীয়তঃ—ঐদিবস মায়ের উপবাস। কিন্তু, তাঁহাদের মিনতির উত্তরে মা বলেন, "যেখানে যাচ্ছি, সেস্থান তো ধর্মক্ষেত্র, মা। পুরুষোত্তমের পাঞ্চজন্য আজও সেখানে বাজছে। আর, মহাকালী স্বয়ং রক্ষা করছেন সেই পুণ্যস্থান। সকলে গিয়ে মাকে দর্শন করব। মাকে ডাক, তাঁর যা ইচ্ছে তাই হবে।"

মায়ের নির্দেশে মহালয়াদিবসের পূর্বাহ্নে প্রয়াগে এক যজ্ঞানুষ্ঠানে সমবেত ভক্তবৃন্দও আহুতি প্রদান করিলেন। প্রসাদ ও পরমানন্দ বিতরণশেষে মা দিল্লী যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে স্থানীয় সন্তানগণের কাতর প্রার্থনা, "মা, ফেরার পথে আবার এখানে আসবেন মা, কথা দিন।" মা বলিলেন, "লালজী মহারাজ তো এলাহাবাদ ছেড়ে যেতে চান না। তাই, এখানকার গাড়ী ওঁর রওনা হবার দিন সবসময় 'লেট্' হয়। উনি রয়েছেন কণ্ঠে সবার আর্জি পেশ কর ওঁর কাছে। তোমরা ভক্ত, তোমাদের জন্য ওঁরও মন কেমন করে।"

পরদিবস দিল্লী পেঁৗছিয়া মা এইবার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন বিশিষ্ট কবিরাজ বৈদ্যনাথ সরকার মহাশয়ের নির্বাচিত কাশ্মীরী গেটে অবস্থিত 'খেম্‌কা-হাউসে।' বিস্তীর্ণ চত্বর ও প্রশস্ত কক্ষসমেত বাসস্থান দেখিয়া মা প্রসন্ন হইলেন। কবিরাজ মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী শ্রীপূর্ণিমা দেবী বার বার আসিয়া মায়ের সেবার সকলপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন। দিল্লীবাসী সন্তানগণও মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এলাহাবাদের ন্যায় তাঁহার পরিশ্রম লাঘবের সংকল্প লইলেন। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কোট্‌লা, লোদী রোড, মতিবাগ প্রভৃতি স্থানে শ্রীসারদামাতার পুণ্যচরিত আলোচনার জন্য মাকে যাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পরিশ্রম হইলেও মা ইহাতে আনন্দই অনুভব করিতেন।

শারদীয়া মহানবমী সমাগত হইলে স্থানীয় ভক্ত নরনারীগণ বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য ও নানাবিধ উপহার মাতৃচরণে নিবেদন করেন। উক্ত দিবসে কবিরাজ মহাশয়ের আয়োজিত সান্ধ্যসভার অধিবেশন হয়

তিশ্‌হাজারী কালীমন্দির-চত্বরে। তথায় আশ্রম-বালিকাবৃন্দ কর্তৃক গীত এবং অভিনীত 'মাতৃ-আবাহন' অনুষ্ঠান সমাগত ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করে। একদিন গান্ধী-ময়দানে রামলীলা মহোৎসবে বহুসহস্র দর্শকের সমক্ষে সন্ন্যাসিনী মাতাজীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত জনমণ্ডলীর জ্ঞাতার্থ কর্তৃস্থানীয় দুই ব্যক্তি 'মাইক'-যোগে তাঁহার ত্যাগতপস্যাপূত জীবনকথা সংক্ষেপে হিন্দী ভাষায় বর্ণনা করেন।

শ্যামাপূজার পর মা উপনীত হইলেন বৃন্দাবনধামে। মায়ের বৃন্দাবনগমনের সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র দিল্লী, এলাহাবাদ, গিরিডি এবং কলিকাতা হইতেও অনেক সন্তান গুরুগোবিন্দ একত্র দর্শনমানসে তথায় গিয়া সমবেত হইলেন। মা সকলকে বিভিন্ন দেবমন্দির ও কুঞ্জবনাদি দর্শন করাইলেন। কালাবাবুর কুঞ্জে যে কক্ষটিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাস করিতেন, একদিন সকলকে লইয়া সেই স্থানেও কিয়ৎক্ষণ মাতৃনাম কীর্তন হয়।

শীঘ্রই রাসপূর্ণিমা তিথি সমাগত হইল। এইদিবসের সন্ধ্যায় প্রতিমন্দিরে দেবতাযুগল রত্নবেদী হইতে অবতরণ করিয়া নাটমন্দিরে অবস্থান করেন। চতুর্দিক আলোকোদ্ভাসিত। মনোহর বসনভূষণ ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত দেবতাবৃন্দের সম্মুখে কোথাও মৃদঙ্গকরতাল সহযোগে নানা সম্প্রদায়ের কীর্তন, কোথাও অভিনয় এবং সর্বত্র ভক্তগণের জয়ধ্বনিতে সমগ্র বৃন্দাবন আনন্দমুখরিত। মা সকলকে লইয়া শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন এবং অন্যান্য দেবতার মন্দিরে গিয়া রাসলীলা উৎসব দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন-জীউর মন্দিরে সেইরাত্রে 'নৌকাবিলাস' অভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে। মদনমোহনজীউর হস্তে রহিয়াছে নৌকাচালনার হাল, নদী পার করিয়া দিবার জন্য আকুতি জানাইতেছেন শ্রীমতী, সঙ্গে আছেন আহিরিনীবৃন্দ ও বড়াই। কিন্তু ন্যায্য পারানি দানে রাধারাণী ইতস্তত করিতেছেন। এক আনা দুই আনা করিয়া তিনি যখন পূর্ণ ষোল আনা দানে স্বীকৃত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার কৃপাহস্ত প্রসারিত

করিলেন। ঘটনাটির সুনিপুণ রূপায়ণে মা মুগ্ধ। তিনি কন্যাগণকে বলেন, "ওরে, ভগবান এম্‌নি করেই হাত বাড়িয়ে আছেন, তাঁর শুধু আকাঙ্ক্ষা—ভক্তের ষোল আনা মন।"

মুঙ্গেররাজমন্দিরেও সেইরাত্রে রাসলীলার আয়োজন হইয়াছে। ব্রজবাসী কয়েকটি কিশোর বালক কর্তৃক উহা অভিনীত হইবে। অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণ এবং অপরজন শ্রীরাধিকারূপে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনে বসিলে পঞ্চপ্রদীপের মঙ্গলালোকে তাঁহাদের আরতি হইল। রাণীমাতা পরিজনসহ চিকের অন্তরালে আছেন। কিশোর-কিশোরীর অভিনয় তাঁহার মনপ্রাণ হরণ করিল। 'অভি তো ওয়ে ভগবান বন গয়ে' এই বলিয়া তিনি একখণ্ড নূতন বস্ত্র পাঠাইলেন তাঁহাদের পদধূলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ধূলিকণা আনীত হইলে অশ্রুধারায় তাহা বার বার বক্ষে ও মস্তকে ধারণ করিলেন তিনি। রাণীমাতার এইরূপ ভক্তিভাব দর্শনে মা প্রসন্ন হইয়া বলেন, আহা, সাক্ষাৎ ব্রজগোপী, অনেক সাধনা করা আছে।'

অতিশয় আনন্দে মাতৃবৃন্দের শ্রীবৃন্দাবনে রাসপূর্ণিমা উৎসব দর্শন হইল। ইহার পরই দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন। যাত্রার পূর্বদিবসে মা বিশেষ বিশেষ দেবতাগণকে পুনর্বার গিয়া দর্শন করেন। শ্রীগোবিন্দজীর চন্দ্রবদনখানির প্রতি অপলক দৃষ্টিপাত করিয়া মা বলেন, "তোমার দর্শন এ জীবনে আর কি কুলুবে, গোবিন্দ? বড় অক্ষম হয়ে পড়ছি যে! তিন আশ্রমের ধর্ম, কন্যাদের সতীত্ব তুমি রক্ষে করো, ঠাকুর। মায়েদের হাত তুমি ধরে থেকো।" গৌরীমাতার সমাধিমন্দির ও তুলসীমঞ্চে প্রণামান্তে উভয়স্থানেই বসিয়া মা বহুক্ষণ জপ করিলেন।

অতঃপর দিল্লী। ইতিমধ্যে মায়ের সন্তান শ্রীশক্তীশচন্দ্র রায় একটি বিদ্যালয়ভবনে ধর্মসভার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে মা তথায় উপস্থিত হইয়া ভাষণ দান করেন। অখিল ভারত বেতার কেন্দ্রের ভক্তবৃন্দের পরিচালনায় নিউদিল্লী কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণেও অন্য একদিবস ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবন হইতে

প্রত্যাগমনের পর হইতেই মা শ্বাসকষ্টে ভুগিতেছিলেন। তদুপরি, সভা-দিবসের প্রাতঃকাল হইতে মায়ের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট হইয়া যায়। ঔষধ সেবন করার পর অপরাহ্ণে স্বরভঙ্গের কিছু উপশম হইল বটে, তবে তাহা জনসভায় ভাষণদানের উপযুক্ত নহে। উদ্যোক্তারা চিন্তান্বিত হইলেন। অসুস্থতাসত্ত্বেও মা নির্ধারিত সময়েই সভায় যোগদান করিলেন।

উদ্বোধন সঙ্গীত এবং অন্যান্য বক্তার বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। সর্বশেষে মায়ের ভাষণ। ভগ্নস্বরেই মা প্রথমে শ্রীসারদামাতার প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—'আদ্যাং শক্তিং প্রকৃতিমসমাং ঈশ্বরীং বিশ্বধাত্রীম্', মাতৃবন্দনার কিয়ৎক্ষণ পরেই যেন মায়ের সর্বপ্রকার অসুস্থতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য তিরোহিত হইল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল মা বলিলেন। ভাষণের উপসংহারে তিনি সমবেত সন্তানবৃন্দকে শ্রীমাতার আশীর্বাদ জানাইয়া বলেন, "আমার মায়ের আশীর্বাদ সকল সন্তানের ওপরেই সবসময় বর্ষিত হচ্ছে। আদিতে তিনি, মধ্যে তিনি, অন্তেও তিনি। যার যা কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাও, জেনো, তিনি সবার দিকেই তাঁর করুণাদৃষ্টি মেলে আছেন। তাঁর নামে সর্বকর্ম উৎসর্গ করে সকলের চিত্ত তন্ময় হোক, তাঁর কৃপাধারার দিব্য অভিষেক জীবজগৎকে মঙ্গলে রাখুক, শান্ত রাখুক। ভজ ভজ সারদামায়ী। ভজ ভজ সারদামায়ী।" আবেগকম্প্রকণ্ঠে মা ভাষণ সমাপ্ত করিলেন, জনসভা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ!

সভাকার্যের পরিসমাপ্তি করেন আশ্রমের শিশুকন্যাগণ 'চণ্ডীলীলা' অভিনয়ে। অভিনয়টি অনবদ্যভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় বেতারকেন্দ্রের সহকারী অধিকর্তা শ্রীবিমলনারায়ণ চৌধুরী একটি তানপুরা এবং কয়েকখানি সঙ্গীতপুস্তক কন্যাগণকে উপহার দেন।

অকস্মাৎ এইসময় ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতা-আশ্রমের জন্য মা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দিল্লীতে আরও কয়েকদিবস অবস্থান করিবার ইচ্ছাসত্ত্বেও, পথিমধ্যে

কোনপ্রকার বিঘ্নের আশঙ্কায় মা কালবিলম্ব করিলেন না। তবে এলাহাবাদের সন্তানগণের প্রার্থনানুযায়ী প্রত্যাবর্তনকালে তথায় গিয়া ত্রিরাত্র বাস করেন।

এলাহাবাদ হইতে যেদিন মা যাত্রা করেন, সেদিনও অমাবস্যা তিথি। অনেকেই বলিলেন, "মা, এলাহাবাদ থেকে দুবারই আপনি ভরা-অমাবস্যায় রওনা হলেন। আজ তো সারাদিন উপবাস। কাল কখন পৌঁছোবেন, তারপর পূজো সেরে তবে জলগ্রহণ। আপনার বড় কষ্ট হবে।" সকলকে প্রবোধ দিয়া মা বলেন, "সন্ন্যিসীর দেহ, কোন কষ্টবোধ নেই। মা সারদার যা ইচ্ছে।"

মাতৃবিচ্ছেদের অশ্রু প্রতিচক্ষে, মা-ও সন্তানের ব্যথায় কাতর। সন্তানগণ ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানাইলেন, "আবার তাড়াতাড়ি আসবেন, মা। আপনার সঙ্গে যেন আবার তাড়াতাড়ি দেখা হয়।" মৃদুহাস্যে মা উত্তর দিলেন, "হবে বাবা, তবে এবার দূর থেকে।"

এই দূরত্বের অর্থে কত বড় দুঃসহ অনন্ত ব্যবধানের ইঙ্গিত যে মা সেইদিন প্রয়াগতীর্থে দিয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাহা কে অনুমান করিতে পারিয়াছিল?

শ্রীবিবেকানন্দ-জয়ন্তী

স্ফূর্তিং মূর্তিমতীমিবাস্থ মতিদাং জাড্যাপহাং যদ্‌গিরং
ব্যাপ্তাং সপ্তসমুদ্রপারগমনস্ফারাং জুষন্তে জনাঃ।
আনন্দান্তবিবেক-নাম রচয়ন্ পৃথ্বীতলে সার্থকং
জীয়াজ্জীবগণৈকজীবনসুধাশ্রীধাম সোঽয়ং সুধীঃ ॥*

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার জীবন্ত ভাষ্য এবং নবভারতের পথিকৃৎ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ। দুর্গামা চিরকাল তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, শৈশবে স্বামিজীর যে স্নেহ ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি জীবনে কোনদিনও বিস্মৃত হন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বামিজীর বক্তৃতা, রচনা এবং পত্রাবলী পাঠের ফলস্বরূপে মায়ের মন কিরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই মহান ভাবধারা মায়ের অন্তরে যে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত তাঁহার কণ্ঠে স্বামিজী-রচিত কবিতাবলীর বিভিন্ন অংশের ভাবোদ্দীপ্ত আবৃত্তিতে। কবিতাসমূহের অধিকাংশই ছিল মায়ের কণ্ঠস্থ। মনে বিশেষ কোন অনুভূতির উদয় হইলে সেই ভাবদ্যোতক পংক্তিগুলি মা আবৃত্তি করিতেন।—

'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয়?'

'হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিকে'র অনুরূপ ব্যথা মায়ের চিত্তকেও মথিত করিয়াছে, উচ্চহৃদয়ের এই দুঃসহ দুঃখচিত্রে তিনি স্বীয় অনুভূতিরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেন। আবার,

'শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—

* শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ-বিরচিত (উদ্বোধন পত্রিকা হইতে গৃহীত)

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ— বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।'

স্বামিজীর এই 'মরমের কথায়' মা-ও যেন শুনিতে পাইতেন তাঁহার অন্তরে নিত্যধ্বনিত প্রেম-মাহাত্ম্যেরই প্রতিধ্বনি।

'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও',—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যায়।'

মায়ের জীবনব্রতেরও মন্ত্র ছিল, 'দাও আর ফিরে নাহি চাও।' এই মন্ত্র তাঁহার অন্তরাত্মাকে নিঃস্বার্থ প্রেমের মহিমায় উদ্দীপিত করিত। তিনি অনুভব করিতেন হৃদয়মধ্যস্থ সেই প্রেমসিন্ধুর আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

এতদ্ব্যতীত, স্বামিজীর যে-কোন প্রসঙ্গে মা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। স্নেহাস্পদ নরেন্দ্রনাথের আয়ত নয়নদ্বয় শ্রীসারদা মাতাকে দেখাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহ, নরেন্দ্রের সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার ভাবসমাধি, শ্রীমাতার উপর বিশ্বজয়ী বীর পুত্রের কিরূপ একান্ত শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা, গুরুভ্রাতাদিগের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রথমজীবনের বিরাগ উত্তরজীবনে অনুরাগে রূপান্তর, গৌরীমাতা ও গিরিবালা দেবীর সহিত বালোচিত কৌতুকানন্দ, 'খুকী' দুর্গামাতার উপর তাঁহার অশেষ স্নেহাশিস্—এইপ্রকার বহু বিষয়ই শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বলিয়া মা আনন্দ লাভ করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা, দেবমাতা, ধীরামাতা, মিস্ ম্যাক্লাউড -প্রমুখ বিবেকানন্দজীর পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে শ্রীমাতার নিকট মা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাভক্তির আলোচনাও অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তিনি করিতেন। মায়ের অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই বীর সন্ন্যাসীর দেশপ্রেমের বহ্নিই বাংলার যুবকগণের চিত্তকে উদ্দীপিত করিয়াছে এবং তাঁহার মহান আদর্শ ও কল্যাণবাণী কার্যতঃ অনুসরণ করিলে ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল অবশ্যই সাধিত হইবে।

এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই মায়ের চিত্তে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসবটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। ১৩৬৯ সালের মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বামিজীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে আশ্রমের নবনির্মিত বিদ্যালয়ভবনে মা দিবস-ত্রয়ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিবেকানন্দজীর লোকোত্তর পুণ্য জীবনচরিত আলোচনা, তাঁহার রচিত স্তবস্তোত্রাদির আবৃত্তি, সঙ্গীতাবলীর পরিবেশন এবং বিবেকানন্দ-নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তাঁহার মহান ত্যাগব্রত, দেশপ্রীতি, জীবপ্রেম ও বিশ্বব্যাপী অপূর্ব কীর্তিকথাসমন্বিত 'বিবেক-গাথা' নামক একখানি পুস্তিকা এই উপলক্ষে আশ্রম হইতে প্রকাশিত হয় এবং তাহা সংলাপসহযোগে সঙ্গীতে পরিবেশন করেন আশ্রমিকাবৃন্দ।

'বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি' কর্তৃক শ্যাম স্কোয়ারে (সুভাষ বাগ) আয়োজিত সভায় মা স্বামিজীর ত্যাগোজ্জ্বল জীবন সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। ইহা ব্যতীত, দেশবাসীর পক্ষ হইতে দক্ষিণ-কলিকাতায় কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভাতেও দুর্গামাতা আমন্ত্রিত হইয়া স্বামিজীর বিরাট অবদান, বিশেষতঃ মাতৃ-জাতির উন্নয়নে তাঁহার ব্যাকুলতা এবং দেশপ্রীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

বিবেকানন্দজী-প্রসঙ্গে মায়ের একদিবসের ভাষণের কিয়দংশ :

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে ভারতপ্রেমিক ও বিশ্ব-প্রেমিক, ত্যাগী সন্ন্যাসী তথা কর্মযোগী, এবং ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়-প্রতীক। অন্তরে অধ্যাত্ম জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি অম্লান রেখে কর্মযজ্ঞের অনির্বাণ দীপ হাতে নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর সম্মুখে। আবার, তিনি মনে করতেন, গৃহীর পক্ষে যেমন ধর্ম আর কর্ম উভয়ের সমন্বয় রক্ষা প্রয়োজন, সংসারাসক্তিশূন্য যোগীর পক্ষেও তেমন মোক্ষলাভের চেষ্টাই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত নয়। সন্ন্যাসীকে দীক্ষিত হতে হবে—'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই মহামন্ত্রে। স্বামিজী বলেছেন, পুরুষ

আর প্রকৃতি দুইকে নিয়েই সমাজ। তার একটি অংশকে দুর্বল করে রাখলে সমগ্র সমাজজীবন পঙ্গু হয়ে পড়বে। তাই তিনি বলতেন,—এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। নারীজাতির অভ্যুদয় না হলে জাতির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যই তিনি নারীকে ধর্ম ও কর্ম দুইক্ষেত্রেই আহ্বান করেছিলেন। তিনি বিশেষ-ভাবে বলেছিলেন, ভারতীয় নারীর শাশ্বত আদর্শ শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবী। তাঁকে সামনে রেখে অগ্রসর হলেই ভারতের নারী তার যোগ্য আসনের অধিকার লাভ করবে।

একদিন নগরসংকীর্তনসহ শোভাযাত্রার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে আলোকমালায় সজ্জিত রথে এবং বিভিন্ন যানেতে শোভা পায় শ্রীশ্রীঠাকুর-ঠাকুরাণী, স্বামিজী ও গৌরীমাতার পত্রপুষ্পশোভিত পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি, তাঁহাদের অনুগমন করে ব্যাণ্ড পার্টি এবং বিভিন্ন কীর্তনসম্প্রদায়। সন্ন্যাসিনীবৃন্দ, ব্রহ্মচারিণীগণ, আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রীসমূহ এবং অগণিত নরনারীর সমাবেশে শোভাযাত্রাটি হইয়াছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (বর্তমান বিধান সরণী) পরিক্রমণকালে সমগ্র দলটি যখন সিমলা অঞ্চলে স্বামিজীর পিতৃভবনের সমীপস্থ হয় তখন তথায় অপেক্ষমাণ ভক্তমণ্ডলী বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আনীত পুষ্পমাল্য ধূপ প্রভৃতি নানা উপচার মায়ের হস্তে অর্পণ করেন। মাতৃনির্দেশে স্বামিজীর প্রতিকৃতিতে তৎসমুদয় শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করা হয়। 'স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়'ধ্বনি এবং স্থানে স্থানে জনগণের মধ্য হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকে। মা রিক্সাযোগে সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকেন। বিবেকানন্দ রোড, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ এবং ভূপেন বসু এভিনিউ হইয়া সকলে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রসাদ বিতরণের পর উক্ত দিবসের উৎসব সুসমাপ্ত হয়।

নবদ্বীপ-আশ্রমেও জয়ন্তী-উৎসব সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর মা গিরিডি-আশ্রমে জয়ন্তী-উৎসবের পরিকল্পনা এবং

আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে জনৈকা আশ্রমিকা বালিকাদিগের অভিনয়োপযোগী 'বিবেকানন্দ' নামক নাটক রচনা করেন।

নির্দিষ্ট দিবসে গিরিডি অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের তাৎকালিক ডেপুটি ইনস্‌পেক্‌ট্রেস শ্রীউর্মি মুখার্জির পৌরোহিত্যে সভার উদ্বোধন হয়। শিশু কুমারীবৃন্দের বিবেকানন্দ-স্তোত্র আবৃত্তির পর স্বামিজী সম্বন্ধে এক মনোগ্রাহী ভাষণে মা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভানেত্রী মহোদয়াও আলোচনা করিলেন স্বামিজীর ত্যাগ ও সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত জীবন সম্বন্ধে। সর্বশেষে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত 'বিবেকানন্দ' নাটকটি সমাগত মহিলা-বৃন্দের অন্তর স্পর্শ করে।

উৎসব সমাপ্তির পর মা বলেন, "স্বামিজীর শতবার্ষিকী হয়ে গেল, আমারও সব কাজ এবার শেষ হলো।"

স্বামিজী-জয়ন্তী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে স্বনামধন্য বাগ্মী অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী মহাশয়ের অভিভাষণের সারাংশ বিবৃত হইল। কলিকাতায় আশ্রম-ভবনে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী-সভায় স্বামিজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি বলেন,—

ভারত-আত্মার অনাবৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সাধনায়, আধুনিকযুগে বিধৃত আজিকার এই নব মহাভারতের ভাবমূর্তি রচনার প্রকাণ্ড কর্ম-কাণ্ডে, একক কোন মহাজনের মহাপুণ্যনাম যদি উচ্চারণ করতে হয়, —তাহলে সে নাম নিঃসন্দেহে বিশ্ববন্দিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের। বহির্বিশ্বে ভারতবাণীর বলিষ্ঠ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও যদি বিশিষ্ট কাহারও অবদানের বেদীমূলে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করতে হয়,—তাহলে সেও ওই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। প্রাচীন ভারতের গৈরিক মৃত্তিকার ওপর গৈরিকবসনে মৃগচর্মের আসনে উপবিষ্ট হয়েও স্বামিজী আধুনিক পাশ্চাত্যজগতের জ্ঞানবিজ্ঞান, সমাজদর্শন, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতির জনকল্যাণকারী উপযোগিতাকে অস্বীকার করেন নি, বরঞ্চ উভয়ের সামঞ্জস্যীকরণে ও সমন্বয়সাধনের মধ্যেই ভাবী পৃথিবীর

মঙ্গলসূত্র অন্বেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন,—শুধু ইন্দ্রিয়সমন্বিত দেহ নয়, আবার দেহহীন নিরাকার নিরালম্ব আত্মাও নয়, দেহ আর আত্মা—এই দুয়ে মিলেই জীবন্ত মানুষ; বিজ্ঞান ও বেদান্তের রাখীবন্ধনেই সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ভাবগত সম্পূর্ণতা; তাতেই তার সত্যকারের শান্তি ও মুক্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেই আদর্শ-গত সংঘাতের দিনে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন এমনিভাবেই এক শাশ্বত মুক্তিবাণী প্রচার করেছিলেন। বেদান্তনির্গলিত ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ —নব ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এই স্বামিজীকে আবার ধর্মের এক অভিনব ভাষ্যকাররূপেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বচরাচরে তাবৎ বস্তুই ব্রহ্ম। এই অনুধ্যান স্বামিজীর উপাস্য দেবতাকে কোন ভজনালয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকতে দেয় নি, শিলীভূত হতে দেয় নি কোন বিগ্রহের মধ্যে। তাঁর ঈশ্বর সর্বত্রই বিচিত্র হয়ে বিরাজ করছেন,—রূপে রূপে অপরূপ হয়ে আছেন। জীবের প্রতি প্রেমই তাই ঈশ্বর-প্রেম,—জীবসেবাই শিবসেবা। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসসন্তান স্বামিজী তাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সেই অমৃতঝরা জীবন্ত ধর্মবাণী—

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন, সেবিছে ঈশ্বর ॥”

সন্তানবৎসলা

জগতের সকল মহাপুরুষই প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন, ইহলোকে প্রেমই সারবস্তু। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেই প্রেমের বলে মানবহৃদয় জয় করিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণও মানবপ্রেমিকরূপে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। দুর্গামাতার অন্তরেও ছিল অনুরূপ স্বর্গীয় প্রেমধারা। তিনি ছিলেন স্বভাবতঃই স্নেহময়ী। তাঁহার স্নিগ্ধনয়নের প্রসন্ন দৃষ্টি, সুমিষ্ট কণ্ঠের একটি 'বাবা' কিংবা 'মা' সম্বোধন সন্তানবৃন্দের সকল সন্তাপ মুহূর্তে হরণ করিয়া তাঁহাদের মন আনন্দে পূর্ণ করিত। মায়ের হৃদয়নিঃসৃত এই স্নেহধারার স্পর্শলাভে কত মানুষের অশান্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে, কত শোকার্ত পাইয়াছে সান্ত্বনা, কত পীড়িত ভুলিয়াছে রোগযন্ত্রণা। তাঁহার পবিত্র ও স্নেহ-মধুর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁহাদিগের ঘটিয়াছে, তাঁহাদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগিত,—আত্মীয়বন্ধু সকলকেই লইয়া যাই মায়ের নিকট, মাতৃস্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া সকলে ধন্য হউন। মা কলিকাতার বাহিরে যাইতেছেন,—এই সংবাদ শুনিলেই যাত্রাদিবসে নির্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে নরনারীর ভিড় জমিয়া যাইত। সকলেরই আকুলতা, আর একবার মাকে দর্শন করিয়া আসি। তিনি অনুপস্থিত থাকিলে মনে হইত—ছুটিয়া যাই বিদেশে মায়ের সান্নিধ্যে। যাঁহাদিগের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন মায়ের অবস্থিতির স্থান গিরিডি, নবদ্বীপ, পুরী, বৃন্দাবন এবং আরও কত স্থানে। মায়ের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটিলে ব্যাকুল নরনারীর অবিরাম অনুসন্ধান চলিত – মা কবে ফিরিবেন। মায়ের দীর্ঘদিনের অদর্শনে সকলেরই প্রাণে বেদনাক্লিষ্ট প্রতীক্ষা এবং তাঁহার উপস্থিতিতে সর্বত্রই জন-সমাগম, নিত্য আনন্দোৎসব।

মায়ের স্নেহস্পর্শে সন্তানগণের আনন্দানুভূতির স্মৃতি তাঁহাদিগের

লেখনীতে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অংশবিশেষ অতঃপর উপস্থাপিত করা হইল।

শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শিষ্য শ্রীতারাপদ চৌধুরী লিখিয়াছেন,—

"আমি যখন মাতাঠাকুরাণীকে (দুর্গামাকে) প্রথম দেখি তখন আমার বয়স ১৯ কি ২০ বছর হইবে। পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় সদ্য আসিয়াছি, সুতরাং বয়স আন্দাজে বুদ্ধি অপরিপক্ক।...

"যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে মাতৃহীন আমি তাঁহাকে এক স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী ও পরমকরুণাময়ী মাতৃমূর্তিতেই পাইয়াছিলাম, আর সে সম্বন্ধ চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি আমার গর্ভধারিণী জননী, আমি তাঁহার শিশু সন্তান। প্রথম প্রথম এইভাব সময়ে সময়ে তাঁহার উপর অযথা উপদ্রবের আকারেও প্রকাশ পাইয়াছে। মনে পড়ে, মূর্খতাবশতঃ তাঁহাকে অমান্য করিতে, বৃথা আবদার অভিমানে ক্লিষ্ট করিতেও পশ্চাৎপদ হই নাই। কিন্তু তিনি প্রথমাবধি শেষপর্যন্ত আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার স্নেহ অঙ্কে স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সেই সব স্মৃতি এখন বেদনা দেয়।...

"সর্বোপরি তাঁহার অনুপম মাতৃত্ব আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 'সর্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা' যে মহামায়ার কথা আমরা পাঠ করি, যাহার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা শ্রীশ্রীমার জীবনীতে শুনি, দুর্গামার মধ্যেও নারীজাতির সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাতৃত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই মাতৃত্ব তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সর্বভূতে প্রসারিত ছিল। উহাই তাঁহাকে সর্বভূতে সমবেদনাপরায়ণা, সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, ক্ষমাশীলা, তিতিক্ষাসম্পন্না মহীয়সী নারীতে পরিণত করিয়াছিল। জীবনের শেষদিকে দেখিয়াছি, তিনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলকে কৃপাদানে উদ্যতা হইয়াছেন। লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার সান্নিধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিত,—মা তাহাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন। তিনি কেবল যে সন্তানদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকেই

দৃষ্টি দিতেন তাহা নহে, তাহাদের সাংসারিক জীবনও যাহাতে নিরুপদ্রব ও শান্তিময় হয় সেদিকেও তাঁহার সতত লক্ষ্য ছিল। জীবনের নানাপথে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি, কিন্তু কোন অবস্থায়ই তাঁহার কল্যাণহস্তের স্পর্শলাভে বঞ্চিত হই নাই।…

"মা এখন ধ্যানগম্যা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি আমাদিগকে ভুলিতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-লোক হইতে তাঁহার অজস্র আশীর্বাদ ও কৃপাধারা অদ্যাপি সকল সন্তানের শিরে বর্ষিত হইতেছে।"

মায়ের আকর্ষণী শক্তির প্রসঙ্গে অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী ঃ

"…আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে তাঁর (দুর্গামার) একটি বিশেষ আকর্ষণী শক্তি যার দ্বারা অনায়াসে অতি অবলীলাক্রমে তিনি তাঁর কাছে টানতে পারতেন জিজ্ঞাসুদের।…দুর্গামাকে মনে পড়লেই সেই হাসিমাখা অভয়া মাতৃমূর্তিই আমার মনে পড়ে এবং মনে হয় তিনি 'মা' এ কথা বললেই যেন তাঁর বিষয়ে সব বলা হয়ে যায়। তবে এই যে আকর্ষণী বা চৌম্বক শক্তি এ যে কেবল তাঁর উপস্থিতি বা প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকেই বিচ্ছুরিত হোত তা নয়, তা ছিল আরো সুদূরপ্রসারী,—এ সত্য আমি নিজের জীবনে অনুভব করেছি এবং সঙ্কোচের সঙ্গে হলেও সেই সাক্ষ্যটি লিপিবদ্ধ করে রাখছি।…

"…তখন আমি ঢাকায় থাকি। কমরুন্নেসা কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষা, বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে, সারাদিন কেটে যেত স্কুল, কলেজ ও সংসারের কাজে ও ঝঞ্ঝাটে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতাম বাড়ীতে ফিরেও। কিন্তু সব কাজ শেষ হয়ে গেলে বিছানায় শুয়ে ঘুমের আগে আসতেন দুর্গামা। তাঁকে দেখতে পেতাম আর অনুভব করতাম তাঁর প্রবল আকর্ষণ, যদিও তখন পর্যন্ত বাল্যকালে একবার ভিন্ন তাঁকে আমি দেখিনি, তাঁর কোন ছবিও আমার কাছে ছিল না। শুধু ঘুমের আগে নয়, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলেও এমনি হোত। এর প্রায় ৫ বছর পরে আমি কলকাতায় আসি এবং দুর্গামার সন্তানমণ্ডলীতে যোগ দেবার আগে বছর ২।৩ কেটে যায়, অথচ বছর ৭।৮ আগেই আমার ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে যায়

যে, এখানেই আমি আসব এবং দুর্গামার কাছেই।' এই ঘটনা আমার জীবনে বিশেষ অর্থবহ বলেই আমি মনে করি।

"দুর্গামা আশ্রমটিকে যেভাবে সম্প্রসারিত করেন এবং বাংলা দেশের জনসমাজের কাছে এর একটি বিশেষ ভূমিকা রচনা করেন, এর মূলে তাঁর এই আকর্ষণী শক্তির একটা বড় অবদান ছিল।"

শ্রীসন্তোষকুমার ব্রহ্মচারীর সহধর্মিণী,—

"মায়ের প্রতি ভক্তদের কত ভালোবাসা দেখেছি। মনে পড়ে, একবার মা দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরছেন। সেবারে আমরাও ছিলাম মায়ের সঙ্গে। গভীর রাত্রে এলাহাবাদে ট্রেন থামবে কিছুক্ষণের জন্য।...প্রচণ্ড শীত তখন। এলাহাবাদে গাড়ী যখন এসে পৌঁছাল, দেখে অবাক হয়ে গেলাম, মায়ের সব সন্তান, কন্যা ঐ দারুণ শীতে, সব অসুবিধা উপেক্ষা করে, মায়ের একটুখানি দর্শনের জন্য ছুটে এসেছেন সবাই। সকলের চোখে জল, সকলের মুখে এক কথা—মাগো, আবার কবে দেখবো তোমায়? আহা, কি ব্যাকুলতা! কি ভালবাসা!...তাঁদের চোখের জল দেখে আমাদেরও মন হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত।...

"একদিন কলকাতার আশ্রমে গিয়ে শুনলাম, মার খুব জ্বর হয়েছে, নীচে তাঁকে নামতে দেওয়া হয় নি। শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।...বিষণ্নমনে আমি উপরে মার কাছে গেলাম। প্রণাম করে বললাম, 'মা, এত জ্বর, আজ আর নীচে নামবেন না।' মা একটু হেসে বললেন, 'ও কিছু না মা, যাই আমার ছেলেরা এসেছেন, দেখে আসি।' বলে আর কারও কথা শুনলেন না, নীচে নেমে গেলেন এবং রাত্রে সন্তানদের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেলে তবে উপরে এলেন। ছেলেদের মা এত ভালবাসতেন যে, যা নিজের ভালো লাগতো ও আরও কতরকম খাবার, মিষ্টান্ন সব ছেলেদের নাম করে করে রেখে দিতেন। কোনও উৎসবে বা কাজের ভিড়ে সকলের প্রসাদ পাওয়ার সময় উপস্থিত থাকা তো সম্ভব নয়, কিন্তু কাজের শেষে প্রত্যেকের নাম করে খোঁজ করতেন, প্রসাদ পেয়েছেন কিনা।

মা যে সকলের মা, মা জগজ্জননী,—তাই সকলের প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, এত কৃপা!

"মা বলতেন, 'মাগো, আমার ছেলের অফিসের ছুটীগুলি সব জমিয়ে রাখবে। আমি যখন বাইরে বেড়াতে যাবো, তখন সঙ্গে যাবে তোমরা।··· আর একদিন মা বলেছিলেন, 'মাগো, শনিবারটা আমার, ঐদিন আর কোথাও যাওয়া চলবে না। আমার কাছে আসতে হবে। আমার ছেলেকেও বলেছি এ কথা।"

এই ভক্তদম্পতি প্রতিসপ্তাহে আসিয়া মাকে দর্শন করিতেন এবং মায়ের আহ্বানে বহুস্থানে তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সুদীর্ঘকালের আশ্রমসেবাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমায়ারাণী পালের অভিজ্ঞতা :

"একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পরের দিন আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আগের দিনই মার আদেশ ছিল, যেন সন্ধ্যায় আমি আশ্রমে যাই। বাড়ীতে সন্ধ্যারতির পর আমি শুয়ে আছি, ইতিমধ্যে মা আশ্রম থেকে ফোন করেছেন ও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মার আদেশ, কোনমতে উঠে আশ্রমে কিভাবে যাব চিন্তা করছি। কখন যে বাড়ী থেকে আশ্রমে পৌঁছে যথানিয়মে মাকে প্রণাম করলাম এখন ঠিক আর খেয়াল নেই। আশ্রমে হল-ভর্তি ভক্ত মহিলাদের নিয়ে মা আনন্দ দিচ্ছেন। কাহাকেও কুশল জিজ্ঞাসা করছেন, আবার কাহারও দুঃখে দুঃখিতা হচ্ছেন। এ যেন এক চাঁদের হাটে শ্রীদুর্গাপ্রতিমা বিরাজ করছেন। মার আদেশে খানদুয়েক গান গাইলাম।···বাড়ী এলাম একেবারে অন্য মানুষ। পথে ভাবলাম, ঐ সময় আমার শরীর অসুস্থ ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার সময় মার সঙ্গে ৩।৪ ঘণ্টা কেমন করে কেটে গেল! যেন সব ভোজবাজি। ঐদিনের আনন্দরেশ এখনও মনে লেগে আছে।···

"একবার গিরিডি থেকে দিল্লী রওনা হব। মার কাছ থেকে বিদায় নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মার সামনে বসে চোখে শুধু জল আসছিল।···গাড়ীর সময় হওয়ার অনেক আগে মা আমাদের রওনা

করিয়ে দিলেন। সঙ্গে দিলেন অবনীদা ও অচ্যুতদাকে। দূরে যখন চলে গেছি প্রায় মোড়ের মাথায়, তখনও দেখি—মার গৈরিক স্নেহাঞ্চল মা হাতে ধরে উড়িয়ে আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মনে হলো মা বলছেন, 'মাগো, আবার এসো।' আশ্রম থেকে রওনা হবার সময় নিজেদের জিনিষ কিছুই দেখি নি। গাড়ীতে উঠে দেখি, মার আদেশে দিদিদের দেওয়া ঝুড়িভর্তি নানাবিধ খাবার। মনে হলো—এ কেমন স্নেহ? এ স্নেহের আস্বাদ কি কখনও পেয়েছি? মনের মধ্যে কত অনুসন্ধান করলাম। পেলাম গর্ভধারিণীর মধুর স্নেহের আস্বাদ। পরে গুরুস্নেহের আস্বাদ যেন মধুরতমের সাথে আরও কিছু অমৃত-মেশানো। মনে মনে সহস্র প্রণাম জানিয়ে বললাম, আমার সঞ্চিত এ অমৃত যেন ফুরিয়ে না যায়।"

আসানসোলের প্রবীণ অ্যাডভোকেট শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষের মাতৃবন্দনা—

"মায়ের শ্রীচরণের আশ্রয় ও সান্নিধ্য পেয়েছি কলহারিণী কালীপূজার দিন (১৩৬৩)। সেদিন মনে হলো, মা আমার সকল ভার নিজের হাতে নিলেন। প্রকৃতই সেদিন থেকে আমাকে তিনি যেন হাত ধরে আধ্যাত্মিকতার পথে চালিয়েছেন এবং দুঃখবেদনার আঘাত সহ্য করবার শক্তি জুগিয়েছেন। আজও মনে হয় তিনি তাই করছেন। মায়ের অযাচিত স্নেহ ও করুণা বিতরণের সীমা নাই।

"শোকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছেন···'তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নেবার শক্তি তোমরা যেন অর্জন করতে পার। দুঃখের তিমিরান্ধকারেই তো তাঁর মঙ্গলপ্রদীপখানি জ্বলে ওঠে। স্বাভীষ্টচরণে শরণাগত থেকে তাঁর শ্রীপদে সর্ববস্তু সমর্পণ কর।···তাঁর করুণা সুখের মধ্যেও আছে, আবার দুঃখের মধ্যেও আসে। ভক্ত তাঁকে ভালবেসে, বিশ্বাস করেই দিব্যানন্দের অধিকারী হয়।'

"মা তখন নিজে অসুস্থ, এবং ঐ অবস্থা চলছিল কয়েকমাস যাবৎ। তবু শিষ্যশিষ্যা ও ভক্তদের দর্শনাভিলাষ পূরণ করার জন্য রোগশয্যা ত্যাগ করে তিনি নীচে নেমেছেন। তাঁর সেই রুগ্ন

অবস্থাতেও দেখেছি,—সেই একই সৌম্য-প্রশান্ত, স্নেহ-করুণাভরা মাতৃমূর্তি ও তাঁর অকৃপণ কৃপাবিতরণ।"

শ্রীআশালতা রায় লিখিয়াছেন,—

"মায়ের অযাচিত আশীর্বাদ ও করুণা আমাদের জন্য নিয়ত কেমন করে বর্ষিত হত তা আমরা কতটুকুই বা জানতে পেরেছি!

"এমনিই একদিন সকালে প্রাত্যহিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মা রিক্সা করে যাচ্ছেন। হঠাৎ রাস্তায় আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা। তাড়াতাড়ি মা রিক্সা থামালেন। সন্তান আনন্দে মাকে প্রণাম করলেন। মা একগাল হেসে সন্তানকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বাবা, এবার মেয়ের বিয়ে দাও।'

"এরপর সব ব্যাপারটা যেন ছকে আঁকার মত এগিয়ে চললো। আমাদের একমাত্র সন্তান, বিয়ের কথা তো মনে তেমন স্থান পায় নি। তার ওপর যৌথপরিবার, ওর ওপর তিন পিসী, দুই ভগ্নী তখনও অবিবাহিত। কিন্তু আশ্চর্য! মার আদেশে যেন যাদুর মত সবকিছু সুরাহা হয়ে গেল।

"আমাদের চিরাচরিত প্রথামত প্রথমেই আশ্রমে ৺দামোদর-লালজীর নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে এলেন। কারণ মা তখন নবদ্বীপ আশ্রমে ছিলেন। মেয়ের বিবাহের সময় তাঁর কলকাতায় আসার কোন সম্ভাবনা নেই জেনে আমাদের মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, যথাসময়ে বিবাহের দিন এসে গেল।

"সকালে সবাই খুব ব্যস্ত, এমনসময় বাড়ীর উঠোনে মা আমার সশরীরে মূর্তিমতী দেবীর ন্যায় উপস্থিত। আমরা মাকে দেখে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছি। আনন্দে চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবলাম, মাগো, কত করুণা তোমার! মাকে বসিয়ে, মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লাম। তার আগে কোন কারণে মনটা চঞ্চল ছিল। মা বুঝি জানতে পেরেছিলেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'ভয় কি মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার চন্দ্রামণির বিয়ে, আমি কি না এসে দূরে থাকতে পারি? মনটা

নবদ্বীপে ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো, আমার নগেনবাবার নাতনী।' আমার মেয়েকেও মা আশীর্বাদ করলেন। আমাদের সবকিছুই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। মায়ের সেই অপূর্ব করুণার কথা ভেবে আজও অবাক হয়ে যাই।"

শ্রীসুশীলকুমার সিংহের কথা ঃ

"মা পাওয়া কি সহজ কথা'—কিন্তু তা সহজ হয়েছে অন্ততঃ আমার কাছে, এবং হয়েছে 'দুর্গামা'কে জীবনে পেয়েছি বলে। মাতাপিতৃহীন হয়েছিলাম শিশুবয়সেই। মাকে দেখার আগে পর্যন্ত আর কাউকে মাতৃ-সম্বোধন করতে পারি নি,—পারব না বলে নয়, মাতৃ-সম্বোধনের যে আকর্ষণ, তা অনুভব করতে পারি নি বলে। যদিও মাতৃসুলভ ভালবাসা মাতৃসমা অনেকেরই কাছে পেয়েছিলাম।···এই মাতৃস্নেহ জীবনে সঞ্চারিত হল আমাকে দীক্ষা দানের পর।···মাকে তাঁর অহেতুকী কৃপা ও ভালবাসার মাধ্যমে পেয়েছিলাম।···

"ভগবান বা তাঁর অংশ—তাঁদের ইচ্ছাতেই যখন সকলই সম্ভব হয়, তখন তাঁদের বাক্যকে অনুরূপ কিছু বিশেষণে বিভূষিত না করাই শ্রেয়ঃ। তাঁদের দৃষ্টিও ত সকলের গভীরে। তাই তিনি যখন কৃপা করে বলেন অভয়ের কথা 'বিপদ তোমার আসবে আকৃতিতে হাতীর মতন, কেটে যাবে কখন টের পাবে না, চলে যাবে আরশুলার আকৃতিতে।'···বিপদে আমার কোনও দুর্ভাবনা ছিল না, পূর্বে পাওয়া মার ওই অভয় বাক্যতেই।

"অক্ষমকে এবং অযোগ্যকে সাধারণতঃ মায়েরা আকর্ষণ করেন বেশী করে। ওই সন্তানরা হয়ত তাতেও সুখী হয় না, হয়ত আরও বেশী চায়, চাওয়ার অধিকার আছে কি না জানে না, মানে না। এ যেন তার জন্মগত অধিকার। আমারও অনেকটা এই অবস্থা ছিল।···এখনও নিশ্চিত আছি, মায়ের কৃপা আমার ওপর অবিচল, যা এখনও প্রতিপদে অনুভব করতে পারি। তিনি আছেন। ভগবানের লয় নেই, তাঁরও লয় নেই।"

শ্রীউষা ঘোষের উক্তি :

"আমার দীক্ষার বছর, গুরুপূর্ণিমার তিনমাস আগে মা আমাকে মার ছেলের সঙ্গে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু গুরু-পূর্ণিমার দিন আমরা ঠিক সন্ধ্যেবেলায় কুচবিহার থেকে ফিরে এলাম।...স্নান করে, পূজো সেরে বাজারে গেলাম। হাতে তখন টাকাও নেই বেশী। মার জন্য দশটাকা দিয়ে একখানি সাড়ী, কিছু ফুল, একটি পদ্মফুল ও ফুলের মালা এবং সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে কেনা আশ্রমের জন্য কিছু পেঁড়া সম্বল করে মনের আনন্দে আশ্রমে যাচ্ছি। গিয়ে কড়া নাড়তেই আশ্রমের এক দিদি দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে গিয়ে খুব সঙ্কোচের মধ্যে পড়লাম। গিয়ে দেখি, অনেক বড়লোকের বাড়ী থেকে অনেক ফুলমালা, রাবড়ী, দামী কাপড় নিয়ে সকলে বসে আছেন। আমি হতাশ হয়ে ভাবছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—এগুলো মা কি নেবেন? কি করেই-বা এই জিনিষ মাকে দেব? এমনসময় কে যেন বললেন, 'মা তোমায় ডাকছেন।' আমি তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, 'আমাকে ডেকেছেন, মা?' উত্তরে মা বললেন, 'হ্যাঁ মা, কই, দাও আমাকে।' আমি অবাক হয়ে চুপ করে আছি। আবার মা বললেন, 'দাও মা, আমাকে।' আমি তখন তাড়াতাড়ি সেই জিনিষগুলি দিলাম, আর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা, আপনি এ কাপড় পরবেন?' মা বললেন, 'হ্যাঁ মা, পরব বলেই তো নিলাম।' তখন আমার কি আনন্দ! মাকে প্রণাম করতে মা আশ্রমের একজন দিদিকে বললেন, 'এদের দুজনকে আগে খাইয়ে দাও। আর, এই ফুল মিষ্টি ওপরে রেখে এস।'

"সেদিন মাকে দেখলাম,—তিনি দীনদুঃখীর মা আগে। আমার দিকে তখন সবাই চেয়ে দেখছে। মার এই অহেতুকী কৃপা দেখে সকলেই অবাক।"

শ্রীপ-এর স্মৃতিকথা :

"ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলের কিছু কৃষকসন্তান মার কৃপালাভ করেন। তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র। কিছু ডাঁটা, শাকপাতা নিয়ে মাকে

প্রণাম করতে এসেছেন। মার কি আনন্দ! তাঁদের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে প্রসাদ দিলেন। তাঁরা চলে যেতে মা বলছেন,—এরা কত সরল! এদের কত ভক্তি! এরা গরীব অশিক্ষিত, কিন্তু এদের ঈশ্বরানুরাগ লোককে দেখাবার মত। এরা মায়ের কৃপা পাবেই।”

সন্তানের জননী না হইয়াও দুর্গামার স্নেহবাৎসল্য ছিল অনন্য-সাধারণ। তাহা ছিল যেমন গভীর তেমন সুদূরপ্রসারী। বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত নয়, নির্বিচারে সকলের জন্যই তাহা থাকিত অবারিত। আজ তিনি কেবল আশ্রমমাতা নহেন, তিনি লোকমাতা।

এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবেদিতা দেবী লিখিয়াছেন,—

“একদিন মার সঙ্গে প্রাতঃকালীন ভ্রমণে গিয়েছি, মা হেঁটে চলেছেন, ছাতা, পাখা আর আসন নিয়ে আমি চলেছি সঙ্গে। চলার পথে মায়ের কতগুলি নির্দিষ্ট জায়গা ছিল বসে বিশ্রাম করবার জন্য। সেইদিন মা বিধান সরণীর একটি দোকানের সামনে বাঁধানো একটি জায়গায় বিশ্রামের জন্য বসলেন। আমি মাকে হাওয়া করছি। কাছে মার পাশেই এক মিষ্টিওয়ালা এসে বসল মাথা থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নামিয়ে। মিষ্টিওয়ালার কাছ থেকে মা কিছু মিষ্টি কিনলেন। আমি ভাবলাম, মা এখন মিষ্টি কিনে কি করবেন, রাখবেন কোথায়? এখন তো হেঁটে চলেছেন। কিন্তু, মায়ের কি প্রাণ! মিষ্টিবিক্রেতাকে সেই মিষ্টির ঠোঙ্গাটি দিয়ে বললেন, ‘বাবা, তুমি এটা খাও।’ মিষ্টিওয়ালা গরীব লোক, নিজে কখনও খাবে না, দুটি পয়সার জন্য দরজায় দরজায় ঘুরবে। এইজন্যই বুঝি স্নেহময়ী জননী নিজহাতে সন্তানকে খাওয়ালেন। তাঁর স্নেহ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যে করুণার উৎস ছিল দক্ষিণেশ্বরের নহবতে, দেখলাম—সেই করুণাঘন মাতৃস্নেহ আজও শুকিয়ে যায় নি, তারই একটি অনুপম হৃদয়জুড়ানো স্বতঃ-উৎসারিতধারা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম।

“আর একদিন। মা গঙ্গাস্নানে গেছেন, স্নানান্তে গেরুয়া শাড়ীখানি পরে রিক্সাতে উঠতে যাচ্ছেন, এমনসময় শতছিদ্রবসনা এক

নারী মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মা, আমাকে একখানা কাপড় দিন, লজ্জা ঢাকবার আমার কিছু নেই।' তাঁর শোচনীয় অবস্থা মায়ের অন্তর স্পর্শ করল। কোন দ্বিধা না করে মা তাঁর ভেজা নতুন সাড়ীখানি তাঁকে দিয়ে দিলেন। এভাবে দুঃস্থদের কাতরতায় মা কোন কোন দিন বেড়াবার পথে নিজের ছাতাখানি, কোনদিন গায়ের চাদরখানি দান করে ফিরে আসতেন। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, অসহায় শিক্ষার্থিনীরাও তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। মায়ের অন্তর তাঁদের জন্যও কাতর হয়েছে। তিনি তাঁদেরও যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।

"আর একটি ছিল মায়ের প্রায় নিত্যকর্ম। সকালবেলায় কলকাতার সদর রাস্তায় অথবা গঙ্গার ধারে প্রায় রোজই বেড়াতে যেতেন। রাস্তার পাশে বসে-থাকা ভিখারী, খঞ্জ, দুঃস্থরা মাকে চিনতো। মাকে দেখলেই তাদের মন আনন্দে ভরে উঠতো। 'মা' 'মা' করে তারা তাদের দুখানি হাত মায়ের দিকে প্রসারিত করে দিতো। মা-ও রুমাল খুলে তাদের কিছু কিছু দান করতেন।"

এতদ্ব্যতীত, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপর্যয়ের দিনেও বস্ত্র এবং অর্থদ্বারা আর্তসেবায় তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। এইপ্রকার ব্যয়ের তিনি কোন হিসাব রাখিতেন না। জনৈক সন্তান একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, এ বুঝি আপনার বে-হিসেবী খরচ!' মা হাসিলেন মাত্র।

বাস্তবিকই করুণাময়ী মাতার এই স্নেহসম্পদের কোন হিসাব থাকিত না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহার এই স্নেহধারা প্রবাহিত হইত নীরবে,—বহিয়া যাইত আর্তের সেবায়, অখ্যাত আর অবজ্ঞাত হৃদয়ের সান্ত্বনায়।

স্বপনবুড়ো(শ্রীঅখিল নিয়োগী)র শ্রদ্ধার্ঘ্য :

"মানুষ যেমন আলো-হাওয়াকে সহজভাবে গ্রহণ করে, দুর্গামাও ঠিক তেমনি দেবতার আশীর্বাদী ফুলের মতো আমার জীবনে

এসেছেন। কতখানি তার দাম কিছুই বুঝতে পারি নি। মনে হয়েছে এ যেন আমার সহজ প্রাপ্য।···গৌরীমার জীবন্ত আশীর্বাদরূপেই পেয়েছিলাম দুর্গামাকে।

"মাকে হারিয়েছিলাম অনেককাল। কিন্তু এই সারদেশ্বরী আশ্রমে আবার নতুন করে মাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। দুর্গামাই আমাকে প্রথমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর মাতা সারদামণি সম্পর্কে বলবার জন্যে প্রাণেপ্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করেন।···ছোটদের জন্যে গল্প লিখি বটে, কিন্তু পুণ্যজীবন আলোচনার আমি কি অধিকারী? কিন্তু মা যাকে ধরে থাকেন তার ভয়ডর থাকে না। সেই থেকে সুরু—এখনো চলছে সে কাজ।··মা প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'ছোটদের মধ্যে ঠাকুর আর ঠাকুরাণীর কথা ছড়িয়ে দাও।' যুগান্তরে 'পাততাড়ি'তে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ও সারদামাতার জন্মদিনে ছবি দিয়ে রচনা প্রকাশের প্রেরণা তিনিই আমাকে দান করেন। নির্ধারিত সপ্তাহে সেই সন্দেশ প্রকাশিত হলে—তিনি কাগজ চেয়ে নিয়ে দেখতেন।

"সারদেশ্বরী আশ্রমকে কেন্দ্র করে কত মহাজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। কত সাহিত্যিক, বক্তা, শিল্পী, গায়কের সান্নিধ্যে এসে জীবন ধন্য হয়েছে। সেও দুর্গামার অহেতুক কৃপা! কতভাবে তিনি জীবনে পরশমণির স্পর্শ দিয়েছেন।···

"আমরা সপরিবারে যখনই কোনো সঙ্কটে পড়েছি, দুর্গামা দুর্গতিহারিণীর মতো সকল বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন উপলব্ধি করি।···

"সন্তানদের কল্যাণকামনা করা ছাড়া তাঁর আর কোন সাধনা ছিল না। সব সন্তানই মনে করতো, সে-ই মায়ের বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি। কিন্তু দুর্গামার স্নেহ-ফল্গুধারা সকল সন্তানের শিরে অঝোর ধারায় বর্ষিত হতো। যদি কোনো সন্তানের অসুখবিসুখের কথা শুনতেন, তখন তিনি···সেই রুগ্ন ও পীড়িত মানুষটির সংবাদ আগে সংগ্রহ করতেন। সেই দুর্গামাকে যাঁরা কাছে পেয়েছিলেন

তাঁরাই ধন্য। মায়ের স্নেহের পরিমাপ করা কোনো সন্তানের পক্ষেই সম্ভবপর নয়।"

স্বনামধন্য গায়ক শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক আশ্রমে এক উৎসবের দিনে দুর্গামাতার প্রথম সন্দর্শনের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"...ভক্তজনে পূর্ণ একটি বৃহৎ দীর্ঘাকার কক্ষ, ধূপগন্ধে ভরা, পবিত্র পরিবেশ। কক্ষের পশ্চিম দিকে একটি সুপ্রশস্ত বেদী। সেখানে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখলাম, গভীর শ্রদ্ধায়, অতি সযতনে ফুলের মালা দিয়ে মনোরম করে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদামাতাঠাকুরাণী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীগৌরীমাতার নয়নাভিরাম চিত্রপট এবং বেদীর পুরোভাগে শ্রীশ্রীদামোদরলাল—অপরূপ শালগ্রামশিলা।...

"বেদীর উত্তরপ্রান্তে দেখলাম বসে আছেন এক জ্যোতির্ময়ী নারী, যেন মহিমময়ী মাতৃমূর্তি। ভক্তজনেরা আসছেন বেদীপৃষ্ঠে মস্তকস্পর্শ করে ওই মাতৃমূর্তির কাছে এসে তাঁর চরণে প্রণাম করছেন। মা তাঁদের আশীর্বাদ করছেন।...মাকে দেখলাম—কী প্রশান্ত, প্রসন্ন, আনন্দময়ী রূপ। পরিধানে লালপাড় সাড়ী, ললাটে সিন্দুর বিন্দু। অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিতা স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি। যেন জগজ্জননী দেবী দুর্গা মানবী মূর্তি পরিগ্রহ করে বসে আছেন।...

"মায়ের চরণযুগলে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। স্নেহময়ী মা আমার মাথায় আশিসহস্ত বুলিয়ে দিলেন, মনে মনে তিনি যেন জপ করলেন। আমার সারা দেহ এক অনির্বচনীয় ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকমুহূর্ত যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম, অব্যক্ত আনন্দশিহরণে দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। ততক্ষণে আমার মেয়ে মায়ের শ্রীচরণযুগলে মাথা রেখে প্রণাম করছে। তার মাথায়ও মা আশিসহস্ত বুলিয়ে কী যেন জপ করলেন এবং মুখের দিকে তাকিয়ে আদরিণী মা আদর করে বললেন, 'আমার পঙ্কজবাবার মেয়ে বুঝি? পিতৃমুখী মেয়ে, কি

নাম তোমার মা ?···অরুণলেখা ? বাঃ, বেশ নাম। কিন্তু তুমি আমার দিদিরাণী, তোমাকে দিদিরাণী বলে ডাকবো।'···

"উৎসবানুষ্ঠানের কর্মসূচী অনুসারে···বক্তৃতা শেষ হবার পর, আশ্রমের পক্ষ থেকে···আমাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ জানালেন। মহাসমস্যায় পড়লাম।··· শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমাদের গৃহদেবতা। গান নির্বাচনের সমস্যায় পড়ে তাঁকেই মনে মনে স্মরণ করছি, অরুণলেখা কানের কাছে ফিস ফিস করে বললে, 'এত ভাবছ কেন বাপি, তোমার তো প্রতিদিনের উপাসনা, গাও না—

'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'—

"···সেই পুণ্যসন্ধ্যায় আমার অন্তর্লোকে নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের সন্ধান পেয়েছিলাম, তাঁর স্তবগান করে এক অপার্থিব আনন্দবিভব লাভ করেছিলাম, আমার তুচ্ছ জীবন ধন্য হয়েছিল।"···

অতঃপর দুইখানি পত্র উদ্ধৃত করা হইতেছে।

প্রথমখানি মা লিখিয়াছিলেন বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব জিলাজজ অনুকূল-চন্দ্র সান্যালকে। সান্যাল মহাশয় শ্রীসারদামাতার মন্ত্রশিষ্য, দুর্গামাতা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। পত্রে বৃদ্ধ সন্তানের প্রতি মায়ের আশীর্বাদ এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে।—

"পরমাশীর্বাদভাজন সন্তান আমার! প্রভুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্ময়ী ভবতারিণী মাতাদেবী সারদাজননীর অপার করুণাশীর্বাদের নিত্যধারায় সন্তান আমার নিত্যস্নাতস্নিগ্ধ থাকুন, শাশ্বত আনন্দলাভের পথে পরিচালিত থাকুন। সন্তানের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ চিৎপদ্মে মাতাদেবী নিত্যাধিষ্ঠিত থাকিয়া সন্তানের মানসার্ঘ্য গ্রহণ করুন। 'জপাৎ সিদ্ধি' এই মহাবাণী সন্তানের জীবনে সার্থক হউক, মা সারদা সন্তানকে নিত্য আশীর্বাদ করুন—মাতৃনাম স্মরণে সন্তান দিব্যানন্দে বিভোর থাকুন—ইহাই সন্ন্যাসিনী মাতার নিত্য আশীর্বাদ।

"কেমন আছ বাবা ? বহুদিন সন্তানের কোন সংবাদ পাই নাই,

মাতাপুত্রে দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, মাঝে মাঝে সন্তানকে দেখিবার জন্য মাতৃহৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হয়। সুবিধামত এসে দর্শন দিলে কত যে আনন্দ পাব বলতে পারি না।…”

দ্বিতীয় পত্রখানিতে দুর্গামাকে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিয়াছেন জাষ্টিস বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়।—

“শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—মা, আপনার অপার স্নেহসিক্ত আশীর্বাদী পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। মা সর্বদাই পুত্রের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন। মার আশীর্বাদ কখনও বিফল হয় না। পুত্রও যাহাতে নিজের সমস্ত চিন্তা বিসর্জন দিয়া অশ্রুমান বালকের ন্যায় মাতার উপর নির্ভর করিতে পারে এইমাত্র তার প্রার্থনা।

“আমার এই জীবন অনেক অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু তার মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পর্শ অনেকবার অনুভব করিয়াছি। যদিও নিজের অক্ষমতাবশতঃ পূর্ণভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আজ এই জীবনের অপরাহ্ণে আপনার এই অপার্থিব স্নেহ ও করুণা লাভ করা বাস্তবিকই আমার কোনও পূর্বকৃত সুকর্মের ফল। আপনার তপস্যাপূত জীবন, সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতার অনেক উপরে অবস্থিত।…মাতৃস্নেহই আপনাকে এই ধূলাকাদা মাখা সন্তানদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। আমাদের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া দিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের, দেবত্বের পথ দেখাইয়া দিন, এই আমার নিজের প্রার্থনা।

“আশা করি আপনার নিজের এবং আশ্রমস্থ সকলের কুশল। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিজন”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক জনসভায় বলিয়াছিলেন,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে মাতৃপূজাপারম্পর্য খুব বিস্তৃত হয়েছে। প্রথমতঃ শ্রীসারদাদেবী, তারপর শ্রীগৌরীদেবী, তারপর

শ্রীদুর্গাদেবী। এই যে মাতৃপ্রতিমাপরম্পরা মাতৃসাধনা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আমাদের ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ। যেমন রোমান ক্যাথলিক চার্চে আছে 'Apostolic succession', তেমনি আমাদের মধ্যেও এই মাতৃপ্রতিমা। সারদা দেবী, গৌরীপুরী দেবী এবং দুর্গাপুরী দেবী—এঁরা সত্যসত্যই মাতার মত আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, আমাদের সর্বদোষ ক্ষমা করেছেন; মাতার মত আমাদের ধর্মজীবনে উপদেশ দিয়েছেন, আমাদের জীবনের পুষ্টি সম্পাদন করেছেন। যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করে গেছেন, যে আত্মবিসর্জন তাঁরা কার্যের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেছেন, যে স্নেহ ও ভালবাসা তাঁদের সমস্ত জীবনব্যাপী তাঁরা প্রচার করে গেছেন, যে ভালবাসাতে তাঁরা সকলের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন—তা সত্যই অপূর্ব।

দুর্গাপুরী মাতার কাছে যাঁরা দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে যাঁরা ধর্মজীবনের পথিক হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর অক্ষয় প্রভাব নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছেন, তা তাঁদের ধর্মপথকে আরও সুগম করবে, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তাঁর মুখেই মাতৃভাব মাখানো ছিল। তাঁর দিকে দৃষ্টি তুললে পরেই দেখা যেতো যে, আদর্শ মাতৃভাব তাঁর মুখে অঙ্কিত আছে, এবং মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হতো। তাঁর স্নেহসুধায় কত লোক যে পুষ্ট হয়েছে, সান্ত্বনা পেয়েছে, কত লোকের যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে, সেটা বলে শেষ করা যায় না।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুভূতি :

"মা সারদা যাঁহাদের মধ্যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, ফলফুলে শোভিত হইয়া তাহা যেমন দুর্গামার মধ্যে মনোহর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল, অন্যত্র এমন দেখা যায় না। বোধ হয় এইজন্যই গৌরীমা মা দুর্গাকে বিশেষরূপে চিহ্নিতা কন্যা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাঁহাকে নয়নপথে চাহিয়াছিলেন (জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে), মা দুর্গা তাঁহারই ঘরণী। এই যুগে ইহা একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়।

"মা সারদার কৃপায় মা দুর্গা দিব্যানুভূতিতে পূর্ণ ছিলেন। সন্তানদের মনের কথা তাঁহার নিকট কিছুই অগোচর ছিল না। মা দুর্গার ছিল শত শত সন্তান, এইজন্য তাঁহাকে প্রধানতঃ বাৎসল্যের মূর্তি বলিয়া মনে হইত ; যদিও কোন সন্তানবিশেষের উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না, তথাপি তাঁহার স্নেহ ও আশীর্বাদ সকল সন্তানের উপরে সমভাবে বর্ষিত হইত। মমত্বহীন হইয়া স্নেহশীল হওয়া একান্তই অসাধারণ শক্তি।"

শ্রীপুষ্পকুমার পালের মাতৃবন্দনা ঃ

"মায়ের চরিত্রে শ্রীশ্রীমার চরিত্রের বিকাশ দেখে কতদিন মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছে। প্রবল জ্বর ও শ্লেষ্মায় তিনি পীড়িতা। শ্বাস-প্রশ্বাসের অতিশয় কষ্ট, তবুও তিনি ভক্তের প্রার্থনায়, চিকিৎসকের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়াও তাঁকে কৃপা করেছেন। কত অগণিত সন্তান মার কাছে তাঁদের সুখদুঃখের কাহিনী অহেতুক দীর্ঘ করে অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করেছেন, কিন্তু মায়ের কোন অনুযোগ বা বিরক্তি ছিল না।...

"আমাদের মত সাধারণ সন্তানের প্রতিও তাঁর কত স্নেহ, কত কৃপা, কত উৎসাহব্যঞ্জক কথা! একদিন বলছেন, 'তোমাদের মত সন্তান পাওয়া আমার সৌভাগ্য। তোমরা আমার মার কথা প্রচার কর। তোমাদের কণ্ঠে শ্রীশ্রীসারদা মার কথা শুনলে আমার মন ভরে ওঠে।'

"এই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, এই করুণাময়ী মাতৃমূর্তির সম্মুখে কার না মস্তক অবনত করতে ইচ্ছা যায়? সর্বসময় এক ভাব, একই প্রার্থনা—আমি কিছু চাই না, তোমরা ভাল থাক। তোমরা সুখে থাক। তোমাদের কল্যাণ হোক। আমি তোমাদের জন্য দিনের পর

"দিন, বৎসরের পর বৎসর তপস্যা করে যাব। শ্রীশ্রীমার কাছে অবিরাম প্রার্থনা জানাবো—যেন তাঁর কৃপা তোমরা পাও।

"মায়ের কথা, তাঁর অতুলনীয় স্নেহ ও কৃপার কথা ঠিক ঠিক প্রকাশ করা অসম্ভব। সে কৃপা ও সে স্নেহ দয়া নীরবে অন্তরে উপলব্ধি করাই শ্রেয়ঃ।

"মা শ্রীশ্রীমায়ের কন্যা ও সর্বতোভাবে তাঁর ভাবে ভাবময়ী। বাক্যে ও কার্যে এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে এবং প্রকাশে তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমার এক বিকল্প মূর্তি। প্রতিরোমকূপে ছিল তাঁর মাতা সারদার নাম। কণ্ঠে নিরলস আবেদন, 'ভজ ভজ সারদামায়ী।"

শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের উপলব্ধি :

"পরমপুরুষের ত্রিবিধ শক্তি···হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। সকলের মূলে যে ক্রিয়া করে তাহাই সন্ধিনী শক্তি—কর্মপ্রবৃত্তি। চিদ্‌ভাবের যে শক্তি তাহার নাম সংবিৎ—ইহাই জ্ঞানশক্তি। আনন্দ-ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহার নাম হ্লাদিনী—তাহা ভক্তি বা প্রেমশক্তি। জীবের যে এই তিনটি শক্তি উহা সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তির অনুরূপ—অস্ফুট বীজাবস্থা···। সাধনবলে এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইলে জীবও ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ যেরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে তাহা অগ্নির গুণ কিয়দংশে প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম জীবের মধ্যে নিজশক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু সকল জীবই সেই শক্তিকে প্রস্ফুটিতরূপে ধারণা ও প্রকাশ করিতে পারে না। সাধনবলে মহৎ জীবনে তাহা ব্যক্ত হয়। জগতে এইরূপ সাধুমহাপুরুষ ও শক্তিসম্পন্না মাতৃজাতির কতিপয় ব্যক্তির ভিতর আমরা ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করি। আমাদের মা দুর্গামা জগতের মহামানবের একজন প্রধানা। তাঁহার ভিতর এই ত্রিশক্তির ক্রিয়া ও বিকাশ পরিপূর্ণভাবে আমরা দেখিতে পাই। আমরা শ্রীশ্রীমাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, কিন্তু শ্রীদুর্গামার দর্শনে তাঁহার ভিতরেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা উপলব্ধি করি।"

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক সভায় দুর্গামাতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন,—

"দয়ার্দ্রহৃদয়া মাতা দুর্গা পবিত্রতার হোমশিখা,—মাতৃত্বের অম্লান প্রতিচ্ছবি। মাতা দুর্গা মাতা সারদেশ্বরীর চরণযুগল দুইহাতে ধরেছিলেন, আবার দুইহাতে ধরেছিলেন গরীয়সী গৌরীমাতার চরণযুগল। সেই চরণ-ধরা কমলকোমল স্নেহদ্রব দুইখানি হাত অসীম স্নেহে, অসীম আশীর্বাদে আমাদের মাথার ওপরে রেখেছিলেন। আমরা এক স্পর্শে তিন স্পর্শ লাভ করেছি। প্রথম স্পর্শ মাতা দুর্গার, দ্বিতীয় স্পর্শ মাতা গৌরীর আর তৃতীয় স্পর্শ সর্ববরেশ্বরী মাতা সারদামণির। দুর্গামা একে তিন, তিনে এক। গৌরীমাতার কর্মশক্তির এবং সারদামাতার কৃপাশক্তির যোগফল। ঠাকুরের পূজার শেষ জীবন্ত অর্ঘ্য। মাঠাকরুণের ভাষায় শেষ পূর্ণঘট।"

বিদায়—শ্রীমাতৃনিকেতন

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে মা ১৩৬৯ সালের চৈত্রমাসে গিরিডি গমন করেন। সকলের আশা ছিল—উৎসবান্তে কয়েকদিবস তথায় বাস করিলে মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। এই বৎসরের প্রথম দিক হইতেই মা ডায়বেটিস (বহুমূত্র) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তদুপরি এইসময় শ্বাসকষ্টও বৃদ্ধি পায়। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক কোন চিকিৎসাতেই আশানুরূপ সুফল পরিলক্ষিত হইল না। অথচ কেহ কুশল প্রশ্ন করিলে মা উত্তর দিতেন যে, তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ আছেন। আশ্রমের প্রাচীন কন্যাগণ মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু শ্রীমাতৃনিকেতনের প্রিয় ও শান্ত পরিবেশ অবিলম্বে ত্যাগ করিতে মা সম্মত হইলেন না। মায়ের প্রত্যাবর্তনের জন্য কলিকাতা হইতে যখন পুনঃপুনঃ ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র আসিতে লাগিল এবং সন্তানগণও কেহ কেহ এতদুদ্দেশ্যে গিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন মা বলেন, "আমায় আর দু'চারটে দিন এখানে থাকতে দাও তোমরা। আর যদি না আসতে পারি!" তাঁহার এইপ্রকার উক্তিতে আর কেহ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিতেন না।

১৩৭০ সালের শুভ নববর্ষের উৎসব শ্রীমাতৃনিকেতনেই অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা এবং দূরবর্তী স্থান হইতেও সন্তানগণ আসিয়া উপনীত হইলেন মায়ের শ্রীচরণধূলি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায়। স্নেহময়ী জননীও তাঁহাদের উপস্থিতিতে আনন্দিত। দুইবেলা নাটমন্দিরে বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা, সন্ধ্যায় কীর্তন ও মাতৃনামগান চলিতে লাগিল। কেহ কেহ দীক্ষাও গ্রহণ করিলেন।

মা যখন গিরিডিতে যাইতেন কন্যাদের জন্য নানাপ্রকার আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। তন্মধ্যে ধর্মমূলক নাটকাদির অভিনয় অন্যতম। এইবারও তাহার আয়োজন হইল। বিদ্যালয়প্রাঙ্গণের পুষ্পোদ্যানে যখন অভিনয়ের অনুশীলন চলিত, মা বারান্দায় বসিয়া তাহা দেখিতেন এবং উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "আহা, সব যেন আমার বনবালা! চমৎকার হচ্ছে, মায়েরা, চমৎকার হচ্ছে।" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মহড়া দেখিয়া তাহার দোষগুণের সমালোচনাও করিতেন। তিনি স্বয়ং কোনদিন অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহার রসগ্রহণে ও গুণাগুণবিচারে তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা পরিলক্ষিত হইত। এইকারণে এবম্বিধ কোনপ্রকার অনুষ্ঠান সর্বজনসমক্ষে উপস্থাপন করিবার পূর্বে মায়ের দৃষ্টিপ্রসাদ এবং তাঁহার অনুমোদন লাভ করিয়া তবে উদ্যোক্তা কন্যাগণ নিশ্চিন্ত হইতেন।

কন্যাকুলের চিত্তবিনোদনের জন্য এইবারও মা তাঁহাদিগকে তোপচাঁচি, পরেশনাথ পাহাড় এবং উশ্রী জলপ্রপাত দেখাইতে লইয়া গেলেন। বনভোজন অর্থাৎ সহরের উপকণ্ঠে কোন নির্জন স্থানে চড়ুইভাতি ছিল মায়ের একটি প্রিয় উৎসব। রন্ধনান্তে প্রভু জগন্নাথদেব ও শ্রীসারদামাতার প্রতিকৃতির সম্মুখে ভোগ নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন বৃক্ষের নিম্নে উন্মুক্ত স্থানেই। উপস্থিত রাখাল বালকগণও এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইত না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্তনসময়ে মোটর বাসে বসিয়া সমবেতকণ্ঠে কন্যাদিগের স্তবসঙ্গীত চলিত। ইহাতে সময় সময় মা-ও যোগদান করিতেন। তাঁহার চরিত্রের ইহা ছিল এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। অক্ষম বার্ধক্যেও কন্যাদিগের আনন্দবিধান করিয়া তাহাতে নিজেও অংশ গ্রহণ করিতেন।

মায়ের শরীর অসুস্থ, তদুপরি গ্রীষ্মের নিদারুণ খরতাপ, সুতরাং আশ্রমপ্রাঙ্গণেই এইবার চড়ুইভাতির ব্যবস্থা হইল। কন্যাগণও এই বিকল্প ব্যবস্থায় সর্বান্তঃকরণে সম্মত হইলেন। মা সেইদিবস তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ কর্মের আয়োজন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,

"মায়েরা, তোমরা এত আনন্দ করে খাটছ, আমার ইচ্ছে করছে, আমিও তোমাদের দলের একজন হয়ে কোমর বেঁধে রান্না করি।" শুনিয়া কন্যাগণ মহাখুশী হইলেন, কিন্তু মায়ের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তবে অনুরোধ করিলেন, "মা, আপনি একবার গিয়ে আমাদের সব রান্না শুধু ছুঁয়ে দিয়ে আসবেন, চলুন।" স্নেহময়ী মাতা যেন মুহূর্তে কন্যাগণের সমবয়স্কা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সহিত সানন্দে রন্ধনের স্থানে গিয়া খিচুড়ীর বড় হাঁড়ি ও তরকারীর কড়াই খুন্তিদ্বারা স্পর্শ করিলেন। ইহাতেই কন্যাকুল উল্লসিত। মাকে কেন্দ্র করিয়াই সেদিনের এই আনন্দোৎসব। কটিদেশে সাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া রন্ধনের স্থানে মায়ের এইপ্রকার রূপ আশ্রমের প্রাচীন সন্ন্যাসিনীগণ ব্যতীত নবীনাগণ কেহই দর্শন করেন নাই।

চড়ুইভাতির প্রসঙ্গে মা বলিলেন, "সারাটা জীবনে রান্না করার সুযোগই তো পেলুম না আমি, আর আজ তো শেষ হয়ে এলো। আর কি হবে?" 'শেষ' কথাটি মায়ের মুখে উচ্চারিত হইবামাত্র কন্যাগণ ব্যথিতচিত্তে বলিলেন, "এটা কেমন কথা, মা! আপনি এ কথা ফেরৎ নিন। শ্রীমা আপনাকে দীর্ঘজীবী করে রাখুন। রান্না করার সুযোগ আপনার জীবনে যে হয় নি সেটা শ্রীমা-ই দেন নি। তাহলে আপনার এত সব কাজ করতো কে? রান্নার কথা বলতে গিয়ে এ একটা কি অমঙ্গলের কথা বললেন আপনি! আপনার কথা ফেরৎ নিন।" মা মৃদুহাস্যে বলেন, "কি জানি মা, শ্রীমার যা ইচ্ছে। আর কি এখানে আসা হবে আমার, তোমাদের এই চাঁদের হাটে?" কন্যাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসা হবে, আপনাকে বার বার আসতে হবে এখানে। আপনি নিজে উচ্চারণ করে বলুন, 'আসব'। মা কোনমতেই তাহা বলিলেন না, কন্যাগণও ছাড়িবেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া মা পূর্বের বাক্যই পুনরাবৃত্তি করিলেন, "শ্রীমা আনলে নিশ্চয়ই আসব। তিনি যা করবেন তাই-ই তো হবে।"

এত আনন্দকলরবের মধ্যে কন্যাকুলের মন যেন সহসা বিষাদাচ্ছন্ন

হইল। কেন যে এই প্রসঙ্গ উঠিল, কেনই-বা মা এইভাবে কথা বলিলেন, তাহার কোন সমাধান হইল না। ভারাক্রান্তচিত্তে সেই দিনের চড়ুইভাতির বাকী অংশ সম্পন্ন হইল।

আরও কিছুদিন গিরিডিতে অতিবাহিত হয়। এক সন্ধ্যায় মায়ের ভাবরাজ্যের এক দিব্যচিত্র উন্মুক্ত হয় উশ্রী নদীর তীরে, তাঁহার জনৈকা কন্যা তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"জ্যৈষ্ঠের খরদাহের আকাশে সহসা দেখা দেয় প্রকাণ্ড এক কালো মেঘ। রৌদ্রতপ্ত আকাশে মেঘের শুভাগমনে সকলেই পুলকিত। সৌন্দর্যপিপাসু চিত্ত মায়ের, মেঘের ঐ রূপ তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলে উশ্রীর তীরে। কন্যারা চলেন পদব্রজে, মা একখানি রিক্সায়। উশ্রীর তীরে গিয়ে মা বলেন, 'যা সবাই নদীতে।' খরস্রোতা উশ্রী তখন শুষ্কমরুশ্রী ধারণ করেছে, তার বালির উপরে খেলা করা ছিল আমাদের অতি আনন্দের ব্যাপার। আর, এই খেলা দেখতে মা-ও ভালবাসতেন খুবই। মায়ের কথায় সকলেই গেল নেমে, বাদে আমি। দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর রিক্সাখানি ধরে।

"পরপারে দেখা যায়—কৃষ্ণমেঘচ্ছায়ার চন্দ্রাতপতলে রামসীতা আর হরগৌরীর মন্দির। শ্যামল মেঘের রহস্যময় সৌন্দর্যের প্রতি মায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সহসা মা বলেন, 'আহা, ঠিক যেন আমার প্রভুর গায়ের রঙ।' মায়ের দিকে এতক্ষণ লক্ষ্য রাখি নি, কিন্তু তাঁর সেই ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠেছি। দেখি তাঁর দিকে চেয়ে—এ কী! এ তো আমাদের সেই মা নন, এখন যেন ভিন্ন জগতের তিনি! কী অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমা তাঁর মুখমণ্ডলে! গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে এক অপার্থিব ও অনির্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হয়ে আছেন তিনি।..."

শারীরিক অসুস্থতার কোন উপশম না হইলেও মা মনের আনন্দে প্রায় দুই মাস গিরিডিতে রহিলেন। অতঃপর ২৮-এ জ্যৈষ্ঠ মায়ের

কলিকাতা প্রত্যাগমনের দিন ধার্য হইল। বিদায়মুহূর্তটি এইবার বড়ই মর্মস্পর্শী, অতিশয় করুণ। আশ্রমবাটীর সর্বত্র মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃক্ষলতাদিকে করস্পর্শে আদর করিলেন। গোমাতৃদ্বয়কে সম্মুখে আনয়ন করাইয়া প্রসাদ দিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিবারের মত খোকন সামন্তের মোটর বাস্ আসিয়াছে মায়ের সঙ্গীয় কন্যাগণকে এবং মাল-পত্র ষ্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য। মা যাইবেন ডাক্তার শ্রীসুখময় চৌধুরীর মোটরগাড়ীতে। চালক তিনিই স্বয়ং। যাত্রার প্রাক্কালে ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে আশ্রমপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমাতৃনিকেতনে অধিষ্ঠিত দেবতাগণকে প্রণাম নিবেদন করিয়া মা কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর নিজকক্ষে গিয়া কন্যাদের আদর ও আশীর্বাদ জানাইয়া বলিলেন, "মায়েরা সব, পবিত্র থেকো, ধর্মপথে থেকো। শ্রীমা তোমাদের হাত ধরে নিয়ে চলুন। মানুষের দেহ চিরদিন থাকে না, শ্রীমা আর গৌরীমার আদর্শই নিত্যবস্তু। আমরা তাঁদের কন্যা, এটাই সবচেয়ে বড় পরিচয়, এই গৌরব যেন তোমাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে, মা।"

মায়ের বিদায়সম্ভাষণে কন্যাগণ সকলেই করুণভাবে ক্রন্দন করিতেছেন, বলিতেছেন, "মাগো, এবার বড় বেশী মন কেমন করছে। আপনি আবার ভাদ্রমাসেই আসবেন। আমরা সেই অপেক্ষাতেই থাকবো। একটা একটা করে রোজ দিন গুণবো। আপনাকে ছেড়ে দিতে মন এবার একটুও চাইছে না।"

মায়ের চক্ষুও সজল। বাহিরের নাটমন্দিরে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। মোটরে উঠিতে গিয়াও আর একবার ফিরিয়া গিয়া কন্যাগণের মধ্যে কয়েকজনকে ডাকিয়া পুনর্বার আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর গৌরীমাতার সমাধিপীঠে প্রণাম নিবেদন অন্তে মা ধীরপদে শ্রীমাতৃনিকেতন হইতে যাত্রা করিলেন।

গিরিডির রেলষ্টেশনে বিদায়সন্ধ্যা।

মায়ের প্রত্যাবর্তনকালে প্রতিবারই অনেক ভক্তসন্তান ষ্টেশনে

উপস্থিত থাকেন, এইবারও তাঁহারা আসিয়াছেন। অধিকন্তু এইবার মায়ের অনুমতিক্রমে আশ্রমকন্যাগণও অনেকে আসিয়াছেন। যথা-কালে মাতৃপদধূলি গ্রহণ করিলেন সকলে অশ্রুসিক্ত বেদনায়। স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যাদিগের কাতরতাদর্শনে মায়ের অন্তরও বিচলিত। আর কি আসিতে পারিবেন তিনি গিরিডিতে,— শ্রীমাতৃনিকেতনে!

নির্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রযান চলিতে আরম্ভ করে।

গাড়ীর গবাক্ষপথে মুখ বাহির করিয়া হস্তসঞ্চালনে সকলের প্রতি মা শেষবার স্নেহাশিস জানাইলেন। যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিলেন তাঁহাদিগের দিকে।

প্রিয় শ্রীমাতৃনিকেতন, প্রিয় গিরিডি,—বিদায়! বিদায়!!

শেষের অধ্যায়

ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

বহু সন্তান হাওড়া ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছেন দুর্গামাকে দর্শন এবং সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মন বিষণ্ণ হইল; দীর্ঘকাল স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া আসিলেও মায়ের মুখমণ্ডলে দেখা যায় অদৃষ্টপূর্ব অবসন্নতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। প্ল্যাটফর্ম অতিক্রমকালে তাঁহার শ্বাসকষ্টের তীব্রতা দেখিয়াও অনেকেরই মনে হইল, এ দেহ আর কতদিন!

মায়ের প্রথম জীবনে একদিন শ্রীশ্রীসারদামাতা বলিয়াছিলেন, "বটগাছগুলো বুড়ো হয়েও মরে না, তাদের ঝুরি নাবে; নেবে মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার রসপুষ্ট হয়, মূল গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। তোমরা রইলে এই গাছের ঝুরি।" শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের ভাবধারাকে রসপুষ্ট এবং সম্প্রসারিত করিবার কল্যাণব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া, অগণিত নরনারীর আধ্যাত্মিক এবং ঐহিক জীবনের আশ্রয়স্থল, শ্রীমাতার চিহ্নিত এই ঝুরিটিও আজ বৃদ্ধ ও জীর্ণ,—জীবনসায়াহ্নে আসিয়া উপনীত।

গিরিডি হইতে প্রত্যাগমনের পর মায়ের দন্তমূলে তীব্র বেদনা অনুভূত হওয়ায় ডাক্তার এন. সি. বাড়রী দুইটি দাঁত তুলিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পূর্বেই একটি তীক্ষ্ণকোণ দাঁতের ঘর্ষণে জিহ্বায় ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল। চিকিৎসক উক্ত দাঁতটিও তুলিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন উহা সুদৃঢ় থাকায় মা এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। চিকিৎসায় যন্ত্রণার লাঘব হইল, কিন্তু ক্ষতটি নিরাময় হইল না, ইহার কারণ অধিক ব্লাডসুগার। ডায়বেটিসরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জে. পি. বসু ইতিপূর্বেই ইনসুলিন ইনজেকশনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কিন্তু মা উহা গ্রহণ করেন নাই। ফলে কেবল ঔষধসেবনে ব্লাডসুগার হ্রাস পাইল না। স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির

দিকে যাইতেছে, কিন্তু তাঁহার প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্ম, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম যথাপূর্ব চলিতে থাকে।

দৈহিক অসুস্থতাকে তিনি মানসিক বলের দ্বারা যতদিন সম্ভব দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও ছিলেন আনন্দ এবং সরসতার প্রতিমূর্তি। গিরিডি হইতে আসিবার পরও আশ্রমকন্যা-দিগের সহিত আলিপুর পশুশালায় গিয়া আনন্দ করিয়াছেন, শিশু-দিগের সঙ্গে কত হাস্যপরিহাস করিয়াছেন।

কিন্তু, ইদানীং আশ্রমবাটীর সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ তিনতলা হইতে একতলায় নামা-উঠা মায়ের পক্ষে ক্লেশকর হইতেছিল, অথচ প্রতিদিন দর্শনার্থী নরনারীর সমাগম। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য মায়ের প্রাণও ব্যাকুল, মা একতলায় না নামিয়া পারেন না। অবশেষে চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন, সোপানাবলী অতিক্রমকালে কয়েকটি ধাপের পরে চেয়ারে বসিয়া মা কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবেন, তৎপর পুনরায় নামিবেন। চেয়ারের ব্যবস্থা থাকিত, কিন্তু নামিবার ও উঠিবার সময় মা বহুদিনই এই নিয়ম মান্য করিতেন না। ইহাতে শ্বাসকষ্ট অধিকতর বৃদ্ধি পাইত।

প্রবীণ কবিরাজ শ্রীহৃদয়ভূষণ গুপ্ত মহাশয় বিভিন্নসময়ে মায়ের চিকিৎসা করিয়াছেন। এই সময়েও তাঁহার চিকিৎসা চলিতে থাকে। অবস্থাবিশেষে এ্যালোপ্যাথিক ঔষধও মা গ্রহণ করিতেন। এইবার ভাদ্রমাসে মায়ের কয়েকদিন জ্বর হয়, তাপমাত্রা উঠিত ১০৩° ডিগ্রী পর্যন্ত। আশ্রমের নিকটবর্তী চিকিৎসক শ্রীমণীন্দ্রকুমার সিংহ নানাভাবে মাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন, জ্বরের উপশম হইল। কিন্তু অতঃপরও মধ্যে মধ্যে জ্বরের প্রকোপ দেখা যাইত, আবার বিরতিও ঘটিত। ডাক্তার সিংহই ডায়বেটিসের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার জে. পি. বসুর পরামর্শ লইতে মাকে প্রথম অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শরীরের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তার জে. পি. বসু মাকে পুনরায় একদিন বলেন যে, ইনসুলিন ইনজেকশন ব্যতীত

উপকার হইবে না। মায়ের পুরাতন চিকিৎসক ডাক্তার অনাথনাথ বসুও মাকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেন। সকলের অনুরোধে মা অবশেষে মতের পরিবর্তন করিলেন একটি সর্তে, "যদি কেষ্টধন এসে ইনজেকশন দেয় তবেই আমি রাজী।"* মায়ের কেষ্টধন ইহাতে সাগ্রহে সম্মত হইলেন। প্রত্যহ দুইবেলা আশ্রমে আসিয়া তিনি ইনজেকশন দিতে আরম্ভ করিলেন। ব্লাডস্যুগার হ্রাস পাইতে থাকে, আবার কদাচিৎ বৃদ্ধির দিকেও যায়। এইভাবে দৈহিক অসুস্থতার হ্রাসবৃদ্ধির মধ্যে দিন অতিবাহিত হইতে থাকে।

চিকিৎসকের নির্দেশে ভাদ্রমাস হইতে মায়ের একতলায় নামা-উঠা নিষিদ্ধ হইল। অতঃপর আশ্রমের ২৪ নম্বর বাটীতে—পুরাতন বিদ্যালয়ভবনের দ্বিতলের হল-ঘরে ভক্তগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়।

এইপ্রকার দুর্বলতার মধ্যেও মায়ের গঙ্গাদর্শন-স্পৃহা হ্রাস পায় নাই। কোন কোন দিন সন্তানদিগের অগোচরে গাড়ী করিয়া মা গঙ্গাদর্শনে যাইতেন, অবশ্য, বয়স্কা কোন কন্যা সঙ্গে থাকিতেন। মায়ের অন্য এক আকর্ষণ ছিল কালীদর্শন। গঙ্গাদর্শন উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়া কালীমাতার দর্শনও করিয়া আসিতেন।

বার্ধক্যে অসুস্থতাকালে সকলেরই ইচ্ছা হয় দীর্ঘকালের সেবক সেবিকার পরিচর্যা গ্রহণ করিতে। মা করিলেন ইহার বিপরীত কার্য। তাঁহার সুদীর্ঘকালের একান্ত সেবিকা শ্রীসুচিত্রাপুরী দেবীকে গিরিডি আশ্রমের দায়িত্ব দিয়া মা কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বিদায়গ্রহণসময়ে বলেন, "আজ আমার লক্ষ্মণবর্জন

* প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৈশোরে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালেই গৌরীমাতা ও দুর্গামাতার স্নেহাধীনে আসেন। তাঁহারা তাঁহাকে কৃষ্ণকুমার এবং অতি আদরে 'কেষ্টধন' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি গৌরীমাতার মন্ত্রশিষ্য এবং আশ্রমের চিকিৎসক।

হলো।"* অবশ্য সুচিত্রা দেবীর অভাব পূরণ করিতে মাতৃগতপ্রাণা অন্যান্য কন্যা অগ্রসর হইলেন।

পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মায়ের প্রাত্যহিক নিয়মে সমগ্রদিবসের কর্মব্যস্ততা অন্তে অধিক রাত্রে প্রসাদগ্রহণ ছিল এক আনন্দের ব্যাপার। সন্ন্যাসিনীগণ অনেকেই তখন উপস্থিত থাকিতেন। শিশুকন্যাকুল জানিত যে, মা আহারকালে স্বহস্তে প্রসাদ দিবেন; সুতরাং নিদ্রার আরাম ত্যাগ করিয়া তাহারাও যথাসময়ে উপস্থিত থাকিত। রাত্রের সেই সমাবেশে নানাপ্রকার আলোচনা ও গল্প চলিত, তিনতলায় তখন বহিয়া যাইত এক অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ। কিন্তু মায়ের অসুস্থতাহেতু এখন ইহা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। একটি নিরানন্দভাব যেন দীর্ঘকালের আনন্দ উচ্ছলতাকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

১৩৭০ সালের আশ্বিনমাসে শারদীয়া মহাপূজা সমাগত। এই বৎসর বিভিন্ন পঞ্জিকার মতানৈক্য থাকায় দুইবার শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বিধান মান্য করিয়া মা উভয় মতেই অর্থাৎ দুইবার পূজা করিলেন। আশ্রমের পূজার অনুষ্ঠান নবম্যাদিকল্লারম্ভ হইতে সপ্তদশদিবসব্যাপী। আশ্রমে বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ব্যতীত এই কয়দিবস প্রত্যহ কালীঘাটের দেবীপীঠে পূজা-উপচার

* শ্রীসুচিত্রা দেবী গৌরীমাতার মন্ত্রশিষ্যা, কিন্তু কার্যতঃ দুর্গামাতার সেবার জন্যই যেন তিনি আশ্রমে আগতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্মকুশল, নিরলস, সদাসতর্ক। কোন্ মুহূর্তে মায়ের কি প্রয়োজন হইতে পারে, মায়ের পীড়ায় সঠিক কি কি বিবরণ চিকিৎসককে বলিতে হইবে, এবং কোন্ উপায়ে মায়ের যন্ত্রণার লাঘব হইবে,—সকলই একমাত্র তিনিই জানেন। মায়ের সুস্থাবস্থায়ও বিশেষ বিশেষ কার্যে তিনি মায়ের দক্ষিণহস্ত এবং অপরিহার্য। যখন গিরিডি শাখার প্রয়োজনে সুচিত্রা দেবীকে পাঠাইতে হইয়াছিল, মা তখনই জানিতেন যে, তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না; সেই কারণেই বলিয়াছিলেন, "আজ আমার লক্ষ্মণবর্জন হলো।"

প্রেরিত হয়। মহানবমীতিথিতে হয় বিশেষ ব্যবস্থা। গৌরীমাতার সময় হইতেই এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। কন্যাগণ ইদানীং সিদ্ধেশ্বরীতলা, ঠনঠনিয়া, দক্ষিণেশ্বর এবং শ্যামনগরের মাতৃমন্দিরেও মায়ের কল্যাণে মহানবমীতে পূজার ব্যবস্থা করেন।

অসুস্থতাসত্ত্বেও প্রথমবিহিত পূজার মধ্যে মা একদিন কালীঘাটে গমন করেন। সকলেই তাঁহাকে এবম্বিধ প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মা গিয়াছেন। শ্রীবিধুবালা দেবী অনেক মিনতিসহকারে তাঁহাকে বলেন, "মা, আপনার দেহ এখন সুস্থ স্বাভাবিক নয়, কেন আপনি অতদূরে এমন করে ভিড়ের মধ্যে যান? এখন অল্পেতেই যে হাঁপিয়ে পড়েন। আপনি যেখানে পূজো করবেন মা কালী সেখানেই আছেন।' উত্তরে মা বলিলেন, 'মাগো, বৃদ্ধ হয়েছি, আর তো পুরী যেতে পারবো না। মায়ের মুখখানি আমার প্রভু জগন্নাথের মতই, তাই তো ছুটে ছুটে ঐ মুখখানি দেখতে যাই। এই যে এত শ্বাসকষ্ট, মন্দিরে অত যে মানুষের ভিড়, যখন ঐ মুখ দর্শন করি তখন কষ্টের কিছুই বোধ থাকে না। আনন্দ পাই।"

লেখিকাকে এইসময়ে মা একদিন বলেন, "কালীঘাটে পূজো পাঠানো কখনো যেন বন্ধ করিস্ নি। তোর যদি সাধ্যে কুলোয়, মহানবমীতে মাকে সোনার নথ আর গরদের সাড়ী দিয়ে পূজো দিস্। যখন যেমন তোর সাধ্যে কুলোবে, সেইভাবেই করবি।" এইবারও মায়ের দীর্ঘজীবন কামনায় মহানবমীতে কালীঘাটে এবং বিভিন্ন কালীমন্দিরে বিশেষ পূজা দেওয়া হইল।

১১ই আশ্বিন সন্ধ্যায় আশ্রমের পরামর্শ-সভার এক অধিবেশন আহ্বান করা হয়। মা সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সদস্যগণ—বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, ডাক্তার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর মায়ের শারীরিক অবস্থা দর্শনে বিচলিত হইলেন, বুঝিলেন তাঁহার দেহ আর অধিকদিন

থাকিবে না। তাঁহারা মায়ের নিকট অনুরোধ জানাইলেন, আশ্রমের স্বার্থে, সমাজের কল্যাণে আরও কিছুকাল আপনার দেহধারণ প্রয়োজন। স্মিতবদনে মা বলেন, "আমি তো আশ্রম ছেড়ে যেতে ব্যাকুল হই নি, কিন্তু থাকা না-থাকা শ্রীমার ইচ্ছে।" সভাশেষে মা স্বহস্তে সকলকে প্রসাদ প্রদান করিলেন। মায়ের জীবদ্দশায় ইহাই সভার শেষ অধিবেশন।

ইতিমধ্যে শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে পাণ্ডা শ্রীগঙ্গাধর দৈতাপতি প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ, তুলসীপত্র এবং ডোরক সহ আশ্রমে আগমন করেন।* অকস্মাৎ তাঁহার উপস্থিতি ও নানাপ্রকার প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে মা পরম আহ্লাদিত হইলেন। পাণ্ডাজী ডোরকটি মায়ের হস্তে অর্পণান্তে বলেন, "এটি প্রভুজী আপনাকে দিয়েছেন, যত্ন করে রেখে দিন।" মা তাহা সানন্দে গ্রহণপূর্বক জনৈক সন্তানের হস্তে দিয়া বলিলেন, "বাবা, প্রভুজীর ব্যবহৃত এই ডোরটি যত্ন করে রেখে দাও, যেদিন তাঁর কাছে রওনা হব, সেদিন আমার হাতে এটি বেঁধে দিও।"

দ্বিতীয়বিহিত দুর্গাপূজা কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে। সেইবার পূজার কয়দিনই বৃষ্টিপাত হওয়ায় কন্যাগণ মাকে বিদ্যালয়ভবনের দ্বিতলেও নামিতে দিলেন না। সুতরাং সমাগত পুরুষ সন্তানবৃন্দ মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে মাতৃদর্শন হইতে বঞ্চিত হইলেন। মহিলাগণ আশ্রমবাটীর ত্রিতলে গিয়া মায়ের দর্শন পাইলেন। মহানবমী দিবসের সন্ধ্যাবেলা সকলেই মাতৃদর্শন লাভ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতিদানে আশাহত সন্তানবৃন্দকে তুষ্ট করা হইল। নামিতে পারিতেছেন না বলিয়া মা নিজেও অতিশয় দুঃখিত। উপরে বসিয়াই তিনি সকল সন্তানের কুশলপ্রশ্ন করিয়া আশীর্বাদ জানাইলেন।

৮ই কার্তিক সেই বহুবাঞ্ছিত মহানবমী পুণ্যতিথি। মায়ের

---

* ডোরক—প্রভু জগন্নাথদেবের স্পর্শপূত পট্টরজ্জুবিশেষ।

জীবনযাত্রার অষ্টষষ্টিতম বর্ষ আরম্ভ, শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের আনন্দ-উৎসবের দিন।

আশ্রমকন্যাগণ সভয়-আনন্দে আজিকার মহাতিথির উৎসব-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমবাটীর ত্রিতল মঙ্গলকলস, আলিম্পন এবং পুষ্পপত্রে সুশোভিত। সমাগত মহিলাবৃন্দের অনুরোধে স্নেহময়ী মাতা সজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। শঙ্খনাদ, স্তোত্রপাঠ এবং বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ধান্যদূর্বাসহযোগে জনৈকা আশ্রমকুমারী মাতাকে আশীর্বাদ করিলেন। মহিলাবৃন্দের বিবিধ উপচার-উপহার এবং প্রণাম মা গ্রহণ করিলেন, সকলকে আশীর্বাদ ও প্রসাদ দিলেন। সকলেই লাভ করিলেন অপার তৃপ্তি।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল পুরাতন বিদ্যালয়ভবনে। দ্বিতলের 'ডায়াস' আলিম্পন, পুষ্পমাল্য ও নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যে সুসজ্জিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই মাতৃদর্শনাভিলাষী নারীভক্তবৃন্দ আশ্রমবাটীর একতলে ও পুরুষভক্তগণ নূতন বিদ্যালয়-ভবনে দলে দলে আসিয়া সমবেত হইলেন। সর্বপ্রথম মাতৃচরণ-বন্দনার আকাঙ্ক্ষায় অদর্শনকাতর সন্তানগণের অনেকে পুরাতন বিদ্যালয়ভবনের সম্মুখস্থ পথিমধ্যেই অধীরচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—কোন্ মুহূর্তে প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইবে।

কিন্তু, এহেন সন্ধিক্ষণে মা অত্যধিক দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষে পার্শ্ববর্তী বাটীর দ্বিতল পর্যন্ত গমন হয়তো সম্ভব হইবে না। সেবিকাগণের মহাদুশ্চিন্তা—মায়ের পুণ্যজন্মতিথি দিবসে একটিবার চাক্ষুষ দর্শন হইতে, তাঁহার আশীর্বাদপ্রাপ্তি হইতে সন্তানদিগকে কোন্ প্রাণে আজিও বিমুখ করা হইবে।

এমন সঙ্কটকালে ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। সেবিকাগণ নিরাশার মধ্যে যেন দেখিতে পাইলেন আশার আলোক। ডাক্তারসন্তান উপরে গিয়া মায়ের দেহ পরীক্ষান্তে সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। মা পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিলে চিকিৎসকের সম্মতিতে সেবিকা কন্যাগণ মাকে

অতিসাবধানে লইয়া আসিলেন উৎসবসভায়। মায়ের সান্নিধ্যে চিকিৎসক সর্বক্ষণ উপস্থিত রহিলেন।

কন্যাগণ মায়ের কণ্ঠদেশে সুগন্ধমাল্য অর্পণ করিলেন। বরণ করিলেন তাঁহাকে শুভ শঙ্খধ্বনি ও অষ্টষষ্টি প্রদীপের আলোকে, যেন দেবীবরণের দিব্য অনুষ্ঠান। নরনারী সুশৃঙ্খলভাবে একের পর এক আসিয়া মাতৃচরণে প্রণাম, পুষ্পমাল্য, স্তবক, বস্ত্র, ফল, মিষ্টান্ন নিবেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কল্যাণে সন্তানবৎসলা মাতা অন্তরের শুভাশিস উজাড় করিয়া দিলেন। সন্তানবৃন্দ মাতৃ-দর্শনে কৃতার্থ, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন।

প্রতিবৎসর শারদীয় মহাসপ্তমীদিবসে মা আশ্রমকন্যাদিগকে লইয়া বিভিন্ন পূজামণ্ডপে প্রতিমাদর্শনে যাইতেন। কন্যাকুল অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকিতেন এই দিবসটির। এইবার অসুস্থতাহেতু মা তাঁহাদের সহিত যাইতে পারেন নাই, প্রাচীনা কয়েকজন সন্ন্যাসিনীর তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে প্রতিমাদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন। দশমীদিবসে জনৈকা কন্যাকে বলেন, "এই পথ দিয়ে প্রতিমা গেলে আমায় দেখাবি।" মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে দুইখানি দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনযাত্রায় আশ্রমবাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া গমন করেন। মা তাঁহাদিগকে দর্শন এবং করজোড়ে প্রণাম করিলেন।

মহানবমীদিবসের পরিশ্রমের ফলে মা পুনরায় জ্বর ও কাশিতে আক্রান্ত হইলেন। তৎসত্ত্বেও দশমীদিবসে সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ভবনের ত্রিতলে তিনি সন্তানদিগের ৺বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করিলেন। এইভাবেই সকলের সহিত সাক্ষাৎ হয় কোজাগরী পূর্ণিমার পূর্বদিবস পর্যন্ত। শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা দিবসে দুর্বল দেহে উপবাসী থাকিয়া মা স্বয়ং দেবীপূজার সকল কৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

১৮ই কার্তিক মায়ের জ্বরের বিরতি ঘটিল, কিন্তু দেহ অত্যন্ত দুর্বল, আহারে অরুচি। মধ্যাহ্নে মা দুগ্ধসহ বার্লিগ্রহণ করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল গভীর নিদ্রা। অপরাহ্ণ অতিবাহিত

হইল, সায়াহ্নও। রাত্রি আট ঘটিকাতেও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সেবিকাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে টেলিফোনে মায়ের অবস্থা জানাইলেন। তিনি অবিলম্বে আসিয়া মাকে দেখিলেন এবং তাঁহার শরীর হইতে রক্ত লইয়া নিজে রক্তপরীক্ষকের নিকট চলিয়া গেলেন। মা তখনও নিদ্রামগ্ন। কন্যাগণ চিকিৎসকের পুনরাগমন এবং রক্তপরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তারসন্তান টেলিফোনে জানাইলেন, অবিলম্বে বিশেষরকমের ইনজেকশন দিতে হইবে, সকলপ্রকার ব্যবস্থাসহ তিনি আসিতেছেন, এখনই আর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন। মায়ের সন্তান ডাক্তার শ্রীসনৎকুমার গুপ্তকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আশ্রমভবনে উপস্থিত হইলেন।

রক্তপরীক্ষায় জানা যায়—মায়ের ব্লাডসুগার ছয়শতেরও উপরে। অভাবনীয়, অস্বাভাবিক, সঙ্কটজনক অবস্থা। অতঃপর ইনজেকশন আরম্ভ হইল, ঐ নলের মধ্য দিয়াই কিছু সময় পর পর ইনসুলিন ও নানাপ্রকার ঔষধ চলিল। কিন্তু নূতন এক উপসর্গ দেখা দিল—সর্বদেহে প্রচণ্ড কম্পন। এই অবস্থা কিছুসময় চলিবার পর দেহের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১০৪° ডিগ্রী জ্বর উঠিবার পর ধীরে ধীরে কম্পনের উপশম হইল।

রাত্রির শেষযামে পুনরায় নূতন অবস্থা, দেহ এমন ঘর্মসিক্ত হইল যে শয্যা ভিজিয়া গেল। পূর্বদিবসের মধ্যাহ্ন হইতে বহুঘণ্টা পরে এইবার মায়ের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেছে, আবার মাঝে মাঝে লোপ পাইতেছে। অবশেষে সেই উদ্বেগপূর্ণ সঙ্কটরজনীর অবসানে মায়ের আচ্ছন্নভাব সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইল।

প্রাতে চক্ষু মেলিয়া দুইজন চিকিৎসককে পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া মা বিস্মিত হইলেন, এবং বুঝিলেন—গতরাত্রে নিশ্চয়ই দেহের কোনপ্রকার বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। চিকিৎসকদ্বয় হয়তো সমগ্ররাত্রি অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। লজ্জিত

ও দুঃখিত মনে মা বলিলেন, "আমার জন্য তোমাদের কত কষ্ট হয়েছে, বাবা। এখন তো ভাল আছি। বাড়ী গিয়ে তোমরা একটু বিশ্রাম নাও গে এখন।" পরম মমতায় মাতা স্নেহভাজন পুত্রদ্বয়ের মস্তকে দক্ষিণহস্ত স্থাপনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। চিকিৎসকদ্বয় চলিয়া গেলে কন্যাগণের অনুরোধ ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মা শয্যাত্যাগান্তে প্রাত্যহিক রীতিতে স্নান করিয়া পূজা সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর আশ্রমের দৈনিক কাজকর্মের বিবরণ শুনিলেন, রসিদপত্রে দস্তখত করিলেন। হিসাবপত্রের ভারপ্রাপ্ত কন্যাকে বলেন, "হিসেবের দায় তোমার, আশ্রমের যেন নিন্দে না হয়।" মায়ের আচরণে মনে হইল—তাঁহার অবস্থা স্বাভাবিক।

এইদিবস দ্বিপ্রহরে ডাক্তার জে. পি. বসু, ডাক্তার মণি দে-প্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আসিয়া মাকে দেখেন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্লাডস্যুগারের রিপোর্ট দেখিয়া বিস্ময়ে চিকিৎসকগণ মন্তব্য করিলেন,—rare case (খুবই বিরল)। ইনি এখনও যা সব করছেন, ইনি বলেই পারছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাঁহাদের প্রস্থানের পর মা শয়ন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রামগ্নও হইলেন।

পূর্বরাত্রেই গিয়াছে আশঙ্কাজনক অসুস্থতা, কিন্তু অদ্য দ্বিপ্রহরে মায়ের কী রূপ! ললাটে কুঙ্কুমচন্দন শোভা পাইতেছে, পরিধানে রহিয়াছে লালপাড় গৈরিক সাড়ী, কেশরাশি বিস্রস্ত। অপরূপ দেখাইতেছে তাঁহাকে। মায়ের নয়নদ্বয় নিমীলিত, আননে সহসা দেখা যায় সুমিষ্ট হাসি। দুইবাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। কন্যাগণ ইতস্ততঃ করিতেছেন বুঝিয়া মা বলিলেন, "ওরে, তোরা আমায় ধরে তোল্। একটা প্রণাম করব।" বিস্ময়াবিষ্ট কন্যাগণ মাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া বসাইয়া দিলেন। মা গলবস্ত্রে যুক্তকরে কাহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় তখন উপস্থিত ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মা, কাকে প্রণাম করলেন? বাবা জগন্নাথ নাকি?" পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে মা হাসিলেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্ মোহিনীমোহন শাস্ত্রী ছিলেন মায়ের পরিচিত এবং মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি এইসময়ে মায়ের রাশিচক্রের বিচার করিয়া বলেন যে, মায়ের আয়ুস্থানে শনি রাহু কেতুর অশুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। দৈবকৃপালাভের আশায় আশ্রমে বিশেষভাবে পূজাপাঠাদির ব্যবস্থা হইল। বয়স্কা কন্যাগণের কেহ কেহ মহানিশায় জপ করিতে আরম্ভ করেন, মায়ের জীবনরক্ষার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান। অবশ্য, ইতিপূর্বেও মায়ের স্বাস্থ্যোন্নতির কামনায় কোন কোন সন্তান জয়রামবাটীর মাতৃপীঠ ও সিংহবাহিনীর মন্দিরে এবং শ্রীশ্রীতারকনাথের নিকটে গিয়া পূজা নিবেদন করিয়াছেন।

একদিন মা আশ্রমবাসিনী কয়েকজন গায়িকা কন্যাকে বলেন, "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে" গানটি আমায় শোনা। মায়ের এই নির্দেশ শুনিয়া তাঁহাদের অন্তর আশঙ্কায় ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, তাঁহারা শ্মশানের এই গানটি গাহিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না।

একদিন শ্রীনীলিমা দেবী নাম্নী এক গৃহস্থ কন্যাকে মা বলেন, "মা, তুমি আমাকে একটি বড় বাজা-ঘড়ি দিও। আমাকে ওপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় কি-না।" কন্যাটি যথাসত্বর মাতৃ-আদেশ পালন করিলেন। দোকানের লোক আসিয়া উহা মায়ের দৃষ্টির সম্মুখে বসাইয়া দিয়া গেলেন।

ঘড়ির ব্যবস্থার পর আরম্ভ হইল মায়ের পঞ্জিকা দেখা। প্রত্যহ পঞ্জিকা খুলিয়া কি যেন দেখেন। কি দেখিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে নিরুত্তর থাকেন, মুখে মৃদুহাস্য।

অবশেষে, ১৩৭০ সালের ২৭-এ কার্তিক, (১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৩), বৃহস্পতিবার, শ্যামাচতুর্দশী।

অতিপ্রত্যূষে মা বলেন, "আমার স্নানের ব্যবস্থা আজ সকাল সকাল করে দাও তোমরা, এরপর মুশ্‌কিল আছে।" মুশ্‌কিল যে কিসের তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিলেন না। মাকে অতিসত্বর স্নান করাইয়া পূজার আসনে বসাইয়া দেওয়া হইল। কম্পিতহস্তে কিন্তু দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি প্রিয়তম দামোদরলালকে তুলিয়া বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিলেন, ললাটে ধারণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার স্নান, পূজা, ভোগ এবং আরাত্রিকাদি সম্পন্ন করিলেন। বহুদিন মা প্রার্থনা জানাইয়াছেন, "আমি যেন শেষদিনও নারায়ণকে তুলসীচন্দন দিয়ে যেতে পারি"; বহুদিন মা দৃঢ়প্রত্যয়ে বলিয়াছেন, "শ্রীমার কাছে যাবার দিনও আমি লালজী মহারাজকে নিজের হাতে পূজো করে তবে যাব।" নিষ্ঠাবতী সাধিকার এই ঐকান্তিক বাঞ্ছা শ্রীশ্রীদামোদর-নারায়ণ পূর্ণ করিয়াছেন। শারীরিক চরম অস্বাচ্ছন্দ্যসত্ত্বেও মা পূজা সমাপন করিলেন। এবং আজিকার এই পূজাই মায়ের বাঞ্ছিত শেষ পূজা।

পূজা অন্তে মালা জপ করিলেন। নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ কন্যাগণ সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন, পাঠ করিতে করিতে মা ইঙ্গিত করিলেন তাঁহাকে শয্যায় লইয়া যাইবার জন্য। কন্যাগণ মাকে তুলিতে গিয়া দেখেন, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে ধরিয়া অতিসন্তর্পণে শয্যায় আনয়ন করা হইল। অতঃপর দেখা গেল, তাঁহার দুই হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ নীলাভ, ওষ্ঠদ্বয়েরও বর্ণ অনুরূপ, সর্বাঙ্গ হিমশীতল। চারিদিকে বালিশ দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় তাঁহাকে রাখা হইল।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে টেলিফোনে মায়ের অবস্থা জানাইলে তিনি অবিলম্বে আসিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে অক্সিজেন সিলিণ্ডার আনা হইল। অতঃপর অক্সিজেন দেওয়া আরম্ভ হয়। মা ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিলেন, এবং অতি মৃদুস্বরে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নিকটবর্তী সেবিকাগণের কর্ণে অস্ফুটধ্বনি আসিতে লাগিল "জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।" চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া মা কি যেন অন্বেষণ করিতেছেন। উপস্থিত অনেকের মনে হইল, তিনি বোধ হয় প্রভু জগন্নাথদেবের ও শ্রীসারদামাতার পট দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ প্রভু জগন্নাথ, শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ, গৌরীমাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দজীর প্রতিকৃতি তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাচীরগাত্রে রক্ষিত হইল। ইহাতে মা প্রসন্ন অন্তরে বলিলেন, "এ-যে দেখছি সব সে রাজ্যের।"

এইসময় জনৈকা কন্যাকে বলিলেন, "মাতৃপূজো যেন ভাল করে হয়।" অপর একজন সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অমাবস্যাটি পালন করো, মা।" সকলেই মায়ের নির্দেশে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। আশ্রমের অনেক কন্যা সেইসময় কাতর দৃষ্টিতে দ্বারদেশ হইতে মাকে দেখিতেছেন। মায়ের শয্যাপার্শ্বে বহিরাগত বহু মহিলা দণ্ডায়মান থাকায় তাঁহারা মায়ের অতিনিকটে আসিতে পারিতেছেন না। চিকিৎসকগণ মহিলাদিগকে বসিতে বলিলেন। মা কি বুঝিলেন তাহা তিনিই জানেন, মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ওদের কিছু বলো না, ওরা আমার আশ্রমের মেয়ে।"

বালিশের সাহায্যে পূর্ববৎ মা বসিয়া আছেন। ক্রমশঃ মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্নও অতীত হইল। সূর্যদেব অস্তাচলগামী। তাঁহার রক্তিম কিরণচ্ছটা হেমন্তের আকাশকে দিবসের শেষ আশীর্বাদ জানাইয়া বিদায় লইল। সন্ধ্যা তাহার তমসাচ্ছন্ন সজ্জায় রাত্রির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বহির্বাটীতে অপেক্ষমাণ সন্তানগণ পুনঃপুনঃ মায়ের সংবাদ লইতেছেন। মা হস্ত দুইখানি তুলিয়া সকলের উদ্দেশে বলিলেন, "মেয়েরা, মায়েরা সকলে আনন্দে থাক, সকলকে আশীর্বাদ। আমার সন্তানরা মাতৃগতপ্রাণ, তাদের সকলকে আশীর্বাদ।" মহিলাগণকে মা স্বহস্তে প্রসাদ দিলেন।

দর্শনার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইলে একজন কন্যাকে মা পঞ্জিকা দেখিতে বলিলেন,—চতুর্দশী শেষ হবে কখন? অমাবস্যাই-বা পড়বে কখন? পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্রের হিসাব শুনিয়া মা বলেন, "আমার পূজো কাল হবে।" এই বাক্যের তাৎপর্য কি, ইহা কিসের ইঙ্গিত,

তখন কাহারও তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিবার অথবা হৃদয়ঙ্গম করিবার অবস্থা ছিল না।

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীদামোদরলালকে চারিতলার মন্দির হইতে ত্রিতলে গৌরীমাতার শয়নকক্ষে আনয়ন করা হইলে মা বলিলেন, "মহারাজজী এসেছেন!" মা নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই আর একজন প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাকে দেখিতে আসিলেন। মায়ের দেহ পরীক্ষান্তে নিরাশ হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। জনৈকা কন্যাকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় ডাক্তার কি বলে গেল রে?" কন্যাটি বলিলেন, "ডাক্তারবাবু বললেন, চিকিৎসা ঠিকমতই চলছে। উনি একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন আপনাকে খাওয়াতে।" ইহা শুনিয়া মা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া বলিলেন, "কিস্‌সু হবে না।" কন্যাটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। উপস্থিত সকলে তখন কাতর হইয়া মাকে বলেন, "মা, একটু দয়া করুন। এত নিষ্ঠুর হবেন না। আপনি শুধু ইচ্ছে করুন—আপনি দেহে আরও কিছুদিন থাকবেন।" মা বলিলেন, "সব শ্রীমার ইচ্ছে, মা।"

অতঃপর কলিকাতা আশ্রমের কন্যাগণের অনেককে, এমন-কি শাখা-আশ্রম হইতে যাঁহাদের পক্ষে আসা সম্ভব হয় নাই, মা তাঁহাদেরও অনেকের নাম ধরিয়া অতি স্নেহভরে ডাকিলেন। বুঝা গেল, তিনি কাহাকেও ভুলেন নাই। যাঁহারা নিকটে আসিলেন, তাঁহাদের চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সব খেয়েছ, মায়েরা?" কন্যাগণ বলিলেন, "আগে আপনি কিছু খান, মা।"

প্রভাত হইতে একবিন্দু জলও মা গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র তুলা ভিজাইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়কে সিক্ত রাখা হইয়াছে। রাত্রি প্রায় এগারো ঘটিকায় ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এবং ডাক্তার গুপ্ত পুনরায় ইনজেকশনের ব্যবস্থা করিতেছেন। মা তাঁহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া স্বগতোক্তিতে বলিলেন, "এসব আর কেন?

এখন তো মৃত্যুপথযাত্রী !" মায়ের এইপ্রকার নিদারুণ উক্তি শ্রবণে মুহ্যমান কন্যাগণের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যাগণ মাকে কিঞ্চিৎ পথ্য দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে তিনি তাঁহার নিত্যব্যবহৃত ছোট দর্পণখানি চাহিয়া স্বীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিলেন। যেন বিজয়াদশমী দিবসে দেবীর দর্পণ দর্শন হইল।

পথ্য আনিলে কন্যাদের প্রার্থনানুযায়ী মা দুগ্ধসহ বার্লি পান করিলেন। একজন সেবিকা মাকে বলেন, "মা, এখন পৌনে বারোটা, আপনি শুয়ে পড়ুন। ঠিক দুটোয় আমি ডাকবো, তখন কিন্তু একটু ফলের রস খেতে হবে।" মা ঈষৎ হাসিলেন মাত্র।

অনুরোধ করা সত্ত্বেও মায়ের নিদ্রার ইচ্ছা বা আগ্রহ দেখা গেল না। বালিশে হেলান দিয়া পদদ্বয় প্রসারিত করিলেন। কন্যাগণ জিজ্ঞাসা করেন, "কোন কষ্ট হচ্ছে, মা?" উত্তরে মা অতি প্রশান্তভাবে বলেন, "না মা, ভাল আছি, কোন কষ্ট হচ্ছে না আমার।" ইহার পরেই মা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপিত দেব-দেবীর পটসমূহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উচ্চারণ করিলেন, "মা ত্রিপুরাসুন্দরী!"

ইহাই মায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শেষ কথা।

মাতৃনাম উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার বদনমণ্ডল এক দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। এই আকস্মিক পরিবর্তন দর্শনে সেবিকাগণ আতঙ্কিত হইয়া অদূরে অপেক্ষমাণ ডাক্তার মুখোপাধ্যায়কে ডাকিলেন। মায়ের দেহ পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিলেন—মা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

দীপ নিভিয়া গেল। সব শেষ।

সেই নূতন বড় ঘড়িটিতে তখন বারোটা বাজিতেছে। মহানিশা। ঘড়ির মাধ্যমে উপরের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা মা এই সময়েই হয়তো স্থির করিয়াছিলেন।

ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় আশ্রমকন্যাগণ চারিদিকে মাতৃপদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উপরের ক্রন্দনরোল শ্রবণমাত্র নীচে মাতৃগতপ্রাণ সন্তানবৃন্দও হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

আশ্রমের যিনি প্রাণস্বরূপ, সকলের আনন্দের যিনি মূল উৎস, যাঁহার মুখের সুমিষ্ট হাসি এবং প্রেরণার বাণী সকলের প্রাণে সঞ্চার করিত অমিত বল এবং অপার আনন্দ সেই পরম স্নেহময়ী মা আর নাই,—এই কথা কেহই ধারণা করিতে পারিতেছেন না। এক মহাশূন্যতায় সকলের অন্তর অভিভূত। কিভাবে যে কালরাত্রি অতিবাহিত হইল কেহই বুঝিলেন না।

রাত্রিশেষে স্থির হইল, প্রভাতের পূর্বেই মায়ের দেহ নূতন বিদ্যালয়ভবনে স্থানান্তরিত করা হইবে। কন্যাগণ ধীরে ধীরে চন্দন-কুঙ্কুমে মায়ের ললাট চর্চিত করিলেন। দেহ আচ্ছাদিত করিলেন নূতন গৈরিকবস্ত্রে এবং চরণ দুইখানি রঞ্জিত করা হইল অলক্তকরাগে। প্রভু জগন্নাথদেবের পূর্বোক্ত ডোরকটি বাঁধিয়া দেওয়া হইল মায়ের বামবাহুতে, বক্ষোদেশে শোভা পাইল প্রভুর অঙ্গসজ্জার সেই সোলার অলঙ্কার, যাহা মা স্বয়ং শেষযাত্রায় শ্রীক্ষেত্র হইতে আনিয়া সযত্নে রাখিয়াছিলেন।

যথাকালে মায়ের পূত দেহ বহন করিয়া বিদ্যালয়ভবনে লইয়া যাওয়া হইল। তক্তপোষের উপর দেহখানি শায়িত, মনে হইতেছে যেন প্রভু জগন্নাথদেবের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মা সকলকে নিকটে আহ্বান করিতেছেন।

সংবাদপত্রে এই নিদারুণ বার্তা প্রচারিত হইয়াছে, টেলিফোন-যোগেও অনেকে ইহা জানিয়াছেন। প্রত্যুষ হইতেই আশ্রমবাটী লোকারণ্য হইয়া গেল। মাতৃহারা রোরুদ্যমান সন্তানসন্ততি মায়ের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। সে যে কী মর্মন্তুদ ক্রন্দন, কী বক্ষোভেদী হাহাকার! পুষ্পমাল্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্তূপীকৃত হইতেছে মাতৃ-অঙ্গে, তাহা অপসারিত হইতেছে, পুনরায় স্তূপীকৃত হইতেছে। বেদনাকাতর নরনারী মায়ের চরণে এবং হস্তে তাঁহাদের মস্তক

স্পর্শ করাইতেছেন, কেহ কেহ বা নববস্ত্রখণ্ডে অলক্তকরঞ্জিত পদচিহ্ন সংগ্রহ করিতেছেন।

জনস্রোতের বিরাম নাই।

গঙ্গাতীরে কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে কীর্তন-সহযোগে শোকযাত্রা আরম্ভ হইল দ্বিপ্রহরে। অগণিত নরনারী পদব্রজে মায়ের অনুগমন করেন। কেহ কেহ তাঁহার রৌদ্রতপ্ত মুখখানির উপর ছত্রধারণ করিয়া চলিলেন। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে পথচারিগণ সন্ন্যাসিনী মাতাজীর প্রতি করজোড়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করেন। বেলা প্রায় দুই ঘটিকায় কাশীপুরে পৌঁছিয়া দেখা গেল, পূর্ব হইতেই মায়ের শেষদর্শনের আশায় এক বিরাট জনতা তথায় অপেক্ষা করিতেছে। সেই জনসমাবেশের মধ্য দিয়া কোনক্রমে মায়ের দেহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিমন্দিরের সম্মুখে রক্ষিত হইল।

কলিকাতা কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করা হইয়াছিল যাহাতে কাশীপুরে গৌরীমাতার সমাধিমন্দিরের পার্শ্বেই দুর্গামাতার দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা যায়। কলিকাতার তৎকালীন মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া সেই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গৌরীমাতার মন্দিরের পূর্বপার্শ্বে তাঁহার উত্তরসাধিকার জন্য শয্যা রচিত হইল। গঙ্গোদকে অভিষেকান্তে আশ্রম-কন্যাগণ নববস্ত্র পরিধান করাইয়া পূজা ও ধূপদীপসহকারে মায়ের আরাত্রিক করিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নও প্রদান করা হইল। অতঃপর শেষশয্যায় শায়িত করা হয় তাঁহার দেহ। আশ্রমের সন্ন্যাসিনীগণ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিলে মায়ের প্রথমা শিষ্যা অগ্নিস্পর্শ করাইলেন মাতৃশিরে।

উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর জয়ধ্বনি এবং আর্তনাদের মধ্যে অনলদেব ধীরে ধীরে মায়ের কুসুমকোমল বরতনুখানিকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। সমাগত নরনারী চিরস্নেহময়ী মাতার উদ্দেশে ঘৃতসিক্ত চন্দনকাষ্ঠে শেষ আহুতি প্রদান করিলেন।

ইহলোকে লোককল্যাণের মহান ব্রত সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর প্রিয়তমা মানসকন্যা—'দেবপূজার পবিত্র ফুল' চন্দনানুলিপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বলোকে তাঁহারই শ্রীচরণে গিয়া পুনরায় মিলিত হইলেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কাশীপুর শ্মশানে গৌরীমাতা ও দুর্গামাতার সমাধিমন্দির

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

যাঁহাদের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি, উক্তি, পত্র ইত্যাদি এইগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—

শ্রীমণিমালা নাগ	৩০১	শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	৪৩০
মতিলাল রায়	৩৬৮	শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ	৩৩১
স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২৩১	ডাক্তার শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত	৪৫৩
মহেন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৯	শ্রীসবিতা ব্রহ্মচারী	৩০০
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ	২৩১	ডক্টর শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ	২৬৪
শ্রীমায়ারাণী পাল	৪৪০	সরলাবালা সরকার	১৬৪
শ্রীমায়া সেন	৪১২	শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ	৭
শ্রীমীরা সেন	৪১০	শ্রীসুতপাপুরী দেবী	৮৩
রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ	৩৭৯	শ্রীসুধাময়ী সেন	৩৩৭
শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩৬৭	অধ্যক্ষা শ্রীসুপ্রভা চৌধুরী	৪৩৮
শ্রীলাবণ্যপ্রভা রায়	৩৪৭	শ্রীসুবোধবালা রায়	৩৪৩
ডাক্তার শ্রীলীলা ঘোষ	৩০৭	সুবোধ রায়	২৯২
শ্রীশোভাময়ী বসু	৩১২	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চন্দ	৩৮৩
শ্রীশোভারাণী চট্টোপাধ্যায়	৩২৭	শ্রীসুশীলকুমার সিংহ	৪৪৩
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫০	অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী	৪৩৪

দুর্গামাতার কতিপয় সন্তান গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

তাপসী প্রেসের পরিচালকগণ গ্রন্থমুদ্রণে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছেন।

ব্লক ও চিত্রমুদ্রণে—রেডিয়েণ্ট প্রোসেস্।

প্রচ্ছদপট অঙ্কনে—শ্রীবলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

ফটোগ্রাফীতে—শ্রী জি. আর. নায়ার।

বাঁধাই—নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

পূর্বোক্ত সকলকেই আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।